চতুর্থ বর্ষ

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সম্পাদক

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫২—আষাঢ় ১৩৫৩

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা-সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫২

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর চারি বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সকল ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ ছিলেন। আমাদের জাতীয় চেতনা তাঁহারই মধ্যে পূর্ণতম প্রকাশলাভ করিয়াছে। সেই ঐতিহ্য ধারণ বহন ও রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের। কাব্য সংগীত চারুকলা শিক্ষা ও লোকসেবা—জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি নিজের শ্রম শক্তি ও প্রতিভাকে উৎসর্গ করিয়া নব নব সম্পদ আহরণ করিয়াছেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের নিপীড়িত জীবনকে সকল বন্ধন ও গ্লানি হইতে উদ্ধার করিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন।

তাঁহার কাছে আমরা কতভাবে ঋণী সে কথা যেন কদাপি বিস্মৃত না হই।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে আজও আমরা জীবন যাপন করিতেছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখের বার্তা ও আলাপের মধ্যেও তাঁহারই ভাষা প্রতিধ্বনিত। তাঁহার নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি তাহারই কৃতজ্ঞতার স্মারক ব্রত পালনের পুণ্য আয়োজনে আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করি।

এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য 'নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি' দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছেন।

উক্ত সমিতি এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কবির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিবেন :

(১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সংগতি পুষ্ট করিতে হইবে।

যে বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শ কবির নিত্যকার ধ্যান ছিল বিশ্বভারতী তাহারই প্রতীক। বিশ্বভারতীর সাধনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারিলে আমরা কবির আরব্ধ ব্রতকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে করি—

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫২

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

¶ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়— শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য (রেজেস্ট্রি ডাকে) ৫।০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪।০।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে চতুর্থ বর্ষের কয়েকজন নূতন গ্রাহক করা যাইতে পারে। এই বৎসরের (তিন সংখ্যা) জন্য তাঁহাদের দেয় তিন টাকা বারো আনা।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চার সংখ্যার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা এক টাকা, ডাকযোগে এক টাকা পাঁচ আনা; তিন সংখ্যা একত্র সডাক তিন টাকা বারো আনা।

¶ দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। মূল্য এক টাকা, ডাক-যোগে এক টাকা পাঁচ আনা।

¶ এই সংখ্যাগুলির কোনোটিতেই ক্রমশ-প্রকাশিত রচনা নাই, প্রত্যেক সংখ্যাই স্বয়ংসম্পূর্ণ; ইহার প্রত্যেক সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, ও অন্যান্য রচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি কর্তৃক অঙ্কিত অনেকগুলি বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র এই কয় বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় এই সকল সংখ্যা পূর্ণ।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের (মাসিক) প্রথম সংখ্যা ব্যতীত অন্য এগারো সংখ্যা কিনিতে পাওয়া যাইবে। মূল্য এগারো সংখ্যা একত্র দুই টাকা বারো আনা। রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিপত্র এই সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

¶ যে-সকল সংখ্যা ফুরাইয়া গিয়াছে সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইবে না।

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

¶ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়— শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য (রেজেস্ট্রি ডাকে) ৫।০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪।০।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে চতুর্থ বর্ষের কয়েকজন নূতন গ্রাহক করা যাইতে পারে। এই বৎসরের (তিন সংখ্যা) জন্য তাঁহাদের দেয় তিন টাকা বারো আনা।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চার সংখ্যার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা এক টাকা, ডাকযোগে এক টাকা পাঁচ আনা ; তিন সংখ্যা একত্র সডাক তিন টাকা বারো আনা।

¶ দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। মূল্য এক টাকা, ডাক-যোগে এক টাকা পাঁচ আনা।

¶ এই সংখ্যাগুলির কোনোটিতেই ক্রমশ-প্রকাশিত রচনা নাই, প্রত্যেক সংখ্যাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ; ইহার প্রত্যেক সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, ও অন্যান্য রচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি কর্তৃক অঙ্কিত অনেকগুলি বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র এই কয় বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় এই সকল সংখ্যা পূর্ণ।

¶ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের (মাসিক) প্রথম সংখ্যা ব্যতীত অন্য এগারো সংখ্যা কিনিতে পাওয়া যাইবে। মূল্য এগারো সংখ্যা একত্র দুই টাকা বারো আনা। রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিপত্র এই সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

¶ যে-সকল সংখ্যা ফুরাইয়া গিয়াছে সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইবে না।

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

নিশান্ত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫২

চিত্রকূট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটুখানি জায়গা ছিল রান্নাঘরের পাশে,
সেইখানে মোর খেলা হত শুক্‌নোপারা ঘাসে।
একটা ছিল ছাইয়ের গাদা মস্ত ঢিবির মতো—
পোড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে সাজিয়েছিলেম কত।
কেউ জানে না, সেইটে আমার পাহাড় মিছিমিছি—
তারই তলায় পুঁতেছিলেম একটি তেঁতুলবিচি।
জন্মদিনের ঘটা ছিল, ছয় বছরের ছেলে,
সেদিন দিল আমার গাছে প্রথম পাতা মেলে।
চারদিকে তার পাঁচিল দিলেম কেরোসিনের টিনে—
সকাল বিকাল জল দিয়েছি দিনের পরে দিনে।
জলখাবারের অংশ আমার এনে দিতেম তাকে—
কিন্তু, তাহার অনেকখানিই লুকিয়ে খেত কাকে।
দুধ যা বাকি থাকত দিতেম, জানত না কেউ সে তো—
পিঁপড়ে খেত কিছুটা তার, গাছ কিছু বা খেত।

চিকন পাতায় ছেয়ে গেল, ডাল দিল সে পেতে—
মাথায় আমার সমান হল দুই বছর না যেতে।
একটিমাত্র গাছ সে আমার, একটুকু সেই কোণ—
চিত্রকূটের পাহাড়তলায় সেই হল মোর বন।

কেউ জানে না, সেথায় থাকেন অষ্টাবক্র মুনি—
মাটির 'পরে দাড়ি গড়ায়, কথা কন না উনি।
রাত্রে শুয়ে বিছানাতে শুনতে পেতেম কানে—
রাক্ষসেরা পেঁচার মতো চেঁচাত সেইখানে।

নয় বছরের জন্মদিনে তার তলে শেষ খেলা—
ডালে দিলুম ফুলের মালা সেদিন সকালবেলা।
বাবা গেলেন মুন্সিগঞ্জে রানাঘাটের থেকে—
কলকাতাতে আমায় দিলেন পিসির কাছে রেখে।
রাত্রে যখন শুই বিছানায় পড়ে আমার মনে
সেই তেঁতুলের গাছটি আমার আঁস্তাকুড়ের কোণে।
আর সেখানে নেই তপোবন, বয় না সুরধুনী—
অনেক দূরে চলে গেছেন অষ্টাবক্র মুনি।

৭ পৌষ, ১৩৩৬

বশিষ্ঠ মহামুনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রান্নাঘরের পাশে একটুকু জমি
সেথা খেলা করিতাম আমি আর অমি।
ছাই জমেছিল ঠিক পাহাড়ের মতো,
পোড়া কয়লায় তারে সাজিয়েছি কত।
পুঁতেছি তেঁতুলবিচি তারি একধারে
সেটা গাছ হয় কিনা তাই দেখিবারে।

রোজ রোজ জল দিই সকালে বিকেলে ;
দুধ কিছু বাকি রাখি, তাও দিই ঢেলে।
একদিন ভোরে দেখি দুটি কচিপাতা
মাটির ভিতর থেকে তুলিয়াছে মাথা।
দিনে দিনে দুচারিটি ডাল দিল পেতে ;
আমার সমান হল দুই বছরেতে।

একটি সে গাছ সেই আমাদের বন,
আমরা দু ভাই সেথা রাম লক্ষ্মণ।
বশিষ্ঠ মহামুনি তাঁরো বাসা আছে ৷–
ভুঁয়ে তাঁর দাড়ি লোটে, জটা লাগে গাছে
সেথায় হরিণগুলো মেনেছিল পোষ,
লড়াই করিত এসে যত রাক্ষস।

ন বছর হল যবে আমার বয়েস
হঠাৎ বনের খেলা হয়ে গেল শেষ।
বাবা গেল কাল্‌নায় রাণাঘাট থেকে
আমারে কলিকাতায় মা'র কাছে রেখে।
রাত্তিরে বালিশের 'পরে মাথা থুয়ে
তেঁতুল গাছের কথা রোজ ভাবি শুয়ে।
　আর সেই তপোবন নাই সেইখানে—
　বশিষ্ঠ মুনি আজ কোথায় কে জানে ।

[১৩৩৬]

এই দুইটি কবিতা সহজপাঠ-রচনার সমসাময়িক। পূর্বপ্রকাশিত স্বপ্ন কবিতার মতো (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫১ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এ ক্ষেত্রেও কবি এক বিষয়কে বিভিন্ন ছন্দে রূপ দিয়াছেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৪

কলকাতা। মঙ্গলবার, ২০শে নবেম্বর। [১৮৯৪]

কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিলুম তারই অনুবৃত্তিস্বরূপে মনে হচ্চে, যে, দিনে এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাহিত্যে গদ্যে এবং পদ্যেও সেই রকম মানুষের ঐ দুটি অংশকে ভাগ করেছে। গদ্য পরিষ্কার কাজের এবং পদ্য সুবৃহৎ বিশ্রামের। সেই জন্যে পদ্যে আবশ্যক কথার কোন আবশ্যক নেই। পদ্যে আমাদের জন্যে যে জগৎ সৃজন করে সে জগতের কাছে আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় দেখায়। তাই যদি না দেখাত, তাহলে নিত্যসৌন্দর্য্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না। মানুষের জীবনে এই দুটো জিনিষই যখন সত্য, এবং দুটো সত্য যখন দিন এবং রাত্রির ন্যায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই তখন গদ্য পদ্য দুইয়েরই আবশ্যক আছে। সেইজন্যে ছন্দে বন্ধে ভাষায় পদ্য প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত সংস্রব দূর করে দিয়েছে— আবশ্যকের স্থানে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করেছে— আমাদের আবশ্যক ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরেও যে একটি অনন্ত আনন্দ-সমুদ্র অকূলের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বার্ত্তাটা নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে দেবার চেষ্টা করেছে। এই গদ্য পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল ঠা[১]— মুখুয্যের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তাহলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝান বড় শক্ত হয়। আমি সংক্ষেপে কেবল বল্লুম— সমতল পৃথিবী সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে একটা স্বতন্ত্র ষ্টেজের আবশ্যক করে— দর্শকদের মাঝখানে নেবে এসে অভিনয় করলে তাদের মনে সেই বিভ্রমটা উৎপন্ন হয় না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুর্দ্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সঙ্গীতের দ্বারা বেশ জাজ্জ্বল্যমান করে সম্মুখে ধরা চাই তবে সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ সেই ষ্টেজ এবং সঙ্গীতের মত— বিষয়টি সেই সমস্ত সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আমাদের মনে এমন সমগ্রভাবে এবং প্রবলভাবে আঘাত করতে পারে— চারিদিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্য্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে— প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই— এক মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ সমস্ত কথা ঠিকটি বোঝান শক্ত— ঠা— বাবুও বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন— বোধ হয় কোন প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।

১ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। পরেও উল্লিখিত।

কলকাতা। ২১শে নবেম্বর [১৮৯৪]

অ ২— ও বাড়িতে তাদের একতলার ঘরে বসে এস্‌রাজে ভৈরবী আলাপ করচে আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা এগারোটা দুপুর হয়ে যায়— দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই একরকম উদাসীন হয়ে আসে, তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে রৌদ্রের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্ম্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি— ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্য শোক নিত্য ভয় নিত্য মিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই ত আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়— কিন্তু প্রকৃতি কি এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্ব্বদা ভুলিয়ে রেখেছে সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি— ভৈরবীতে সেই চিরসত্য সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে— আমাদের এই কথা বলে দেয়, যে, আমরা যা কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না, এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানিনে।

শিলাইদহ। শনিবার, ২০শে নবেম্বর। [১৮৯৪]

গো— এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পর্শু প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের পিছনেই তার নৌকো ছিল— মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার— বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মানুষের জীবনমৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল— আমাদের চতুর্দ্দিকে একটি নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক এক সময় তাকে বড় নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার তুলনায় আমাদের প্রাণটুকু আমাদের বৃহত্তম সুখদুঃখ, আমাদের মহত্তম আশা আকাঙ্ক্ষা কত তুচ্ছ— আমি আজ মরি আর কাল মরি সে তার কাছে কিছুই নয়, আমি একলা মরি আর লক্ষ প্রাণী বন্যায় ভেসে যাক্ সেও তার কাছে কিছুই নয়— সূর্য্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগৎসুদ্ধ নিবে গিয়ে বরফে জমে গিয়ে একেবারে মরে যাবে সেও তার কাছে কিছুই নয়— এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বৎসরের জীব-জনন-লীলা সম্বরণ করে আজ নির্ব্বাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেড়াচ্চে— পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত লুপ্ত জীববংশের কঙ্কাল পড়ে আছে আজ তাদের একটি বংশধরও বর্ত্তমান নেই— তাই আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে ভাবছিলুম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুমূর্ষু মানুষটার হয়ে কার কাছে বলব, আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্চে— আমরা অক্ষম মানুষরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে— তার বেদনা কার কাছে সত্য— মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা তখন এমন অসহ্য কষ্ট পাবার কি আবশ্যক ছিল। আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্ম্মগত সুখদুঃখ বাসনা এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা

২ ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা দেবী।

নিষ্ঠুর প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের আকর, কিন্তু অনন্তের কাছে তার যদি কোন অর্থই না থাকে তবে এ মায়া কেন! আমার কাছে আমার ভালবাসা কতই নিরতিশয়— কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোন স্থান না থাকে তবে ত সে স্বপ্ন মাত্র। আমরা দেশের জন্যে প্রাণপণ করচি, মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্চি, কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ অর্থাৎ সমস্ত জগতের চেয়ে বড়— মানুষ আমাদেরই কাছে মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি— আমাদের বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টাগুলো নিতান্তই উপহাসের বিষয়। গো —র আসন্ন মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত গম্ভীর অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল— কিন্তু সে কেবলমাত্র আমি মানুষ বলে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবর্ত্তী বলে— ওর ভিতরে কি সত্যকার কোন গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব আছে? এই ত পিঁপড়ে মরচে মশা মরচে তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শুকিয়ে পড়ে গেলে একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও ত কম পরিবর্ত্তন নয়! অনন্তের কাছে, একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়া পাতা ঝরে যাওয়া মানুষ মরে যাওয়া সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং সুখদুঃখ সব আমাদেরই। আমার এক এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি। একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করচে আর একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করচে— তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না— এক সময় এক রকম ছিলুম আর এক সময় আর এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনরকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাক্‌ত না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বল্‌চে বেঁচে থাক্‌ব-- বল্‌চে মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে— অথচ কোনকালে কেউ তাকে জয় করতে পারেনি— কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেইজন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা মৃত্যুশোক— বেঁচে থাকবার একটা চির সম্ভাবনা আছে মৃত্যু তাকে বারম্বার পরাভূত করচে।

শিলাইদহ। বুধবার। ৬ই ডিসেম্বর। [১৮৯৪]

সাধারণতঃ অন্যদিন এই সময়টা কিছু গরম হয়ে ওঠে, জোব্বাটা খুলে ফেল্‌তে হয়— আজ ঠিক উল্টো দেখচি। বাইরে বাতাসটা সোঁ সোঁ শব্দে শিষ্‌ লাগিয়েছে— নদীর জল কলকল ছলছল শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; অথচ মেঘের কোন লক্ষণ নেই, রৌদ্র চমৎকার উজ্জ্বল, জলের ধারে কাদা চরের উপর কাদাখোঁচা পাখীগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্চে, এবং শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গুব্‌ করে দিগ্‌বাজি খেলে যাচ্চে। যদি সন্ধের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তাহলে আমার আজ আর বেড়ানটা হবে না। আমি আজকাল একটু স্থান পরিবর্ত্তন করেছি— নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মত জেগে উঠেছে সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বেঁধেচি।— সেই ছড়াটা মনে আছে?—

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর।—

আমি ঠিক সেই শিব সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ডাঙ্গায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড় টেনে বেয়ে যেতে হয়— এই সূত্রে আমার দাঁড় টানাও হয় বেড়ানও হয়। আজকাল

শুক্লপক্ষ— খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফুটে ওঠে— তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে মনে হয় এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী নয় আমারই মনের একটা অপরূপ ভাব। কোন্‌কালে ছেলেবেলায় তিনকড়ি দাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, "তেপান্তর মাঠ— জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে"— যখনি জোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই, তিনকড়ি দাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল— প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করচে তারি মধ্যে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দ্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েচে— শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড় হলে এই ধরণের একটা কোন অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব, এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোন এক জায়গায় কোন একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে— চারিদিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখ্‌তে হয়, যে, যা কিছু অসম্ভব সেইগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে— নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুগ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই— তার আর কোথাও সীমা নেই বাধা নেই।

শিলাইদহ। ১১ই ডিসেম্বর। [১৮৯৪]

আজকাল সকাল সকাল বেড়াতে বেরই— অনেকক্ষণ একলা বেড়াবার পরে * * এসে হাজির হয় — ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই— এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জ্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই— তখন নিদেন খানিকক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং সুখদুঃখ কিছুই কিছু নয়— তারপরে হঠাৎ * * এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে, আজ দুধ খেয়ে আপনার কোন অসুখ করেনি ত, কিম্বা নায়েব মশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি, সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুন্‌তে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি! যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক! যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্চে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিধের কথা আন্‌লে ভারি অসঙ্গত মনে হয়— অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আস্‌চে ;— যেখানে চন্দ্রালোক পড়চে সেইখানেই আমার জমিদারী ; অথচ জ্যোৎস্না বল্‌চে তোমার জমিদারী মিথ্যে, জমিদারী বল্‌চে জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে।[৩]

শিলাইদহ। মঙ্গলবার। ১২ই ডিসেম্বর। [১৮৯৪]

তুই যে লিখেছিস্‌— "ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে?" সম্পূর্ণ মিলন কোনকালেই হবে না। কারণ ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে। ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড় ভাই, উভয়ের সমান বয়স হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব

৩ ছিন্নপত্র গ্রন্থে ৭-১২-১৮৯৪ তারিখ অঙ্কিত পত্র ইহার রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভাল পৃথিবীতে কোন গতিকে সেইটেই আধাখেঁচড়া করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। বিশেষতঃ যখন সব সময় বুঝতেই পারিনে highest ideal কোন্‌টা— হয়ত যেটা nighest সেইটেই highest— হয়ত নিজের ideal sacrifice করাই অনেক সময় higher ideal— হয়ত জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিষ্ফল হবে— হয়ত আর একটু নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি। এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেকের নিজের কাছে। সবসুদ্ধ জগৎটা এমনি জটিল যে, কোনদিকে কাউকে পথ নির্দ্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেন না প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের চলবার প্রণালী এত তফাৎ! হয়ত খুব বেশি না ভেবে যেটা সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী সেই পথটা অবলম্বন করে তারপরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে উপস্থিত হবে সেইটের ভালরকম মীমাংসা করে চলাই সব চেয়ে সুবিধা। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি একটা বিষম সমস্যা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়ত এর খুব একটা সহজ মীমাংসা করে দেবেন, তখন হয়ত আমরা এত বেশি ভেবেছিলুম বলে হাসি পাবে।

কলকাতা। ১৪ই জানুয়ারি। [১৮৯৫]

অল্প অল্প করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করচে। কাল সমস্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল— কাজকর্ম্মে মন লাগ্‌ছিল না, সমস্ত দিনটা একরকম উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কাল অ— এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল, মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরী করে কাটিয়ে দেব— এখন একটু গরম হাওয়া পড়বামাত্রই মনে হচ্চে, এডিটরী করার চেয়ে আমি সেই যে কবি ছিলুম, সে ছিলুম ভাল। ইচ্ছে করচে একটা খোলা জানলার কাছে পড়ে পড়ে একটা শ্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে করে কবিতা লিখে যাই— চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুজ ডালপালা দেখা যায়— এবং বাতাসটি এসে সর্ব্বাঙ্গে লাগ্‌তে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভাল। গানের সুরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়, এবং মাথার ভিতরে একটা অপরূপ নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মত তৃষার্ত্ত উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরী করাই আমার পক্ষে ভাল। গানের এবং কাব্যের জগতে একটা চিরযৌবন আছে জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামঞ্জস্য হয় না। এক একদিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ্দুরের দিকে চাইবামাত্র মনের ভিতরটা পুলকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে— তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্য আসে; বুঝতে পারি, এ কবিত্ব আমার হাড়ের মজ্জার মধ্যে— এ আমার সঙ্গের সঙ্গী— প্রতি বৎসরে নিদেন একবার করেও আমার হাড়ের ভিতর থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে, এবং আমাকে ভুলিয়ে দেবে, যে, আমার অন্তর্জ্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জ্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।

শিলাইদহ। ১লা ফাল্গুন। [১৩০১ ; ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]

এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা— বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারী কাজকর্ম্মে বহুদর্শী। ...

রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যে কি ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি— সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে— এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি— এবং আমার এই অন্তর-প্রকৃতিটি না বুঝ্‌লে, যে, আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না— এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম। দেখ্‌লুম তিনি বেশ বুঝ্‌লেন— কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্‌গুল্ হয়ে গেলেন— জগৎসংসার থেকে আমার নেশাটিকে যে আমি কোন্‌খান থেকে আদায় করে থাকি সেটা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার যে ধর্ম্ম এটা নিত্য ধর্ম্ম, এর উপাসনা নিত্য উপাসনা ;— কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁসে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্ম্মালোচনা বলি— এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বামাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি— এ ছাড়া অন্যান্য যা কিছু dogma আছে যা আমি কিছুই জানিনে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখিনে তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে— যেটুকু আমি positively জান্‌তে পারচি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট— তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয় ; তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systemএ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়— আমি এইটুকু জানি যে জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে তার বেশি জানবার কোন দরকার নেই।

শিলাইদহ। ১৬ই ফেব্রুয়ারি। [১৮৯৫]

এবারে পৃথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে। খবরের কাগজে শোনা যাচ্চে য়ুরোপ বরফে আদ্যোপান্ত মণ্ডিত হয়েছে— ইংলণ্ডে মেরুপ্রদেশের মত শীত পড়েছে— বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরের কূলে এসেও পৌচেছে। ফাল্গুন মাসে এরকম অসঙ্গত শীত বাঙ্গলা দেশে ত কখনো মনে পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিলুম তখন এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড় আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়চে— এবং সেইসঙ্গে মনে পড়চে, সেখানে দীর্ঘ দুপুর বেলায় একলা বসে অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ কোঁ শব্দ শুন্‌তে পেতুম— চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম স্বরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত ;— ইঁদারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝুঁকে পড়েছিল সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে থাক্‌ত। তার থেকে ক্রমে মনে পড়ে সেই ড্যাল্‌হৌসীতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দৃশ্য— তখন আমার মনটা ছোট ছিল কিনা ; বিস্ময়ের পরিমাণ তার মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নির্জ্জন নিস্তব্ধ গম্ভীর ঠাণ্ডা ছায়াময় প্রকাণ্ড পাইনের বন এখনো মনে পড়ে। আমার সেই ড্যাল্‌হৌসীতে আর একবার যেতে ইচ্ছে করে— দেখ্‌তে ইচ্ছে করে আমার সেই বাল্যকালের প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পাওয়া যায় কিনা। তখন একটা মস্ত সুবিধে ছিল যে নিজের জন্যে নিজেকে কিছুই ভাবতে হত না।

শিলাইদহ। ১৭ই ফেব্রুয়ারি। [১৮৯৫]

আজ সকালবেলায় যদিও শীত যথেষ্ট আছে তবু অন্য দিনের মত প্রবল উত্তরে বাতাস নেই— নদীর জলে তরঙ্গের রেখাটি মাত্র দেখা যাচ্চে না, একেবারে আয়নাটির মত স্থির হয়ে আছে। ঐ ওপারে একটি নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মানুষ ধূসর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত করে' গুণ টেনে নিয়ে যাচ্চে— বাস্, আর কোথাও কর্ম্মস্রোতের কোন চাঞ্চল্য নেই— কোন শব্দ নেই, গতি নেই — জলের উপরে এবং বালির চরের উপর সকালবেলাকার রৌদ্র এসে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে, বেলা যেন এগোচ্চে না, একরকম শ্রান্ত শান্তভাবে নিস্তব্ধ বিশ্রাম করচে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু আমিও আজকের এই প্রভাতের অলস সৌন্দর্য্য অলসভাবে উপভোগ করছিলুম— এবং এক একবার ভাব্‌ছিলুম ঐ যে গুটি দুই তিন লোক ওপারে জনশূন্য বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ সুন্দর বলে ঠেক্‌চে কেন— যারা টান্‌চে তারা পেটের দায়ে রীতিমত কাজ করচে; আমার চোখে যে তারা একটি শান্তি এবং সন্তোষের ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্চে তাদের মনে ঠিক সেই শান্তি সন্তোষ এবং সৌন্দর্য্যটুকু নেই— যাই হোক্, এ সমস্ত চিন্তার কোন মীমাংসা হোক্ বা না হোক্ সেজন্যে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না— প্রভাতের এই সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতার একটি প্রান্তভাগে ঐ ধীরগতিতে গুণ টানা যেমন একটুখানি ভঙ্গ,— তেমনি আমার মনেরও শান্ত উপভোগের একটি দূর তীরভাগে ঐ একটুখানি মৃদু অলস চিন্তা একটু ভঙ্গমাত্র, তাতে শান্তিটিকে ঈষৎ বৈচিত্র্য দান করচে। আজকাল প্রতিদিন সাধনা লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশ্চেষ্ট করে তুলে সর্ব্বতোভাবে এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড় করবার অবসর পাইনে— নিজের ভিতরে অহরহ একটা-না-একটা কিছু প্রক্রিয়া চল্‌চে— বাইরে যে কিছু আছে একথা ভুলে থাকতে হয়— সৌন্দর্য্য জিনিষটাও কিছু jealous, সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না— আমি ত সেইজন্যেই বলি কবিতা, কিম্বা সাহিত্যের কোন সুন্দর সৃষ্টি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ করবার জন্যে যথেষ্ট নির্জ্জনতা এবং শান্তির আবশ্যক— তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়; দুটো কাজের মাঝখানকার অল্প অবসরের মধ্যে তাকে চট্ করে একটুখানি চেখে নেবার যো নেই— সেই জন্যেই এত অল্প লোকের যথার্থ কবিতা ভাল লাগে— তাদের মনের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই— অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে বড্ড বেশি ভীড়। মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোন কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হয়— মনে হয় সে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়ত উপযুক্ত সময়েও আর ভাল লাগ্‌বে না। কলকাতায় কবিতার মত জিনিষ বড় সঙ্কুচিত হয়ে যায়— সেখানে তাকে বড় সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জ্জনে তার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি— বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে ওটা কত একান্ত আবশ্যক— এবং এতদিন সহরের মধ্যে মনটা কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল!

শিলাইদহ। ২২ শে ফেব্রুয়ারি। [১৮৯৫]

এই সকল কারণে, খানিকটা বিষয়কর্ম্ম করে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ পড়ে, খানিকটা প্রবন্ধ সংশোধন করে আজকের দিনটা কেটে গেছে। এখন চারটে বেজে গেছে— রোদ্দুরটা পড়ে গেলেই বেড়াতে বেরব। যে সব দিনে পুরোপুরি কাজ কিম্বা পুরোপুরি বিশ্রাম দুয়ের কোনটাই হয়

না— সে সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়। আমাদের মূলতান রাগিণীটা এই চারটে পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্চে আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি— বোধহয় দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে উঠে কোন ওস্তাদ ঐ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিল— আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরাসুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি — না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ, এবং তার ভিতরকার একটা মর্ম্মগত বেদনা। দুঃখের একরকম ব্যথা আছে কিন্তু তার ভিতরেও একটু রস থাকে— আর, একরকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে— সেটা ভারি নীরস, তার ভিতরে একটা উদারতা এবং কল্পনার সৌন্দর্য্য নেই। আর একটা বড় বিপদ্ হয়েছে— ভারি মশা হয়েছে। তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সর্ব্বদাই গা হাত পা চাপড়াতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিম্বা ভাবের মাধুর্য্য কিছুতেই রক্ষা করা যায় না— একটা হিংস্র প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জেগে থাকে অথচ সেটা উপযুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এইরকমের সামান্য পীড়নে, মশার কামড়ে, সহযোগী সাহিত্যসমালোচনে, মোহনভোগের মধ্যে বালিতে মানুষকে কোনরকম বীরত্ব শিক্ষা দেয় না সে আমি বল্‌তে পারি; এই জন্যে আরও পারি যে, আজই আমার মোহনভোগে বালি ছিল— আমার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে * * * *

শিলাইদহ। ১লা মার্চ্চ। [১৮৯৫]

এক একদিন চিঠি না পেয়ে তার পরদিন পেলে একটা বিশেষ নতুন আনন্দ পাওয়া যায়,— হঠাৎ মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাজের কলটা যে বিগ্‌ড়ে ছিল সেইটে আবার যখন হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে চল্‌তে আরম্ভ করে তখন বেশ একটা উল্লাস অনুভব করা যায়। পৃথিবীটা ঠিক আমার মনের মত নয় এইটে মনে করে অনেক সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকা যায়— কিন্তু এক একদিন আসে যখন, পৃথিবীটা ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুতবেগে বইতে আরম্ভ করে। ক্রিষ্টিনা রসেটির যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিস্— সেটা বেশ লাগ্‌ল। কিন্তু তার প্রথম চার লাইনই ভাল,— এবং ঐ চার লাইনেই সমস্ত কথাটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তার পরে যেটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ভাবটা অগ্রসর হয়নি বরঞ্চ কিছু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এক একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়, যেমন আমার সেই "বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে" গানটা— তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থাম্‌তে চাচ্চে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে। কবিতাতেও একটা সুর আছে, ক্রিষ্টিনা রসেটির এই কবিতায় সেই আসল সুরটুকু প্রথম চার লাইনেই শেষ হয়ে গেছে। তুই লিখেছিস্ "আমি এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারলুম না, যে, আসল ভাল ভাব ভাল প্রকাশ করেছে বলে আমার কোন কবিতা ভাল লাগে — না শুধু একটু 'ধরণে'র জন্যে— শুধু একটু ঘুরিয়ে চুট্ করে বলা, একটু ভাষার চালাকির জন্যে।" আসল কথাটা হচ্চে এই, যে, অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন — এবং আমাদের মনের ধর্ম্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিষগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই— সেই জন্যে কোন কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা,

ছন্দ, এবং বল্‌বার নতুন ধরণের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিষটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি— তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সঙ্গীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজ্‌তে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ, পৃথিবীটাকে সর্ব্বদা তাজা রেখে দেওয়া— গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে অনেকটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে আস্‌ত, যদি না কবিরা সর্ব্বদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আস্‌ত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিত্বের কাজ হচ্চে কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিষ কিছুই দেয় না— সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখ্‌তে চেষ্টা করে।

শিলাইদহ। ৭ই মার্চ্চ। [১৮৯৫]

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম, যে, এটা সত্যি বটে মেয়েরা আপনার চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্যরক্ষার প্রতি, পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি যত্ন করে, কিন্তু সত্যি সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বেশি আছে ? এ সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোন মীমাংসা করা যায় না, কারণ, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতরবিশেষ আছে— এরকম বিষয়ে যখন আমরা কোন কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধিস্বরূপে ধরে নেওয়া যায়। আমি যদিচ নিজের চারিদিককে সুন্দর করে রাখ্‌তে ইচ্ছে করি কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্ব্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয় কিন্তু সৌন্দর্য্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই— সৌন্দর্য্য এবং ভালবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না— এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না— যখন মনটা সৌন্দর্য্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[৪]—কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাৎ অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটি— কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা যে, সে একটি সৌন্দর্য্যের মাতাল ছিল। ব[৫]— যেএক সময়ে যথার্থ কবির মত সমুদয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি যে কোনকালে তাঁর চারিদিক সুন্দর করে রাখ্‌তেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকৃতেন না সেও নিশ্চয়। নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিব এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দর্য্যের অ্যাসোসিএশন্ থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনি তাকে মনে পড়বে অমনি তার সঙ্গে সুগন্ধ সুদৃশ্য সুপারিপাট্য মনে উদয় হবে— লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে, এটা খুব আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ করতে হলে চারিদিককে সুন্দর করে তোলা চাই। ফুল প্রভৃতি সমস্ত সুন্দর জিনিষের প্রতি মেয়েদের একটি মমতাপূর্ণ স্নেহ আছে— সে সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিষ— তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির— আমাদের কাছে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল,— সৌন্দর্য্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়ত ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়ত অলীক কবিত্বের মত শোনাতে পারে সৌন্দর্য্য আমার

৪ বিহারীলাল চক্রবর্তী।

৫ বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা— যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভাল করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" সৌন্দর্য্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেচে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্য্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্ত্তিতে দেখ্‌চে— চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্য্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে— অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্ম্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্‌সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়— সৌন্দর্য্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়— আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি— সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝ্‌তে পারি— এবং যা বুঝ্‌তে পারি তার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও বোঝাতে পারিনে।

শিলাইদহ। ১০ই মার্চ্চ। [১৮৯৩]

এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোন গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না— চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই। আজ বোধ হচ্চে ত্রয়োদশী— খুব জ্যোৎস্না হবে— এই দু চারদিন জ্যোৎস্নালোকে আমার পদ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে— খুব সম্ভব, আস্‌চে বারে যখন এখানে আস্‌ব তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাক্‌বে না— তখন হয় ওখানে পদ্মার জল— নয় চষা মাটি। আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ[৬]— এবং ঠা— বাবু থাকেন। তাঁদের কথাবার্ত্তার মাঝে হঠাৎ এক একবার অল্পক্ষণের মত সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত আকাশপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়— আমার সেই চিরপরিচিতটি পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে এক একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়। তখন সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়— একটা যেন সুবৃহৎ সুকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়— একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্রলোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। হঠাৎ সেই সব কাজের কথা এবং শুক্‌নো কথার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য্য বোধ হয়— আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারি অসঙ্গত মনে হয়। আমরা তিনজনে একত্রে বেড়াচ্চি অথচ, কিছুক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্চে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্নামগ্ন গম্ভীর মৌন জগৎ, কথাবার্ত্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, মনে কোরোনা তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে— আমরাও যেমন সেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁড়িয়ে আছি—

আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি,
তোমার যখন্ মনে পড়ে আসিয়ো।

---

৬ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

আমি কৌতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি[৭]— আমি যখন জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মার ধারের নির্জ্জন চরে ঠা— বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট শুন্‌তে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে তখন তার কৌতুকটা আমি এক একবার অনুভব করতে পারি— ওর মধ্যে কোন একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি আছে।

শিলাইদহ। ১১ই মার্চ্চ। [১৮৯৫]

আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস কোনকালে পুরোণো হয় না— হয়ত যখন তফাতে থাকি তখন অন্যান্য জড় জিনিষের চাপে সেগুলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের সম্মুখবর্ত্তী হই অমনি সমস্ত পুরোণো ভাব একেবারে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই মফস্বলের প্রবাসটি কলকাতায় অনেক সময় ম্লান স্মৃতিরূপে মনে থাকে— তখন মনে হয় আমার সেই পদ্মাতীর হয়ত পুরোণো হয়ে গেছে— কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখ্‌তে পাই সবই সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময়টির মতই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে। রোজই সন্ধ্যার সময় চরে বেড়াবার সময় আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, অন্যদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল, আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেক্‌চে— ঠিক সেই ভাবটা সেই রকম করে বুকের মধ্যে পূরে আস্‌চে, যেন আজ এখানে এই প্রথম এলুম— এইটেই আমার কাছে ভারি পুলকের এবং বিস্ময়ের কারণ। আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ সব জায়গা থেকে যে সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি— আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্ত্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি — সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে— আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয় কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য্য, দুর্ম্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জ্জন— যা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে জগতের আর কোথাও নেই— তার মর্য্যাদা আমি যেমন বুঝ্‌ব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝ্‌বে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস্, আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুঁকে নেব— কেন না, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব— তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাক্‌বে— তখন পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাট্‌কা ভাবে ফিরে পাব— আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

---

৭ সাধনা ১৩০১ পৌষ, "কৌতুকহাস্য"; সাধনা ১৩০১ ফাল্গুন, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা"। পঞ্চভূত গ্রন্থে সংকলিত।

বিজ্ঞানের প্রগতি

শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই পদার্থবিজ্ঞানে এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে শুধু যে বিজ্ঞানের পরিধি আশ্চর্যরকম বেড়েছে তা নয়, পদার্থবিজ্ঞানের মূল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ ব্যবহারিক জগৎ ছাড়া একদিকে যেমন অণু-পরমাণুর জগৎ, অন্যদিকে তেমনি নক্ষত্রজগৎ; ক্ষুদ্র ও বিরাট— এই দুই জগতেরই নব নব তথ্য ও তত্ত্ব বিজ্ঞানী তাঁর বীক্ষণাগারে বসে আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কারের ফলে আজ এমন সব সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বিজ্ঞানী এতদিন যাকে স্থির বা ধ্রুব প্রতিষ্ঠা বলে মেনে এসেছেন সেই অচলায়তনের ভিত্তিই গিয়েছে আলগা হয়ে। বিজ্ঞানের সেই পুরাতন প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত ও অটুট রাখবার আর কোনও অবকাশই আজ নাই। বিজ্ঞানীর জগৎ নিয়ে সেজন্য নূতনভাবে চিন্তা করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই চেষ্টায় বিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য জগতের সীমানা অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে অসংগতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের এই আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতি ও ইতিহাসের কথা আপনা থেকেই এসে পড়বে।

যখন থেকে মানুষ কেবল যুক্তিতর্ক ও অনুমান ছেড়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে জগৎ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত গড়তে শুরু করেছে, তখন থেকেই মানুষ হল বিজ্ঞানী, আর তখন থেকেই আরম্ভ হল বিজ্ঞানের যুগ। জড়বস্তুর উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী পেলে শক্তির সন্ধান। শক্তি-উৎপাদনের নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হল ও সেইসঙ্গে গড়ে উঠল গতি- ও বল-বিজ্ঞান। মহামনীষী নিউটনের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন জড়পদার্থের গতিবিধিতে তিনিই সর্বপ্রথম আশ্চর্যরকম প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহির্জগতে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখি, তাদের অবস্থান ও তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান ও গতি কি হবে— নিউটনের গতিবিজ্ঞানে এ প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়। কামানের গোলা কোন্ দিকে ও কত জোরে ছুঁড়লে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, এ যেমন অঙ্ক কষে জানা সম্ভব, আকাশের গ্রহতারকার বর্তমান অবস্থিতি ও গতি থেকে ভবিষ্যতের অবস্থান এবং গতিও তেমনি গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করা কঠিন কাজ নয়। বিজ্ঞানীর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই আশ্চর্যরকম ফলেছিল। এ থেকেই এল কার্য-কারণের নিয়ম, হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদ। সৃষ্টির প্রাক্‌কালেই, মনে করা যেতে পারে, বিশ্বের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কার্য-কারণ-পরম্পরায় যেন সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত। এই নির্ধারিত পথ ছাড়া প্রকৃতি দেবীর 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মনোভাব ছিল এই ধরনের। বিশ্বকর্মা যেন মহাযন্ত্রী— বিশ্বজগৎ তাঁরই হস্তের সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র; নিখুঁত তাঁর নির্মাণকৌশল, আশ্চর্য তাঁর বস্তুসম্পদ, অমোঘ তাঁর বিধিবিধান! সেইজন্যই নিউটন এবং তাঁর

পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিশ্বের যে স্বরূপ রচনা করেছেন তাকে 'যান্ত্রিক স্বরূপ' বলা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে যন্ত্রের নিয়ম, নিশ্চয়তার নির্দেশ।

বিশ্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রধান প্রশ্নই এই— জড়পদার্থের প্রাথমিক বা আদিম উপাদান কি? এ প্রশ্নেরই উত্তরে প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা অণু-পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রাচীন পরিকল্পনার কোনও পরীক্ষামূলক ভিত্তি ছিল না। বর্তমান যুগেও বিজ্ঞানী বলেন বস্তুমাত্রেই অসংখ্য অণুর সমষ্টি। কিন্তু বিজ্ঞানীর এই অণুর পরিকল্পনা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়পদার্থকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ভাগ করলেও যখন তার স্বকীয় ধর্ম বিনষ্ট হয় না, পদার্থের সেই সূক্ষ্মতম অংশেরই নাম তাঁরা দিয়েছিলেন অণু। এরূপ অসংখ্য গতিশীল অণুর পরিকল্পনায় তাপবিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানী এ কথা অবিসম্বাদিরূপে মেনে নিয়েছিলেন যে, বস্তুর অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই বস্তুর উত্তাপের কারণ এবং গতিবেগের তারতম্যেই বস্তুতে বস্তুতে তাপভেদ। নানান দিক থেকে অণুর জগতের অনেক কথা ক্রমে প্রকাশিত হল। রাসায়নিক সংযোগ ও ক্রিয়া এবং অন্যান্য অনেক তথ্যের মীমাংসাও ক্রমে পাওয়া গেল। এ সব তত্ত্বেরই পরিণতি দেখা যায় ড্যাল্‌টনের (Dalton) পরমাণুবাদে। অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য কতকগুলি কণা বা পরমাণু দিয়ে এক-একটি অণু গঠিত— এই পরমাণুবাদের এই হল মূল কথা। অণুর ভিতর পরস্পর আকর্ষণ ও সম্মিলনেই রাসায়নিক সংযোগ। যাকে আমরা মৌলিক পদার্থ বা সংক্ষেপে মৌল বলি, একই রকমের দুই বা বহু পরমাণু মিলে এদের এক-একটি অণুর সৃষ্টি। আবার বিভিন্ন মৌলের দুই বা বহু পরমাণুর সংযোগেই হয় যৌগিক পদার্থের এক-একটি অণু। জড়পদার্থের প্রাথমিক উপাদান সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মোটামুটি এই ছিল সিদ্ধান্ত। বহু বিজ্ঞানীর বহুমুখী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে আজ বিরানব্বইটি মৌলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, আকাশের জ্যোতিষ্কখণ্ডগুলির অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নিউটনের গতিবিজ্ঞানের গণনা আশ্চর্যরকম সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এবার অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে গতিবিজ্ঞান খাটে কি না তার বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অণু-পরমাণুর জগতে গতিবিজ্ঞানের নিয়ম খাটাতে গিয়ে দেখা গেল যে, অসংখ্য অণু-পরমাণুর প্রত্যেকটির অবস্থান ও গতি যখন আমাদের জানা নাই, গতিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এদের ভবিষ্যৎ অবস্থান ও গতি নির্ধারণ করা তখন সম্ভবপর নয়। এই অসম্ভাব্যতা নৈশ্চিত্যবাদ-বিরুদ্ধ কথা নয়; কেননা প্রত্যেকটি অণু বা পরমাণুর খবর ঠিকমত জানা থাকলে গতি-বিজ্ঞানের সাহায্যে এদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী নিশ্চিতভাবেই করা সম্ভব— বিজ্ঞানীর মনে এ ধারণা তখনও বেশ বদ্ধমূল ছিল। কোনও দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের গতিবিধি না জেনেও যেমন সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্ম-মৃত্যুর গড়পড়তা হার প্রভৃতি মোটামুটি বিচার করা যায়, অণু-পরমাণু সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; অর্থাৎ অণু-পরমাণুর প্রত্যেকটির অবস্থান ও গতি জানা না থাকলেও গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকে এদের ব্যবহার ও আচরণ মোটামুটিভাবে আমরা জানতে পারি। সংখ্যাগণিতের সাহায্যে এরূপ সমষ্টিগত গণনা সম্ভব হয়েছে।

পরমাণুও যে পদার্থের আদিমতম উপাদান নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই তা প্রমাণিত হয়। টম্‌সন্ (J. J. Thomson), রাদারফোর্ড্ (Rutherford) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, প্রত্যেকটি পরমাণুর মূল উপকরণ দুটি— ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ও ঋণাত্মক

বিদ্যুৎকণা। বিপরীতধর্মী এই দুই বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণেই বিভিন্ন মৌলের উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই রাদারফোর্ড, বোর (Bohr) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পরমাণুর জগতে নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম খাটিয়ে অনুমান করলেন, পরমাণুর জগৎ সৌরজগতেরই অনুরূপ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, পরমাণুর ধনাত্মক কোষটিকে কেন্দ্র করে তেমনি ক্ষুদ্রতম ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা ইলেক্‌ট্রন বিভিন্ন কক্ষে ভ্রাম্যমাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুতে সমগ্রভাবে বিদ্যুতের কোনও লক্ষণ থাকে না— সুতরাং পরমাণু-কোষের ভিতরকার ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও কোষের বাইরের ইলেক্‌ট্রন বা ইলেক্‌ট্রনগুলির ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমান সমান বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, পরমাণুতে বিভিন্ন কক্ষে যতগুলি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়, পরমাণু-কোষে ঠিক সেই পরিমাণের ধনাত্মক বিদ্যুৎ সন্নিবিষ্ট থাকে। সর্বাপেক্ষা হালকা হাইড্রোজেন্ পরমাণুর কথা ধরা যাক। এতে একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রনের পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। ধন-বিদ্যুতে ভরা হাইড্রোজেন-পরমাণুর কোষকেই প্রোটন (proton) বলা হয়। প্রোটনের বস্তু-মান বা ভর (mass) ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা প্রায় ১৮০০ গুণ বেশি— সুতরাং, হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমস্ত ভরই যেন তার কোষেই নিবদ্ধ। এ কথা অন্য পরমাণু সম্বন্ধেও সত্য। হাইড্রোজেনে যেমন একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রন কোষের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, হিলিয়ামে তেমনি দুটি, লিথিয়ামে তিনটি ইত্যাদি। এইভাবে হাইড্রোজেন্ থেকে আরম্ভ করে সর্বাপেক্ষা ভারি ইউরেনিয়াম্ পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থেই কোষের বাইরের ঘুরন্ত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা এক এক করে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এই অনুপাতে পরমাণুকোষের ধন-বিদ্যুৎও ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। হাইড্রোজেন্ পরমাণুকোষে একটি প্রোটন্, হিলিয়ামের কোষে দুইটি প্রোটনের পরিমাণ ধনবিদ্যুৎ, লিথিয়ামে তিনটি প্রোটনের পরিমাণ ধনবিদ্যুৎ— এইভাবে ক্রমান্বয়ে পরমাণুকোষের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। পরমাণুর এই গঠনতত্ত্বের সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। এই গঠনতত্ত্ব অনুসারে কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুকোষে যে ধনবিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে তার পরিমাণের উপর পদার্থের বিশিষ্টতা বা গুণাগুণ নির্ভর করে।

পরমাণুকোষ নিয়ে আজও অনেক গবেষণা চলছে। পরমাণুকোষে প্রোটন ছাড়া আরও একটি কণার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে; এটি বিদ্যুৎহীন, এর নাম নিউট্রন্ (neutron)। নিউট্রনের ভর প্রোটনের সমান। প্রোটন ও নিউট্রন মিলেই পরমাণুকোষগুলি গঠিত— আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। পদার্থের প্রাথমিক উপাদানস্বরূপ প্রোটন, ইলেকট্রন নিউট্রন ছাড়াও আজ অন্যান্য কণার আবিষ্কার হয়েছে। ইলেকট্রনেরই মত ক্ষুদ্রতম ও সমপরিমাণ ধনবিদ্যুতের কণা পূর্বে জানা ছিল না। এই নব-আবিষ্কৃত ধনবিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণারই নাম পজিট্রন্ (positron)। মিসট্রন্ (mesotron) বা মিসন্ (meson) নামে এক নূতন ঋণবিদ্যুতের কণার সন্ধানও আজ পাওয়া গিয়েছে। এর বিদ্যুতের পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনের সমান কিন্তু ভর ইলেকট্রন অপেক্ষা ১০০ থেকে ৫০০ গুণ। এইসব নানাপ্রকারের নানা নামধারী কণাই জড়বস্তুর আদিম উপাদান— একথা আজ সর্ববাদিসম্মত।

কিন্তু অণু, পরমাণু, ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন্, নিউট্রন্ প্রভৃতি নানাপ্রকার কণাই শুধু পদার্থবিজ্ঞানের সকল সমস্যার সমাধান করে নি। বহু বৎসর পূর্ব থেকেই বিজ্ঞানীকে তরঙ্গের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। আলোকের ধর্ম আলোচনা করতে গিয়েই প্রথমে তরঙ্গবাদের সূচনা হয়। হিগেন্‌স্ (Huyghens)

প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আলোককে প্রবহমান তরঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এ তরঙ্গ কিসের তরঙ্গ? কল্পনা করা হয়েছিল যে, 'ইথার' নামে এক অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড বস্তু বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এবং শূন্যকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে; এই 'ইথার'-সমুদ্রেরই তরঙ্গ আলোকতরঙ্গ। জলের স্পন্দনে যেমন জলে ঢেউ ওঠে, ইথারে স্পন্দন হলেই তেমনি হয় আলোর তরঙ্গ। আলোর তরঙ্গ ছোট-বড়, দীর্ঘ-হ্রস্ব নানারকমের হতে পারে। আলোর বর্ণভেদের কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্য।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ বিজ্ঞানী ক্লার্ক্ ম্যাক্স্ওয়েল্ (Clerk Maxwell) আলোকবিজ্ঞানের এই তরঙ্গবাদকে এক বিশিষ্ট আকার দান করেন। গণিতের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, বিদ্যুতের স্পন্দন হলেই হয় বিদ্যুতের ঢেউ। ছোট বড় নানারকমের বিদ্যুতের ঢেউ শূন্য আকাশে সমান ক্ষিপ্র গতিতে প্রবাহিত হয় এবং এদের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। এই মতে তাপ ও আলোর তরঙ্গ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলে প্রতিপন্ন হল। এর পর জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস্ (Hertz) যখন সত্য-সত্যই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে তার অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করলেন, তখন ম্যাক্স্ওয়েলের বিদ্যুৎ-তরঙ্গবাদ বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এই সময় থেকেই তাপ, আলো, বেতারতরঙ্গ, রঞ্জনরশ্মি, গামারশ্মি প্রভৃতিকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তাপ-তরঙ্গ আলোর তরঙ্গ অপেক্ষা দীর্ঘতর— চোখে তার সাড়া পাওয়া যায় না; ত্বক্ দিয়েই এর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। অতি-বেগুনি (ultra-violet) আলোর তরঙ্গ দৃশ্য আলোর তরঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। আবার বেতারতরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য তাপতরঙ্গ অপেক্ষাও অনেক বড়। অন্যদিকে রঞ্জনরশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে নিঃসৃত গামারশ্মিও বিদ্যুতের তরঙ্গ। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট।

ম্যাক্স্ওয়েলের বিদ্যুৎ-তরঙ্গবাদে ইথারের বস্তুগত সত্তা স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। কেবল তার জ্যামিতিক সত্তাটিকে স্বীকার ক'রে ম্যাক্স্ওয়েল্ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞান যেমন জড়কণা বা বিদ্যুৎকণার উপর খাটানো হয়— ম্যাক্স্ওয়েলের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের এই নিয়মগুলি তেমনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, তরঙ্গের ক্ষেত্রে নিউটনের গতিবিজ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। পরে ইলেক্ট্রন্-তত্ত্বে ম্যাক্স্ওয়েলের এই নিয়মগুলিই আবার বিখ্যাত বিজ্ঞানী লোরেঞ্জ্ (Lorentz) খুব কাজে লাগিয়েছিলেন। তরঙ্গবাহিত শক্তি যেমন বিভিন্ন জড়পদার্থে বিভিন্নভাবে সঞ্চিত ও প্রকাশিত, জড়কণার আকর্ষণ বিকর্ষণে তরঙ্গকুলও তেমনি বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত। কণা ও তরঙ্গ— এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বজগৎ যেন বিচিত্র লীলায় ছন্দিত! এই বিচিত্র লীলার মূলসূত্রগুলিরই অনুসন্ধান ও অনুশীলন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা করে আসছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, অসংখ্য কণার সমষ্টি এই জড়ের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়মগুলি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত— এই উভয় ভাবেই প্রয়েগ করা সম্ভব। সমষ্টিগত প্রয়োগের ফলে জগৎ ও ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি মোটামুটি গড়পড়তা নিয়মে আসা যায়। এই গড়ের নিয়ম সত্ত্বেও এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি এবং ম্যাক্স্ওয়েল্-লোরেঞ্জের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়মগুলির ব্যষ্টিগত প্রয়োগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সুগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলে প্রত্যেকটি কণার খবর যখন পাওয়া সম্ভব হবে, অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের সব খবরই তখন সুনিশ্চিতভাবে জানা যাবে। এই নৈশ্চিত্যবাদের পশ্চাতে রয়েছে চলমান

কার্যকারণ-পরম্পরার অবিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস এবং বিশ্বের সকল ঘটনার দেশকালগত ব্যাখ্যার সম্ভাবনায় গভীর আস্থা। আপেক্ষিকতত্ত্বে দেশকাল ও বস্তু নিয়ে আইন্‌স্টাইন্ যে চতুর্মাত্রিক জগৎ রচনা করেছেন— এই তত্ত্বেও কার্যকারণ-সম্বন্ধ ও হেতুবাদকে স্বীকার করা হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারায় সংশয় ও সংকটের সূত্রপাত হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে। আলোক-তরঙ্গের সহিত বস্তুর পরমাণুরাশির ঘাতপ্রতিঘাতের ফল নিউটনের গতিবিজ্ঞান ও ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-লোরেঞ্জের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়মগুলি থেকে যা সিদ্ধান্ত করা হয়, পরীক্ষায় দেখা গেল তার বিপরীত। এই সংকটেই প্রসিদ্ধ জার্মাণ বিজ্ঞানী মাক্‌স্ প্লাঙ্ক্ (Max Planck) তাঁর শক্তিকণাবাদ (quantum theory) প্রচার করেন। আলোকবিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও পরীক্ষা তরঙ্গবাদের অনুকূল হলেও প্লাঙ্ক্ দেখালেন যে যখনই আলোক এবং পরমাণুর সঙ্গে শক্তির আদানপ্রদান হয়— যার ফলে পরমাণু আলো থেকে শক্তি গ্রহণ করে অথবা যার ফলে পরমাণুর শক্তি থেকে আলোর উৎপত্তি দেখা যায়, তখন তরঙ্গবাদ পরীক্ষিত তথ্যের কোনও মীমাংসাই দিতে পারে না। আলোককে তখন শক্তিকণার সমষ্টি বলে কল্পনা করার দরকার হয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিভিন্ন শক্তিকণার (quanta) সমষ্টি এবং আলোর স্পন্দনসংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে— এই হল শক্তিকণাবাদের মূল কথা। আলোক ও পরমাণুর মধ্যে শক্তির আদানপ্রদানে তথ্যের সহিত তত্ত্বের যে অসংগতি দেখা গিয়েছিল, এই শক্তিকণাবাদে তার মীমাংসা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের জটিল সমস্যার সমাধানও এই নূতন মতবাদে সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তিকণাবাদ মেনে নিলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানীকে বাধ্য হয়েই তরঙ্গবাদের শরণ নিতে হয়েছিল। এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদ বিজ্ঞানজগতে পাশাপাশি অনেক দিন চলেছিল। পরে টম্‌সন্ (G. P. Thomson), গার্মার (Germer) প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানীর অভিনব পরীক্ষার ফলে এই দুই মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া গেল। এঁদের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, সময়বিশেষে ইলেক্‌ট্রনের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে করা যেতে পারে। তরঙ্গের এক ধর্ম বিচ্ছুরণ ; আলোকতরঙ্গের ন্যায় ইলেক্‌ট্রনের স্রোতও সময় সময় জড়পদার্থের উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়— টম্‌সন্, গার্মার প্রভৃতির পরীক্ষায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই সিদ্ধান্ত করা হল যে গতিশীল বিদ্যুৎকণায় কণা ও তরঙ্গ এই দুয়েরই লক্ষণ বা ধর্ম বর্তমান রয়েছে। এই পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা লুই দ্য ব্রোগ্‌লি (Louis de Broglie), হাইসেন্‌বার্গ্ (Heisenberg), শ্রোয়ডিংগার (Schrödinger) প্রভৃতি মণীষী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। এঁরা এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেন— আমরা একে কণাতরঙ্গ-তত্ত্ব বলতে পারি। ইংরাজিতে একে wave-mechanics বা quantum mechanics বলা হয়। এই নূতন তত্ত্বে কণাবাদ ও তরঙ্গবাদের বিরোধ দূরীভূত হল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের মূল চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

পূর্বেই বলেছি, আলোক ও পরমাণুর ভিতর শক্তির আদানপ্রদান সম্পর্কে শক্তিকণাবাদের প্রবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে নিউটনের গতিবিজ্ঞান এবং ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-লোরেঞ্জের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়ম যখন নিতান্তই বিকল বলে সাব্যস্ত হল, তখন এদের মূলে যে অবিচ্ছিন্ন কার্যকারণপরম্পরায় বিশ্বাস ও নৈশ্চিত্যবাদ রয়েছে, সেই বিশ্বাস ও মতবাদেও গভীর সন্দেহ এসে উপস্থিত হল। শক্তিকণাবাদ এ সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হয় নি। কণা ও তরঙ্গকে একীভূত ক'রে যখন কণা-তরঙ্গ-তত্ত্ব প্রচারিত হল, তখন

বিজ্ঞানীর মনে আশা জেগেছিল— হয়তো বা এই নূতন তত্ত্বে কার্যকারণবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু সে আশাও গিয়েছে মিলিয়ে। এই নূতন তত্ত্ব থেকে হাইসেন্‌বার্গ্‌ বরং এক অনৈশ্চিত্যবাদের প্রচার করলেন। এই মতানুসারে বিদ্যুৎকণারূপে ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতি দুই-ই একসঙ্গে সঠিক করে আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব ; আবার তরঙ্গ-সংঘ-রূপেও ইলেকট্রনের কোনও নিশ্চিত নির্ধারণ সম্ভব নয়। তরঙ্গরূপে ইলেকট্রনকে বিজ্ঞানীরা আজ ঝাপসা মেঘের টুকরার সঙ্গে তুলনা করেন। এই মেঘের ভিতর ইলেকট্রন আলোর বেগে ঘুরে বেড়ায় ; কখন এবং ঠিক কোন্‌ জায়গায় তাকে পাওয়া যাবে তা সঠিক করে জানা আমাদের অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান কণা ও তরঙ্গকে যখনই ব্যষ্টিগতভাবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা হয়েছে, তখনই তার সুনিশ্চিত সন্ধান মেলে নি। এক কথায় ব্যষ্টির অন্বেষণে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম মতবাদে নৈশ্চিত্যের কোনও স্থান নাই— সমষ্টিগত বিচারেই কেবল এই তত্ত্বের মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। সমষ্টিগত বিচার এবং বিশ্লেষণের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানীর নিঃসন্দিগ্ধ অভিমত এই যে, এই আধুনিকতম মতবাদের কোনও হেতুমূলক ব্যাখ্যা একেবারেই সম্ভব নয়।

এখানে বলা দরকার, হাইসেন্‌বার্গের অনৈশ্চিত্যবাদে অনিশ্চয়তার পরিমাণ নির্দেশ করা যায়। পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট পদার্থের ব্যবহারে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এতই কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বা শক্তিকণার স্থানকালগত বর্ণনা দিতে হলেই অনিশ্চয়তা হয় অনেক বেশি। এর কারণ, সূক্ষ্ম প্রাথমিক কণার ব্যবহার পরীক্ষা করতে গেলেই মাপ-ফলের উপর মাপ-যন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হয় এবং এর কতখানি যন্ত্র-ঘটিত ও কতটুকু বস্তু-ঘটিত তা পৃথক করে জানা যায় না। এইজন্যই হেতুবাদের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পরমাণুর জগতেই কেবল ধরা পড়ে। এইজন্যই আবার সাধারণ ব্যবহারিক জগতে— যেখানে স্থূল ও পরিমিত আয়তনের বস্তু নিয়েই আমাদের কারবার— অনিশ্চয়তার কোনও আশঙ্কাই থাকে না ; মোটের উপর সেখানে কার্যকারণ-নিয়ম প্রয়োগ করা চলে।

আমরা জানি স্থানগত ও কালগত ব্যবধান এবং গতি-- এদের মাপ-জোকের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এই পরিমাপের দ্বারাই বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। বস্তুর প্রাথমিক উপাদান সম্পর্কে হেতুবাদ ও কার্যকারণ-নিয়মই যখন অনিশ্চিত ও অচল বলে ধার্য হল, তখন মাপক-যন্ত্রে যা মাপা যায় তার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দিল। কাজেই এ কথা বলতে হয় যে, মাপ-জোক ক'রে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা অসম্ভব।

ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না— এই নেতিবাচক উক্তি আধুনিক বিজ্ঞানীর নিকট গ্লানিকর নয় ; কারণ বিজ্ঞানীর কাজ 'প্রকৃতে'র সন্ধান নয়, 'প্রকৃতে'র প্রকাশই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্র। এই প্রকাশেরই বিচিত্রতায় ঐক্যের অন্বেষণে বিজ্ঞানী থাকেন ব্যস্ত। নক্ষত্রলোকের বিবর্তন-ধারায়, ব্যবহারিক জগতের সকল ঘটনায়— পরমাণুর জগতে বিদ্যুৎকণার চলন, স্খলন ও ঘূর্ণনের ইতিহাসে এবং সারা বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান কণা ও তরঙ্গের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে 'প্রকৃত'কে ছেড়ে 'প্রকৃতে'র প্রকাশ নিয়েই বিজ্ঞানী থাকেন ব্যাপৃত। বিজ্ঞানের এ সাধনায় কার্যকারণ-নিয়ম, হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদকে আজ বর্জন করতে হয়েছে এবং যতদূর মনে হয় ভবিষ্যতে মতবাদের পরিণতি হলেও বিশ্বের প্রাথমিক কণা সম্বন্ধে সমষ্টিগত নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই হয়তো জানা সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানীর এই প্রকাশের

জগৎকেই স্বর্গগত বিজ্ঞানী এডিংটন্ (Eddington) বলেছিলেন প্রতীক বা বিগ্রহের জগৎ (symbolic world)। একদিন মনে হয়েছিল, এই প্রকাশই বুঝি শাশ্বত সত্য এবং দেশকাল- ও বস্তু-নিরপেক্ষ। কিন্তু, বিজ্ঞানীর সে ভুল আজ ভেঙেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, বিজ্ঞানজগতের সীমারেখার কথা যদি আমরা মনে রাখি, তবে বিজ্ঞান ও ধর্মে কোনও বিরোধ থাকে না। প্রতীকের জগৎ যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, প্রত্যক্ষ 'প্রকৃত'কে নিয়ে তেমনি ধর্মের জগৎ ও আর্টের জগৎ। আর্ট্ ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানুষের সহিত যোগ হৃদয়ের যোগ; আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির যোগ। এক কথায় ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের এই জগৎ রসসৃষ্টির জগৎ। যে বিজ্ঞানী শিল্পের, ধর্মের বা কবিত্বের রসাস্বাদনে অসমর্থ— সে শুধু বিজ্ঞানীই, আপন রাজ্যেই সে স্বপ্রতিষ্ঠ। আবার যে বিজ্ঞানী এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞানজগতের আস্বাদ পায়, সে বিজ্ঞানী ছাড়া আরো কিছু; এই রসানুভূতি তার বিজ্ঞানে কোনও হানি বা গ্লানি করে না।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের কোন্ পর্যায়ের নাটকগুলিকে ঋতুনাট্য বলিতেছি, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা আছে। ঋতু-উৎসব নামে কবির যে নাট্যসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর-এর সঙ্গে শারদোৎসব ও ফাল্গুনী স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা চলে যে, শারদোৎসব ও ফাল্গুনীকেও কবি ঋতুনাট্য মনে করিতেন। এইখানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ।

আগে একবার বলিয়াছি, আবার মনে করাইয়া দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাট্যের তিনটি ধাপ আছে। এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানুষ প্রধান অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা, মানুষ পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনো ব্যাখ্যাতারূপে, কখনো কেবল দর্শকরূপে মাত্র।

আমরা এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই প্রকৃত ঋতুনাট্য বলিতে চাই। ফাল্গুনী ও শারদোৎসব-এ মানব অভিনেতা প্রধান, প্রকৃতি সজীব ও গভীর অর্থপূর্ণ পটভূমিকা; প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা হইয়া ওঠে নাই।

শ্রেণীবিচারের যে সঙ্কেত দিলাম তদনুসারে আমাদের মতে নিম্নলিখিত পাঁচখানি নাটককে প্রকৃত ঋতুনাট্য বলা চলে। শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন, ও শ্রাবণগাথা।

গীতোৎসব, সুন্দর, ও বর্ষামঙ্গল প্রায় এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু কোনো ক্রমেই এগুলিকে নাটক বলা চলে না— এগুলি বিশেষ বিশেষ ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রচিত বা সঙ্কলিত গানের মালা মাত্র; নাটকীয় লক্ষণ দানের কোনো প্রচেষ্টা এগুলিতে নাই।

কিন্তু যে পাঁচখানিকে ঋতুনাট্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম তাহাও ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রচিত, কিন্তু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ প্রবেশ ও প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বারা এগুলিকে নাটকীয় করিয়া তুলিবার সচেতন চেষ্টা আছে।

এই সব নাটকে দুই শ্রেণীর অভিনেতা দৃষ্ট হয়, মানব ও প্রকৃতি। হয় তো কোনো রাজসভাতে ঋতু-উৎসব লাগিয়াছে; রাজসভার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাজা আছেন, সভাকবি আছেন, পারিষদ্‌গণ আছে, নাট্যাচার্য আছেন, নটরাজ আছেন, আবার আভাসে সামাজিক শ্রোতাগণও আছেন। আবার আর-এক দিকে প্রকৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন ঋতু আছে; নদী আছে; দখিনহাওয়া আছে; শালবীথিকা, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, করবী, বকুল, মাধবী, মালতী ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত দলই প্রধান অভিনেতা; পূর্বোক্ত মানুষেরা দর্শক এবং ব্যাখ্যাতা মাত্র।

শ্রাবণগাথা ও শেষবর্ষণের নটরাজ, এবং বসন্তের কবি নাট্য ব্যাপারের ব্যাখ্যাকারী। যেমন কোনো কোনো চলচ্চিত্রে একটি অশরীরী বাণীকে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে শোনা যায়— অনেকটা সেই রকম

আর কি। আবার ওই তিনখানিতে রাজা উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে আদর্শশ্রোতা বলা যাইতে পারে। গ্রীক্ নাটকের কোরাস্‌কে Ideal Spectator বলা হইয়াছে; তাহারা কেবল আদর্শশ্রোতা মাত্র নয়, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঘটনার গ্রন্থি-উন্মোচনে সাহায্য করিয়া অনেক পরিমাণে ব্যাখ্যাতার কাজও করিয়া থাকে। কোরাসের সেই দায়িত্ব এখানে রাজা এবং নটরাজ বা কবির মধ্যে যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই সব নাটকে মানব অভিনেতারা গদ্যে কথা বলিতেছেন। গদ্য ব্যাখ্যার জন্যও বটে, আবার এই গদ্যের সাদা পটের উপরে গানের সুর ও পাত্রপাত্রীর নৃত্য উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াও বটে। নৃত্য ও গীত ইহার প্রধান অঙ্গ; গদ্যাংশ গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে জোড়া দিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র।

নবীন নাটকখানিতেও গদ্য আছে বটে, এবং তাহার উদ্দেশ্যও পূর্ববর্ণিত-মতো, রসব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, তাহা যে কে বলিতেছে তাহার উল্লেখ নাই; অভিনয়ের সময় স্বয়ং কবি বলিতেন। যিনিই বলুন তিনি একাধারে আদর্শ দর্শক ও ভাষ্যকার ছাড়া আর কিছু নহেন।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায় গদ্য আদৌ নাই। তৎপরিবর্তে গানে ও কবিতায় এটি মিশ্রিত। কবিতাংশ ইহার পটভূমিকা। এই কবিতাগুলিও অভিনয়কালে স্বয়ং কবি আবৃত্তি করিতেন; তাঁহার কাজ ছিল দর্শকের চিত্তে রসোদ্‌বোধনে সাহায্য করা— এখানেও তিনি ভাষ্যকার ও আদর্শ দর্শকের কাজ একাধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবারে ঋতুনাট্যের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন, কৈশোর হইতেই, এই ঋতুরস-উপলব্ধির দিকেই যেন চলিয়াছে। পূর্বে তাঁহার নাটকের যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের নাটক মানবরসপ্রধান, তাহাতে প্রকৃতির সচেতন উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তবু তাহার গুরুত্ব গৌণ, মানুষই প্রধান। তৃতীয় পর্যায়ে মানব অভিনেতা গৌণ হইয়া পড়িয়া প্রকৃতিকে রঙ্গমঞ্চের পুরোভূমিকা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেমন ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রকৃতির রূপ-উপলব্ধির গুরুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। ঋতুনাট্যগুলি কবিজীবনের এই প্রকৃতিমুখী বিবর্তনের চরম-ধাপ। জীবনের শেষ দিকে তাঁহার কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাঁহার কাছে মানুষকে বুঝিবার দোসর প্রকৃতি; মানবজীবনকে যতক্ষণ না প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ যেন তিনি তাহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। মানবজীবনের তীব্র সূর্যালোকের দিকে তাকানো যায় না বটে, কিন্তু সেই আলো যখন প্রকৃতির চন্দ্রলোক হইতে স্নিগ্ধতর হইয়া বিচ্ছুরিত হয় তখন সে দিক হইতে চোখ ফিরাইতে আর ইচ্ছা করে না। এই যে প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প করিয়া বুঝিবার প্রয়াস— ইহার সূচনা ফাল্গুনী নাটকে। বর্তমান ঋতুনাট্যগুলির মতই ফাল্গুনীতেও দুটি ভাগ আছে— প্রকৃতির গীতিভূমিকা ও মানুষের অভিনয়। মানুষের জীবনের রহস্যের চাবিকাঠি যেন প্রকৃতির হাতেই রহিয়াছে।—

'গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা কি আলাদা নাকি?'

'না, মহারাজ— বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

অর্থাৎ, মানুষের প্রাণের লীলাকে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা। কবির কাছে প্রকৃতি যেন মানবজীবনের ব্যাখ্যাতা, ভাষ্যকার। মানবজীবনের দুরূহ কালিদাসকে প্রকৃতির মল্লিনাথ সঞ্জীবনী টীকা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া যেন সরস সুবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান ঋতুনাট্যগুলি ফাল্গুনীর গীতিভূমিকারই পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। কিংবা ফাল্গুনীর মানব-অংশকে বাদ দিয়া গীতিভূমিকার ঋতু-অংশগুলিকে বাড়াইয়া, গদ্য জুড়িয়া দিয়া, প্রবেশ প্রস্থান সংযোজিত করিয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়— ঋতুনাট্যগুলি তাহা ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বনবাণী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠকসমাজে বোধ করি ইহার বহুপ্রচলন ঘটে নাই। কিন্তু, ইহা কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তাপূর্ণ একখানি কাব্য। প্রকৃতি যে মানুষের বিকল্প হইয়া উঠিয়াছে— বনবাণীর পত্রে পত্রে তাহা মর্মরিত হইতেছে। বনবাণীর মধ্যেই যেন তিনি মানববাণীর সার্থক প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন। এই কাব্যের ভূমিকায় প্রকৃতির সহিত তাঁহার, প্রকৃতির সহিত মানুষের, একাত্মতার স্পষ্ট উল্লেখ কবি করিয়াছেন।—

'আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্‌সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন: যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন: কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ: প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না; রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?'

এই ভূমিকাটিতে দেখা যায় বনবাণী কবির কাছে জীবজগতের আদিবাণী, মানুষের বাণী তাহার তুলনায় অর্বাচীন ; বিশ্বের প্রাণের বিশুদ্ধ রহস্য যেন ওই গাছপালার প্রাণের মধ্যে নিহিত। আরণ্যক ঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধদেবের বোধিদ্রুমলীন সাধনার ভিতর দিয়া, লৌকিক সাধিকা বোষ্টমী পর্যন্ত যেন এই সত্যটিকে প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বসৃষ্টির প্রাণবেগ গাছপালার প্রাণ-প্রৈতির মধ্যে স্পন্দিত। পৃথিবীর অরাজকতার কোলাহলে বনবাণীর একতারা বিশ্বসঙ্গীতের ধুয়াটি ধ্বনিত করিতেছে— এই সঙ্গীতের স্নানে কবিচিত্ত নির্মল হইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

প্রকৃতিকে কবি কী দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে প্রকৃতির গুরুত্ব কতখানি, তাহার প্রকাশ ও ব্যাখ্যা এই ভূমিকাটিতে যেমন আছে, অন্য কোথাও তেমন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই কাব্যে জগদীশচন্দ্র বসুর নামে একটি কবিতা আছে। আচার্য বসুর উদ্দেশে ইহার আগেও কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনের সম্বন্ধে কবির গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা ছিল। ইহার কারণও কবির প্রকৃতির প্রতি সমবেদনার মধ্যে নিহিত। জগদীশচন্দ্র যদি নিছক পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিক হইতেন তবে বিজ্ঞানসাধনায় কবির এমন সকৌতূহল সমবেদনা লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। জগদীশচন্দ্রের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল বনবাণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী তরুলতার রহস্য-উদ্ভেদের চেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় কবিপন্থায় কৈশোর হইতেই এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, একজনের পন্থা বিজ্ঞানসম্মত, আর-একজনের পন্থা ধ্যান-গম্য ; লক্ষ্য কিন্তু একই। এখন, সাধনার এই সমলক্ষ্যতাই রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার প্রতি অনুরক্ত ও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত সবগুলি কবিতাতেই বিজ্ঞান-সাধনার এই বিশেষ লক্ষ্যটির সবিশেষ উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞানের অন্য কোনো লক্ষ্যের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইজনে দুই দিক হইতে একই রহস্য-উদ্ঘাটনের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

শেষবর্ষণ

এই পালাগানের উপজীব্য বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। রবীন্দ্রনাথের কোনো পালাই নিছক যাওয়াতে পরিসমাপ্ত নয় ; যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসার সূচনা দিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হন।

এখানে যে কেবল বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন তাহা নয়— পালা সমাপ্তির মুখে দেখা গেল, বাদললক্ষ্মীই মেঘের অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া শরৎশ্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন ; বাদললক্ষ্মীই অবস্থাভেদে শরৎশ্রী, ইহাই এই পালার মর্মকথা।

কোনো রাজসভায় শেষবর্ষণ পালার উৎসব শুরু হইয়াছে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজা, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গানের দল। আর আছেন রাজকবি ও পারিষদ্‌গণ। পালার রচয়িতা কবি পলাতক।

নটরাজ ও নাট্যাচার্যকে পালাগানের প্রয়োজক বলা যাইতে পারে, তাঁহারা নাটকের ঘটনা ও মর্মকে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। রাজা আদর্শ দর্শক, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটিকে গ্রহণ করা উচিত সেইভাবে তিনি করিতেছেন। রাজকবি ও পারিষদ্‌গণ সাধারণ দর্শকের প্রতিনিধি, অর্থাৎ যে ভাবে পালাটি গৃহীত হইবার আশঙ্কা সেই মনোভাবটি তাঁহাদের কথাবার্তায় দেখানো হইয়াছে।

প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে বাদললক্ষ্মী, শরৎশ্রী (দুই-ই এক সত্তা), আর সুন্দর।

আরও একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সংলাপ চলিতেছে গদ্যে, কিন্তু পালার আসল ব্যাপার অর্থাৎ প্রকৃতির রসোদ্‌বোধন চলিতেছে গানে; সঙ্গীতগুলি যেন এখানে কাব্যাংশ, আর গদ্য হইতেছে তাহার ভাষ্য ও টীকা। আলোচনাকালে এই টীকাই গুরুতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্তমান সমালোচক এখানে টীকাকারের টীকা করিতে বসিয়াছেন।

বর্ষার রূপ বাহিরে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনুরূপ একটা লীলা মানুষের অন্তরে চলিতেছে— তাহা যদি না হইত তবে মানুষের পক্ষে বর্ষার কোনো মূল্য থাকিত না।—

'নটরাজ। সে [বর্ষা] তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়। ·

মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, : রজনী শাঙন-ঘন, ঘন দেয়া-গরজন, রিম্‌ ঝিম্‌ শবদে বরিষে।

রাজা। ভিতরের দিকে ? সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি, প্রাণের আকাশে পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।'

অন্তর ও বাহিরের মিলনের ঘটক হইতেছে গান ও সুর। সুরের সারথ্যে দর্শকের চোখের সম্মুখে শ্রাবণের কোন্‌ রূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ?—

'শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।'

শ্রাবণ আপনার পূর্ণতার আনন্দে রিক্ত হইয়াছে, সেই পূর্ণতাজাত রিক্ততাই তাকে ঘরের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উদাসীন সন্ন্যাসী করিয়া পথে বাহির করিয়াছে। এই আইডিয়া রবীন্দ্রকাব্যে অত্যন্ত অবিরল ; বসন্ত ঋতুর তাৎপর্য ব্যাখ্যার বেলাতেও পুনরায় ইহা চোখে পড়িবে।

এমন সময়ে পুবদিক আলোকিত হইয়া শ্রাবণের পূর্ণচন্দ্র আভাসে দেখা দিল।—

'রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমার পূর্ণতা কোথায় ? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই, কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে 'আমার জিত', কান্না বল্‌ছে 'আমার'। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল।'

শ্রাবণের পূর্ণিমা জীবনের সগোত্র, তাহাতে একাধারে হাসি ও কান্না আছে, আর সেই জন্যই হাসিমাত্র-সম্বল বসন্তপূর্ণিমার চেয়ে পূর্ণতর সে। কিন্তু, বর্ষায় তো কেবল মাধুর্য নাই ; কঠোরতাও আছে, নহিলে পূর্ণতা কিসের ? মধুরে কঠোরে মিলিয়া বর্ষার হরপার্বতীর রূপ।—

'বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।...
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা।'

বর্ষার রূপের মধ্যে বজ্রমাণিক আছে, শ্যামল শোভার সঙ্গে বিদ্যুৎ-বহ্নি আছে ; এক দিকে তাহার কোমল সবুজসুধা প্রাণদায়িনী, আর-এক দিকে তাহার মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বন্যা— এই সব বিরুদ্ধের সমাবেশই তাহাকে জীবনের জটিল পূর্ণতা দান করিয়াছে।

কিন্তু, ইহাই বর্ষার রূপের সবটা নয়। তাহার মধ্যে বিরহ অন্যতম প্রধান।—

'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।'

বিরহ আছে বলিয়াই মিলনও আছে। 'খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের।'

এবারে রাজা বলিতেছেন, 'কান্না হাসি, বিরহ মিলন সবরকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।'

গানের আবহাওয়া বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া রাজার ইচ্ছা, বাদলের পালাটাই চলুক। কিন্তু, পালা তো বাদলের নয়, বাদলবিদায়ের। বিদায়ের সুর বাঁশিতে ধ্বনিত না হইলে শরতের আগমনী হইবে কিরকমে? কারণ, ইহা যে একাধারে বাদল বিদায় ও শরৎ-আগমনের পালা। 'শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।'

শরতের আগমনী বহন করিয়া শুকতারা ও শেফালি দেখা দিল।—

'রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ ক'রে ক'রে শরৎকে দেখাবে কেমন ক'রে।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধ'রে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক, আকাশে আলোকশতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হ'য়ে উঠুক।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন ; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে, মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি ব'লে ভুল হয়।··· বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে।··· প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদ্‌গদ্, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশীর ধ্বনি।···

অবগুণ্ঠন-মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু, এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে।'

শরৎপ্রতিমা একাধারে বাহিরেও বটে, অন্তরেও বটে।—

'রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে। বলো তো এবার কে আসবে।

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।···

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি [সুন্দর] এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন।

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদামেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।'

সুন্দরের স্বভাবই এই। ক্ষণিকতা সৌন্দর্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বাস্তবে সৌন্দর্য অত্যন্ত ক্ষণস্থ। বিদায়ের আকস্মিকতায় হতাশ হইয়া রাজা শুধাইলেন—

'রাজা। এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা, তার পরে ?

নটরাজ। তারপরে প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম।'

ইহাই সংক্ষেপে শেষবর্ষণ পালার মর্ম। মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া ছায়া-চিত্রের মত দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে ; মানব দর্শক সাজিয়া বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে।

বসন্ত

বসন্ত পালাগানের কাঠামোটাও শেষবর্ষণের অনুরূপ। পাত্রপাত্রী দুই শ্রেণীর, মানব ও প্রকৃতি। মানব অভিনেতা পটভূমিকাশ্রয়ী, প্রকৃতি পুরোভাগে। কবি ব্যাখ্যাতা, রাজা আদর্শ দর্শক— একে অপরের পরিপূরক।

রাজা রাজকোষের দীনতা দেখিয়া অমাত্যদের সঙ্গ পরিহার করিয়া পালাগানের আসরে আসিয়া উপস্থিত। কবি তাঁহাকে ভরসা দিলেন, এখানে তিনি রাজসঙ্গী পাইবেন ঋতুরাজ বসন্তকে— ইনিও পলাতক।—

'রাজা। ঋতুরাজ ? বসন্ত ?

কবি। হাঁ, মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।'

ঋতুরাজ বসন্ত পরম ঐশ্বর্যে পূর্ণ; সেই পূর্ণতার আনন্দে তিনি সর্বস্ব নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া

রিক্ত হন। যিনি ছিলেন রাজা তিনি সন্ন্যাসীবেশে দেখা দেন। বসন্ত একাধারে রাজা ও সন্ন্যাসী, তিনি এক সত্তায় রাজসন্ন্যাসী।—

'রাজা। ওহে কবি, এ তোমার এ পালাটা কিরকম করে তুলেছ? বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ঐ যে এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি; ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাগুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ঐ যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে পথেই থাকেন।

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।'

বসন্তের এই রাজসন্ন্যাসী, পথিক, বাস্তুছাড়া রূপটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ও পুরাতন আইডিয়া। ইহা মনে না রাখিলে তাঁহার ঋতুরাজকে ও ঋতুনাট্যকে বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

এই বাস্তুছাড়া, পথিক, রাজসন্ন্যাসীর কর আদায় করিবার জন্য বসন্তের পরিচারকগণ উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির কাছে দাবি জানাইতেছে—

'সব দিবি কে, সব দিবি পায়! আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়, আয়, আয়, আয়!
আসবে সে যে স্বর্ণরথে, জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়!'

ঋতুরাজ আসেন স্বর্ণরথে বটে, কিন্তু তিনি সানন্দে ভিক্ষুকের মতো দান যাজ্ঞা করিয়া ফেরেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবানেরও এই একই লীলা।[১]

ঋতুরাজ সর্বস্ব দান করেন বলিয়াই তিনি সর্বস্ব আকাজ্ক্ষা করেন। আর, যাহারা দান করে তাহারা রিক্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয়া উঠে।—

'কবি! বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠেন।··· ···

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়।

রাজা। তা এরা সব [প্রকৃতি] রাজি আছে?

কবি। এদের মুখেই শুনে নিন।'

---

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ খেয়াকাব্যে 'কৃপণ' কবিতা উল্লেখযোগ্য।

বসন্তের আহ্বানে শিথিল প্রকৃতি সাড়া দিয়াছে। বনভূমি বলিতেছে—

'বাকি আমি রাখব না কিছুই,
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।'

আম্রকুঞ্জ বলিতেছে—

'ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে,
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।'

রাজা বুঝিলেন, 'ফল ফলাবো বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে ফল চাই নে বলতে পারলে ফল আপনি ফলে ওঠে।'

এক দিকে ইহারা যেমন সর্বস্বদানের জন্য উদ্‌গ্রীব, তেমনি আর-একদিকে এক দল নিঃশেষ আত্মসমর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত। করবী বলিতেছে, আমি যদি তাহাকে না-ই চিনিতে পারি সে তো আমাকে চিনিয়া লইবে? কুঁড়ির কানে কথা বলিয়া আমায় ফুল ফোটানোকে সার্থক করিবে? বেণুবন বলিতেছে, দখিনহাওয়া তাহার শাখায় শাখায় সুপ্ত গানকে জাগাইয়া তুলুক—

'নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
'মুক্তিদোলা করে যে দান।'

দীপশিখা মিনতি করিতেছে—

ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে মৃদু মৃদু কও।

এমন সময়ে ঋতুরাজের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি চাঁপা-করবীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নাই। মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী অভ্যর্থনার ঐক্যতানে তাঁহার আগমনী জগতে প্রচার করিয়া দিল। দখিন হাওয়া বলিতেছে—

'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘর-ছাড়া ঐ কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যবনে যায় ঘুরে।...
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।'

মাধবী মালতীর 'তুমি কার' এই প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বলিতেছেন—

'আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী।'

বনপথের প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বনফুলের সঙ্গে, কৃষ্ণচূড়া বকুল শিরীষ প্রভৃতির সঙ্গে, তাঁহার কী সম্বন্ধ

প্রকাশ করিতেছেন। এমনি করিয়া মিলনের হাওয়াটি যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে তখন কবি বলিতেছেন—

'কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়?

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।··· বলেইছি তো পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।'

পূর্ণতার মুহূর্তটির চরম লগ্নে ঋতুরাজ বিদায়ের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। মিলন হইতে বিরহ একধাপ মাত্র, পূর্ণতা হইতে রিক্ততা একধাপ মাত্র, রাজত্ব হইতে সন্ন্যাস একধাপ মাত্র। ঋতুরাজের গায়ের কাপড়খানার কথা স্মরণীয়। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' তাঁহার কাছে বিরহ মিলন খণ্ড নয়, জীবনসত্তার এ পিঠ ও পিঠ মাত্র।—

'সেখানে　মিলনদিনের ভোলাহাসি
　　লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে　যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা　রয় কানে গো, রয় কানে।'

কবি যত সহজে, যত আনন্দময় বৈরাগ্যে, বিদায়কে দেখিতেছেন সবাই তেমন দেখিতেছে না। ঝুমকো লতা বলিতেছে—

'না,　যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
　মিলনপিয়াসি মোরা,
　　কথা রাখো, কথা রাখো।'

একদিকে যেমন মিলনপিয়াসি বিদায়ব্যথাতুর ঝুমকোলতা মল্লিকা প্রভৃতি আছে, অন্যদিকে আকন্দ ধুতুরা ও জবা আছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী।—

'আকন্দ। এবার　বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো।
　তোমার　শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।···
ধুতুরা। আজ　খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
　　সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।···
জবা।　ভয় করব না রে
　　বিদায়বেদনা রে।'

কবি এখানে প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভেদ দেখাইয়াছেন। আকন্দ ধুতুরা জবা বিদায়ের দুঃখ সত্ত্বেও তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত। আকন্দ ধুতুরা মহাদেবের প্রিয় পুষ্প। ধ্বংসের দেবতার সাহচর্যে বিদায় ও দুঃখে তাহারা অনভ্যস্ত নয়। জবা কালীর প্রিয় পুষ্প, ধ্বংসের দেবীর সান্নিধ্যে মৃত্যুতে অশ্রুতে সে অভ্যস্ত। তখন সকলে বিদায়মুহূর্তের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া গাহিতেছে—

'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।'

মিলনের পূর্ণতার পক্ষে বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক, নতুবা মিলন খণ্ডসত্তা মাত্র। এই আইডিয়াও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি অতি পুরাতন ও বনিয়াদি আইডিয়া। 'তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগি হয়ে বেরিয়ে চলেছে।' এ যেন মহারাজ হর্ষবর্ধনের সর্বস্বদানের অন্তে চীরবাস মাত্র আশ্রয়ের মতো। পূর্ণের কাছে ঐশ্বর্যে বৈরাগ্যে, মুক্তিতে বন্ধনে, রাজবেশে কৌপীনে, মিলনে বিরহে, গৃহে ও পথে তিলমাত্র বিরোধ নাই ; বসন্ত সেই যথার্থ সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার প্রতীক।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

পূর্বোক্ত দুটি পালাগানের কাঠামো হইতে নটরাজের কাঠামো ভিন্ন ; ইহাতে গদ্য নাই, সংলাপ নাই, মানব পাত্রপাত্রী নাই। পুরোভূমিকা ও পটভূমিকায় ভেদ করিবার চেষ্টা নাই। পূর্বোক্ত দুটিতে গদ্য ও গান আছে, এখানে তৎপরিবর্তে কবিতা ও গান। কবিতাগুলি আবৃত্তি করিবার জন্য— অভিনয়কালে স্বয়ং কবি এগুলি আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলিকে ইহার পটভূমিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে ; এগুলি যেন একাধারে প্রয়োজক, ব্যাখ্যাতা ও আদর্শ দর্শকের বক্তব্য।

পূর্বোক্ত পালাগানগুলির সঙ্গে ইহার আরও প্রভেদ আছে। আগের দুটি ছিল একটি মাত্র ঋতুর পালা : শেষবর্ষণে বর্ষা, বসন্তে বসন্ত। নটরাজ অখণ্ড ঋতুচক্রের পালা। পূর্বোক্ত পালাতে ঋতুই প্রধান অভিনন্দনীয় ছিল, এখানে প্রধান অভিনন্দনীয় ঋতুবিশেষ নয়— স্বয়ং নটরাজ যিনি ঋতুচক্রের ভিতর দিয়া বিশ্বনৃত্য করিয়া চলিয়াছেন।

এই ঋতুচক্রের ভিতরে নটরাজের বিশ্বনৃত্য দর্শন করিবার জন্য বসন্তের আসরে কবি উদ্‌গ্রীব। এই বিশ্বনৃত্যে নটরাজের সঙ্গী হইয়া যোগ দিতে পারিলে বন্ধন স্খলিত হইয়া মুক্তিলাভ করা যায় ; নটরাজ সেই আদর্শ মুক্ত পুরুষ, আর তাঁহার কবি সঙ্গীরা তাঁহার আদর্শ পরিচর।—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম।'

নটরাজের এক পদক্ষেপ ঋতুচক্রের মধ্যে, অন্য পদক্ষেপ রসিকের চিত্তে ; এই দুই পদক্ষেপের ছন্দের সমীকরণ কবিজীবনের উদ্দেশ্য, নটরাজের উদ্দেশ্যও ইহাই।—

'নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে— যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল-পানে,

দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে……
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।'

এখানে লক্ষ্য করিবার মতো দুটি বিষয় আছে। যে কবির কথা বলা হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে যোগী ও সাধকের প্রভেদ নাই; উভয়েরই লক্ষ্য এক, মুক্তি; তবে সাধনমার্গের তফাত আছে, এই মাত্র।

কবি এই মুক্তির রূপটি দেখিতে চান ঋতুর লীলার মধ্যে; মুক্তি মানুষের জন্যই, কিন্তু তাহার শিক্ষাস্থান ঋতুরঙ্গশালা যেখানে নটরাজের নৃত্য ঋতুর প্রহরে প্রহরে চলিতেছে। কেহ বা এই মুক্তির রূপ মানুষের মধ্যে দেখিতে পায়, কেহ প্রকৃতির মধ্যে; রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রকৃতির মধ্যেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কারণ রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতির জীবনে আরোপ করিয়া উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত, ইহাই যেন তাঁহার পক্ষে প্রকৃতিসিদ্ধ।

ঋতুনৃত্যের প্রারম্ভে বৈশাখ। বৈশাখ তপস্বী, তাহার তপের তাপে জগৎ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ তপস্যা নীরস নয়, আষাঢ়ের সরসতার ভূমিকা মাত্র। রসোদ্‌বর্তনের পক্ষে, রসোপভোগের পক্ষে তপঃসংযমের প্রয়োজনেই বৈশাখের এই তপঃক্লিষ্ট মূর্তি। এবং—

'রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।'

বৈশাখের রৌদ্রতপস্যার মধ্যেই আষাঢ়ের প্রত্যাশা রহিয়া গিয়াছে।—

'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।'

আষাঢ় সন্ন্যাসী। কিন্তু এই সন্ন্যাসের রূপটিই আষাঢ়ের সমস্ত রূপ নয়। বর্ষা বিরহের ঋতু, আষাঢ়ের একটি বিরহী মূর্তি আছে। ঘরছাড়া এই সন্ন্যাসীর জন্য কোন্ উমা কোথায় যেন বিরহের তপঃশয্যায় দিবসের নিশীথায়িত দীর্ঘ প্রহরগুলি যাপন করিতেছে।—

'আজি এ বিরহদীপনদীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।'

শ্রাবণ যাইবার সময়ে 'অভিষেকস্নানে' আলোককে সুপ্রসন্ন করিয়া, ধরণীর 'নিগূঢ় বক্ষতলে তৃষ্ণার সম্বল' রাখিয়া, মেঘম্লান আকাশকে আলো দিয়া নিকাইয়া নির্মল শুভ্র করিয়া দিয়া, শরতের আসর প্রস্তুত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।—

'আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।'

শরৎ দৈত্যদমন চিরকালের বালক বীর।—

'মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস :
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তমো রে।'

উমার পুত্র কুমারের দৈত্য জয়ের জন্য জন্ম; শারদার পুত্র শরৎও তেমনি কুয়াসা ও অন্ধকারকে পরাজিত করিবার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

হেমন্ত লক্ষ্মী। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতা' তাঁহার। কবি বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

'স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে···
অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোণার অঘ্রানে।
তোমার অমৃতনৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি—
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।'

এই গেল হেমন্তের এক রূপ, আর-এক রূপ হইতেছে—

'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো :
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

এক দিকে হেমন্তলক্ষ্মী স্বর্গের স্বর্ণকে পক্বশস্যের আশীর্বাদের ভিতর দিয়া পৃথিবীর করগত করিয়াছেন; আবার আর-এক দিকে তিনি তারার দীপগুলিকে আবৃত করিয়া নিজের দীপে দীপান্বিত হইবার সুযোগ মানুষকে দিয়া থাকেন, মানুষ যাহাতে নিজের আলোয় তামসীকে জয় করিবার গৌরব লাভ করিতে পারে। হৈমন্তী বিশেষ ভাবে মানুষেরই লক্ষ্মী, স্বর্গের নহেন।

শীত রুদ্র সন্ন্যাসী। তাঁহার নির্দেশ কী?—

'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো, এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল পুষ্পের দুঃসাহস।'

কিন্তু বিনাশের রূপ সন্ন্যাসীর সবটা নয়, ইহা নবতর জীবনের ভূমিকা মাত্র—

'হে নির্মল,
সংশয়-উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল ;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা
…বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন।'

বসন্তের স্থচনা শীত ; তপস্যা যৌবনরসেরই ভূমিকা মাত্র। তপস্বী সন্ন্যাসীকে—

'কুন্দ মালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন।…
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য।'

কারণ, শীতের ধরণী তপস্বিনী, সে উমা ; শীতের সন্ন্যাসীই বসন্তের বরবেশে তপোবনপ্রান্তে উপস্থিত, সে নবযৌবন কান্ত, সে মহাদেব।[১]—

'হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,　　বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধরো ভুবনমোহন　নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ—
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ　তোমার উদ্দেশে।'

বসন্তের এই মিলন ক্ষণস্থায়ী, কারণ মিলন ও বিরহ মিলিয়াই প্রেমচক্রের সম্পূর্ণতা। বিরহ দুঃখের বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ নয়—

'ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসি যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে।
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।'

এই ক্ষণস্থায়ী মিলন স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে— সে স্মৃতি দোলের স্মৃতি। যে-দোলায় বসন্ত ধরণীকে লইয়া দুলিতেছেন, সেই দোলরজ্জুর এক প্রান্ত আবদ্ধ স্বর্গে, এক প্রান্ত মর্তে ; এক প্রান্ত মানুষের ঘরে, আর-এক প্রান্ত প্রকৃতিতে—

'সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্তে দোলে ছন্দভরে'।

---

১ শরতের রূপে কুমারের রূপক ; বসন্তের রূপে উমা-মহাদেবের রূপক ; কুমারসম্ভবের আইডিয়াটি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মতো আর কোনো কাব্য বোধ করি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে প্রভাবিত করে নাই।

স্বর্গ মর্ত, প্রকৃতি মানুষ, সকলকে দোলের প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া বরবধূর মধুর মিলনদোল চলিয়াছে।—

'লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে, বিরহিণীর মনে।'

এই দোলের আনন্দে তাল রাখিয়া নিখিল যোগ দিয়াছে। 'মাধবী তাই আসিল সেজে', মানুষও আসুক—

'এসো গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক্ বয়ে।'

মানুষে প্রকৃতিতে, সংসারে সংসারাতীতে, কবিতে যোগীতে দোলের প্লাবনে সব ভেদ ঘুচিয়া একেবারে একাকার হইয়া গেল। এই নিখিলপ্লাবী দোললীলার উৎসবতরঙ্গে কবি নিজের চিত্তকে ভাসাইয়া দিতে উদ্‌গ্রীব।—

'অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল।'

কেন এই নিখিলব্যাপী বিশ্বনৃত্যের আয়োজন, ইহার সঙ্গে কবিরই বা কেন যোগ দিবার উৎকণ্ঠা? 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট্ নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।'

এইরূপে ঋতুচক্রের আবর্তনের ভিতর দিয়া নটরাজের নৃত্যলীলা সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। এ লীলা অফুরন্ত, নূতন বৎসরের আভাস দিয়া পালাগানখানির পরিসমাপ্তি।

নবীন

নবীন বসন্ত-আগমনীর পালা গান। ইহাতেও পটভূমিকা ও পুরোভূমিকার পর্যায় আছে। গদ্য আছে, তবে তাহা মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে সংলাপরূপে নহে, একজন মাত্র বলিতেছেন, অভিনয়কালে কবিই বলিতেন; নটরাজে কবিতার যে দায়িত্ব এখানে তাহা গদ্যাংশের।

ইহার ভাব-উপজীব্য 'বসন্ত' পালাগানেরই অনুরূপ; কতকগুলি গানও উহা হইতে গৃহীত।

শ্রাবণগাথা

এ পালাগানটির কাঠামো শেষবর্ষণের মতই সমুখের ও পিছনের ভূমিকায় বিভক্ত। রাজা, নটরাজ, সভাকবি প্রভৃতি মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে গদ্য সংলাপ আছে। রাজা ও নটরাজ দুজনে মিলিয়া আদর্শ দর্শক ও ব্যাখ্যাতা; সভাকবি যেন প্রাকৃতজনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।

ইহার ভাব-উপজীব্য বা তত্ত্ব নূতন নয়। বৈশাখের রুদ্র মূর্তিই পরিণামে শ্রাবণের রসিক বরবেশে তপস্বিনী ধরণীর পাণিপ্রার্থীরূপে উপস্থিত, এবং তাঁহাদের মিলনের বাসরঘরের প্রান্তে বালক শরতের আবির্ভাব।

ঋতুনাট্যের নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের নৃত্যের একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋতুনাট্যে রসোদ্‌বোধনের বহু পন্থার মধ্যে নৃত্য একটি; প্রধান পন্থা সংগীত, নৃত্যকে বাদ দিলেও রসের একেবারে হানি হইত না। নৃত্যনাট্যে নৃত্যই প্রধান পন্থা; তাহাকে বাদ দিয়া তাহার রসোদ্‌বোধন একেবারেই অসম্ভব। অন্য কথায় বলিতে গেলে, নৃত্যনাট্যে নৃত্য যেমন অপরিহার্য, ঋতুনাট্যে সেরূপ নহে; ঋতুনাট্যে নৃত্য নটরাজের লীলাকে প্রকাশের উপায় মাত্র, কিন্তু নৃত্যনাট্যে নটরাজ ও নৃত্য অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিকল্পনা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

গত মহাযুদ্ধের সময় হতে অনেক দেশেরই ধারণা হয়েছিল ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশ নিজেদের খুশিমত চললে জগতের সমস্যার সমাধান হবে না, বরং নানারকম ঘাতপ্রতিঘাতে এমন গোলমাল দেখা দিতে পারে যাতে সমস্ত বিশ্বের বিপদের সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরকম আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কিছু চেষ্টা হয়েছিল আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠায়। নানা কারণে রাষ্ট্রসংঘ সাফল্য লাভ করতে পারে নি, কিন্তু তবু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কিছু কিছু চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের পর জগতে আর্থিক গোলমালও কম দেখা দেয় নি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তার উপযোগী প্রতিষ্ঠান খুব কম হলেও যতটুকু গড়ে উঠেছিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেটুকু সহযোগিতাও দেখা যায় নি, তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে নি। বিশ্বব্যাপী মন্দার পর যখন বহু দেশেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় সে সময় হতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিকে নজর পড়তে থাকে। অবশ্য, এই সহযোগিতা যে বেশিদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল তা নয়। প্রথমতঃ, মন্দার সময় হতে প্রত্যেক দেশই নিজের স্বার্থ বাঁচাবার জন্য অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিল, এই কারণেই সেসময় হতে বহু দেশেই জাতীয় পরিকল্পনার শুরু। দ্বিতীয়তঃ, অভাব-অনটন-সংকোচনের দিনে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে, অধীন দেশগুলির উপর শোষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে, অনগ্রসর দেশগুলিকে বড় দেশগুলির অভাব মোচন করবার জন্য নিজেদের স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। এইসব কারণে গত মন্দার পরেও কিছুদিন অর্থনৈতিক গোলমাল চলবার পর নানা দেশের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রফা হয়। এই রফার ফলে নানা দেশের মধ্যে চুক্তি ও সহযোগিতা দেখা দেয়, কিন্তু কোনও পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি।

এই যুদ্ধের সময় যুদ্ধের তাগিদে মিত্রপক্ষের মধ্যে খানিকটা আর্থিক সহযোগিতা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা উঠেছে, যুদ্ধোত্তর আর্থিক প্রশ্নগুলির কিভাবে সমাধান হতে পারে। কয়েকটি কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: (১) এতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলে আসা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ দুটি-একটি শিল্পপ্রধান দেশের সমৃদ্ধির জন্য সারা জগৎ শোষণ করা হয়েছে। কিন্তু বনেদি দেশগুলির অবস্থা মলিন হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যদিকে অনগ্রসর দেশগুলি অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিয়েছে। সেইজন্য যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে বাঁচতে হয় এবং অধীন ও বিজিত দেশগুলি থেকে ছিটেফোঁটা হলেও কিছু লাভের আশা রাখতে হয় তাহলে গত শতাব্দীর মত অবাধ শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং মালিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে একটা রফা করতে হবে। (২) এই যুদ্ধের পর একদিকে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন উঠতি দেশগুলি নতুন নতুন বাজার দখল করতে চাইবে, তার ফলে অন্যদিকে মন্দা প্রভৃতি নানা গোলমাল দেখা দিতে পারে। এরকম গোলমাল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা বন্ধ করার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। (৩) তৃতীয়তঃ, জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশেরই চেষ্টা হবে নিজের দেশকে তাড়াতাড়ি বড় করে

তোলা। বিশেষতঃ, অধীন ও অনগ্রসর দেশগুলিতে এই যুদ্ধের সময় কিছু মূলধন জমা হওয়ায় সেই নবজাগ্রত মূলধন জাতীয় বাজারগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চাইবে। বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রধান সুরই এই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বোম্বাই-পরিকল্পনারও মূল কথাটা এই ধরনেরই। এমন কি, ইংলণ্ড প্রভৃতি সব বড় বড় দেশও যেসব জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে তার মধ্যেও অবাধ কারবার এবং খোলা-দরজা নীতির প্রাধান্য নেই; তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশের সমস্ত কার্যক্ষম লোককে কাজ দিতে হবে, দেশে পূর্ণ-নিয়োগ বজায় রেখে তারপর বাইরের কারবার। বরং বাইরের কারবার ততটুকুই দরকার যতটুকু কারবার করলে পূর্ণ-নিয়োগ-নীতির সহায়তা হতে পারে। জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশই এই নীতি অবলম্বন করলে তার ফলে সংঘর্ষ বাধতে পারে। রফা করবার এও আর একটি কারণ। সুতরাং, এই যুদ্ধের পর যে আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিকল্পনা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে সেটি আগের মত বিভিন্ন দেশের মধ্যে চুক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়, একেবারে কড়া বাঁধন দিয়ে একটি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। গত বছর ব্রেটন উড্‌সে সম্মিলিত জাতিগুলির পক্ষ থেকে যে আর্থিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে এই চেষ্টাই করা হয়েছে। তার প্রধান কথাটা কি ও তার আসল চেহারা কি, এই পরিকল্পনা সফল হবার কি সম্ভাবনা, সফল হলেও তাতে জগতের কি উপকার হবে, এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করা অবান্তর নয়। আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে কোনও আশ্বাসবাণী শুনলে তাতে পুলকিত হবার আগে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করা উচিত, বিশেষতঃ যখন এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারত-সরকারও যোগ দিয়েছেন এবং নানারকম আর্থিক দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন।

২

ব্রেটন উড্‌সে গৃহীত আর্থিক পরিকল্পনার প্রধান কথা দুটি। প্রথমতঃ, একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল স্থাপিত হবে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক আর্থিক কারবারের সাহায্য করা। এই তহবিলের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়াবার চেষ্টা করা হবে, আরও চেষ্টা করা হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সকল সভ্যদের আপন আপন দেশে কাজকর্মের এবং প্রকৃত আয়ের ঘাটতি না পড়ে, মুদ্রা-বিনিময়-হারে গোলমাল দেখা না দেয়। কোনও গোলমাল দেখা দিলে তহবিল হতে সাহায্য করে সেই গোলমাল থামাবার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু, যুদ্ধের ঠিক পরেই যে-সব আর্থিক গোলমাল দেখা দেবে সেগুলি সম্বন্ধে এই তহবিল কোনও কিছু করবে না, মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এই তহবিলের কাজ শুরু হবে। যুদ্ধের ঠিক পরের গোলমালগুলি সামলাবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইটি হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় কথা। যদিও তহবিলটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, তবুও ব্যাঙ্কটির গুরুত্বও কম নয়। বিশেষতঃ, যুদ্ধের ঠিক পরে ব্যাঙ্কটির কাজই বেশি হবে। সেইজন্য তহবিলটির কথা আলোচনা করবার আগে ব্যাঙ্কটির কথা আলোচ্য।

এই ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্য হবে: (১) সভ্য-দেশগুলির পুনর্গঠন ও উন্নতির সহায়তা করা। এইজন্য, উন্নতিমূলক কাজে মূলধন-লগ্নির সহায়তা করা হবে, অনগ্রসর দেশগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার উৎসাহ দেওয়া হবে। (২) যাতে ব্যক্তিগত মূলধন বিদেশে লগ্নি হয় তার জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হবে; তাতেও মূলধন না পাওয়া গেলে ব্যাঙ্ক নিজের টাকা লগ্নি করবে। (৩) যাতে দীর্ঘকালের জন্য সুসমঞ্জসভাবে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করা হবে এবং সেইভাবে বিদেশে টাকা লগ্নি করাবার চেষ্টা করা হবে। (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে দরকারমত টাকা ধার দেওয়া-নেওয়ায় ব্যবস্থা করা হবে। (৫) যাতে যুদ্ধকালীন আথিক ব্যবস্থা সহজেই শান্তির সময়ের আর্থিক ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে তার চেষ্টা করা হবে।

যে-সব দেশ আন্তর্জাতিক তহবিলের সভ্য থাকবে সে-সব দেশ গোড়া হতেই এই ব্যাঙ্কেরও সভ্য থাকতে পারবে। পরে অন্যান্য দেশও এই ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে সভ্য হতে পারবে। ব্যাঙ্কের মূলধন হবে একহাজার কোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার, দরকার হলে এই মূলধন আরও বাড়ানো যেতে পারবে। কোন্ দেশ কত টাকার শেয়ার নেবে তারও একটা বন্দোবস্ত হয়েছে।—

দশ লক্ষ ডলারের হিসেব

দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
অস্ট্রেলিয়া	২০০	চীন	৬০০	ডোমিনিকান রিপাব্লিক	২
বেলজিয়ম	২২৫	কলম্বিয়া	৩৫	ইকোয়েডর	৩.২
বলিভিয়া	৭	কোস্টা রিকা	২	ইজিপ্ট	৪০
ব্রেজিল	১০৫	কিউবা	৩৫	এল্সাল্ভাদর	১
কানাডা	৩২৫	চেকোস্লোভাকিয়া	১২৫	ইথিয়োপিয়া	৩
চিলি	৩৫	ডেনমার্ক[১]		ফ্রান্স	৪৫০
গ্রীস	২৫	গোয়াটেমালা	২	হাইটি	২
হণ্ডুরাস	১	আইসল্যাণ্ড	১	ভারতবর্ষ	৪০০
ইরান	২৪	নিকারাগুয়া	০.৮	দক্ষিণ আফ্রিকা	১০০
ইরাক	৬	নরওয়ে	৫০	সোভিয়েট রুশিয়া	১২০০
লাইবেরিয়া	০.৫	পানামা	০.২	যুক্তরাজ্য	১৩০০
লাক্সেমবুর্গ	১০	পারাগুয়ে	০.৮	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩১৭৫
মেক্সিকো	৬৫	পেরু	১৭.৫	উরুগুয়ে	১০.৫
নেদার্ল্যাণ্ড্স্	২৭৫	ফিলিপাইন	১৫	ভেনিজুয়েলা	১০.৫
নিউজীল্যাণ্ড্	৫০	পোলাণ্ড্	১২৫	যুগোস্লাভিয়া	৪০
				সর্বমোট	৯,১০০

ব্যাঙ্কের মোট মূলধন বাড়ানো হলে এইসব দেশগুলিও আরও শেয়ার কিনতে পারবে, যাতে এই অনুপাত বজায় থাকে। অনুপাত বজায় রাখার এই চেষ্টার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। শেয়ারের টাকার শতকরা কুড়ি ভাগ এখন দিতে হবে, আশি ভাগ 'কল্' করলে দিতে হবে। ঐ কুড়ি ভাগের মধ্যে আবার দুই ভাগ দিতে হবে সোনায়, আর আঠারো ভাগ দিতে হবে নিজের দেশের টাকায়। যদি কোনও দেশের মুদ্রামূল্য পড়ে যায় তাহলে সেই দেশকে সেটা পুষিয়ে দিতে হবে ব্যাঙ্কে আরও টাকা জমা দিয়ে। আর, যদি কোনও দেশের মুদ্রামূল্য চড়ে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক সেই দেশকে অতিরিক্ত টাকাটা ফেরত দেবে।

১ ডেনমার্কের দেয় পরে স্থির হবে।

ব্যাঙ্কের কারবার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সত্যিকারের প্রয়োজন বুঝলে ব্যাঙ্ক কোনও দেশকে ধার দিতে পারবে। যদি সেই দেশ ব্যাঙ্কের সভ্য না হয় তাহলে কোনও সভ্য-দেশকে সেই ধার গ্যারান্টি করতে হবে। ধার তিন ধরনের হতে পারবে। ব্যাঙ্ক নিজের মূলধন থেকে ধার দিতে পারবে, অথবা বাজার থেকে ধার করে ধার দিতে পারবে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক কোনও দেশে কোনও ব্যক্তিগত লগ্নি গ্যারান্টি করতে পারবে। এই ধার যদি কোনও জাতীয় মুদ্রায় দিতে হয় তাহলে যে দেশের মুদ্রা সেই দেশের সম্মতি নিতে হবে; কোনও দেশ নিজের মুদ্রায় ধার নিতে পারবে না, অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়লে; কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিময়ের গোলমাল বন্ধ করবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রাতেও ধার দেওয়া চলবে। সুদ বা আসল শোধ করতে দেরি হলে ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকাটা ফেরত নিয়ে কিনে নিতে পারবে; অথবা, কিস্তি খেলাপ পুষিয়ে নেবার জন্য সেই দেশের উপর 'কল্-মনি' দাবি করতে পারবে।

ব্যাঙ্ক পরিচালিত হবে একটি গভর্নর-বোর্ড দ্বারা। প্রত্যেক দেশ একজন করে গভর্নর নিয়োগ করবে। প্রত্যেক সভ্যের আড়াই শত ভোট থাকবেই, তার উপর প্রত্যেকটি এক লক্ষ ডলারের শেয়ারের জন্য একটি ভোট থাকবে। এই হিসেব করলে দেখা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভোট হবে ৩২০০০টি, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ভোট হবে ১৩২৫০টি, সোভিয়েট রুশিয়ার ভোট হবে ১২২৫০টি, ফ্রান্সের ৪৭৫০টি, ভারতবর্ষের ৪২৫০টি। ব্যাঙ্কের প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিচালিত হবে ডাইরেক্টরবৃন্দের সাহায্যে; যে পাঁচটি দেশের শেয়ার সব চেয়ে বেশি থাকবে তারা নিয়োগ করবে পাঁচজন ডাইরেক্টর, আর বাকি সব দেশ আরও সাতজন ডাইরেক্টর নিয়োগ করবে। কোনও দেশ ইচ্ছা করলে সভ্যপদ ত্যাগ করতে পারবে, তখন তাদের শেয়ার ব্যাঙ্ক কিনে নেবে।

৩

এই ব্যাঙ্ক সাময়িক ব্যাপার নয়। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। যখন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং আন্তর্জাতিক তহবিলটির কাজ আরম্ভ হবে তখনও এই ব্যাঙ্কটির কাজ চলবে এবং ব্যাঙ্কটি তহবিলটির সাহায্য ও সহযোগিতা করতে থাকবে। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক পরের গোলমাল সামলাবার দায়িত্ব প্রধানতঃ এই ব্যাঙ্কের উপরই পড়বে। সেইসব গোলমাল মোটামুটি মিটলে তহবিলের কাজ শুরু হবে। তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে: (১) আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার ও সুসমঞ্জস বৃদ্ধি। এই 'সুসমঞ্জস' কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। (৩) মুদ্রাবিনিময়ের স্থায়িত্বসাধন। (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহুমুখীন কারবার। ইদানীং দেখা যাচ্ছিল, অধিকাংশ দেশই বহুতরফা চুক্তির বদলে দুতরফা চুক্তি করছিল। গত শতাব্দীতে বহুমুখীন কারবারই বেশি চলতি থাকায় চুক্তিগুলিও বহুতরফা হত। দুতরফা চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্রোতও ফিরে যাচ্ছিল। তার ফলে বাণিজ্যের গতি অনেকক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। এইরকম দুতরফা চুক্তি ও দুতরফা কারবার বন্ধ করা এই তহবিলের উদ্দেশ্য হবে। (৪) আন্তর্জাতিক লেন-দেনে গোলমাল হলে এই তহবিলের সাহায্যে সেই গোলমাল নিবারণের চেষ্টা করা হবে।

তহবিলের মোট পরিমাণ হবে আপাততঃ আট শত আশি কোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বর্ণ ডলার। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দেবে দুই শত পঁচাত্তর কোটি, যুক্তরাজ্য এক শত ত্রিশ কোটি, সোভিয়েট রুশিয়া একশত কুড়ি

কোটি, চীন পঞ্চান্ন কোটি, ভারতবর্ষ চল্লিশ কোটি, ফ্রান্স পঁয়তাল্লিশ কোটি, কানাডা ত্রিশ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকা দশ কোটি। এই টাকা আদায় করা হবে সোনায় এবং স্বদেশীয় মুদ্রায়। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্যের হিসেব করা হবে ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের, অথবা সোনার, হিসেবে মুদ্রাগুলির যা দাম হয় সেই দামের পরিমাপে। মুদ্রার মূল্য উঠছে কি পড়ছে, বিনিময়-হারে কতটা বদল হল, তাও হিসেব করা হবে এই দামের পরিমাপেই। মুদ্রাবিনিময়-হার মোটামুটি স্থির রাখবার দায়িত্ব প্রত্যেক সভ্যকেই নিতে হবে। কোনও সভ্য তহবিল-নির্দিষ্ট দামের বেশি বা কম দরে সোনা কেনা-বেচা করতে পারবে না, তহবিল-অনুমোদিত ক্ষেত্র ছাড়া স্বাধীন বিনিময়ও সহজে হতে পারবে না। অবশ্য, পূর্ব হতে যেখানে চুক্তি আছে সেখানে কিছু কিছু ব্যতিক্রম করতে হবে। কোনও মৌলিক গোলমাল নিবারণ করবার দরকার হলেই তহবিলের অনুমতি অনুসারে মুদ্রার মূল্য কমানো-বাড়ানো যেতে পারে, অন্যথায় নয়। যদি কোনও কারণে কোনও দেশের মুদ্রার মূল্য কমে যায় তাহলে সে দেশকে আরও টাকা তহবিলে জমা দিতে হবে। কোনও সভ্য নিজের মুদ্রার বদলে অপর দেশের মুদ্রা কিনতে পারবে, যদি তাতে তহবিলের কোনও আপত্তি না থাকে। সোনা দিয়ে তহবিল হতেও অপর দেশের মুদ্রা কেনা যেতে পারে, সোনা দিয়ে স্বদেশের মুদ্রাও কোনও কোনও অবস্থায় তহবিল থেকে কেনা যেতে পারবে। রপ্তানি বাড়াবার জন্য ন্যায়সংগত পরিমাণ মূলধনের দরকার হলে সে মূলধন পাওয়া যাবে, সাধারণ ব্যাবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ অসুবিধা হলে সাহায্য করা হবে। কোন একটি দেশের মুদ্রা যদি কোনও কারণে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে আরম্ভ করে তাহলে তহবিল সে সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশকেই জানাবে এবং সেরকম দুষ্প্রাপ্যতার কারণ অনুসন্ধান করবে ; সেইসঙ্গে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা যাতে ধার পাওয়া যায় তার চেষ্টাও করা হবে। এই তহবিলের কোনও সভ্যই চলতি কারবার ও চলতি লেনদেনের উপর স্বেচ্ছামত বাধানিষেধ চাপাতে পারবে না, তহবিলের উদ্দেশ্যবিরোধী মুদ্রাবিনিময়-চুক্তিও হতে পারবে না। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কোনও দেশই অন্য কোনও দেশের হস্তগত তার আপন মুদ্রা আবার কিনে নিতে পারবে না। তা ছাড়া, একই দেশে অনেক রকমের মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতি কোনও পক্ষপাত-মূলক ব্যবস্থা চলবে না। তহবিল কোনও সভ্যের আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও খবর চাইলে সে খবর দিতে হবে। কোনও সভ্য তহবিলের সভ্য নয় এমন কোনও দেশের সঙ্গে কারবার করতে পারবে না।

তহবিলের কাজ চালাবার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের মতই গভর্নর ও ডাইরেক্টবৃন্দের সাহায্যে করা হয়েছে। এই গভর্নর ও ডাইরেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে বড় বড় দেশগুলির কর্তৃত্ব বেশিই থাকবে। প্রত্যেক সভ্যের আড়াই শত ভোট এমনিতেই থাকবে, তার উপর তহবিলে-জমা তাদের টাকার প্রত্যেক এক লাখ ডলারে একটা করে ভোট হবে। তহবিলের কারবারে লাভ হলে তার কিছ অংশ অবস্থাবিশেষে সভ্যদের দেওয়া হবে। কোনও সভ্য ইচ্ছা করলে সভ্যপদ ত্যাগ করতে পারবে। এই হল তহবিলের মোটামুটি চেহারা।

৪

বোঝা গেল, জগতের বড় কর্তারা আশা করেন যে এই তহবিল ও ব্যাঙ্কের সাহায্যে যুদ্ধান্ত ও শান্তিকালীন সমস্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখন বিচার্য হচ্ছে, তাঁদের আশা সত্যিই সফল হতে পারে কি না। গত মহাযুদ্ধের পর বড়কর্তারা আশা করেছিলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ যুদ্ধ বন্ধ হবে, কিন্তু তা হয় নি। এই মহাযুদ্ধের-পরবর্তী জগতের রাজনৈতিক কাঠামো নিরূপণ ও যুদ্ধনিবারণের উপায় উদ্ভাবনের

জন্য সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বৈঠক বসেছে। কিন্তু যেরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে সে বৈঠকের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেমনি আর্থিক ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষতঃ, ডাম্বার্টন্‌ওক্‌স্ পরিকল্পনা ও ব্রেটন উড্‌স্ পরিকল্পনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ।

এ ধরনের আর্থিক পরিকল্পনা সফল হতে হলে সর্বপ্রথম চাই, পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির আন্তরিক সহযোগিতা এবং আন্তরিক ইচ্ছা। সেইসঙ্গে দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে জগতের আর্থিক বিন্যাস ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সহায়ক কি না। ব্রেটন উড্‌স্ পরিকল্পনায় এ দুটির কোনটিই নেই।

প্রথমে আন্তরিক ইচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতার কথাই আলোচনা করা যাক্। যে সমস্ত দেশ বর্তমানে এই তহবিল ও ব্যাঙ্কের সভ্যতালিকাভুক্ত সে সমস্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান উন্নত নয়। ঐ দেশগুলির মধ্যে তিনটি দেশ সবচেয়ে বড়— আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট রুশিয়া। গত শতাব্দীর গোড়া হতে এই শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত জগতে আর্থিক প্রাধান্য ইংলণ্ডেরই অপ্রতিহত ছিল। সেসময় অন্য দেশগুলি শিল্পেও অগ্রসর হয় নি। কাজেই জগতের অধিকাংশ দেশ জোগাত কাঁচা মাল, ইংলণ্ড সরবরাহ করত শিল্পদ্রব্য— এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেশ নির্বিবাদে চলা খুব আশ্চর্য নয়। ঠিক এই কারণেই গত শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলত। অবাধবাণিজ্য-নীতির আসল অর্থ ছিল যে যেমনটি আছে সে তেমনটি থাক্ অর্থাৎ, বড় দেশগুলি চিরকালই বড় হয়ে, সমৃদ্ধ হয়ে থাক্, ছোট দেশগুলি চিরকালই কাঁচামাল জোগাতে থাক। কিন্তু ক্রমশ এ অবস্থার বদল হল। অধীন অনগ্রসর দেশগুলির আকাঙ্ক্ষা জাগতে লাগল যে তারাও শিল্পে বাণিজ্যে বড় হয়ে উঠবে, তার ফলে জাতীয় আয় বাড়বে, দেশের লোকের অবস্থা উন্নত হবে। অন্যদিকে বড় দেশগুলির মধ্যেও ক্রমশ বাধল স্বার্থের সংঘাত; ইংলণ্ডের মত আমেরিকা জার্মানি জাপান প্রভৃতি দেশও শিল্পজগতে বড় হয়ে উঠল ও জগতের বিভিন্ন বাজার দখল করবার চেষ্টা আরম্ভ করল। ফলে বহু জায়গায় ইংলণ্ডকে বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পর এই ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই মহাযুদ্ধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র খুবই বড় হয়ে উঠেছে। কানাডা প্রভৃতি অন্য দেশগুলিও অগ্রসর হয়েছে। তারা তাদের পণ্যের বাজার খুঁজতে এবং নতুন বাজার সুবিধামত দখল করতে ইতস্তত করবে না। অথচ অন্যদিকে যে সব দেশ এতকাল অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হয়েছিল তারাও স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করবে এবং দরকার হলে তার জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য বাধানিষেধের প্রাচীর তুলতে ইতস্তত করবে না। সুতরাং, যুদ্ধোত্তর যুগে আর্থিক অবস্থা কি হবে সে সম্বন্ধে একটা কথা খুব স্পষ্ট: বিভিন্ন দেশ আর্থিক বিবর্তনের সমান পর্যায়ে না থাকায় তাদের উদ্দেশ্যও এক হতে পারে না। শিল্পবাণিজ্যে-অগ্রসর বৃহৎ দেশগুলির চেষ্টা হবে সমস্ত জগৎময় প্রসার লাভ করা— তা না হলে তাদের নিজেদের দেশে বেকার-সমস্যা দেখা দেবে, জাতীয় আয়ে ঘাটতি হবে। নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারে ঝগড়া লাগবার সম্ভাবনা হলে একটা রফা হওয়া যদি বা সম্ভব হয়, যে-সব দেশের বাজার দখল করতে হবে সে-সব দেশের সঙ্গে রফা হবে কেমন করে? তাদের সহযোগিতা কি উপায়ে পাওয়া যাবে? সেইজন্য স্বার্থের সমতার ভিত্তিতে কয়েকটি বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী দল গড়ে উঠবার সম্ভাবনা। তার মধ্যে একদিকে থাকবে বড় দেশেরা; মাঝে থাকবে সেই-সব

দেশ যারা সমস্ত জগৎটাকে গ্রাস করতে চায় না, কিন্তু নিজেদের ও অপরের প্রয়োজনমত সমানে সমানে লেনদেন করে ; আর, যেসব দেশ একদিন কৃষিপ্রধান ছিল এবং এতকাল শোষিত হচ্ছিল কিন্তু এখন নতুন ঠেলে উঠতে চাইছে তাদের আর একটি দল হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : এই তহবিল ও ব্যাঙ্ক এই সমস্যা মেটাবার কি চেষ্টা করেছেন ? ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে বলা হয়েছে : To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes··· to promote private foreign investment by means of guarantees or participation in loans and other investments made by private investors ; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital. এতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নি যে, অনগ্রসর দেশগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করবার চেষ্টা করা হবে, বরং মূলধন লগ্নির যে কথা বলা হয়েছে তাতে এ সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে ব্যাঙ্ক যে-সব দেশ মূলধন লগ্নি করবার চেষ্টা করছে তাদের সমস্যা সমাধানেরই চেষ্টায় বেশি ব্যস্ত, যে সব দেশে সেই মূলধন লগ্নি হবে তাদের চিন্তা করা হচ্ছে না। দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে মহাজনেরা কিভাবে নতুন খাতক পেতে পারে, খাতকেরা কি ভাবে মহাজনদের গ্রাস হতে উদ্ধার হতে পারে তা নয়। ব্যাঙ্কের গঠনের মধ্যেও বড় কর্তাদের ক্ষমতা যথেষ্ট। আর, যে হারে ব্যাঙ্কে শেয়ারের টাকা জমা দেওয়া হবে স্থির হয়েছে তার মধ্যেও কি নীতি আছে বোঝা দুষ্কর। যুক্তরাজ্যকে দিতে হবে একশত ত্রিশকোটি, কানাডাকে দিতে হবে সাড়ে বত্রিশ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে দিতে হবে দশ কোটি, অস্ট্রেলিয়াকে কুড়ি কোটি, অথচ ভারতবর্ষকে দিতে হবে চল্লিশকোটি। এই মহাযুদ্ধে কানাডার শিল্প-বাণিজ্য অত্যন্ত প্রসার পেয়েছে ; তার পক্ষে ইংলণ্ডকে এক-শ কোটি ডলার দান করতে কষ্ট হয় নি। অথচ তাকে দিতে হবে ভারতবর্ষের চেয়ে কম ! দুটি দেশের বহির্বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করলে ব্যাপারটির অসংগতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে কানাডার বহির্বাণিজ্যের হিসাব দিচ্ছি :—

মোট বাণিজ্য (ডলার)	মোট মূলধন চলাচল (উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি) (দশ লক্ষ ডলারের হিসেব)
১৯৩৮ সালে ১,৫২৬,১৩৫,৪৮৭	১৯৪১ সালে +৪৯১
১৯৪২ সালে ৪,০২৯,৭০৭,৯৭৯	১৯৪২ সালে +১,১০৯

—*Canada, 1944 : Official Handbook of Present Conditions and Recent Progress*

আর, সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থা তুলনীয়—

মোট বাণিজ্য (কোটি টাকার হিসেবে)
১৯৩৮-৩৯ সালে ৩২১
১৯৪২-৪৩ সালে ৩০৪

—*Report on Currency & Finance, 1942-43*

টাকা ও ডলারের বিনিময়-হারে যতই তারতম্য হোক্‌-না কেন, এক ডলারে আড়াই টাকা

মোটামুটি এই হিসেব ধরলেও দেখা যায় কানাডার বহির্বাণিজ্য ভারতবর্ষের তিনগুণ। তা ছাড়া এই যুদ্ধের ফলে কানাডার হয়েছে উন্নতি, ভারতবর্ষের অবনতি। তবুও ব্যাঙ্কের মূলধন জোগাবার বেলায় ভারতবর্ষকে দিতে হবে কানাডার চেয়ে বেশি। জাতীয় আয়ের হিসেব ধরলেও দেখা যাবে কানাডা ভরতবর্ষের অনেক আগে। কোনও হিসেবেই ভারতবর্ষের কাছ থেকে এইরকম বেশী টাকা আদায়ের কৈফিয়ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অনুচিত এবং অসংগত পীড়ন করা হচ্ছে এরকম সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। শুধু কানাডার বা ভারতবর্ষের কথা নয়, এই রকম অসংগতি এই পরিকল্পনার সর্বত্র। তহবিলের পরিকল্পনাও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। তারও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে: To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income. প্রশ্ন জাগে, কার আয় বজায় রাখবার চেষ্টা করা হবে? যে-সব দেশের আয় এখন অন্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি, তাদের আয় বাড়াবার, বা যেমন আছে অন্তত তেমনি বজায় রাখার চেষ্টা হবে? কিন্তু যে-সব দেশ পেছিয়ে পড়ে আছে তাদের দেশের আয় বাড়াবার বিশেষ সুযোগ কি পাওয়া যাবে না? তহবিলের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে: To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members. এই multilateral system বা বহুমুখীন লেনদেন সম্ভবই হতে পারে না যদি না আন্তর্জাতিক ব্যবসার স্রোতও বহুমুখীন হয়। ধরা যাক্, ভারতবর্ষ একসঙ্গে পাঁচটা দেশের সঙ্গে অবাধে কারবার করছে এবং সেই অপর পাঁচটি দেশের মধ্যেও অবাধ কারবার চলছে। তখন লেনদেনও বহুমুখীন হওয়া স্বাভাবিক; ভারতবর্ষ কিছু জিনিস ইংলণ্ডের কাছ থেকে নিয়ে তার বদলে টাকা দিচ্ছে, ইংলণ্ড আবার টাকা দিচ্ছে কানাডাকে কানাডার জিনিস নিয়ে. কানাডা আবার হয়তো সেই টাকা হতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তার দেনা শোধ করছে। এইভাবে বহুমুখীন লেনদেন চলে। কিন্তু এইরকম বহুমুখীন লেনদেন হতে পারে না যদি না কারবারও বহুমুখীন হয় এবং দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলে। অথচ, ইদানীং অনেক দেশই এই অবাধ-বাণিজ্য-নীতির গ্রাস হতে নিস্তার পাবার জন্যই দুতরফা চুক্তির আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছিল। তার ফলে কোনও দেশেই অপর কোনও দেশ চুক্তি-বহির্ভূত স্বাধীন বাণিজ্য করতে পারত না। এইভাবে অনগ্রসর দেশগুলি নিজেদের উন্নতি এবং অপর দেশের কাছ থেকে চুক্তিসূত্রে নানা সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা করছিল। যদি দুতরফা কারবার বন্ধ করে বহুতরফা কারবার চালাবার উদ্দেশ্যই তহবিলের থাকে তাহলে তার আগে জানা দরকার যে, বহুতরফা কারবারের নামে আন্তর্জাতিক শোষণ ও অত্যাচার চলবে না। সেরকম আশ্বাসবাণী এই পরিকল্পনায় নেই। এই তহবিলে আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মুদ্রার মূল্য, বিনিময়-হার এবং সোনা কেনা-বেচার দাম তহবিল ঠিক করে দেবে; যদি তহবিলের বড় কর্তাদের উপর ছোটদের বিশ্বাস না থাকে তাহলে এ ব্যবস্থা সফল হবার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? আর, তহবিলে দেয় টাকার পরিমাণ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যেও সেই অসংগতি সমানভাবেই আছে।

সুতরাং, সকল দেশই যে এই পরিকল্পনা সফল করবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করবে এ আশা দুরাশা। কারণ, বড় দেশগুলির স্বার্থসাধন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে এই সন্দেহ জাগবার সংগত কারণ থাকলে সহযোগিতা অসম্ভব।

৫

কিন্তু, তর্কের খাতিরে সহযোগিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ছেড়ে দিলাম। ধরা যাক্, সব দেশই এই যুদ্ধোত্তর কালের নতুন স্বর্গ রচনায় প্রাণপণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। তবুও কি এই পরিকল্পনা সফল হতে পারবে ? জগতের আর্থিক বিন্যাস ও অর্থ নৈতিক বিবর্তন এই পরিকল্পনার সাফল্যের সহায়ক হবে কি ? ব্যক্তিগত বাধা ছেড়ে দিলেও নিছক বস্তুগত বাধায় পরিকল্পনাটি ব্যাহত হবে কি না।

এই প্রশ্নের আলোচনা করবার আগে আর দু-একটি কথা আলোচনা করা দরকার। আন্তর্জাতিক ব্যবসার একেবারে গোড়ার কথাটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। সব দেশে সব জিনিস সহজে উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য যে দেশে যে জিনিসটি সহজে হয় সে দেশে সেই জিনিসটি তৈরি করে অন্যান্য জিনিস আবার যে দেশে সহজে হয় সেই দেশ থেকে আমদানি করলে উভয়পক্ষেরই লাভ। এরকম আমদানি-রপ্তানি হলে প্রত্যেক দেশই অনেক অনাবশ্যক খরচ ও পরিশ্রমের হাত হতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু একটা দেশেরও যেমন প্রয়োজনের সীমা আছে, কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে জগতের প্রয়োজনও তেমনি সীমাবদ্ধ। যেমন, ধরা যেতে পারে ১৯৩৮ সালে জগতে খাবারের দরকার ছিল দু'হাজার কোটি টন, লোহার দরকার ছিল একহাজার কোটি টন। এই দরকারের কম-বেশি অবশ্যই হতে পারে। যুদ্ধের সময় খাবার সঞ্চয় করে রাখতে হয়, লোহা নষ্ট হয়— তার ফলে হয়তো খাদ্যদ্রব্য লাগবে চারহাজার কোটি টন, লোহা দুহাজার কোটি টন। কিন্তু, যদি ১৯৩৮ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চলতে হয় তাহলে তখনকার প্রয়োজনাতিরিক্ত বা প্রয়োজনের কম উৎপাদন করলে চলবে না। সুতরাং প্রথম কথা হল, জগতের প্রয়োজন কি, এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার ভার সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয়েছে কিনা তার উপর আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্ক ও তহবিলের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সুসমঞ্জস' ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে তোলা, সেটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

জগতের সাম্প্রতিক আর্থিক বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক দেশই ব্যগ্র হয়েছে কৃষি ছেড়ে শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর হতে, কেননা শিল্প-বাণিজ্যে লাভ বেশি। কলিন ক্লার্ক্ হিসেব করেছেন, এখন যে রীতিতে বিবর্তন হচ্ছে সেই রীতিতে বিবর্তন হতে থাকলে ১৯৬০ সালে দেখা যাবে, এখন যে সব দেশ শিল্পে অগ্রসর তাদের ঝোঁক পড়বে বাণিজ্যের উপর বেশি, আর যে-সব দেশ এখন কৃষিপ্রধান সে-সব দেশ শিল্পপ্রধান হয়ে উঠবে। তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীর কয়েকটা তুলে দিচ্ছি—

কার্যক্ষম জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কিসে নিযুক্ত

	বর্তমানের হিসাব (সর্বশেষ সেন্সাস)			১৯৬০ সালের অনুমান		
	কৃষি	শিল্প	বাণিজ্য	কৃষি	শিল্প	বাণিজ্য
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৯·৩	৩১·১	৪৯·৬	১৬·৪	২৬·৫	৫৭·১
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	৬·৪	৪৩·৯	৪৯·৭	৪·২	৪৪·১	৫১·৭
ফ্রান্স	২৫·০	৩৯·৭	৩৫·৩	২০·৭	২৭·৮	৫১·৫
সোভিয়েট রুশিয়া	৭৪·১	১৫·৪	১০ ৫	২৫·২	৩৬·০	৩৮·৮
জাপান	৫০·৩	১৯·৫	৩০·২	১৩·০	৩৮·৫	৪৮·৩
চীন	৭৫·০	৫·০	২০·০	৪০·১	৪৪·৯	১৫·০
ভারতবর্ষ	৬২·৪	১৪·৪	২৩·২	২৭·৭	৫৭·৩	১৫·০

উপরের হিসাব হতে দেখা যায় কৃষি হতে শিল্প, শিল্প হতে বাণিজ্য, এইভাবে বিবর্তিত হতে হতে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াবে যে-সময় প্রত্যেক দেশই বাণিজ্য ও শিল্পের দিকে ঝুঁকবে। সে সময় জগৎময় কৃষির অবনতির সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। যতদিন পর্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশগুলি উন্নত না হচ্ছে, তাদের ক্রয়শক্তি না বাড়ছে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত দেশ শিল্পদ্রব্য তৈরি করলে তা বিক্রি হবে না। জাতীয় ক্ষেত্রে এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি। সেইজন্যই সম্প্রতি রব উঠেছে, উৎপাদন হচ্ছে মানুষের সুখের জন্য, তাই ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশের লোকের অভাবের অন্ত নেই অথচ আমরা সে অভাবের দিকে নজর না দিয়ে বিদেশের জন্য পসরা সাজিয়েছি, এবং সে পসরা বিক্রি হচ্ছে না— এ অবস্থা সন্তোষজনক নয়। যদি জগতের আর্থিক বিবর্তন এইরকম অনিয়ন্ত্রিতভাবে হতে থাকে তাহলে এমন একটি সময় আসবে যে-সময় প্রত্যেক দেশই উৎপাদন করবে অপর দেশের জন্য, আর সকলেই চাইবে বাণিজ্য ; ফলে সংকট অনিবার্য।

এই সংকট বন্ধ করতে হলে জগতে আপাতত কতটা কৃষিজ দ্রব্য, কতটা শিল্পজদ্রব্য এবং কতটা বাণিজ্যের দরকার আছে সেটা বুঝে সেগুলিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। তারপর যেমন যেমন অবস্থার উন্নতি হবে, গরিব দেশগুলির ক্রয়শক্তি বাড়বে, তেমনি মোট প্রয়োজনের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারবে। এইভাবে 'সুসমঞ্জস' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতে পারে। কিন্তু, এই বিতরণ করতে হলেই বিবাদ বাধবে কোন্ দেশের কি অংশ হবে। জগতের কারবারের মোটা অংশ কার হবে। এ সমস্যার সমাধান হওয়া বড় কঠিন। সেইজন্যই এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দরকার যে প্রতিষ্ঠানে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকে, এবং জগতের বাণিজ্যের ন্যায়সংগত অংশ প্রত্যেকেই পায়। ব্রেটন উডস্ পরিকল্পনা সেদিকে ঝোঁকে নি।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু জিনিস উৎপাদন ও বিনিময়ের সুব্যবস্থা করলেই হবে না, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মূলধনের একটা উপযুক্ত বিলিবন্দোবস্ত হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেখা যায় জিনিসের কারবার মূলধন-লেনদেনের সঙ্গে জড়িত, মূলধনের প্রভাব জিনিসের কারবারের উপর যথেষ্ট পড়ে। যে-সব দেশকে দেনা শোধ করতে হচ্ছে সে-সব দেশকে রপ্তানির আধিক্য বজায় রাখতেই হয়, আর যে-সব দেশ প্রবীণ উত্তমর্ণ তাদের সাধারণতঃ আমদানির আধিক্য থাকে। জগতের মূলধন লগ্নি হতে হতে তার একটা রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে ; কতকগুলি দেশ মহাজন এবং কতকগুলি দেশ খাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মধ্যে কারবারটাও সেইভাবে গড়ে উঠেছে। লীগ অফ্ নেশনের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এসম্বন্ধে বলা হয়েছে : Study of the trade balances shows that the cases of triangular or multilateral settlement within small groups of countries were relatively unimportant and that almost all balances belonged to a single world-wide system which also provided for the transfer, along round-about routes, of interest, dividends and other payments due from debtor countries to European creditor countries, particularly the United Kingdom...Distortions of the original pattern, whether caused directly by the war, or by measures of commercial policy must cause friction and may threaten the whole functioning of the system and

the economic welfare of the states dependent on it. (*Network of World Trade.*) সুতরাং আন্তর্জাতিক জিনিস লেন-দেনের চেহারা বদলাতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মূলধনের সমস্যারও সমাধান করতে হবে; তা না হলে উভয়ে বিরোধ লাগতে পারে। মহাজনদের পাওনা হয়ত কিছুকাল বন্ধ রাখতে হবে, ছোট দেশদের টাকা দিতে হবে কিন্তু দেখতে হবে তার ফলে তাদের স্বাভাবিক উন্নতির পথে বাধা না হয়। আর শেষ পর্যন্ত যদি জগতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের নতুন করে বিন্যাস করতে হয় সেইসঙ্গে মহাজন-দেনদারের বিন্যাসও নতুন রকম হওয়া দরকার হবে। আপাতত তার কোন লক্ষণ এই পরিকল্পনায় নেই।

তৃতীয়তঃ, এই পরিকল্পনা সফল হতে হলে জগতে সোনার পুনর্বণ্টন দরকার হবে, কেননা এই পরিকল্পনার মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে সোনার স্থান বেশ দৃঢ় এবং প্রত্যেক দেশকেই ব্যাঙ্কে বা তহবিলে টাকা জমা দেবার জন্য অন্তত কিছু পরিমাণ সোনা লাগবে। অথচ অধিকাংশ সোনা এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। লীগ অফ্ নেশন্সের প্রকাশিত *Money and Banking 1940-42* হতে দেখা যায় জগতের মোট সোনা হচ্ছে এখন ২৯৯৯ কোটি ডলার মূল্যের; তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে ২২৬৮·৭ কোটি ডলার মূল্যের সোনা, অর্থাৎ মোট সোনার শতকরা ৭২·৩ ভাগ। এ অবস্থা থাকলে সোনায় লেনদেন হতে পারে না। একটা আনুমানিক হিসাব হতে কথাটা স্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক্। ব্যাঙ্কে ভারতবর্ষের দেয় মোট চল্লিশকোটি ডলার, তার মধ্যে সোনায় দিতে হবে প্রত্যেক শেয়ারের শতকরা দুভাগ, অর্থাৎ প্রায় আশিলক্ষ ডলার। আর, তহবিলে দেয় টাকার মধ্যে শতকরা পঁচিশভাগ দিতে হবে সোনায়। অর্থাৎ সেখানে দেয় চল্লিশকোটির মধ্যে দশকোটি ডলার দিতে হবে সোনায়। তাহলে সোনা মোট দেয় দাঁড়াল দশকোটি আশিলক্ষ ডলার মূল্যের। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাব হতে দেখা যায় কিছুদিন থেকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সোনা আছে তার দাম ৪৪·৪ কোটি টাকার কাছাকাছি। টাকা ও ডলারের বিনিময় হার যদি ১ ডলার = ২·২৮৯ টাকা হয় (বোম্বাই-পরিকল্পনায় এই হারই ধরা হয়েছে) তাহলে ঐ হারে হিসেব করলে রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের সোনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯·৩ কোটি ডলার মূল্যের কাছাকাছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষকে ব্যাঙ্ক ও তহবিলের সভ্য থাকতে হলে তার মোট ১৯·৩ কোটি ডলার দামের সোনার মধ্য থেকে প্রায় এগার কোটি ডলার দামের সোনা বার করে দিতে হবে। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে অনেক পুনর্গঠন অনেক উন্নতি দরকার এবং তার জন্য বহু টাকাও দরকার। নোটের পরিমাণ যত বাড়বে সেই অনুপাতে সোনাও বাড়বার দরকার হবে। যুদ্ধোত্তর যুগে সেইজন্য আমাদের আরও বেশি সোনার দরকার হবে। কিন্তু, আরও সোনা পাওয়া দূরে থাক্, এই পরিকল্পনায় যে সোনা আছে তারও অর্ধেকের বেশি দিয়ে দিতে হবে। তার বদলে আমরা কি যে সাহায্য পাব তার কোনই স্থিরতা নেই। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই ভারতবর্ষের জন্য যে-সব এদেশী পরিকল্পনা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক সংযোগ খুব বেশি ঘনিষ্ঠভাবে না রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক্, যুক্তরাষ্ট্র সোনা পুনর্বণ্টন করতে রাজি আছে। কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠবে, যুক্তরাষ্ট্র কি বিনা দামে এই সোনা খয়রাত করবে? এরকম খয়রাত আশা করা চলে না; তার উপর সমস্ত দেশই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণগ্রস্ত (ইজারা-ঋণও এর অন্তর্গত), সে ঋণ অনাদায় থাকতে থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের আবার সোনা খয়রাত করা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। তবুও তর্কের খাতিরে ধরছি যুক্তরাষ্ট্র সোনা খয়রাত করতেই

রাজি হল। তখনও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। গত মহাযুদ্ধের পরও এইরকম অবস্থা দেখা দিয়াছিল। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তখন আমেরিকার কাছে ঋণী, তারা আশা করছিল, তারা আবার সে ধার শোধ দেবে জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে; অথচ জার্মানির তখন ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষমতা নেই। যে সময় যুক্তরাষ্ট্র জার্মানিকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করল, সেই টাকারই অংশবিশেষ ইংলণ্ড ফ্রান্স মারফত যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কিছু ফেরত যেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন বাদে যুক্তরাষ্ট্র যখন শুল্কপ্রাচীর তুলল এবং অন্যদিকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল তখনই ঘটল বিপদ। সমস্ত জগতের আর্থিক ব্যবস্থা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়ল। লীগ অফ্ নেশন্‌সের পূর্বোক্ত রিপোর্টটির কথায়: After a temporary disruption during the1914-18 war, multilateral trade governed by the system was resumed during the twenties and was supported by United States capital exports. The functioning of the system was disturbed by the reduction of these capital exports from the middle of 1928 and the repatriation of liquid funds by creditor countries…for some time a breakdown was avoided as countries exposed to strain were able to settle their international accounts by selling gold or drawing upon liquid assets abroad. Apparently the system of multilateral trade continued to exist, in reality it did not function. (*Network of World Trade*) এবারও যদি সোনা খয়রাত করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয় তাহলে এবারও গতবারের মূলধন রপ্তানির মত দুরবস্থা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাঁ হাতে দিয়ে ডান হাতে নেওয়া বেশিদিন ভাল লাগবে না। বিশেষতঃ যখন বাঁ হাত দিয়ে যা দেওয়া হচ্ছে ডান হাতে তার অনেক কম ফিরে আসছে। সে সময় দানের প্রবৃত্তি স্বতঃই খর্ব হয়ে আসবে।

এইরকম ত্রুটির তালিকা বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করে লাভ নেই। আসল কথা, আমরা সত্যিই একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। গত শতাব্দীতে যে আর্থিক বিন্যাস গড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে তার সমস্ত ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর একটি নতুন বিন্যাস গড়ে উঠতে চাইছে। এখন সেই মৌলিক পরিবর্তনের দাবিকে অস্বীকার করে যে-কোনও পরিকল্পনাই রচিত হোক-না কেন ঘটনাস্রোত তার বিপক্ষে যাবে। তা ছাড়া অর্থনীতির উদ্দেশ্য কি সে-সম্বন্ধেও মতের মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থই যে মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ যে মানবসমাজের কল্যাণের উপায়মাত্র এই কথাটা স্বীকৃত হতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রকে যন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া চলবে না। এই সমস্ত পরিবর্তনের কথা মনে না রেখে কোন পরিকল্পনা রচনাই আর সম্ভব হতে পারে না। যদি তা করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছোট দেশগুলি প্রাণপণে বড় দেশগুলির সংসর্গ পরিহার করে চলবে, অন্যদিকে বড় দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বেধে যাবে। আর, জাতীয় ক্ষেত্রে ঐরকম চেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে তাতে একদিকে আর্থিক গোলমাল দেখা দেবার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মানসিক অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকবে, যে অসন্তোষ অনুকূল হাওয়া পেলে বিপ্লবে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত দুঃখকষ্টের পরেও এতটুকু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল না, এটাই সব চেয়ে বড় নিরাশার কথা।

সত্যেন্দ্রনাথ
ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ
ও তাঁহার সহধর্মিণী
ব্রাইটনে গৃহীত ফটোগ্রাফ

আলপনা

আলিপনা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলিপনাটি কী জানতে চাও তো বলি।

ছেলে-ভোলানো ছড়া কেটে মা যেমন মনে আছে যেটি সেটি খুলে বললেন, সহজ ভাষায়, সাধু-ভাষায় নয়, আলিপনাগুলি তেমনই সহজে যে রেখা যে-সব আঁক বাঁক ছোটো ছোটো মেয়েদের হাতে আসে সেই দিয়ে নিজ হাতে লেখা মনের ইচ্ছা। ওটাকে ড্রইং ক্লাসের রুল কম্পাস ধরে টানা নক্সার কোঠায় ফেলতে যাওয়া ভুল। যেমন করে হাতের লেখাটুকু ছাপার অক্ষরে ছাপিয়ে বলা চলে না, এটি অমুকের হস্তাক্ষর, তেমনি কচি হাতের টানা আলিপনাকে পাকা ড্রইং মাস্টারের রুল-কম্পাসের বাঁধন দিয়ে টানা চিত্রকর্মের ছাঁদে ফেলে বলা চলে না— এটি হল আলিপনা। আলিপনা বিচার করবার সময় ঠিক গোলটি ঠিক রেখাটি টানলে কিনা মেয়েটি এ কথাই ভাববার নয়— অশিক্ষিত হাতের ছাপ বলেই তা সুন্দর হল, এই বলব। ছেলে-ভোলানো ছড়া ব্যাকরণ-দোরোস্ত বা ছন্দশাস্ত্র-দোরোস্ত হলে ছেলে-ভোলানো ছড়ার কোঠা থেকে বাদ পড়ে যায় যেমন, আলিপনাও তেমনি জ্যামিতিক ও নির্ভুল নক্সা হলে আর আলিপনা থাকে না।

লক্ষ্মীপূজায় মাঝের খুঁটির গোড়ার আলপনা : পদ্ম, ধানছড়া, কলমীলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

আলিপনাগুলি কেমন, তাই বলি। শিউলি ফুল গাছের তলায় ছড়িয়ে আছে যেমন, আকাশের তারা মাথার উপরে ছড়িয়ে আছে যেমন, পারিজাত ফুলের মালা মাটিতে খসে পড়ে আছে যেমন, তেমনিভাবে আছে ঘরে আঙিনাতে পিঁড়ির 'পরে আলিপনা। এই সহজ শিথিল ভাবটুকুই হল আলিপনার সৌন্দর্য। সেগুলি মোগল বাদশাদের দরবারগৃহের পাষাণ দেওয়ালে সযত্নে বসানো নানা পাথরের কারুকার্য নয়। এটা ভুললে চলবে না—

ছেলে-ভোলানো ছড়া যেমন চাঁদ ধরা ফাঁদ
ব্রতচারিণীর আলিপনার সেই শ্রী ও ছাঁদ।

আলিপনা কথাটার মানেই হচ্ছে সখীপনা। শুভদিনে ডাক পড়ে পাড়ার মেয়েদের আলিপনা বা সখীপনা করতে। ড্রইং মাস্টারের ডাক পড়ে স্কুলের একজামিনের দিনে। সখীপনা করে একদল আলিপনা ছড়ায়, ফুল ছড়ায়, লাজ বর্ষণ করে, সহজ আনন্দে। তারা মানদণ্ড মানসূত্র ইত্যাদি

ধ'রে ড্রইং-মাস্টারি করতে তো নিমন্ত্রণ পায় না। বুঝে দেখো, কোন্‌খানে তফাত আলিপনায় আর আলিপনার সংস্কৃত সংস্করণ তথাকথিত আলিম্পন-শিল্পে।

আলিম্পন কথাটি পুরো সংস্কৃত, আর আলিপনা কথাটি পুরো চলতি বাংলা। আলিম্পন বোঝায় কিছুর প্রলেপ দেওয়ালে বা মেঝেতে দিয়ে কিছু করা। যেমন কাদা দিয়ে ঘর নিকোনো— চুন লেপে দেওয়ালে চুনকাম করাও বোঝায়। ভিত্তিচিত্রণও এসে পড়ে এর ভিতর। আলিপনা বোঝায়— সখীপনা করে ঘরের শ্রী বর্ধন করা, ক্রিয়াকর্মে সুচারুতা সম্পাদন করা। আলিপনা শব্দটি, এর মধ্যে পাঁচ সখীতে মিলে আল্পনা দেওয়া, পিঁড়া চিত্র করা, তাও এসে পড়ে।

কাদম্বরীতে দেখি রাজা স্নান সেরে যে উত্তরীয়খানি পরবেন সেখানির পাড়ে সখীরা চন্দনের রেখা দিয়ে হংসমিথুন লিখে দিয়ে আলিপনা বা সখীপনা করে প্রতিদিন। কালিদাস কবি বর্ণনা করছেন— ইন্দুমতীকে নিয়ে রাজকুমার অজ ফিরছেন, খবর হল; সঙ্গে সঙ্গে নগরের অট্টালিকাগুলি রাজমিস্ত্রির হাতের আলিম্পনে বা চুনকামে সুধাধবলিত হয়ে গেল, তোরণ সমস্ত চিত্রকরের হাতের নানা বর্ণের প্রলেপে ও নক্সাতে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা বিস্তার করলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আলিম্পনের কাজ হয়ে চুকল যখন তখন প্রসাধনের বেলা; পুরন্ধ্রীরা প্রসাধনে রতা, শোভাযাত্রার বাদ্যধ্বনিতে সচকিত হয়ে প্রসাধন অসমাপ্ত রেখে তারা ছুটল বরবধূ-দর্শনে— তখনো শুকায় নি পায়ের আলতা, বাঁধা হয় নি গ্রন্থি মুক্তাহারের! বরবধূ দেখার আবেগভরে চলে গেল পুরকামিনীরা। ছেঁড়া হার থেকে বিগলিত মুক্তাবিন্দু, সিক্ত চরণের অলক্তকরাগ, তাদের গতাগতির পথে যেন অপরূপ আলিপনার শোভা বিস্তার করলে।

আলিপনা বাঁধা-ধরা হিসাবদোরস্ত করে আঁকা মণ্ডনশিল্পের ধার দিয়েও গেল না, অথচ সুন্দর ভাবটি জাগালে অতি সহজে।

ফোটা গোলাপে ডৌলটি নির্ভুল গোল হয়ে দেখা দিল না যখন কোরকের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেল ফুলটি। ফোটা ফুল হাতে করেই এটা বোঝা গেল। সুতোয় গাঁথা ফুলমালার বেড়টি নির্ভুল গোল হতেই পেল না; লোহার তার দিয়ে কাঠামো-বাঁধা রৌদ্‌-মালার চক্রাকার বেড়টার মতো, কিম্বা ঢালাই-করা হাঁসকলিটার বেড়ের মতো।

রুল-টানা ড্রইং দিয়ে আলপনার ভাব কিছুতে বোঝানো যায় না। ছোটো ছোটো ব্রতচারিণীদের হাতের আলিপনা আমার কাছে লাগে যেন কচি মেয়েগুলির স্বহস্তে লেখা এক-একখানি আঁকাবাঁকা অক্ষরের চিঠি।

শ্রীরানী চন্দ কর্তৃক অনুলিখিত।

স্মৃতিচিত্র

শ্রীপ্রতিমা দেবী

১৯১৪ সাল। গুরুদেব পাহাড়ে যাবার জল্পনা-কল্পনা করছেন, আমরাও উৎসুক হয়ে উঠেছি রামগড়ের নতুন-কেনা বাড়ি দেখবার জন্য। এদিকে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের নাম সার্থক করে গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়িধারী আশ্রমের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে আমার স্বামী ও দিনেন্দ্রনাথ বদরিকাশ্রমে যাত্রা করলেন। নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে ধর্মপিপাসা কতটা ছিল বলতে পারি না, তবে দেশভ্রমণের ইচ্ছা ছিল প্রবল।

আমাদের দেশে গেরুয়ার মাহাত্ম্য সর্বত্র। কাজেই তীর্থযাত্রীরা গৈরিকের জোরে চটিতে সুব্যবস্থা করে নিতেন। আহারাদি অনায়াসে জোগাড় হত, এমন কি পাঁঠা ও মুরগির মাংসও কপালে জুটে যেত। ভোজনবিলাসী দিনেন্দ্র ছিলেন মোটা মানুষ; বেশি রাস্তা হাঁটা তাঁর পোষাত না। আমার স্বামী তাঁর জন্য একটি পাহাড়ী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করেন। গল্প শুনেছি পাগড়ি-পরা দিনেন্দ্রকে রাস্তায় অনেকে বিবেকানন্দ বলে ভুল করতেন। সহযাত্রী ছাত্ররা তাঁকে বোধ হয় প্র্যাক্‌টিক্যাল্ জোক্ করবার জন্য তাঁর ঘোড়ার প্যাডেল আল্‌গা করে রেখে দিয়েছিল। এক চটি থেকে আর-এক চটির উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন দিনু চলেছেন সকলের আগে আগে; হঠাৎ দেখা গেল দিনেন্দ্র স্যাণ্ডেলসুদ্ধ ঘোড়ার পেটের দিকে ঘুরে যাচ্ছেন। ছাত্ররা হৈ হৈ করে দৌড়াল গুরুমশায়কে বাঁচাতে। এদিকে পাহাড়ী ঘোড়া বেগতিক দেখে আপনিই দাঁড়িয়ে গেছে। পাশেই গভীর খদ। ঘোড়া অসংযত হলে আরোহীর সমূহ বিপদ ছিল। তখন যদিও সকলে ভয় পেয়েছিল কিন্তু পরে এই ঘটনা নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত ছাত্ররা দিনুর সঙ্গে রগড় করত।

এঁদের বদরিকা রওনা হবার কিছু পরেই গুরুদেব মীরাদেবী ও আমাকে নিয়ে রামগড় যাত্রা করেন। মনে আছে আমরা কাঠগুদমে নেমে একটি ঝোলা সাঁকো পেরিয়ে ভীমতালের দিকে রওনা হয়েছিলুম। এইখান থেকেই পাহাড়ের আসল শোভা হল শুরু। ডাণ্ডি করে হিমালয়ের পথে সেই আমার প্রথম যাত্রা। পাহাড়ের সে আর-একরকমের দৃশ্য। বনফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সবুজ ঘাসের উপর ফাগুনের নিপুণ আল্‌পনা-আঁকা পথ। গাছের আড়ালে আড়ালে মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি খেলা, উপত্যকার বাঁকে বাঁকে এ-পাহাড় থেকে অপর পাহাড়ের দৃশ্য-বদল। পাহাড়ের অন্যদিকে ঘুরে গেলে মনে হয় যেন নতুন রূপ দেখছি। এইরকম গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে কুমায়ুন অঞ্চলের পাহাড়ী মেয়েদের সৌন্দর্যের তারিফ করতে করতে এসে পৌছনো গেল রামগড়ের শিখরে। আমাদের নতুন-কেনা বাড়ি 'হৈমন্তী' ডাকবাংলার থেকে দু- মাইল দূরে। প্রথমে ভেবেছিলাম এখানে বেড়াবার রাস্তা বেশি নেই, পরে দেখা গেল অনেক আঁকাবাঁকা জঙ্গুলে রাস্তা আছে আর তারই সঙ্গে পাহাড়ের চূড়োয় যাবার ভারি সুন্দর একটা পথ। সেখান থেকে হিমালয়ের বরফের শ্রেণী চারিদিক থেকে দেখা যায়, যেমন তার উচ্চতায় মনকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি নিচের দিকে তাকালে খদের গভীরতায় মন তলিয়ে যায় কোথায়। ছোট্ট নদী বেঁকেচুরে চলে গেছে সে যেন একখানা রুপালি কোমরবন্ধ নীল পাহাড়ের গায়ে জড়ানো। পাহাড়ের অপর শিখরে এক সাহেবের বাংলা এবং আর একদিকে এক মেমের বাড়ি।

এই দুটি আস্তানা না থাকলে সেখানে জনমানবের সম্পর্ক আছে বলে মনে হত না। আমাদের বাংলা মামুলি প্যাটার্নের ছোট্ট পাহাড়ী বাড়ি, তবে চারিদিকটা ছিল সুন্দর। গুরুদেব এই বাড়ির নাম দেন 'হৈমন্তী'। সবুজ পত্রে প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্প এইখানেই লেখা হয়েছিল। যখন পৌছলুম তখন গোধূলির দীর্ঘ বেলা পড়ে এসেছে, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে স্ট্রবারি-ক্ষেতের সুবাস ভাসছিল হাওয়াতে।

এখানে আসার পর গুরুদেবের ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাড়ীদের গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের বাগানে একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত। বেচারার কষ্ট দেখে তিনি ওষুধ দিতে লাগলেন। এই রুগীটির জন্য তাঁর কত করুণাই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তাকে সুস্থ করে তোলেন। সেই থেকে তাঁর ডাক্তারি সম্বন্ধে পাহাড়ীদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেল। গোমস্তা টীকারাম রোজ তাঁর কাছে রুগীদের ওষুধ নিয়ে যেত। যাঁরা হেঁটে আসতে অক্ষম তারা ঘরে বসেই ওষুধ পেত। রুগীর প্রতি তাঁর গভীর মমতার পরিচয় বারংবার দেখেছি, কিন্তু তার প্রথম পরিচয় পেলেম এবার। এমন কি বিশেষ জরুরি কাজও গুরুদেবকে তাঁর রুগীর চিন্তা থেকে বিমুখ করতে পারত না। অসুস্থ লোকের প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক মমতা ছিল। শুনেছি আমার শাশুড়ীঠাকুরানীর সেবাও শেষদিন পর্যন্ত নিজের হাতেই তিনি করেছিলেন। আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন যার যেখানে অসুখ-বিসুখ হত তৎক্ষণাৎ নিজেই হোমিওপ্যাথিক বা বায়োকেমিক ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। দিনে দশবার লোক পাঠিয়ে সেই রুগীর খোঁজখবর না আনালে তাঁর মন কিছুতেই সুস্থির হত না। কবি-প্রকৃতির সঙ্গে সেবাপরায়ণতার আশ্চর্য সমন্বয় দেখেছিলুম। জীবের দুঃখকষ্ট কী নিবিড় আঘাতই করত তাঁকে। শুধু মানুষের প্রতি নয়, সমস্ত জগতের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল ছড়ান। গাছপালাকেও মানুষের মত করেই দেখেছেন। তাই গাছ কাটতে মনে ব্যথা পেতেন। তাদের প্রতি অবহেলা সইতে পারতেন না কোনোমতেই। তাঁর গান ও কবিতায় তাই কত-না মায়ায় জড়িয়ে আকাশ, বাতাস, ধানের ক্ষেতের কথা লিখে রেখে গেছেন, যেন তারা তাঁর আপন জন।

কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সেবার পাহাড়ে আমাদের অতিথি হয়েছিলেন। গুরুদেব ঠিক সেই সময় 'গীতালি'র গান রচনায় নিযুক্ত। আমাদের বাগানের এক কোণে একটি গুহা ছিল, প্রকৃতি তাঁর নিজের ঘর নিজেই বানিয়েছিল। তারই মধ্যে গুরুদেব অতুলবাবুকে নিয়ে গানের বৈঠক বসাতেন। দু'জনে গানে-গানে মেতে যেতেন, অনেক নতুন সুরের সৃষ্টি হত সেই সঙ্গে।

এদিকে বদরিকা-ফেরত আমার স্বামী ও দিনেন্দ্রনাথ এসে যোগ দিলেন এই দলে। দিনু আসাতে গানের স্রোতে লাগল বন্যা, হুহু করে গীতালির কথা ও সুর পাহাড়ী ঝরনার মত ঝরে পড়তে লাগল। 'সন্ধ্যা হল গো' এই গানের সুর ও কথা রামগড়েই তৈরি হয়েছিল। আমরা যখন সন্ধ্যার দিকে বনপথ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরতুম, অন্ধকারে গুরুদেবের স্বর পাহাড়ের গা ছাপিয়ে আকাশপ্রান্তিকে উড়ে বেড়াত। যেন পথহারা পাখির কণ্ঠের করুণ মিড়ের ঝংকার শোনা যেত দিগ্‌দিগন্তব্যাপী। তিনি সমস্ত সন্ধ্যাই সেই সুর গুনগুনিয়ে চলতেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে যে নিবিড় আবেগ আছে, তারই ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর মনে। সেই আবেগ দিয়ে বেঁধে গেলেন ঐ গানের সুর।

কতবার কত সন্ধ্যা আসবে ঘুরে-ফিরে ঐ পাহাড়ে, কত মানুষ কতরূপে তাকে উপভোগ করবে, কিন্তু কে জানবে কবির মনে কী সুরের বীণা বেজেছিল সেদিন। এমনি করে কবির কত গানের মধ্যে

কত দিনের দরদ-লাগা মনের ছায়া লুকিয়ে আছে। ছোটখাট কত অনুভূতির কত চেহারা তার মধ্যে ছায়াপাত করেছে, কালের গোপন খাতায় তা লুকানো থেকেই যাবে। অতুলবাবু ছুটি ফুরাতে নেমে গেলেন, দিনুও চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। হিমালয়ের গানের আসর গেল ভেঙে।

তারপর এলেন মিঃ এণ্ড্রুজ্ তাঁর ছুটির কয়দিন কাটাতে। কিছুদিন আগে বিলেতে এই মানুষটির সঙ্গে গুরুদেবের আলাপ হয়েছিল। তাঁকে কাছে পেয়ে গুরুদেব অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেন। এণ্ড্রুজ যে কী গভীর ভক্তি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন তা মনে করলে আজও আশ্চর্য লাগে। এই মানুষটির অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ছিল, সেজন্য সাধারণ লোকে সব সময় তাঁকে বুঝতে পারত না। বন্ধু হিসাবে ইনি ছিলেন সত্যিকার দরদী লোক।

এণ্ড্রুজ্‌সাহেব আসার কিছুদিন পরেই আমাদেরও পাহাড় থেকে নামার দিন এগিয়ে এল। রামগড়ে ডাণ্ডি সংগ্রহ করা বরাবরই শক্ত, তার উপর সেবার আমাদের দল ভারি ছিল বলে সকলের জন্য ডাণ্ডি পাওয়া গেল না। এই খবর এণ্ড্রুজ্‌সাহেবের কানে পৌঁছবামাত্র তিনি বললেন— আমি হেঁটেই নাম্‌ব। বাবামশায়ও সেই সঙ্গে হাঁটবার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমরা সকলেই তাঁদের এই প্ল্যানে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু গুরুদেব যখন যা স্থির করতেন তার থেকে তাঁকে টলানো সহজ হত না। সকলেই যাত্রা করলুম— কেউ ডাণ্ডিতে, কেউ হেঁটে, আর কেউ বা ঘোড়ায়। সাহেব চলেছেন বাবামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর কথার মধ্যে এতই নিবিষ্ট যে, কোন দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। আমরা পৌঁছবার অনেক পরে ওঁরা ভীমতালে পৌঁছলেন। এইখানে আমাদের আহারাদি করবার কথা ছিল। ডাকবাংলায় আহার সেরে যখন আমরা উঠেছি, দেখি খুড়ো[1] এণ্ড্রুজসাহেব লাঞ্চ্ খেয়েই হাঁটবার জন্য প্রস্তুত। কিছুমাত্র ক্লান্তি তাঁর ছিল না। গুরুদেবের সঙ্গে হাঁটার আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হতে চান না। তিনি বলে উঠলেন— Gurudev, let us go, children will come behind। বাবামশায় বিনাবাক্যব্যয়ে সাহেবের সঙ্গ নিলেন। এই যাত্রায় মনে পড়ে আমরা ট্রেন মিস্ করেছিলুম, আর সাহেব তাঁর গুরুদেবকে নিয়ে মনের আনন্দে ডেরাডুন মেলে উঠে পড়েছিলেন। পরে গুরুদেবের কাছে শুনেছিলুম যে রাত্রে তিনি পায়ে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন। পাহাড়ের এই দীর্ঘ পথ চলবার ক্লান্তি তাঁকে চেপে ধরেছিল গাড়িতে উঠে। দীনবন্ধু (এণ্ড্রুজ্) তখন বুঝেছিলেন, গুরুদেবকে এতটা হাঁটানো তাঁর ভালো হয় নি; তাই অনুতপ্ত চিত্তে রাতভোর গুরুদেবের পদসেবার জন্য প্রস্তুত। পা ম্যাসেজ্ করে দেবার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গুরুদেব তাঁর সেবা গ্রহণ করতে পারেন নি। কারুর সেবাই তিনি সহজে গ্রহণ করতে চাইতেন না। কাজেই সাহেবের মনোরথ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হল না। এই ঘটনার কিছু পরে এণ্ড্রুজ সাহেবের একবার কলেরা হয়েছিল। গুরুদেব তাঁর এই অসুস্থতার সময়ে সমস্তক্ষণ তাঁর নিকট বসে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা এবং সারাক্ষণ রুগীর বিশেষভাবে তদারক করেছিলেন। এণ্ড্রুজ্ সাহেব সেই ঘটনা তাঁর জীবনে কখনও ভোলেন নি। তিনি অনেক সময় বলতেন, গুরুদেব যখন আমার এই ঘোরতর ব্যামোতে আমার কাছে এসে বসলেন, তখনই মনে হল আমার সব অসুখ সেরে যাবে। গুরুদেব কোনো সংক্রামক রোগকেই ভয় করতেন না। তিনি বলতেন, তাঁর নিজের শরীর

---

১ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে সাহেবের সঙ্গে খুড়ো-সম্বন্ধ পাতান। পরে পরিবারমহলে আমরা সাহেবকে এই নামেই অভিহিত করতাম। আর বাবামশায় সাহেবকে ডাকতেন 'স্যার চার্লস্' বলে।

এতই জোরালো যে কোনো প্রকার সংক্রামক ব্যাধি তাঁর শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। সাহেব তখন আমাদের দেশে প্রথম এসেছেন, এদেশের হালচাল তখনও তাঁর জানা ছিল না। তাই শান্তিনিকেতনে আসবার পথে গরমের দিনে বর্ধমানে একটি তরমুজ কিনে খেয়েছিলেন। এই রসালো ফলটির আয়তন দেখেই সাহেব বোধহয় এত খুশি হয়ে গিয়েছিলেন যে সেটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শান্তিনিকেতনে পৌঁচেছিলেন। সেখানে পৌঁছবার একদিন পরেই কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। গুরুদেব তখন কলকাতায় ছিলেন। টেলিগ্রামে এই খবর পৌঁছবামাত্র তিনি শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন। সাহেবের এতদূর সংকটজনক অবস্থা হয়েছিল যে তিনি তখনকার দিনের বোলপুরের মিশনরির পাদ্রি মিক্ সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তোমাদের গ্রামের চার্চ্ ইয়ার্ডে আমার সমাধি দিয়ো। এমন কি অনেকে বলে, সেই সমাধি খোঁড়া হয়েছিল পর্যন্ত। সৌভাগ্যবশতঃ সাহেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই নিয়ে ছাত্রমহলে সাহেব সুস্থ হলে পর অনেক রহস্য চলত। সাহেবের জহুরী বলে বাবুর্চি ছিল। সেও সাহেবের এই ব্যামোয় খুব সেবা করেছিল। সাহেব শেষদিন পর্যন্ত জহুরীকে বাপের মত ভালোবাসতেন এবং সম্ভ্রম করতেন। জহুরী সাহেবকে তাঁর খেপামির জন্য অনেক সময় বকুনি দিত। একটি ছোট ছেলের মত সাহেবকে দেখেছি চুপ করে জহুরীর স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতেন।

ভীমতাল হতে কাটগুদম যাত্রার সময় গুরুদেব আমাদের ডাণ্ডিতে ওঠবার অনুরোধ রক্ষা করলেন না। মৃদু হেসে বললেন :

“বউমা আজ তোমরা আমার শরীরের উপর সন্দেহ করছ, কিন্তু এক সময় ছিল, এই পাহাড়ের রাস্তায় আমার মেজ মেয়ে রেণুকার ডাণ্ডির সঙ্গে একাই নেবেছিলুম। বোধহয় ১৯০৩ সালে রেণুকা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে আলমোড়ায় চেঞ্জে নিয়ে যেতে বাধ্য হলুম।

“শান্তিনিকেতনে কিছু কাজ থাকার দরুন রেণুকে সেখানে তার মামার দায়িত্বে রেখে কলকাতায় ফিরে আসতে হল। কয়েক দিন পরেই খবর এল রেণুর অসুখ বেড়ে গেছে। সেই খবর শুনে ফিরে রওনা হতে হল আলমোড়ায়। সেখানে পৌঁছে বুঝলাম রেণুর জীবনের শেষদিন এগিয়ে এসেছে। আমি পৌঁছবার কয়েকদিন আগেই রক্তবমি শুরু হয়েছে। ডাক্তার আর তার মামা কাছে ছিলেন সমস্ত ক্ষণ। আমার আসার খবর পৌঁছতেই সেখানকার সিভিলসার্জন আমার সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি চলে গেলেন। শুনলুম বলে গেছেন, ‘আমি এর বাবাকে বলতে পারব না যে তাঁর মেয়ের জীবনের আর কোনো আশা নেই।’ অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে প্রথম রেণুর ঘরে যখন ঢুকলুম, জ্ঞান তখন তার বেশ আছে। আমি কাছে বসতেই সে বারবার বলতে লাগল, ‘বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো’। বাড়ির অন্যদের কাছেও শুনলুম, কয়েকদিন ধরেই সে সকলকে অনুরোধ করছে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ‘তোকে বাড়ি নিয়ে যেতেই তো এসেছি’। তার এই একান্ত ইচ্ছে অপূর্ণ রাখতে পারলুম না। তক্ষুনি ডাণ্ডির বন্দোবস্ত করতে বললুম। আলমোড়া তখনকার দিনে খুব নির্জন জায়গা ছিল। এখনকার মত লোকালয় গড়ে ওঠে নি তখনও। অত তাড়াতাড়ি ডাণ্ডি-বেহারা পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। তাকে শুইয়ে নামাবার জন্যে তক্ষুনি কাঠ দিয়ে স্ট্রেচার তৈরি করিয়ে নিলুম। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও বেহারা সংগ্রহ করা গেল। তার শেষ বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমার মন তখন অশান্ত। তার মা ছিল না— আমিই তার সেবা করে এসেছি ব্যামোর মধ্যে। তোমরা ভাবো আমি সেবা করতে

পারি না। তার যখন এক-একদিন ব্যামো বাড়ত, সমস্ত রাত সে কাত্‌রাত রোগের যাতনায়; হোমিওপ্যাথি বই দেখে দেখে রাতভোর তার মাথার কাছে বসে ওষুধ দিতুম। তখন ঘাড়ে আমার লেখার বোঝা অনেক চাপানো ছিল। রুগী তদারক করতুম আর সেই সঙ্গে লেখাও চলত—লেখার পর লেখা। এই দুই কাজই একসঙ্গে করেছি। এদেশ ওদেশ করে তাকে নিয়ে একাই ঘুরে বেড়িয়েছি; আর কেউ ছিল না আমার হয়ে ভাববার।

"সেই সময় আবার শান্তিনিকেতন ইস্‌কুলের জন্য নানা চিন্তা ও অর্থের অভাব আমার মনের উপর পাষাণ চাপানো ছিল। কিন্তু শরীর ও মন বলিষ্ঠ ছিল, আর ছিলুম কষ্টসহিষ্ণু যথেষ্ট। আলমোড়া থেকে ১০০ মাইল কাটগুদম পর্যন্ত তাকে নিয়ে নামতে হল। অনেক জায়গায় হাঁটতেও হয়েছিল। এই দীর্ঘ রাস্তা শেষ করে ট্রেন ধরলুম। ওষুধপত্র রুগী এবং কয়েকজন আত্মীয়কে গাড়িতে চাপিয়ে দিলুম। আমি রইলুম পাশের কামরায়। পশ্চিমের কোনো এক জায়গায় সকালবেলা গাড়ি থামতে স্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য নেবেছিলুম। গ্রহ যখন বিরূপ তখন সবই চলে বিপরীত দিকে। ভুলক্রমে সিটের উপর পার্স্‌ ফেলে এসেছিলুম, ফিরে গিয়ে দেখি সেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্ষণকালের জন্য মনটা খুব বিগড়িয়ে গেল। বিতৃষ্ণা জন্মে গেল সংসারটার উপর। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ভাবতে লাগলুম, যে পার্স্‌ নিয়েছে আমার চেয়ে হয়তো তারই টাকার বেশি প্রয়োজন। আমি না হয় খুবই অসুবিধেয় পড়লুম কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়তো যথার্থ অভাবী, হয়তো এই টাকা তার যথার্থ উপকারে লাগল। নিজেকে যখন ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে ভাবতে পারলুম তখনি হারানোর দুঃখ থেকে মন মুক্তি পেল।

"এই লম্বা রাস্তা শেষ করে জোড়াসাঁকোয় যখন পৌছলুম, যাত্রা শেষ করে মন হল নিশ্চিন্ত। তার বাড়ি ফেরার শেষ সাধ পূর্ণ করলুম বটে কিন্তু দুদিন পরে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল জন্মের মত।"

এইখানে এসে তিনি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হলেন— বুঝি অতীতের অন্তরাল থেকে একটি বিস্মৃত বেদনা তাঁর মনের উপর ছায়া ফেললে। বর্তমান ঘটনা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি অনায়াসে বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারতেন। এমনি করেই তিনি একদিন বিছের কামড়ের যাতনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এক সময় রাত্রে তাঁকে বিছে কামড়ায়, তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিলেন, নিকটে কোনোপ্রকার ওষুধও ছিল না। বেদনা উপশম করবার নিমিত্ত তিনি নিজেকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, তিনি আর-এক মানুষ; যাকে বিছে কামড়েছে তার থেকে তিনি ভিন্ন লোক। যে-দেহ কষ্ট পাচ্ছে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে পারবামাত্রই তাঁর সমস্ত যাতনা শেষ হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ একজন সুস্থ লোকের মত রাত্রে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমতে পারলেন।

এই অদ্ভুত মানসিক শক্তি ছিল বলে জীবনের গভীরতম পরীক্ষার দিনেও নিবিড়তম সৃষ্টির কাজ তিনি করে গেছেন।

সত্যেন্দ্রস্মৃতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

১লা জুন ১৯৪৫। আজ ঠিক ১০৩ বৎসর আগে পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। এবং গত ৯ই জানুয়ারিতে, তাঁর মৃত্যুর পর ঠিক ২২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাঁর ৮১ পূর্ণ হতে মাস-পাঁচেক বাকি ছিল।

জন্মদিন রক্ষা করার তাঁর একটি অভিনব পন্থা ছিল। সেদিন অপরের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহারাদি পাওয়াই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু শেষাশেষি দেখেছি তিনি সেদিন আত্মীয়-বন্ধু বিশেষতঃ ছোটদের নিমন্ত্রণ করে উল্টে তাদের প্রত্যেককে উপহার দিতে ভালোবাসতেন। এখনও তাদের কারো-কারো কাছে সেই স্নেহের নিদর্শন আছে।

তিনি আম ভালোবাসতেন বলে তাঁর বোম্বাই সিবিলিয়ানী পদের উত্তরাধিকারী ভাগ্নে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল জন্মদিনে নিয়মিত তাঁকে একবাক্স 'আফ্‌স্' (Alphonso) পাঠিয়ে দিতেন; অবশ্য আমরাও তার ভাগ পেতুম। প্রত্যেকটি পাতলা সাদা কাগজে মোড়া, যেন ঢাকাই শাড়ি-পরা সুন্দরীর মত সেই আমগুলির যে কি মনোহর স্বর্ণবর্ণ, তা যাঁরা না দেখেছেন শুধু শুনে বুঝতে পারবেন না। আর কেবল রঙ নয়—যেমন সু-বর্ণ, তেমনি সু-গন্ধ, তেমনি সু-স্বাদ, তেমনি নধর নিটোল চিক্কণ নিরেট গড়ন—কোথাও কোনো খুঁত নেই। কিন্তু এই ভরা জ্যৈষ্ঠমাসে সেই দেব-দুর্লভ অমৃতফলের বর্ণনা বাড়িয়ে অনর্থক পাঠকের হিংসা ও লোভরিপুর উদ্রেক করতে চাই নে।

জন্মদিন-রক্ষার প্রথা বোধহয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমাদের ঘর থেকেই প্রবর্তিত হয়। নয়তো এ দেশের নিয়ম শুধু বড় ছেলের জন্মতিথি করা, এই আমার ধারণা। তারও খুঁটিনাটি অনেক রকম অনুষ্ঠান আছে— অন্যত্র দেখেছি। আমার দাদার জন্মদিন বর্ষাকালে এবং আমার শীতকালে পড়ত বলে সেই উপলক্ষ্যে চাকররা যথাক্রমে ছাতা ও কম্বল বখশিশ পেত, এবং আত্মীয়স্বজনকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হত মনে আছে। আর আমাদের উপহারও বাদ যেত না অবশ্য। এই দীর্ঘকাল পরেও তার কিছু কিছু নমুনা সঞ্চিত আছে; কিন্তু যাঁরা এত স্নেহ করে দিয়েছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়?— 'যত্নে তৃণ-কাষ্ঠখান রহে যুগপরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।'

আর এক জিনিস বাবা খেতে ভালোবাসতেন, সে হচ্ছে দুধের সকল প্রকার পাক—যাকে বলতেন 'দুধীয়'। সে বোধহয় আমার বাপের বাড়ির পারিবারিক রুচি। আমার তো বিশ্বাস, দুধ খেলে মোটা হয়। কিন্তু আমার একটি প্রবীণা বান্ধবী তার প্রতিবাদে একবার আমার নাম করে বলেছিলেন যে, দুধ খেলে যদি মোটা হত তাহলে তার পিসিরা এতদিনে দরজা দিয়ে গলতে পারত না! তা হবে। এটা ঠিক যে বাবার মোটা হবার খুব ইচ্ছে ও চেষ্টা সত্ত্বেও কখনও মোটা হতে পারেন নি, কেন জানি নে। ভাইদের মধ্যে তাঁর গঠন কিছু খর্ব ও কৃশ ছিল, রঙও ছিল শ্যামলা। চেহারা ভালোই ছিল। ওঁদের তো সকলেরই বেশ কাটা কাটা মুখশ্রী। এই রঙ নিয়ে তাঁর সঙ্গে রবিকাকার একবার বেশ মজার বচসা হয় শুনেছি। বাবা নাকি তাঁকে বলেন, 'আচ্ছা রবি, তোমার কি ছোটবউয়ের কারো রঙ তো তেমন

ফরসা নয়, তবে বেলার রঙ এমন ধব্‌ধবে হল কি করে ?' তার উত্তরে তিনি বলেন, 'কেন মেজদা, আপনার আর মেজবোঠানের রঙও তো শ্যামলা, তবে সুরেন-বিবির রঙ এত সাফ্‌ হল কি করে ?'

রঙের কথা যখন উঠলই, তখন আর একটা ছেলেবেলার স্মৃতিকথা বলি ;—ঠিক স্মৃতি নয়, শ্রুতিই বলা উচিত। একবার ঘটনাচক্রে মা দু-তিনটি শিশুসন্তান— দাদা, আমি ও একটি ছোট ভাইকে নিয়ে কোনো বন্ধু-সমভিব্যাহারে আগে বিলেত যান। ছোট ভাইটির নাম ছিল কবীন্দ্র, ডাকনাম চোবি। সে সেখানেই মারা যায়। বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল, ছবিতে দেখেছি। মা অন্তঃসত্তা অবস্থায় যান ; যে ছেলেটি সেখানে হয়, সেও অল্পদিনেই মারা যায়। এখনও দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের পাশে ওদের ছোট গোর বিলেতের গোরস্থানে আছে শুনেছি। বাবা কিছুদিন পরে (বোধহয় রবিকাকাও সেইসঙ্গে) বিলেত যান। এখন, আমি ওদেশে দেখেছি সকলেরই 'পাপা'র রঙ সাদা, আমার 'পাপা' যে কালো হবেন তা বোধহয় ধারণাই করতে পারি নি। তাই নাকি তাঁকে দেখে 'ও আমার পাপা নয়' বলে দরজার পিছনে গিয়ে লুকোই। লোকে 'ত্যাজ্যপুত্র করা' শুনতে অভ্যস্ত, কিন্তু ত্যাজ্যপিতা করাটায় নতুনত্ব আছে। এইখানে সলজ্জে স্বীকার করে রাখি যে, ছেলেবেলায় বিলেতে বছর-আড়াই কাটানোর দরুন দুটি বিলিতী বদ অভ্যাস আমার রয়ে গিয়েছিল— এক হচ্ছে দাদাকে নাম ধরে ডাকা, আর এক হচ্ছে বাবাকে 'পাপা' বা তার কোনো অপভ্রংশ নামে সম্বোধন করা। কিন্তু ঢের বেশি বয়সের লোকেরও যখন ওর চেয়ে ঢের অল্পদিন প্রবাসে কাটিয়ে মাতৃভাষা পর্যন্ত ভুলে যাবার উপক্রম হয়, তখন আমার এই সামান্য বাল্যক্রটি-দুটি নিশ্চয়ই মার্জনীয়। আমার পিস্‌তুতো ভাই সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী যখন বিলাতফেরত কোনো বাঙালী ব্রাহ্মণ-যুবককে ঘটকালী জালে ধরবার অভিপ্রায়ে কথোপকথনচ্ছলে, 'কতদিন বিলেতে ছিলেন' এই প্রশ্ন বাংলায় ক'রে 'bout a yeah' এই উত্তর কেতাদুরস্ত ইংরিজী উচ্চারণে পান, তখন তিনি অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। তাই নিয়ে আমরা কতদিন কত হেসেছি।

উপরে যে-কয়টি ঘটনা লিপিবদ্ধ হল, তার থেকে পিতৃদেবের স্বভাবের কতকগুলি বিশেষত্ব ধরা পড়বে। এক হচ্ছে আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি একটা উদার স্নেহমমতার ভাব, যা কারো প্রতি হয়তো তেমন গভীর আসক্তিতে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু সকলের প্রতি সমভাবে বিস্তৃত ছিল। যেজন্যে এমন কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়া ছিলেন না— নিতান্ত কুনো ও ঘরোয়া ধরনের ছাড়া— যাঁরা তাঁর বোম্বাই-প্রবাসের সঙ্গী কোনো সময় হন নি বা আদরযত্ন পান নি। অবশ্য হাতেকলমে আতিথেয়তা ও আদরযত্ন করবার ক্ষমতা আমার মায়ের বেশি ছিল। আর এক হচ্ছে তাঁর সরলতা ও অসংসারী ভাব। ঐ অবস্থায় নিজের তরুণী অনভিজ্ঞা স্ত্রীকে কেবলমাত্র দুটি শিশুসহ দুটি চাকর ও সহযাত্রী বন্ধু সহায়পূর্বক সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে পাঠানো কি সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল ?— জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (প্রসন্নকুমারের খ্রীস্টান ত্যাজ্যপুত্র) সেখানে তাঁদের নাবিয়ে নিতে এসে নাকি বলেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র এ কি করলেন ? নিজে সঙ্গে এলেন না ?'— এছাড়া অসাংসারিকতার আরও ঢের প্রমাণ আছে। মাকে নিয়ে যখন প্রথম বাবা বোম্বায়ে ঘর করতে যান, তখন শুনেছি মোতি নামে এক মুসলমান চাকরের হাতেই সমস্ত ঘরকরনার ভার থাকত, সে যখন যা টাকা চাইত, একটা খোলা ডেস্ক থেকে বের করে দেওয়া হত। আমরা তো নিজেই বড় হয়ে দেখেছি, যখন স্কুলের ছুটিতে বছর-বছর তাঁর কর্মস্থলে যেতুম, তখন শোবার ঘরে জানালার ধারে একটা ক্যাশ বাক্সের উপরেই চাবি রাখা থাকত। টাকার দরকার হলে চাকরকে হুকুম করতেন, 'অ্যাই ! বাক্‌স্ লে আও, চাবি লে

আও!' এমন মানুষের টাকাই বা জমবে কেমন করে, বিষয়-সম্পত্তিই বা টি কবে কি করে? ফলেন পরিচীয়তে। অথচ তিনি নিজে মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁরই রচিত গান মনে পড়ে—

'বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে?
তব চরণামৃতপান-পিপাসিত
নাহি চাহি ধনজনমানে।'

অনভিজ্ঞতার আরও নানান দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা এই যে, শুনেছি প্রথম কাজে ভর্তি হয়ে বাবা যখন একটা কি পরীক্ষা দেন, সেটা পাশ হবেন ধরে নিয়েই যা পুরস্কার পাবার কথা তার চারগুণ দাম দিয়ে ঘর সাজাবার আসবাবপত্র কিনে বসে থাকেন। অথচ সে-পরীক্ষায় পাস হলেন না। তখন আর কি করেন, অগত্যা টাকাটা পাঠাবার জন্য বাপকে টেলিগ্রাফ করেন; কিন্তু মহর্ষি বলেন, তিনি দেবেন না। মাতৃদেবীর কাছে বেশ মজার গল্প শুনেছি যে, এই দুঃসংবাদ পেয়ে তাঁরা স্বামীস্ত্রী নাকি টেবিলের দুধারে বসে মাঝে হান্ট্‌লি পামার্স্‌-এর একবাক্স বিস্‌কুট রেখে তার একটি একটি করে খাচ্ছেন আর ভাবছেন কি হবে। এমন সময় মহর্ষির টেলিগ্রাম এল যে, টাকাটা পাঠাচ্ছেন (প্রথমবার দেবেন না বলে বোধহয় কেবল ধাপ্‌পা দিয়েছিলেন)।

আমার দাদামশায় অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ওঁদের দিয়ে নূরনগর নামে এক আবাদ কিনিয়েছিলেন; সেটা তিনিই দেখতেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। মা তো কিছুই বুঝতেন না। মাঝখান থেকে সেই অবধি জমিদারী চিঠির হস্তাক্ষরের উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। আর বাবা তো তারে বাড়া। একটা কি অষ্টম আইনের ধারা আছে (তাতে বুঝি খাজনা সময়মতো দিতে না পারলে সম্পত্তি বিকিয়ে যায়?); সেই 'অষ্টম' করবে শুনে বাবা নাকি বললেন, 'আমরা নবম করব, দশম করব।' আর কত উদাহরণ দেব? ১৯নং স্টোর রোডের (এখন 'বিরলা পার্ক্') মতো ওঁদের অমন সুন্দর বাড়িবাগান যখন সামান্য খাজনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে ও সেখানে ঢেঁট্রা পিটছে, তখন বাবা তার পিছনেই আমার 'কমলালয়' বাড়ির বাগানে (এখন নদীয়ার মহারাজার) কোনো ছোটছেলের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে দোলনায় দুলছেন, বেশ মনে আছে। অবশ্য বিষয়ী বন্ধু-বান্ধব মিলে সে-বাড়ি পরে উদ্ধার করে দিলেন, কিন্তু কেবল পরহস্তগত হবার জন্য।

সরলতার সঙ্গে স্পষ্টবাদিতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কিন্তু যাদের পক্ষে সেটা স্বভাবসিদ্ধ, লোকে বোধহয় তাদের উপর তেমন চটে না। নিমন্ত্রণবাড়ি গিয়ে যদি খাবার দিতে দেরি হত তো বাবা তাদের তাড়া লাগাতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না। আর কোনো আগন্তুক যদি তাঁর অভিপ্রেত সময়মতো ওঠবার লক্ষণ না দেখাতেন তো বাবা চৌকির হাতার উপর ভর দিয়ে অর্ধ উত্থানপূর্বক এমনভাবে 'তবে তাহলে…' বলতেন যে ভদ্রলোকের আর বুঝতে বাকি থাকত না যে তাঁর প্রস্থানই প্রার্থনীয়। কিন্তু এর চেয়ে বড় জিনিস ছিল পিতৃদেবের সত্যাহুরাগ। যেমন তাঁর নাম ছিল সত্যেন্দ্রনাথ, যেমন তাঁর মূলমন্ত্র বেছে নিয়েছিলেন 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', তেমনি তাঁর জীবনেও তিনি যা সত্যপথ ও সত্যমত বলে মনে করতেন তার থেকে কখনও ভ্রষ্ট হন নি। এমন কি আমাদের কোনো কুটুম্ব ছোক্‌রা চাকরি-জোগাড়ের জন্য সামান্য কি একটা মিথ্যাকথা বলেছিল শুনে বাবা বলেছিলেন, 'ওকে চাবুক মারা উচিত।' অথচ

সেরকম সাদা বা কমবেশ ঘোর রঙের মিথ্যেকথা দুবেলা অবলীলাক্রমে বলতে লোকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, নিত্য দেখতে পাই। এইসব ভাবলে মনে হয় তাঁরা ঠিক যুগে জন্মান নি।

অথচ তাঁর 'ভালোমানুষ' বলে নাম ছিল। কথাটা আমার পছন্দ নয়, তবে চলিত বলে ব্যবহার করলুম। সংসারে ভালোমানুষের স্থান নেই। সকলেই পেয়ে বসে ও নিজের সুবিধে করে নেয়। সেই যে পুরানো গল্প আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছিলুম যে, সাপকে কেউ দেখতে পারে না বলে সে লোকপ্রিয় হবার আশায় ব্রহ্মার পরামর্শে মানুষকে না কাম্‌ড়ে একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু তার ফলে লোকে তাকে মাড়িয়ে দ'লে চলে যেতে লাগল ব'লে আবার যখন ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ জানালে তখন তিনি বললেন, 'বাপু, আমি তো তোমায় ফোঁস্ করতে মানা করি নি।' মানুষেরও সংসারে আত্মরক্ষা করতে হলে একটু ফোঁস্ করা দরকার।

কর্মক্ষেত্রে শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পিতৃদেবের কখনও অবনিবনাও হয়েছে বলে শুনি নি। বরাবরই তাদের সঙ্গে সমভাবে সপরিবারে মেলামেশা করেছেন। কেবল ছুটি হলেই কলকাতায় চলে আসতেন বলে নতুন নিয়ম করে দিয়েছিল যে, ছুটিতে নিজের প্রদেশের বাইরে যেতে পারবে না। মা বলতেন এই বাড়ি-আসা তাঁদের খুব কাম্য ছিল, এবং অনেকদিন অন্তর অন্তর আসতেন বলে খুব আদর পেতেন। তাঁর কোনো অসুস্থ অবস্থায় যখন বছরখানেক কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন বোম্বাই থেকে বাবা তাঁকে যে চিঠি লেখেন সেগুলি আমার কাছে আছে। সেগুলি 'স্ত্রীর পত্র' নাম দিয়ে ছাপালে সেকালের অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। এবং স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য বাবার কি ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। বিলেতে পর্যন্ত নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতরে যাবার পথের খড়খড়িগুলো কে ভেঙে ফেলছে। মেয়েদের মধ্যে কইয়ে-বলিয়ে হাসিখুশি মেয়েকেই ভালোবাসতেন। নিজে খুব গল্প করতে পারতেন না বলে গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। একটি হাসিখুশি ভাইঝির সঙ্গে তাই 'দেখনহাসি' পাতিয়েছিলেন। ইংরিজী ধরনধারন যে ভালোবাসতেন, সেও অনেকটা ওদের পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য। নিজের ভ্রাতৃবধূদের মাথার কাপড় টেনে খুলে দিতেন শুনেছি; অথচ তাঁরই আপন দাদা, জ্যাঠামশায়, আব্রু সম্বন্ধে খুব রক্ষণশীল ছিলেন। আশ্চর্য, পিঠোপিঠি দুই ভাইয়ের এক পরিবারে মানুষ হয়েও কতকগুলি সামাজিক বিষয়ে এমন মতভেদ ছিল, অথচ দুইজনের মধ্যে খুব সম্প্রীতিও ছিল। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে মাকে বিলেত নিয়ে গিয়ে ঐ স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে ফেলেন, কিন্তু বাপের অমতের জন্য তখন তা করতে পারেন নি। বস্তুতঃ বড় বয়সেও ছেলেরা বাপকে কি রকম মেনে চলতেন, তার থেকে মহর্ষির চরিত্রবলেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংসারিক হিসেবে খুব কাম্য এমন এক বিবাহ-সম্বন্ধ আমার দাদার জন্য উপস্থিত হলে, বাবার নিজের অমত না থাকলেও বিজাতে দিতে মহর্ষির আপত্তি হবে জেনে তিনি রাজি হলেন না। ইংরেজি আদবকায়দা তাঁর কিছু কিছু অভ্যস্ত এবং পছন্দ হলেও কখনো সপরিবারে সাহেবিয়ানার স্রোতে ভেসে যান নি। তাঁর একটি আবাল্যবন্ধুর পরিবার সেই পথে ভেসে যাওয়ায় তিনি বাবাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'সতুভাই, তুমিই ঠিক করেছ।' বস্তুতঃ বাবার সব বিষয় একটা মাত্রাজ্ঞান ছিল, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। তাঁর প্রিয় গীতার উপদেশ যুক্তাহারবিহার তিনি সর্বদা মেনে চলতেন। আর ঘড়ির কাঁটা ধরে সব কাজ করতেন। বেশভূষায় বাবা বরাবর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ছিলেন। স্নান করে মুখে যে পাউডার দিতেন তার ছোট্ট ব্রুশটি

এখনো আমার কাছে আছে। আর খাওয়া বাদ গেলেও কোনদিন নাওয়া বাদ যাবার জো ছিল না। সাঁতার খুব ভালো দিতে পারতেন। ছেলেবেলায় ওঁদের পালোয়ান রেখে কুস্তি শেখানোর রেওয়াজ ছিল। তবে যৌবনকালে হাঁটুতে একটা বাতের ব্যথা হয়ে অনেকদিন ভুগেছিলেন, তাই ঘোড়ায় চড়তে একটু অসুবিধে হত। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ ছিল; প্রথম কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সেখান থেকেও সংস্কৃত বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন চিঠিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যখন ছুটিতে বম্বে যেতুম, তখন রাত্রে খাবার পর আমাদের শকুন্তলা প্রভৃতি কত কাব্য পড়ে শোনাতেন। গুড়গুড়ি টানতে টানতে ঢুলুনি পেলেও টেবিলে খানিকক্ষণ না বসে কখনো শুতে যেতেন না। এক সময়ে আমার জন্য সংস্কৃত-শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেবভাষা কখনো আয়ত্ত করতে পারলুম না। তবে তার ধ্বনি এখনো কানে অমৃতবর্ষণ করে, সেও যথালাভ। বাবা-ওঁদের সংস্কৃত-উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ছিল, তার ব্যতিক্রমেও ঘোর আপত্তি ছিল। বোম্বাই গিয়ে তাঁকে নানা ভাষায় পারদর্শী হতে হয়েছিল। মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, সিন্ধী ইত্যাদি যে প্রদেশে যখন গেছেন তারই ভাষা শিখতে হয়েছে। এখন আফ্‌সোস হয় যে অমন সুযোগ থাকতে আমরা অন্ততঃ একটা কোন অবাঙালী ভারতবর্ষীয় ভাষা কেন ভাল করে শিখলুম না। টুটি-ফুটি হিন্দীতেই কাজ সারতুম।

বাবার শেষ জীবনে কবিতা আবৃত্তি করবার ঝোঁকের কথা হয়তো অনেকেই জানেন, যাঁদের বয়স এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে। ছাত্রদের কত যত্ন করে শেখাতেন, তা তাঁদের কারো কারো মুখেই শুনেছি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তাঁর প্রিয় কবিতা কত যে নিজের হাতে খুট্‌খুট্‌ করে টাইপ করেছেন, এবং বড় বড় বই-আকারে বাঁধিয়ে রেখে গেছেন। চুপ করে বসে থাকাতো ওঁদের ধাতে ছিল না। চিরকালই কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমার সঙ্গে তাঁর গীতানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ্‌ দেখেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সে বিষয় তাঁর আন্তরিক উৎসাহের কথাও অনেকে জানেন, তবে তিনি যে নিজে গাইতে পারতেন, এবং ব্রহ্মসংগীত তৃতীয় ভাগের প্রায় সমস্ত গানই যে তাঁর রচনা, তা হয়তো জানেন না। শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই ভাই রাঁচিপ্রবাসে তাঁদের পাহাড়ের শান্তিনীড় শান্তিধামে বাসকালীন রোজ প্রত্যুষে কাঁসরঘণ্টা শুনে কুসুমতলার বেদীতে সমস্বরে যে উপাসনা নিয়মিত ও আন্তরিকভাবে করতেন, তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনেকেরই মনে দেশকালপাত্রের ছাপ থেকে গেছে নিশ্চয়ই। তাঁদের নিজের হাতে পায়রার ঝাঁককে দানা খাওয়ানো, হরিণ-ময়ূরের পাহাড়ে চরে বেড়ানো, প্রত্যেক অপরিচিত আগন্তুকের সঙ্গেও শিষ্টালাপ এ সবে এবং পর্বতচূড়ায় মন্দির-স্থাপনের দরুন চতুর্দিকে প্রকৃত আশ্রমের ছবিই যেন ফুটে উঠেছিল। বাবা চিরকালই জীবজন্তু, বিশেষতঃ পাখি-পোষা এবং বাগান-করা ভালোবাসতেন। লেখাপড়ার তো কথাই নেই।

তাঁর সাহিত্যরচনার ভাষায় প্রসাদগুণ আছে সকলেই বলে। তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের মুখপত্রে জামাতা শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—

'এ ভাষা যেমন সরস তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতিপ্রয়োগ নেই, অপপ্রয়োগ নেই, দুষ্টপ্রয়োগ নেই, কষ্টপ্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অহংকার নেই। ফলে এ ভাষা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।'

২০ বৎসর বয়সে তখনকার দিনে প্রথম সাহস করে বন্ধু মনোমোহন ঘোষ-সহ বিলাতযাত্রা এবং সিবিলসার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি পিতৃদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এই পত্রিকারই অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে ; পুনরুক্তি বাহুল্য। বিলাত-যাত্রাকালে যে গানটি লিখে দিয়ে যান সেটি আমার বেশ লাগে বলে এইখানে তুলে দিচ্ছি। প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে মাতৃদেবী লোকান্তরিত হবার কিছুকাল পূর্বেও এই গানটির উল্লেখ করেছেন, এবং আমরা তাঁর কানে দেবার নলের ভিতর দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করলে পর বলেছেন, 'বেশ কথাগুলি, না ?' অথচ তখন অন্য কত কথা ভুলে গিয়েছিলেন। স্মৃতির কোথায় কি গভীর রেখা খনন করা থাকে, তার রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করবে ?

ললিত

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন ?
কোন প্রাণে যাব চলি বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে
সদা প্রাণ চাহে যারে
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ-দহন ॥
শরীর যদিও যাবে
মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত
ছায়া যায় দূরে তত
তবু না ছাড়ায় কভু পাদপবন্ধন ॥

আর কি বলব ?—একজন নামী লেখক বলেছেন, 'আমরা যাকে Personality বলি, সেটি কতকগুলি বড় এবং অনেকগুলি ছোটর সমষ্টি।' বড়গুলি বাইরের লোকে জানতে পায় বা খোঁজ রাখে, ছোটগুলি বেশির ভাগ ঘরের লোকেই জানতে ও দেখতে পায়। সেই রকম ছোট ফুলের একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি আজ তাঁর নামে নিবেদন করে দিলুম, পত্রিকার সম্পাদনা-সমিতির অন্যতম সদস্যের বিশেষ অনুরোধে। হয়তো কুড়ি বৎসর আগে তুললে ফুলগুলি আর একটু টাটকা থাকত।

'তিনি যে লোকেই থাকুন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন।'—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম-তারিখ

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে লিখিত পারিবারিক খাতায় সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ—২০ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৪ শক, অর্থাৎ ১ জুন ১৮৪২ পাওয়া যায়।

ছাত্র-জীবন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণ পাঠে জানা যায়, এই বৎসরের এপ্রিল মাসে সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পাঠোন্নতি বা General Proficiency গুণে তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দু স্কুলের ছাত্র-হিসাবে মাসিক দশ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য বর্দ্ধমান-রাজ-প্রদত্ত সিনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন।

এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন।

কেহ কেহ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের সহপাঠী ছিলেন। এই উক্তির মূলে যে সত্য নাই, তাহা ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইবে :—

> Hindu College . . . In accordance with the recommendation of the examiners, prizes in books as usual have been awarded to the meritorious students of the junior school . . . .
>
> 1st Class Arithmetic ... Keshub Chunder Sen.
>
> 4th Class Arithmetic .. . Satyendra Nath Tagore.

বিবাহ

প্রেসিডেন্সী কলেজে পঠদ্দশায় সত্যেন্দ্রনাথ বিবাহিত হন। এই বিবাহ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।* পাত্রী—যশোহর, নরেন্দ্রপুর গ্রাম-নিবাসী অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ঠাকুর-পরিবারের অনেকেরই বিবাহ যশোহরে হইয়াছিল ; তখনকার দিনে যশোহরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি ছিল।

সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত-গমন

ভারতীয়দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম সিভিলিয়ান। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই প্রদেশ। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে বন্ধুবর মনোমোহন ঘোষের আগ্রহাতিশয্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

---

* "জ্ঞানদানন্দিনী দেবী" প্রবন্ধে ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪৮) ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন :—

"যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদাদেবীর জন্ম হয়। এই সালটি সনাক্ত করবার দুটি আনুষঙ্গিক উপায় আমাদের ছিল। একটি এই যে, মা বলতেন তাঁর একমাত্র পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বৎসর আর তাঁর নিজের একুশ বৎসর বয়স একসঙ্গে আরম্ভ হয়। কারণ দুজনের জন্মদিন একই দিনে পড়ে। আর আমার দাদার জন্মের সাল জানতুম ১৮৭২, সুতরাং মায়ের হবে ১৮৫২। আর একটি এই যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন একুশ পূর্ণ হলেন, তখন যে সব সরকারী কাগজপত্র এল তাতে যেন লেখা ছিল মা-বাবার বিয়ের সাল ১৮৫৯। ওদিকে শুনেছি আমার দাদামশাই মায়ের আট বৎসর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, সে হিসেবেও ১৮৫২ সালে জন্মালে ১৮৫৯-এ সাত পূর্ণ হয়ে আটে পড়ে।"

দিবার জন্য তাঁহার সহিত বিলাত গমন করেন। কোন্ তারিখে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (পৃ. ৫০) ভুলক্রমে লিখিয়াছেন :— "আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খ্রীঃ, বয়স তখন ১৯।" ইহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিলাত যাত্রা করেন—২৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে। ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের সহযাত্রী মনোমোহন ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"We have now come to Ceylon—the famous and fabulous লঙ্কা. To what a great distance we have left you. A sheet of water extending to more than a thousand miles, intervenes . . . . You might have accompanied us a little further than the Garden Reich, and then might have returned by the after packet-steamer 'Celerity', as did Sir Bartle Frere, leaving his wife to proceed to England.

The parting between Sir Bartle and his wife reminded me forcibly of our parting scene of the morning of the 23rd March, when the shores of India receded from us, and you were all left behind . . . .

. . . . S. N. T. and I am now once again in the fair land of Ceylon, but all its gold is now turned into dust."*

সত্যেন্দ্রনাথও তাঁহার বড় দাদাকে মান্দ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন :—

. . . ."We are four days away from home"— Madras, on board the 'Colombo', 27 March 1862.†

সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত গমনের রাত্রিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (আশ্বিন ১৮৪৬ শক, পৃ. ১৫২-৫৪) প্রকাশিত হইয়াছে।

'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সালটি ভুল, উহা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

"বাঙ্গালী সিবিলিয়ান··· কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষের পুত্র বাবু মনোমোহন ঘোষ "সিবিল সার্ব্বিসের" পরীক্ষাদানার্থী হইয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন ;··· সম্প্রতি যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সত্যেন্দ্রবাবু উত্তীর্ণ হইয়াছেন।···"

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

রাজকার্য্য

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৪, ৩০ জুলাই তারিখ হইতে এই সার্ভিসের কর্ম্মিরূপে গণ্য হইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে সস্ত্রীক জলপথে যাত্রা করিয়া ১৮৬৪, ১২ ডিসেম্বর তারিখে কর্ম্মস্থল বোম্বায়ে উপনীত হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বোম্বাই হইতে বাড়ীতে লেখা একখানি পত্রে দেখা যায়, তিনি বোম্বায়ে বসিয়া প্রবেশিকা ভাষাপরীক্ষা দিতেছেন। ১৮৬৫, ২৭ এপ্রিল তারিখে তিনি আমেদাবাদের এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। ৩৩ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত বোম্বাই প্রদেশে রাজকার্য্য করিয়া তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে অবসর গ্রহণ করেন। বোম্বাই-সরকার কর্ত্তৃক বর্ষে বর্ষে প্রকাশিত History of Services of Gazetted Officers...Bombay Presidency হইতে আমরা তাঁহার রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

* "Satyendranath Tagore—His Letters"—*The Calcutta Review*, Oct., 1924, Pp. 119.

† Ibid. *The Calcutta Review*, September 1924.

SATYENDRANATH TAGORE

Joined the Service, 30th July 1864; arrived, 12th December 1864

Station	Substantive appointment	Date	Officiating appointment	Date
Ahmedabad ...	Unattached	12th Dec. 1864	...	...
...	Asstt. Collr. & Magte. ...	27th Apr. 1865	...	...
Do ...	Do ...	...	Asstt. Judge & Sessions Judge	1st Sept. 1866
Sick leave from 28th October 1866 to 7th April 1867.				
Ahmedabad ...	Asstt. Collr. & Magte. ...	...	Asstt. Judge & Sessions Judge	4th July 1867
Sick leave from 16th October 1867 to 15th June 1868.				
Ahmednagar ...	2nd Asstt. Collr. & Magte. ...	24th Dec. 1867	...	...
Do ...	Do ...	...	Asstt. Judge & Sessions Judge	26th June 1868
Do ...	Asstt. Judge & Sessions Judge	19th Oct. 1868	...	...
Satara ...	Do ...	8th Feb. 1869	...	...
Dhulia ...	2nd Grade Asstt. Judge and Sessions Judge ...	7th Apr. 1869	...	...
Poona ...	Do ...	28th Mar. 1871	...	...
Thana ...	Do ...	...	Joint Judge & Sessions Judge	28th June 1872
Ahmednagar ...	Do ...	...	Judge of the Small Causes Court	22nd Mar. 1873
Kaladgi ...	Do ...	...	Senior Asstt. Judge & Sessions Judge ...	30th June. 1873
Do ...	1st Grade Asstt. Judge ...	15th June 1875	Do ...	...

Station	Substantive appointment	Date	Officiating appointment	Date
Hyderabad ...	Judge & Sessions Judge. Shikarpur ...	30th Aug. 1875	Distt. and Sessions Judge	30th Aug. 1875
Ahmedabad ...	Do ...	...	Do ...	19th Apr. 1876
Subsidiary leave from 14th to 19th September 1878.				
Furlough from 20th September 1878 to 10th May 1880.				
Surat ...	Judge & Sessions Judge, Shikarpur ...	...	Distt. and Sessions Judge ...	11th May. 1880
Shikarpur ...	Do ...	27th Nov. 1880	...	...
Surat ...	2nd Grade Judge & Sessions Judge. ...	3rd May 1881	...	...
Kanara ...	Do ...	29th May 1881	...	...
Special leave from 8th January to 4th March 1883.				
Kanara ...	2nd Grade Judge & Sessions Judge. ...	5th March 1883	...	...
Do ...	1st Grade Judge & Sessions Judge. ...	28th Aug, 1883	...	...
Sholapur-Bijapur	Do ...	18th Jan. 1884	...	...
On special duty of arbitrating on the question of the compensation to H. H. Maharaja Holkar for the alleged loss of grazing rights, from 26th November 1885 to 8th January 1886.				
Nasik ...	1st Grade Judge & Sessions Judge, Sholapur-Bijapur ...	...	Distt. and Sessions Judge ...	...
Sholapur-Bijapur	Do ...	7th Oct. 1886	...	...
Special leave from 22nd August to 26th December 1890.				
Sholapur-Bijapur	1st Grade Judge & Sessions Judge ...	27th Dec. 1890	...	...
Furlough from 2nd April 1893 to 15th March 1894.				
Satara ...	1st Grade Judge & Sessions Judge. Sholapur-Bijapur ...	...	Distt. and Sessions Judge ...	16th Mar. 1894
Satara ...	1st Grade Judge & Sessions Judge ...	29th Apr. 1896	...	...

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা

সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি লইয়া তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেলগাছিয়া ভিলায় চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয়। মেলার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁহার মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ। তাঁহারই আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ মেলার জন্য একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতায় চৈত্রমেলা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবিধ উপায়ে জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করাই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (পৃ. ৩৫-৬) এই স্বদেশী 'মেলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা [গণেন্দ্রনাথ] তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তা'র শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা।"

সত্যেন্দ্রনাথের রচিত এই ভারত-সঙ্গীতটি ("মিলে সবে ভারতসন্তান") চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (এপ্রিল ১৮৬৮) প্রথম গীত হয় ; আমাদের জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের অনতিবিলম্বেই সত্যেন্দ্রনাথ নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের ১০ম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অধিবেশনের কাল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০-১২ই জুন। শেষের দিনটি প্রবল ভূমিকম্পের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণ ইংরেজীতে পাঠ করেন ; উহা রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সভায় বাংলাতেও বিবৃত হইয়াছিল। ইংরেজী অভিভাষণটি ১১ জুন ১৮৯৭ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছে। সম্মিলনে অবনীন্দ্রনাথও যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহার 'ঘরোয়া'য় এই অধিবেশনের একটি বর্ণনা আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩০৭ ও ১৩০৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

আচার্য্য—২ ফাল্গুন ১৮২৭ শক (ইং ১৯০৬) হইতে সত্যেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে নিযুক্ত হন।

আচার্য্য ও সভাপতি—১ শ্রাবণ ১৮২৯ শক (ইং ১৯০৭) হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক—"কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে" তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।" ১৬ আগষ্ট ১৮৪৩ তারিখে এই সভার মুখপত্রস্বরূপ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম বারো বৎসরের পত্রিকা সম্পাদন করেন—অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা', পৃ. ৬৪)। ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার ছিল একটী পেপার-কমিটি বা গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার উপর। নানা কারণে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যে বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা রহিত করিয়া দিলেন। নূতন ব্যবস্থায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। পত্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন মহর্ষির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে একাধিক বার পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল এইরূপ :—

(১) ১১ পৌষ ১৭৮১ শক (২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯) হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিলাত যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

(২) ১৮৩১ শক (এপ্রিল ১৯০৯) হইতে ১৮৩২ শক (এপ্রিল ১৯১০) পর্য্যন্ত।

(৩) ১৮৩৭ শক (এপ্রিল ১৯১৫) হইতে ১৮৪৪ শকের মাঘ সংখ্যা (জানুয়ারি ১৯২৩) পর্য্যন্ত যুগ্ম-সম্পাদক (অন্যতর সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ব্রহ্মসঙ্গীত

সত্যেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি সুপরিচিত গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১)

অতুল জ্যোতির জ্যোতি।
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন, জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন;
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচলশিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা।
রবিকিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে: সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা।

গ্রন্থাবলী

বাংলা

১। **স্ত্রী-স্বাধীনতা**।

এই পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' পুস্তকে (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন :—

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।... John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম।

২। **সুশীলা-বীরসিংহ** নাটক। সংবৎ ১৯২৪ (২ মার্চ ১৮৬৮)। পৃ. ১৮২+৩

"সেক্সপিয়রকৃত নাটক বিশেষ ['সিম্বেলীন'] অবলম্বন করিয়া বিরচিত"। নাটকখানির শেষে স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া "মনুষ্য-জীবন" নামে তিন পৃষ্ঠার একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটি 'নব রত্নমালা'য় "জীবন-সঙ্গীত" নামে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। **দ্বিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা**। মাঘ ১৭৯৩ (ইং ১৮৭২)।

১৭৯৩ শকের ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা। ইহা পরবর্ত্তী ফাল্গুন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ২ আষাঢ় ১২৭৯ তারিখের 'অতিরেক মধ্যস্থে' প্রকাশ :—

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা জানিলাম, সর্ব্বগুণাকর ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গ-লেখক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এবং সুধাপ্রসবিনী লেখনীধারক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণের অবিদ্যমানে ব্রাহ্মসমাজকে সুলেখক ও সদ্বক্তার জন্য লালায়িত হইতে হইবে না।

৪। **শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা**। আদি ব্রাহ্মসমাজে ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত। ইং ১৮৭২।

এই পুস্তিকা পাঠে ২৩ ভাদ্র ১২৭৯ তারিখে সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' লিখিয়াছিলেন :—

ইহাতে ব্রহ্মই যে আত্মার পরম লক্ষ্যস্থল; ঈশ্বর বুদ্ধি, যুক্তি ও জ্ঞানাতীত হইলেও প্রেম ও ভক্তির দ্বারা গোচর হন; বাহ্যিক সভ্যতা ও ইউরোপীয় অনুকরণ প্রকৃত উন্নতি নহে; ব্রাহ্মগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই সম্প্রদায়ভেদ হওয়া অতীব দুঃখের কারণ ইত্যাদি বিষয় সকল সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে তেজস্বিতার সহিত সভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

৫। **বোম্বাই চিত্র**। (সচিত্র) বৈশাখ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৫৪১+পরিশিষ্ট 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' ৫০।

৬। **মেঘদূত** (পদ্যানুবাদ)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ২৭।

৭। **বৌদ্ধধর্ম্ম**। ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০২)। পৃ. ২৪০।

৮। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**। ৪ পৌষ ১৩১১। (১৭ জানুয়ারি, ১৯০৫)। পৃ. ৩৮৭+৫। পদ্যে অনূদিত। ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। "প্রকাশকের নিবেদনে" তিনি লিখিয়াছেন :—

প্রায় এক বৎসরকাল পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত তাঁহার দুই গ্রন্থ 'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'র পদ্যানুবাদ-এর পুনর্মুদ্রণকল্পে সংশোধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন। অতঃপর নিষ্ঠুর কালের আর সবুর সইল না।··· নববর্ষ, ১৩৩০।

৯। **নব রত্নমালা** (সচিত্র)। ১৩১৪ সাল (ইং ২০ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ৮+৩+২১৪+১৬১+৫৬।

"শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গ-সংগ্রহ।" ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনা স্থান পাইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত সংস্করণ প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়।

১০। **ভারতবর্ষীয় ইংরাজ**। ১৩১৪ সাল। (১৫ মার্চ ১৯০৮)। পৃ. ৩৯।

'বোম্বাই চিত্র' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

১১। **আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস**। (সচিত্র) ৫ আগষ্ট ১৯১৫। পৃ ২৬৬।

ইংরেজী

1. **Raja Ram Mohan Roy.** An Address delivered at the City College Hall, Calcutta on 27th September 1889, the Fifty-third anniversary of the death of Raja Ram Mohan Roy. Pp. 12.

2. **Autobiographical Notes and Reminiscences.** Cal. 1 August, 1897.

3. **Tukaram, the Sudra poet of Maharashtra.** 1901.

4. *The Auto-Biography of Maharshi Debendranath Tagore.* With illustrations. Translated from the original Bengali by Satyendranath Tagore and Indira Devi. Calcutta. 1909. (1 Nov. 1909). Pp. ii+XXIV+195.

পত্রাবলী

সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি ইংরেজী পত্র ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে এবং বিলাতে অবস্থানকালে লিখিত।

মৃত্যু

৯ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে, ৮১ বৎসর বয়সে, কলিকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিগত ২৪শে পৌষ রাত্রি ৩টার সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল মহর্ষিপরিবার একটী মহামূল্য রত্ন হারাইলেন তাহা নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের একটী বিরাট স্তম্ভ খসিয়া গেল. আদি ব্রাহ্মসমাজের ত কথাই নাই। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।···

মহর্ষি পূর্ণ উদ্যমে যখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মিলিত হন। কেশব বাবুর সহিত সত্যেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। উভয়েই প্রাণমন ঢালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষিদেব এই দুইজনকে লইয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। ভ্রমণের দৈনিক বৃত্তান্ত সত্যেন্দ্রবাবু লিপিবদ্ধ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তৎসময়ে বাহির করেন।···

কেবলমাত্র রাজকার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় নাই। তিনি বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছেন। পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসিবার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র উপাসনাকার্য্য ধারাবাহিকরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিনিকেতনের উৎসবে ও মাঘোৎসবে বেদীর আসন গ্রহণ করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পর্য্যন্ত যোগ দিতেন এবং নিজ বাগ্মিতাশক্তিগুণে বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোহরণ করিতেন। ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি রাঁচিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপন সহোদর শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকরূপে বহু বৎসর ধরিয়া অনেক মূল্যবান প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু অবধি সত্যেন্দ্রবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন।···

·· শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু এক মুহূর্ত্তও বিফলে ক্ষেপণ করেন নাই। "ব্রহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" তাঁহারই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। মহর্ষির নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া তিনিই উহা প্রকাশ করান। "বোম্বাইচিত্র" তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে তিনি গীতা ও তাহার পদ্যানুবাদ তাঁহার গবেষণা সহ বাহির করেন। "নবরত্নমালা" ও "বৌদ্ধধর্ম্ম" তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা। তিনি তাঁহার শেষ রোগশয্যায় শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার সাহায্যে গীতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুইখানি গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে তাঁহার কর্ম্মে উৎসাহ উপলব্ধি হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা, বৈদিক যুগের সমালোচনা ও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা, যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং নিজ হস্তাক্ষরে লিখিয়া পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাহার কলেবর এত বড় যে উহা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।* তিনি সর্ব্বদাই লিখন পঠনে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় ও অমূল্য সম্পত্তি। এমন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত অল্পই আছে। এতদ্ব্যতীত মনোমোহন বাবুর সহিত তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকতা করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সত্যেন্দ্র বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে প্রকৃত জ্ঞান ও সরল চরিত্রের উপরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা।···

কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু জাতীয় ভাব হইতে কিছুমাত্র পরিভ্রষ্ট হন নাই। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য অন্যতর সহায় হইয়াছিল। এই হিন্দুমেলা উপলক্ষে তাঁহার রচিত "মিলে সবে ভারতসন্তান" জাতীয় সঙ্গীতটী কোন্ বঙ্গবাসী না জানেন ?···(মাঘ. ১৮৪৪ শক)

---

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী জানাইয়াছেন :—তিনি যে নিজের হাতের লেখা প্রবন্ধাদি বাঁধিয়ে রেখে গেছেন, তা'ত আমরা কেউ দেখিনি বা জানিনে। তবে অবসর গ্রহণের পর তিনি সখ করে' typewrite করতেন অনেকে হয়ত জানেন না। এবং এই প্রকারে তাঁর প্রিয় বিখ্যাত কবিতাদি type করে' বাঁধিয়ে রেখে গেছেন বটে। সে বইগুলি তাঁর নাতিদের কাছে লালবাঙ্গলা, ১নং পাম প্লেস, বালিগঞ্জে রক্ষিত আছে।

স্বরলিপি

বঁধু তোমায় করব রাজা— রাজা ও রানী

কথা ও সুর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি— শ্রীইন্দিরা দেবী**

সা | { রা গা গমগা ‖ গ রা -া গধা | ধা পা -মগা |
বঁ | ধু তো মা॰য়্ ‖ ক র্ ব॰ | রা জা ॰॰ |

[-া]
| গরা -সরা -গমা | গা রা -গরা | সা -া সা } -া -া -া |
| ত॰ ॰॰ ॰॰ | রু ত ॰॰ | লে ॰ "বঁ") ॰ ॰ ॰ |

| পা ধা -া | ধ র্সা না -র্সনা | ধা পা -া | প ধা পাঃ -মঃ |
| ব ন ॰ | ফু লে ॰র্ | বি নো দ্ | মা লা ॰ |

| গমা রা -পা | মগা রা -া | -া -গরা সা রা গা গমা ‖
| দে॰ ব ॰ | গ॰ লে ॰ | ॰ ॰॰ "বঁ ধু তো মায়্" ‖

‖ { পা -া গা | পা পা -ধা | ধা র্সা -নর্সর্রা | র্সা র্সা -া |
‖ সিং ॰ হা | স নে ॰ | ব সা ॰॰॰ | ই তে ॰ |

| প র্সা র্সা -না | না ধা -নধা | পা পধা -নর্সা | না ধা -নধা } |
| হৃ দ য়্ | খা নি ॰॰ | দে ব॰ ॰॰ | পে তে ॰॰ } |

| { -পা -া ধা | ধ র্রা র্সা -া | না -ধা ধনর্সা | (না ধা -নধা) } |
| ॰ ॰ অ | ভি ষে ক্ | ক র্ ব॰॰ | (তো মা ॰য়্) } |

| না -ধপা -া | গরা -সরা -গমা | মগা রা -গরা |
| তো মা॰ য়্ | আঁ॰ ॰॰ ॰॰ | খি জ ॰॰ |

| সা -া সা | রা গা গমগা ‖ ‖
| লে ॰ "বঁ | ধু তো মা॰য়্" ‖ ‖

স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

জতুগৃহদাহ

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫২

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আয় তোরা আয় আয় গো—
গাবার বেলা যায় পাছে তোর
যায় গো।
শিশিরকণা ঘাসে ঘাসে
শুকিয়ে আসে,
নীড়ের পাখি নীল আকাশে
চায় গো॥
সুর দিয়ে যে সুর ধরা যায়,
গান দিয়ে পাই গান,
প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ—
তোর আপন বাঁশি আন্‌,
তবেই যে তুই শুনতে পাবি
কে বাঁশি বাজায় গো॥
শুকনো দিনের তাপ
তোর বসন্তকে দেয় না যেন শাপ।
ব্যর্থ কাজে মগ্ন হয়ে
লগ্ন যদি যায় গো বয়ে
গান-হারানো হাওয়া তখন
করবে যে হায়-হায় গো॥

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৫

কলকাতা। ১৫ই মার্চ্চ [১৮৯৫]

আজ সকালবেলাটা যে কি করে কাটিয়েছি তা বল্‌তে পারিনে। কোন কাজই করি নি— বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল, এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্‌টাচ্ছিলুম—মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ-শিট্ সংশোধন আছে—সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবা-মশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে,[1] কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ মাত্র নেই—বোধ হয় অনুতাপ করবার মত উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্তপ্রভাতের বাতাসে আমাকে বড় মাটি করে দেয়— কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্ব্বশরীরে লাগানই একটা যথেষ্ট কর্ত্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয় এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারী। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক একটা সকালবেলা এক একটা দৈববাণীর মত আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল, একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কি! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারী[2] করা নয়, এই সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপূর অকর্ম্মণ্যতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভাল গান শুন্‌লেও ত পরিতাপ হত না, আমার পক্ষে এক একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে গানের কাজ করে, এই হাওয়া এবং আলো, এবং ছোটখাট নানা প্রকার শব্দ আমাকে সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে— তখন বেশ বুঝতে পারি কেবলমাত্র "হওয়া"তেই একটা আনন্দ আছে— "আছি" এই কাণ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার— সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্ব্বব্যাপী আনন্দ। এইরকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

কলকাতা। ১৬ই মার্চ্চ। [১৮৯৫]

ভাল মন্দর তর্ক কোনকালে শেষ হবার না। মনের গঠন, কিম্বা কাজের ফলাফল, কোনটা থেকে মানুষের ভালমন্দ বিচার করতে হবে? শুদ্ধমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা যদি বিচার করতুম, তাহলে

১। "তখন তিনি [মহর্ষি] পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের ২রা ও ৩রা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তখন তিনি নিজে পড়িতে পারিতেন না।" ইত্যাদি। জীবনস্মৃতি, "হিমালয়যাত্রা"।

২। ১৩০১ অগ্রহায়ণ—১৩০২ কার্তিক, সাধনা, চতুর্থ বর্ষ। বস্তুত, প্রথম তিন বৎসরও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সম্পাদক আখ্যা গ্রহণ না করিলেও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যভার বহুলপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে মানুষ দৈবাৎ একজনকে আঘাত করেছে, আর যে ইচ্ছাপূর্ব্বক করেছে উভয়কে আমরা সমান দোষী করতুম— যে লোক রাগের মাথায় একটা কঠোর কাজ করেছে, আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে উভয়কে আমরা একই দণ্ড দিতুম। অবশ্য কোন্ কাজটা ভাল অথবা মন্দ সে একটা কথা, আর কোন্ মানুষটা ভাল অথবা মন্দ সে আর এক কথা। আমরা অন্তর্য্যামী নই, আমরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কাজের থেকে মানুষকে বিচার করি সে কথা সত্যি, কিন্তু সেই জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচার করিনে। কিন্তু শেলির জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস্ সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভাল হলেও হয়ত কোন কোন বিষয়ে তার ধর্ম্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে, সে হয়ত বিশেষ স্থলে নিজের সুখে অন্ধ হয়ে পরকে কষ্ট দেয়— সেটা তার পক্ষে কোন কারণেই প্রশংসার বিষয় নয়। শেলীর স্বভাবে যা দোষ ছিল সে দোষকে গুণ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোন ন্যায্য কারণ নেই— এখন কথা এই, যে, দোষ ছিল বলে যে তার কোন গুণ ছিল না তাও নয়। তার চেয়ে অনেক কম গুণবান লোকও তার মতন অমন লোককে কষ্ট দেয়নি। শেলির জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না, যে, লোকবিশেষে দোষও গুণ হয়, কিন্তু এই প্রমাণ হয়, যে, কোন লোকই সম্পূর্ণ ভাল নয়। প্রত্যেক লোকেরই দোষগুণের ওজন করে' যেটা বেশি হয় সেইটার অনুসারেই তাকে ভাল কিম্বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে শেলিকে কেউ বা খুব প্রশংসা করে কেউ বা গাল দেয়— কিন্তু আসল শেলিকে কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। মানুষদের সঙ্গে যখন মানুষের ক্ষণিক সম্বন্ধ, তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষেরা মানুষকে বিচার করবে এইটেই স্বাভাবিক— যাঁর সঙ্গে মানুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব, অনেক সাধুর চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট্ পল্, সেণ্ট্ অগষ্টিন্, যদি অল্প বয়সে মারা যেতেন তাহলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত? কিন্তু তাই বলে' সেই কথা বলে নিজেকে ভোলাবার কোন দরকার নেই— দোষ মাত্রেই দোষ— পৃথিবীতে যখন অল্পদিনের জন্যে এসেছি তখন যথাসাধ্য পরস্পরকে সুখী করে' এবং সংসারে স্থায়ী সুখের সৃষ্টি করে যেতে পারলেই ভাল,— আমরা কেবল এক সন্ধ্যার জন্যে একটি পান্থশালায় একত্র হয়েছি, এইটুকু সময় যদি সুখে সান্ত্বনায় সাহায্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করে যেতে পারি তাহলেই আমি ভাল লোক— নিজের সুখের জন্যে যাকে আমি অন্যায় কষ্ট দেব সেই আমাকে মন্দ লোক বল্‌বে, এবং কোন কূটতর্কের দ্বারা সেটা অপ্রমাণ করতে বসা সঙ্গত বোধ করি না।

কলকাতা। সোমবার। ১৮ই মার্চ্চ [১৮৯৫]

মাঘ মাসের সাধনার[৩] সেই গল্পটা সাধারণতঃ অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভাল লেগে গিয়েছিল— সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা[৪] পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের ভাল লাগা মন্দ লাগা সম্বন্ধে কিছু

৩। "নিশীথে", সাধনা, মাঘ ১৩০১।

৪। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা", সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০১ :—

"সাধনা। মাঘ। "নিশীথে" একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যানকৌশল অকিঞ্চিৎকর; কেবল ভাষার সৌন্দর্য্যে ও বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন ভাষা, এমন অলঙ্কার, নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু অর্দ্ধেক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে "ডাক্তার! ডাক্তার!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে

বোঝবার যো নেই— বুঝলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না— সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে সাহিত্যচর্চ্চা করে সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোন শিক্ষা নেই ; "ভাল লাগিল" বা "ভাল লাগিল না" সে কথা শুনে কোন ফল নেই ;— তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাহলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে কোন লোকের মত মাত্রের কোন মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভাল সমালোচনা নেই— তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই ; তারা সাহিত্যের সৃজনকার্য্যের মাঝখানে বাস করচে না— তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেণ্টিমেণ্ট্ এবং কোন্‌টা সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেকরকমের ভাল লেখা না বেরলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তারপরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভাল সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখ্‌চি, যতই বয়স বাড়চে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্চে— প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীর ভাবে আঘাত করে না— বোধ হয় দুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্চে।

কলকাতা। ২০শে মার্চ্চ। [১৮৯৫]

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়লোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভাল লাগে জানিস্?[৫] ওর চরিত্রে কোনরকম দ্বিধা ছিল না— ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখেনি— ওর একরকম

এই গল্পের সূত্রপাত করিলেন। ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া অত রাত্রে কেন যে তিনি নিজের কাহিনী কহিতে বসিলেন, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণাবাবু রাত্রি আড়াইটার পর যে ভাষায়, যেরূপ অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া নিজের গল্প বলিতেছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক নহে, একজন লোক পূর্ব্বকাহিনী বলিতে বলিতে, সুকবির কবিতার ভাষায়, বহুপূর্ব্বদৃষ্ট প্রকৃতির প্রত্যেক ছবি, সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া, শুভ্র নির্ম্মল চন্দ্রালোক হইতে অন্ধকার, শব্দ, সৌরভ, নিশ্বাস পর্য্যন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতেছেন ;— ইহা ঠিক স্বভাবসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণা বাবু একজন সেন্টিমেণ্টাল কবি হইলে বরং কতকটা মানাইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাকে যাত্রার দলের একজন স্মরণশক্তিশালী অভিনেতা বলিয়া বোধ হয়, লেখক তাঁহাকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, সাধনার পাঠকদের গল্পপিপাসাপরিতৃপ্তির জন্য, তিনি রাত্রি আড়াইটার সময় তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন মাত্র। লেখকের গল্পকৌশলের অভাবে, এবং স্বভাবসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না থাকায়, গল্পটির মুণ্ডপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। আর এতখানি ভাষার ব্যয় কিসের জন্য ? মানবজীবনরহস্যের কোন্ অংশের ছবি আঁকিবার জন্য লেখকের এত প্রয়াস, তাহাও তো স্পষ্ট বোধগম্য হইল না।"

৫। শেলির কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দ্রষ্টব্য— বিশ্বভারতী সম্মিলনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত শেলির মৃত্যু-শতবার্ষিকীর সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা "শেলি"। ভারতী, আশ্বিন ১৩২৯। অভিভাষণটি তাঁহার কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপ ভাল লাগে— তারা সহজ স্বাভাবিক— তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিওরি দ্বারা নিজেকে ভেঙ্গে চুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই— সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়— সে জানেও না সে কাকে কখন্ আঘাত দিচ্চে, কাকে কখন্ সুখী করচে— তাকেও কোন বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারো জানবার যো নেই— কেবল এইটুকু স্থির, যে, ও যা ও তাই, তাছাড়া ওর আর কিছু হবার যো ছিল না— ও বাইরের প্রকৃতির মত স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর— এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধামাত্রহীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে— এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে— কোন দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না— এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মত আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরম রহস্যময়— এরা এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি বলে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করচে। যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা করে' কাজ করে, যারা জানে ভালমন্দ কাকে বলে তাদের সহজে ভালবাসা ভারি শক্ত— তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে কিন্তু তারা অনায়াস ভালবাসা পায় না— তারা আত্মবিসর্জ্জন করতে পারে কিন্তু তারা আত্মবিসর্জ্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি ত আমার অনেক প্রবন্ধে[৬] লিখেছি, মানুষের মননামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য কিন্তু ভালবাসার পাত্র নয়— আসল খাঁটি বড় লোকেরা মনোবিহীন— তারা স্বতস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট— তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্য্য বলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়।

কলকাতা। ২রা এপ্রিল। [১৮৯৫]

আজও সমস্তদিন সেই বক্তৃতাটা[৭] নিয়ে পড়েছিলুম। বাঙ্গলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মত করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়— যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণতঃ কোন বিষয়ে কোন কথা ভাল করে ভাবা অভ্যাস নেই সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়, তার পরে নিজের মনে ভারি একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বারম্বার দেখেছি বাঙ্গালীরা একটা কোন ভাবের সূত্র মনে মনে সহজে অনুসরণ করতে পারে না, তারা একদম ফীলিঙ্গে মেতে উঠ্‌তে চায়— একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিষ ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

৬। যথা, "পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি", সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০০; "অখণ্ডতা" নামে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে সংকলিত।

৭। "বাংলা জাতীয় সাহিত্য", ১৩০১ সালের "২৫ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসবসভায় পঠিত"। 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

কলকাতা। ৪ঠা এপ্রিল। [১৮৯৫]

আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম— সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোন আস্‌বাব নেই— কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বল্লেই হয়— আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখ্‌তে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ— কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাচ্চি এ ঘরে এসে লেখার কোন ব্যাঘাত হচ্চে না— বেশ মন দিতে পারচি। …ঘরে কোন আসবাব না থাকাও একটা মস্ত সহায়। আমি দেখ্‌চি, plain living, high thinkingএর পক্ষে নিতান্তই দরকার— জড় পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড় জিনিষগুলো মনের সঙ্গে কোন মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোন নিত্য নূতন সংবাদ আনয়ন করে না— আস্‌বাব্‌গুলো চিরকালই একরূপ আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে— ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে— আস্‌বাবের মধ্যে চারিদিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখ্‌লে মনটা বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গ[৮]— দের বাগানটিও আমার পক্ষে বড় সুবিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে— এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্‌তকে নির্ম্মল স্নিগ্ধ ঘর থাকে— ঠেসান দিয়ে বসবার মত একটি কৌচ এবং লেখবার মত একটি ডেস্ক থাকে— এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ— ফুটন্ত ফুলের গন্ধ এবং পাখীর ডাক— তাহলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্ত্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও পৃথিবীতে বেশ চলে যায়, এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত্র সুখ পায় না।

কলকাতা। ৬ই এপ্রিল। [১৮৯৫]

আমি যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের হাওয়ার দোহাই দিয়ে কর্ত্তব্য পালনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে থাকিঁ, তার মধ্যে একটু গভীর অর্থ আছে। এক শ্রেণীর কাজ আছে আলস্য যার অঙ্গ— বহুল পরিমাণে আলস্যের থেকে রসাকর্ষণ না করলে সে বাড়তে পারে না। আমার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রকৃতি থেকে মনে হয় আমি সেই জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিলুম— ঘন ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকলে আমার জীবনের যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্ত্তব্য তার ব্যাঘাত হতে পারে। কাজকে কর্ত্তব্যকে গজে মেপে বিচার করা উচিত হয় না,— যদি সেই রকম বিচার করতে হত, তাহলে মাটি চষার কাজ সকলের চেয়ে ফাষ্ট ক্লাশ প্রাইজ্‌ পেত। সাধনার জন্যে, সংসারের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে কাজ করতে করতে এক এক সময় আমার স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজের দাবী উত্থাপন করে— সে বলে, তোমার কাজকর্ম্ম পরে হবে আপাততঃ এই আকাশ এবং বাতাস এবং পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণরূপে রসাকর্ষণ করে নেও। সেটাকে বাইরে থেকে আলস্য এবং কর্ত্তব্যের অবহেলা বলে মনে হতে পারে— কিন্তু যার মন সে জানে এই আলস্যসম্ভোগ তার প্রকৃতির

৮। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাদ্য— এটুকু না হলে তার সমস্ত পত্র পুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে না— শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ হয়েও গাছ উনুন জ্বালাবার কাজে লাগে— কিন্তু সজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্যক। এখন কথাটা কেবল এই যে, যদি মজুরি করার চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠতর কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হয় তবে সেই আমার প্রধান কর্ত্তব্য কি না? শ্রেষ্ঠ কাজ মাত্রই খুব বড় বনস্পতির ন্যায় অনেকখানি স্থান এবং সময় চায়— তাকেই আমি আলস্য বলি, বৈরাগ্য বলি, ধ্যান বলি।

কলকাতা। ১৪ই এপ্রিল। [১৮৯৫]

কাল সমস্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ...অন্য কোন দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম— কিন্তু কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল— আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই তবু কাল একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যাবার মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুতে মনের মধ্যে ভারি একটা অপরূপ কবিত্ববেদনার সঞ্চার হচ্ছিল— ঠিক যেন একটা গান শুনছিলুম এবং মনের মধ্যে যে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোন অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। যতদিন যত কবিতা পড়েছি এবং গান শুনেছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি— তার সমস্ত রস মনের কোন্ এক জায়গায় সঞ্চিত আছে— মাঝে মাঝে এক একদিন কেন তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে কিছুই বুঝতে পারিনে এবং এ রস নিয়ে কি করব, কোথায় কার কি কাজে লাগ্‌বে কিছুই জানিনে— এর কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কোন আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে কিনা তাও বুঝিনে, কিন্তু এর এক অসীমতা গভীরতা এবং রহস্যপূর্ণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এবং এ জিনিষটাকে কিছুতেই অসত্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না— এর মধ্যে যে একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভাল— কলকাতা সহরের জড় আরাম এবং সন্তোষ এর তুলনায় খুব নিকৃষ্ট মনে হয়। কাল রাত্রে জ্যো[৯]—দের ওখানে অ[১০] একটা এস্‌রাজ হাতে করে বস্‌ল, বাইরে বৃষ্টি পড়চে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্চে আমি প্রথমে ভরা বাদর গাইলুন তারপরে গাইলুম আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে— গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ পরিপূর্ণ ছিল নববর্ষাটিও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল— ভাবছিলুম এই যে সুরের এবং ভাবের একটা অপূর্ব্ব রাজ্য এ কি কেবলি আমার মনের? এর অনুরূপ আর কোথাও কিছুই নেই? এ কি কেবলই মরীচিকা?

কলকাতা। ২রা মে। [১৮৯৫]

আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্চে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়ই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্য্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সঙ্গীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্য্যটা কি। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই

৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর?

১০। অভিজ্ঞা দেবী।

ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভাল করে বেজে উঠ্‌লেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠ্‌বামাত্রই এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্ম্মের আলোআঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে, যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মত বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোন তুচ্ছ অংশ হয়ত অপরিমিত বড়, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে কণ্টকিত করে তুল্‌চে, কিন্তু সঙ্গীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কি এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্স্‌পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্যদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মত হয়ে আসে, এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানের পর্য্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মত কানে বাজে— সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সঙ্গীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জ্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজ-বন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সঙ্গীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্‌ মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্‌ মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্যে ভাল গান কিম্বা কবিতা শুন্‌লে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে— সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্য-সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্য্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

পতিসর পথ। ১লা জুন। [১৮৯৫]

অনেকদিনের পরে আমার নির্জ্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারি আরাম বোধ হচ্চে— মনে হচ্চে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বল্‌চে— তুমি এসেচ, তোমাকে দেখে আমি বড় খুসি হয়েছি। নির্জ্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্চে। আজ দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না— রোদ্দুর উঠেছিল কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসটি বেশ মধুর লাগছিল। নদীটি ছোট— দুই তীর ঘাসে সবুজ হয়ে গড়িয়ে এসেছে— গোরু চরচে, মেয়েরা জল তুল্‌চে, গা ধুচ্চে— উলঙ্গ ছেলেগুলো বোট দেখে চীৎকার স্বরে দূরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করচে— ছোটবড় নানাবিধ গ্রাম, তার নানারকমের নাম— দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই, আর ভাবি, যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্ত্তের ছবি-মাত্র— কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী— যারা ঐ জলে নেমে স্নান করচে এবং ডাঙ্গায় বসে বাঁখারি ছুলচে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্‌ একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে— সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি— সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্ত্তি লোকরা তাদের সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী— এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব্ব এবং অসামান্য তা বল্‌তে পারিনে— কিন্তু তবু এরকম করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে— আমরা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোট সেইটে ভাল করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা

হয়ে এসেছে— দুই ধারের গ্রাম আপন আপন ঘরে প্রদীপ জেলে নিভৃত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে— গল্প করচে, তামাক খাচ্চে, ঘুমচ্চে, কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাঁড় ফেলে ঝুপ্ঝুপ্ শব্দ করে চলেছে, দুধারের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

পতিসর। ৩রা জুন। [১৮৯৫]

এমন সময় "গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া"[১১]— যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। বাতাস কখনো পূব দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আস্চে— বৃষ্টি যেন এক[illegible]রে ছিটেগুলির মত বিষম জোরে ছট্ ছট্ শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করচে··· বাত[illegible] জন্তুর মত সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোঙ্রাচ্চে। ···বিদ্যুৎ এবং বজ্রেরও বিরাম নেই। আমার জান্লা সার্সি সমস্ত বন্ধ— কেবল যেদিকে বাতাস নেই সেই দিককার একটি খড়খড়ি খুলে মেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখ্চি। বর্ষাটা এমনি জমে এসেচে, যে, ইচ্ছে করচে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই— কিন্তু পদ্যে লিখ্তে বস্লে বোধ হয় লেখা শেষ হবার পূর্ব্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে ত আর অক্ষর মিলিয়ে চল্তে হয় না। এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখ্তেও বেশ। তাই লিখ্তুম— কিন্তু পাশে শৈ[১২]— বসে আছে— কেউ কাছে বসে থাক্লে লেখা হয় না। কিন্তু মনের ভিতর ভারি একটা উল্লাস হচ্চে— এই ঝড়ের আঘাতে মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জ্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠ্চে— একটা কিছু করতে ইচ্ছে করচে, নিদেন খুব সুখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাব্তে ইচ্ছে করচে— নিদেন খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিম্বা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে— কত মেঘলার দিন, কত তেতালার ছাতের উপরকার আকাশ, কত পূর্ব্বস্মৃতি মনের ভিতর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মত হু হু করে উড়ে যাচ্চে!

পতিসর। ৬ই জুন। [১৮৯৫]

তারপরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখ্তে বসেছিলুম— মাস ত প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপূর্ব্বক এইমাত্র লেখা শেষ করে ফেল্লুম। এখন সাতটা বেজে গেছে— কিন্তু এখন গ্রীষ্মের বেলা খুব দীর্ঘ; তাই এখনো সূর্য্যালোক বেশ স্পষ্ট আছে। যতক্ষণ একটা লেখা চল্তে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে— সেটা শেষ হয়ে যাবামাত্রই আবার একটা নতুন বিষয়ের অন্বেষণে নিতান্ত দিশেহারার মত লক্ষ্মীছাড়ার মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়।···এত চিন্তা করে চেষ্টা করে কষ্ট সয়ে একজনকে লিখ্তে হয়, অথচ পাঠকেরা কতই অবহেলার সঙ্গে মূঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সে জন্যে আক্ষেপ করা কাপুরুষতা, অনেক সময়েই করিনে— কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলায় শরীর মনকে ক্লান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একটা ক্ষণিক ঔদাস্যের হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না— রণে ভঙ্গ দিয়ে খ্যাতিহীন নির্জ্জনে আপন মনের মত কাজ এবং মনের মত বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখ্তে ইচ্ছে করে। মানুষের পক্ষে মানুষের জনতার মত এমন শ্রান্তিজনক আর কিছুই নেই— প্রকৃতির উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমাত্র বিশ্রামের স্থান— আর সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আনে।

১১। 'কালমৃগয়া'র একটি গানের প্রথম ছত্র।

১২। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

মণ্ডনশিল্প

শ্রীনন্দলাল বসু

মুলনীতি

গহনা, কার্পেট, আল্পনা, পোশাকের উপর সুতার কাজ, লিপিরঞ্জন (illumination) প্রভৃতি মণ্ডনশিল্পের দৃষ্টান্তস্থল। সংক্ষেপে বলা যায়, সাজানোই এর প্রধান লক্ষণ।

শিক্ষার্থীদের যাতে মণ্ডনশিল্পের ধরন বোঝবার এবং ভালো কাজ করবার সুবিধা হয়, এমন কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্বভাবের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন রূপ (form) ও ছন্দ (movement) লক্ষ্য ক'রে মূল সূত্রগুলি নির্ণয় করা যাচ্ছে। বক্তব্য বিশদ করবার উদ্দেশ্যে A, B প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট কতকগুলি চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

যে কোনো ডিজাইনে বা অলংকারে দুটি দিক আছে: প্রথমতঃ তার বাইরের আকৃতি (A)। দ্বিতীয়তঃ তার ভিতরের শৃঙ্খলা বা বিভাগ (B)।

প্রত্যেক রূপ বাইরের দিকেও যেমন নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধা, ভিতরের দিকেও তার নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে (C)। শিল্পী ইচ্ছাক্রমে একটি রূপের বাইরের আকৃতির সঙ্গে অন্য একটি রূপের ভিতরের শৃঙ্খলা যোগ করতে পারেন (D)।

বহুদিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ছন্দ বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালাই হয়ে ক্রমশ বৈচিত্র্য হারায়। নূতন মণ্ডনশিল্পের রচনাকালে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যে নূতন করে স্বভাবকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

তবু আবার অবচ্ছিন্ন (abstract) রূপ ও ছন্দ নিয়েই শিল্পীর সৃষ্টিকার্য ও বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক কাজের বোধ সুগমতর হয়। কারণ, অবচ্ছিন্ন রূপ ও ছন্দের ভিতর দিয়ে দেখলেই স্বভাবের বহুবিচিত্র জটিলতা সরল ও বিশদ হয়।

একটি পানের পাতার আর একটি অশ্বত্থপাতার অবচ্ছিন্ন রূপ প্রায় একই; তারই উপরে প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (E)। শিল্পী এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদের জ্ঞান থেকেই নূতন নূতন মৌলিক সৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন। নইলে মোটামুটি টাইপগুলি নিয়েই নাড়াচাড়া করলে কাজ প্রাণহীন কসরতে দাঁড়ায়।

এ প্রবন্ধে রূপ, ছন্দ এবং আলোছায়ার যথোচিত প্রয়োগ সম্বন্ধেই আলোচনা করা গেল। যেহেতু রঙ প্রধানতঃ হৃদয়াবেগব্যঞ্জক, তা নিয়ে বিশদ ও স্বতন্ত্র আলোচনা করাই ভালো।

মণ্ডনশিল্পের রচনা হল আসলে রূপ ও ছন্দ নিয়ে। আনুষঙ্গিকভাবে অন্য দুটি বিষয়েরও জ্ঞান প্রয়োজন: তাল বা যতি (pause) এবং ওজন (balance)।

যথোচিত বিন্যাস, আলোছায়া এবং ছন্দবেগের হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে রচনার তাল নির্দিষ্ট হয় (F)। অন্যথা শিল্পরচনা জবরজঙ্গ এবং বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হয়ে পড়ে। তাল ঠিক থাকে কখনো বা যথাস্থানে ফাঁক
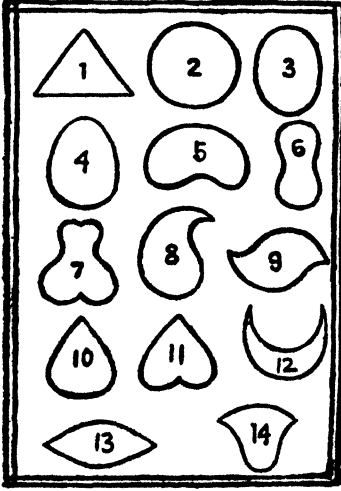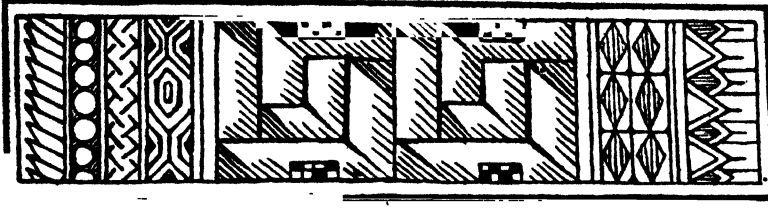
A : 1 ত্রিকোণ 2 বৃত্ত 3 বর্তুল 4 ডিম্ব 5 বরবটীবীজ 6 পদ্মবীজ 7 লাউ 8 কল্কা 9 শঙ্খ 10 পাতা 11 পান 12 শশীকলা 13 যব 14 পদ্মমণি
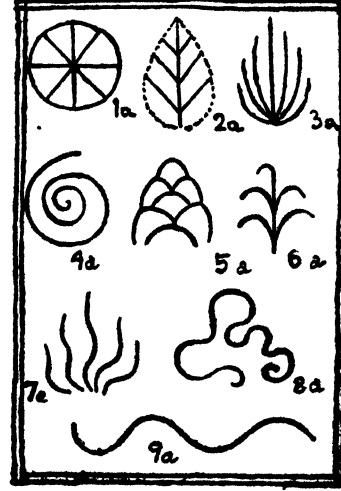
B : 1*a* চাকা 2*a* পাতা 3*a* শর 4*a* আবর্ত 5*a* আঁশ 6*a* ঘাস 7*a* শিখা 8*a* মেঘ 9*a* লতা

লেখক কর্তৃক অঙ্কিত।

পদ্ম : ভাস্কর্যে প্রয়োগ। লেখক কর্তৃক কল্পিত ও অনুকৃত।

পদ্ম :　ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে ও ধাতুমূর্তি নির্মাণে প্রয়োগ।　পরম্পরাগত শিল্পকীর্তি হইতে লেখক কর্তৃক অনুকৃত।

পদ্ম : প্রাচীন চিত্রে প্রয়োগ। লেখক কর্তৃক অনুকৃত।
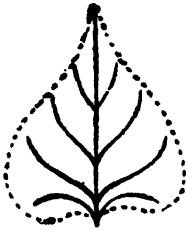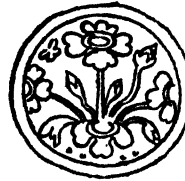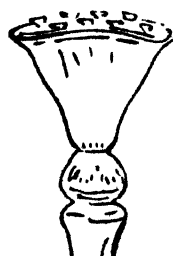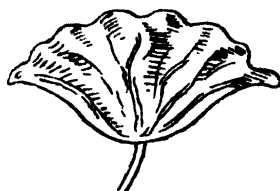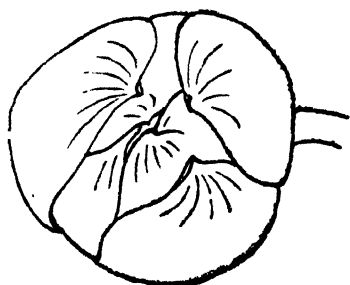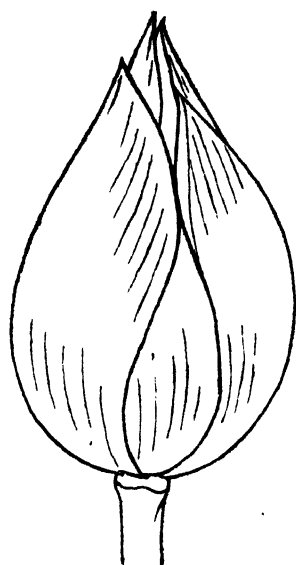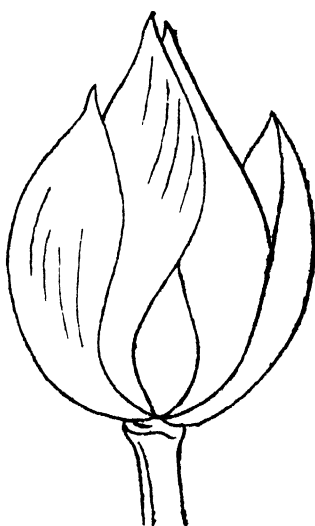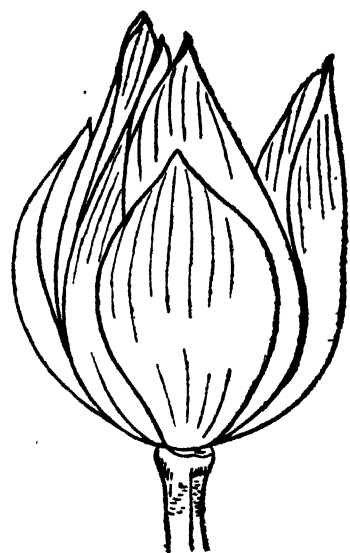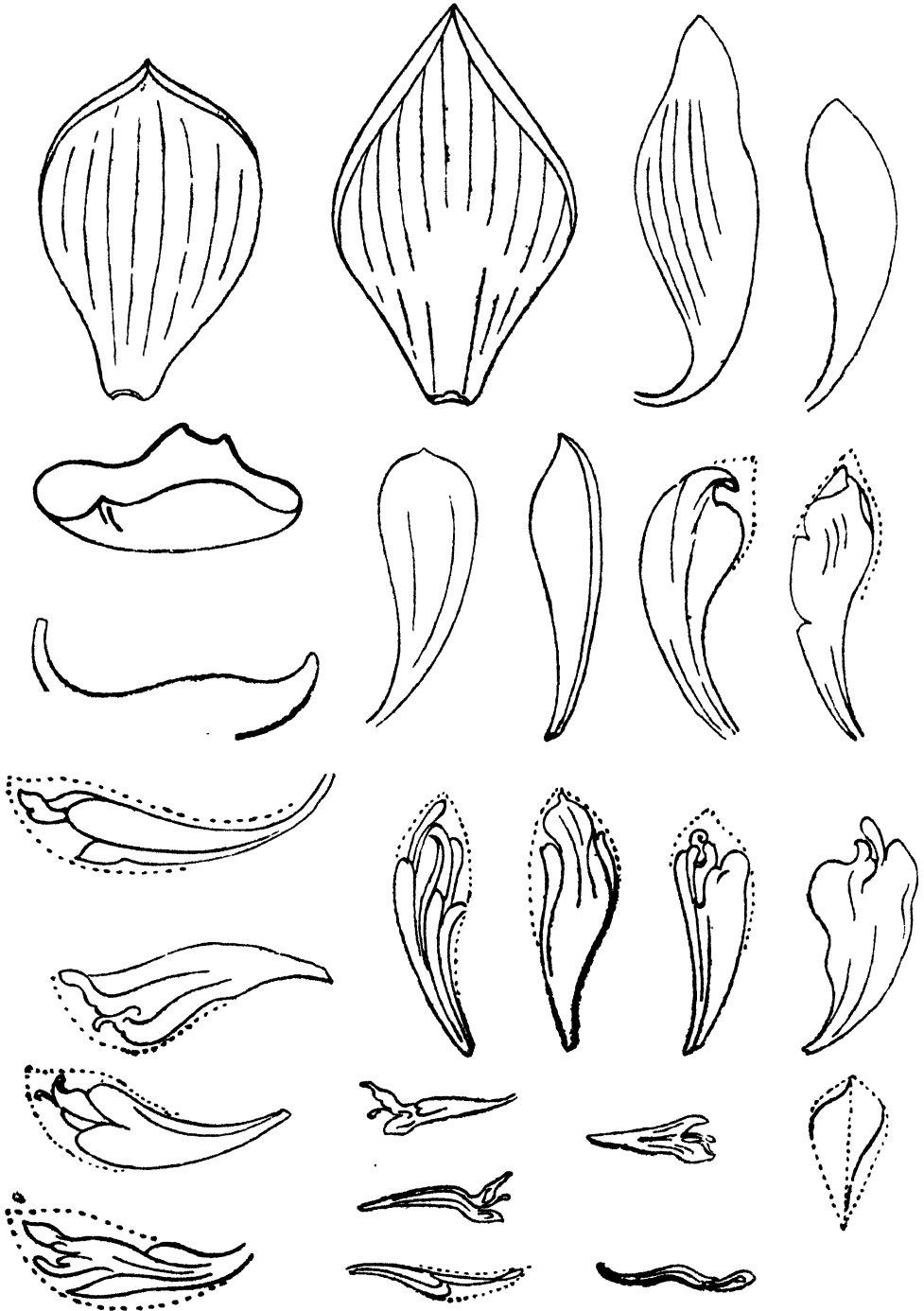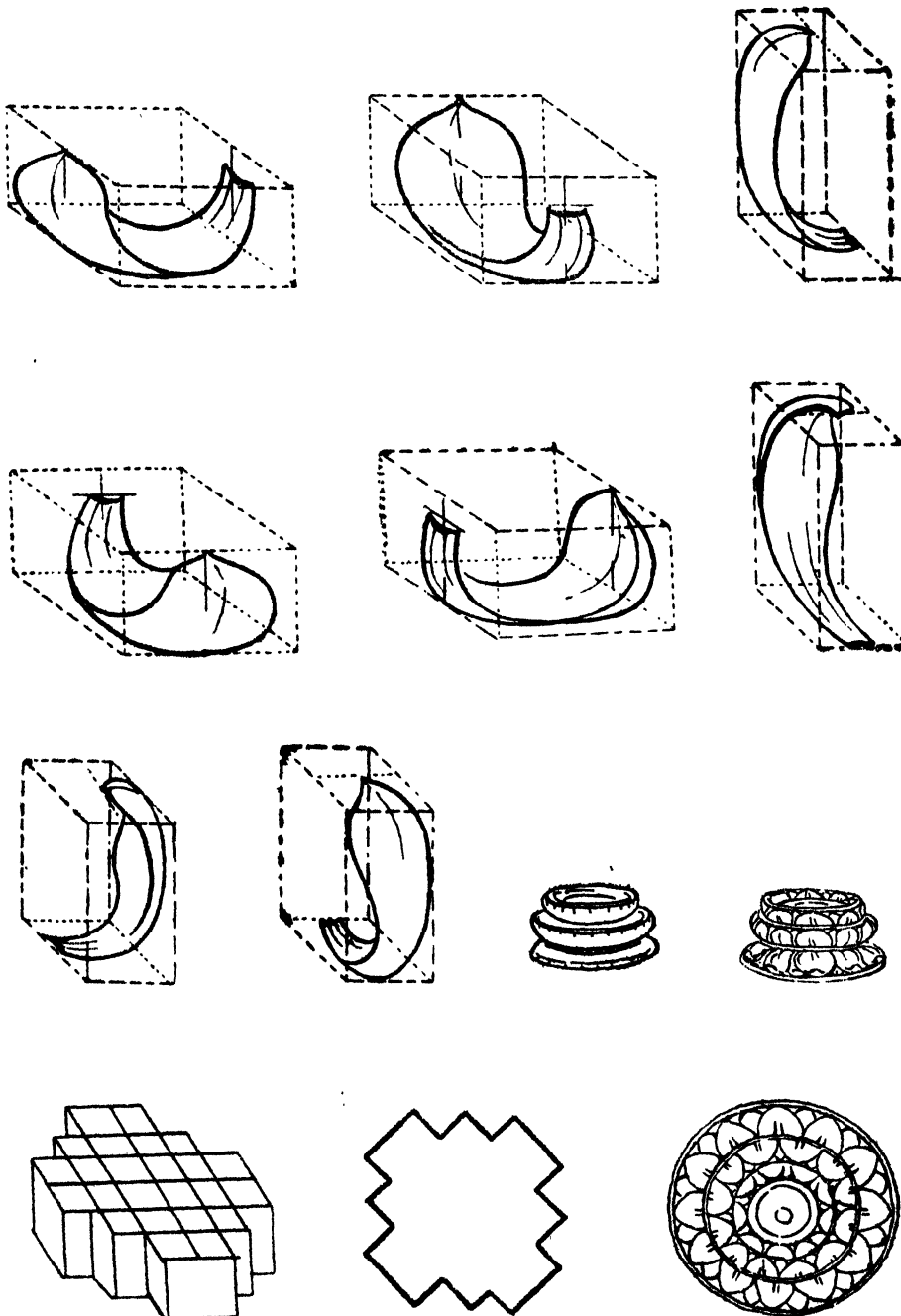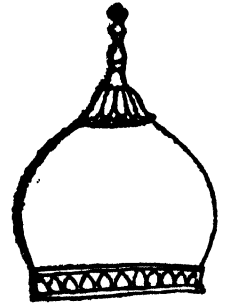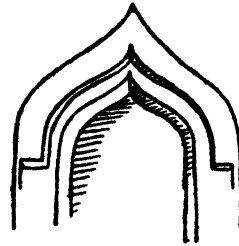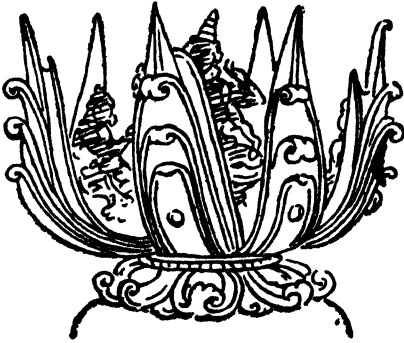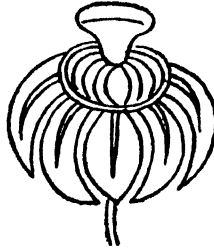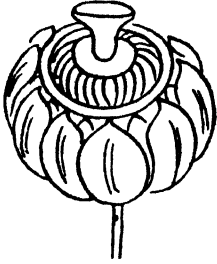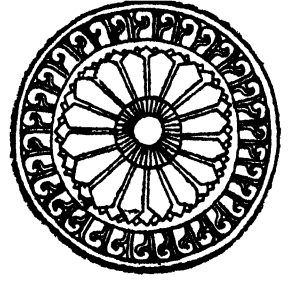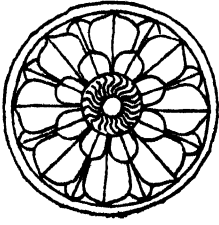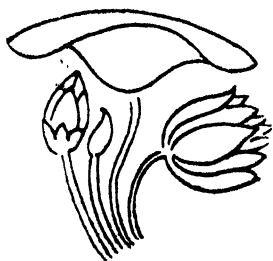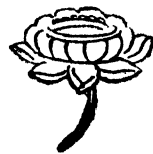
অতঃপর বর্তমান লেখকের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় লব্ধ জ্ঞান থেকে এ দেশের মণ্ডনশিল্পে পদ্মের বহুল প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। শিল্পের উপাদান বদল হওয়ামাত্রই রূপেরও ছাঁদে কিছু না কিছু বদল সুনিশ্চিত। এজন্য একই পদ্ম থেকে এমন বহুবিচিত্র অলংকার-কল্পনার উদ্ভব হয়েছে।

পঞ্চ প্রতীক ও আলংকারিক রূপ

আমাদের দেশের মণ্ডনশিল্পে এ-দেশে-সুলভ ফুলফল প্রভৃতির যে বিচিত্র প্রয়োগ হয়েছে কয়েকটি মৌলিক রূপ বা টাইপে নিবদ্ধ ক'রে তাদের বিশদ পরিচয় নেবার চেষ্টা করা গেছে। এ কথাও বলা হয়েছে, প্রাণবান নূতন পরিকল্পনার জন্যে নূতন করে স্বভাবের অনুশীলন দরকার, নইলে কেবল বাঁধাধরা ছকে বা ছাঁদে নির্ভরশীলতা সৃজনপ্রতিভার পায়ের বেড়ি হয়ে উঠবে।

এই আলোচনারই সূত্রে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে পঞ্চভূতের যে পঞ্চ প্রতীক কল্পনা করা হয়েছে সেইগুলিই আমাদের সমস্ত আলংকারিক কল্পনার মূলে রয়েছে। পরবর্তী ছবিতে ও ব্যাখ্যায় এ কথা বিশদ হবে। এও মনে রাখতে হবে যে, সর্ববিধ সৃষ্টিকার্যে মূলতত্ত্বে ফিরে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়; মূল ঐক্যকে অনন্ত বৈচিত্র্যে রূপায়িত করাই লক্ষ্য।

প্রথমতঃ পৃথিবী। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে পৃথিবীর প্রতীক হল ঘনক বা কিউব; সমতলক্ষেত্রে তারই প্রতিরূপ হচ্ছে চতুষ্কোণাকার। সমুদয় ভূতের মধ্যে পৃথিবীরই স্থিতি অনন্যনির্ভর বলে মনে হয়। অতএব, প্রতীক হিসাবে কিউবের কল্পনা যথাযথ। পাথরের জালিকাজ বা অনুরূপ কাজের পক্ষে কিউবই হল আশ্রয়; স্থায়িত্ব ও ঘনত্বের বিগ্রহ হিসাবে অস্থির রূপপ্রবাহের উপযুক্ত সীমা।
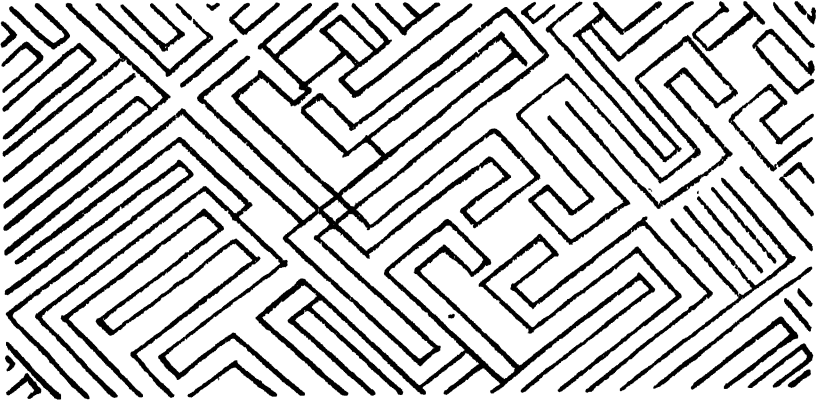
দ্বিতীয়তঃ জল। জলের প্রতীক গোলক। সমতল ক্ষেত্রে তাই বৃত্তে পরিণত হয়। বিশেষ আশ্রয়ের অভাবে জল বৃত্তাকার বিন্দু রচনা করে; আশ্রয়ভেদে তথা বিভিন্ন বাধা পেয়ে এর আকারের বদল

হয়। ভূমিতে প্রহত হয়ে জল বৃত্তময় আবর্ত রচনা করে। বায়ুর আঘাতে হয় তরঙ্গায়িত। যুগপৎ তরল ও ভারি বলে এর গতির রেখা সর্বদা নিম্নাভিমুখী। তিব্বত প্রভৃতি দেশে গুটানো পর্দায় যে ছবি আঁকা হয় তাতে এই-জাতীয় রূপরেখার বহুবিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ আগুন। আগুনের প্রতীক হ'ল শঙ্কু, বা সমতলগত হলে ত্রিকোণ; কতকটা উর্ধ্বমুখ ফুলের কলি বা কলার মোচার মতো তার রূপ। নিষ্কম্প শিখাকে এইরূপই দেখা যায়। বাতাসের তাড়নায় আগুনের শিখা নানা তরঙ্গে ও আবর্তে ধাবিত হয়; কিন্তু জলের মতো নয়, উল্লেখযোগ্য ভার না থাকাতে এর রূপের রেখাসমুদয় উর্ধ্বগামী।

চতুর্থতঃ বায়ু। বাতাসের প্রতীক অর্ধচন্দ্র, বাতাসের সংস্পর্শে জলে মাটিতে সর্বদাই যে রূপ অঙ্কিত হয় তারই ইঙ্গিত করে। বাতাস সদাগতি, কিন্তু অদৃশ্য বলেই আপনার আকার রচনা ক'রে দেখায়

ধূলিতে বালুতে জলে বাষ্পে। মেঘের বিচিত্র ভঙ্গীতে বাতাসের বহুরূপী আবর্ত ও ঢেউ বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। উর্ধ্বগতি কম্বুরেখা (ascending spiral) এর লঘুত্বের সাক্ষ্য।

পঞ্চমতঃ আকাশ। আকাশের অর্ধেকটা আমাদের মাথার উপর দৃশ্যগোচর, অপর অর্ধেক অদৃশ্য। আকাশের প্রতীক কতকটা ডিম্বাকৃতি। আকাশ বলতে সর্বাশ্রয় ও নিরাকার দেশকেই বোঝায়। সকল বস্তুর তথা রূপের আশ্রয়স্বরূপ হওয়ায় গুম্বজের মতন শূন্যরূপে একে ধারণা করাই সংগত। যে কোনো নক্সার রেখাঙ্কণের ভিতরে ও বাইরে যে ফাঁক, রূপরচনার সার্থক সৌন্দর্যের পক্ষে যা রেখার মতোই অপরিহার্য, নক্সার ক্ষেত্রে তাকেই খণ্ড খণ্ড আকাশ বলা যেতে পারে।

কাব্য
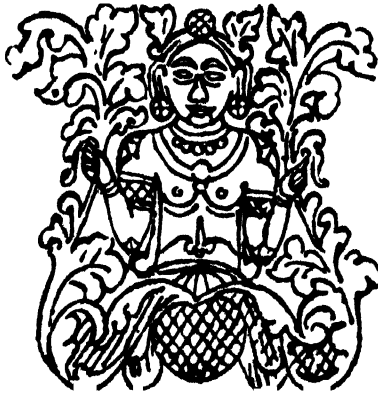
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রায় মাসাবধি কাঁচা খাইয়া, পোড়া খাইয়া, অর্ধভুক্ত থাকিয়া, কোনো কোনো দিন বা একেবারে অভুক্ত থাকিয়া অনেক কষ্টে একটি পাচক-ঠাকুর জোগাড় হইল। নিজের হাত-দুখানির দিকে চাহিবার ফুরসৎ হইল একটু; চোখ ফাটিয়া জল আসে; পোড়া পেটের গোলামি করিতে কাটিয়া, হাজিয়া, পুড়িয়া একসা হইয়া গেছে: কুটনা কোটা, ফেন গালা, ডাল সাঁতলানো, সবকিছু ঐ দুটির উপর দিয়াই তো গেল।

যাই হোক, লোকটি পাওয়া গেছে ভালো। প্রথমত, এখানকার লোক নয়। মাস-ছয়েক এখানে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় লোক রাখিবার আর প্রবৃত্তি নাই; যেমন অলস, তেমনি অকর্মণ্য, আর বাড়ি যদি নিকটে হইল তো আমার এক মাসের ভাঁড়ার পনের দিনে নিঃশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিবে; শুধু চালডালই নয়, তেল নুন হলুদ তেজপাতা কিছুই বাদ পড়িবে না। সমস্ত দোষ চাপাইবে ইঁদুরের উপর। যদি বলি, 'ইঁদুরের তেল নুন তেজপাতায় সঙ্গে কি সম্বন্ধ?' উত্তর হইবে, আমি পুবের লোক, এখানকার ইঁদুরকে চিনি না।

দ্বিতীয় সুবিধা এই দেখিলাম, লোকটির বয়স হইয়াছে, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর হইবে। আশা করা গেল শখটখের বালাই থাকিবে না, আমার সাবান মাজন মাথার তেল অনেকটা নিরাপদ থাকিবে। তৃতীয় পাচক যে রাখিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম, সে রাত্রে আমার সিল্কের পাঞ্জাবী আর পম্প্‌সু-জোড়া পর্যন্ত নিজের দখলে রাখিত। এ লোকটা সাদাসিধে, দাড়িগোঁফ মাথার চুল সব ক্ষুর দিয়া কামানো, এদিকে বুকপিঠ কালো কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ভরা; অর্থাৎ চুলের যে বিভাগ লইয়া শৌখিনি করা চলিত তাহার গোড়া মারিয়া দিয়াছে, যে বিভাগ শৌখিনির পরিপন্থী সেটাকে রাখিয়াছে জিয়াইয়া।

আর একটা কথা, লোকটার বাড়ি বলিল ছাতনার কাছে একটা গ্রামে। ছাতনা চণ্ডীদাসকে লইয়া টানাটানি করে। সত্যমিথ্যা যাই হোক, লোকগুলার মনে একটা ছাপ আছেই। কবির দেশের লোক, কেমন একটা শ্রদ্ধা হইল; বিশ্বাস হইল অসময়ে দাগা দিবে না: জিনিসটা মূলে তো একই, প্রেয়সীর দিকে গেলে বলি প্রেম, মনিবের দিকে গেলে বলি প্রভুভক্তি।

এর উপর একবেলা পরীক্ষায় বুঝিলাম, রাঁধেও খাসা।

২

বর্ষাকাল। এদিকে কটা দিন অসহ্য গুমট গেছে, তাহার উপর স্বপাকের পালা; গুমট, আগুনের তাত, তাহার পরে আবার উদরেও হুতাশনের প্রদাহ, কি করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। যাক, এবার বিধি প্রসন্ন। সকালেই গোপীনাথকে পাওয়া গেল। বেশ রাঁধিয়াছিল, রাত্রে আরও ভালো,— দেখিয়া-শুনিয়া লইবার সময় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চিন্ততা, তাহার সঙ্গে পেট পুরিয়া ভালো আহার, গুমটের ভাবটা আর বুঝিতেই দেয় নাই। পরের দিনটি আরও চমৎকার। সকালে উঠিয়া দেখি কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেছে, কোনোখানে এতটুকু ফাঁক নাই। তবুও কিন্তু বিরাম নাই, মেঘের এক-একখানা পাতলা স্তর খুব লঘুগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, মনে হইতেছে, আয়োজনে কোথাও যদি একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে সেটুকু সারিয়া

লইয়া একেবারে পূর্ণ উদ্যমে বৃষ্টি ঢালিবে, মেঘমহলে তাহারই এই অতিব্যস্ততা। এতটুকু আওয়াজ পর্যন্ত নাই, ধীরসঞ্চারে সমস্ত আকাশপথ ব্যাপিয়া সারারাত ধরিয়া এই এতবড় আয়োজনটা হইয়াছে। রাত্রে এক-আকাশ নক্ষত্র দেখিয়া শুইতে গিয়াছিলাম, সকালে চোখ খুলিয়াই মনে হইল, একটা জাদু হইয়াছে,— কোথায় ছিলাম, রাতারাতি কে আমায় অন্য কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার বাসাটি ঠিক কাঁসাই নদীর ধারে। নদী, তাহার পরেই একটা বাঁধ, তাহার পরেই আমার বাসা। মাঠকোঠা, তবে একটু নূতন ধরনের ; ঘরের সামনে-পিছনে ওরই মধ্যে একফালি করিয়া বারান্দা-গোছের আছে। এটা দেখিতেছি এখানকার স্টাইল।··· এদিকে শুকো গেছে, কিন্তু ছোটনাগপুরের পাহাড়ে নিশ্চয় বর্ষা নামিয়াছে ; গৈরিক রঙের বেগচঞ্চল জলে কাঁসাই নদী টলটল করিতেছে। নদীর ওপার থেকেই ঢেউখেলানো জমি,—নামিয়া উঠিয়া নামিয়া উঠিয়া কতদূর চলিয়া গেছে— একেবারে বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকরেখা ঘেঁসিয়া কালো মেঘের নিচে তরঙ্গায়িত ঘননীলের রেখা— ময়ূরভঞ্জের পর্বতশ্রেণী।

বহুদিন পরে একটি মুক্ত আলস্যে আমার মনটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেদিন আবার আমার সাবরেজেস্টারি আপিসের ছুটি, তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিনটি দেখা দিয়াছে, একটি ক্যাম্বিসের চেয়ার বাহির করিলাম, তাহার উপর শরীরটা এলাইয়া দিয়া সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম।·· আগের দিনটি গোপীনাথকে আনিয়া দিয়াছিল, সেদিন আমি যেন নিজেকে নিজের কাছে ফিরিয়া পাইলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, অবিরাম রান্নাঘরের চিন্তা আমার মধ্যেকার যে মানুষটিকে দেশছাড়া করিয়াছিল, মেঘসঞ্চারেরের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে একটা অপরিসীম ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এমন কি মনে হইল, সদ্য-সদ্যই কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া যাই।

গোপীনাথ চা লইয়া আসিল। আমার মন তখন এতটা তরল অবস্থায় যে ইচ্ছা হইল গোপীনাথের সঙ্গেও এই দিক্‌প্রসারিত সৌন্দর্য লইয়া দুটো কথা কই। এই সব নির্বান্ধব দেশে যে-লোকটিকেই একটু কাছে পাওয়া যায় তাহার কাছেই যেন মনটাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করিয়া এইরকম দিনগুলিতে। কিন্তু ওর মুখের পানে চাহিয়া আর উৎসাহ রহিল না। মুখের প্রতি রেখাটি কঠিন, দৃষ্টি একেবারে ভাবলেশহীন, আর মাথার মাঝখান থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডলটাই রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকা। চাকরি লইবার সময় গোপীনাথ একটু দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা সাতপুরুষ ধ'রে রাঁধা করচি, বাবুমশয়, ঈতে হট্‌বো নাই বটে।"

তবু চণ্ডীদাসের দেশের লোক, লোভ সম্বরণ করা গেল না, বলিলাম, "মেঘের অবস্থা দেখচ গুপীনাথ? কি মনে হয়?"

গোপীনাথ তাহার মাছের মতো ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি মনে হয়— একটা কথা বটে।···আজ খিচুড়ি চাপাই, বাবুমশয়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে।"

এর পরে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না।

গোপীনাথই কিন্তু আমার মনের তন্ত্রীটাকে বর্ষার সুরে যেন আরও ভালো করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। বিশ্বের যত বিরহিণী তাহাদের জন্য আমার মনটা আরও বেশি করিয়া আতুর হইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের এই ট্রাজেডি,— বর্ষা আসে, নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তার বেদনা জাগে, কিন্তু সে-বেদনার প্রতিবেদন জাগে না কোনোখানেই।··· বিশ্বের যত পুরুষ সবাইকেই যেন আমার গোপীনাথ বলিয়া মনে

হইল, কর্মব্যস্ত, বিরস, এমন বর্ষার দিনেও তাহার মনকে দ্রব করিতে পারে না। পুরুষের বিরহ লইয়া যত কাব্য সব আমার কাছে নিরর্থক অলীক বলিয়া মনে হইল। পুরুষের বিরহব্যথা বলিয়া কোনো অনুভূতি হয় না, খুব বেশি হয় তো একটা সাময়িক অভাববোধ, সাময়িক আর নিতান্তই শারীরিক।... আমি যেন স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলাম দেশ-দেশ জুড়িয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বেদনার প্রলেপের মতো এই সুনিবিড় মেঘাবরণ, তাহারই ছায়ায় যত অন্তঃপুরের বাতায়নে যত প্রোষিতভর্তৃকার ব্যাকুল নয়ন; এই আকাশের মতোই স্তিমিত, সজল। অথচ যাহাদের জন্য ব্যাকুলতা সেই পুরুষেরা কিন্তু সবাই নির্বিকার, তাহাদের অনবসর পরুষ জীবনে বর্ষা যদি নিতান্ত কোনো সুখস্মৃতির আলোড়ন তোলেই তো সে খিচুড়ির, তাহার বেশি ভাবিবার ক্ষমতাই নাই পুরুষের।

আমার মনে হইল মেঘদূতের যক্ষও আ[illegible]ক মাসের ভাঁড়া প্রিয়ার হাতের খিচুড়ির কথাই ভাবিয়াছিল, সেই দুঃখ আর লজ্জার কথাটা চাপা দিতেই [illegible]জপাতা কি-ত আড়ম্বর।

দুপুরের আগেই বৃষ্টি নামিল।

খিচুড়িই রাঁধিয়াছিল গোপীনাথ, আমার কাছে কোনো উত্তর না পাওয়ায় নিজের কেরামতি দেখাইবার জন্য বোধহয় বেশি মনোযোগ দিয়াই রাঁধিয়াছিল। বেশ পরিতৃপ্তিতে আহার করিয়া আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম।

এখানে বর্ষার রূপই অন্যরকম। আমাদের ওদিকে ঘন গাছপালার জন্য এ রূপটি খুলিতে পায় না, প্রতি পদেই বাধা পাইয়া বর্ষা যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়ে। ধারাপাতও খুব প্রবল, একটি হালকা হাওয়ায় অল্প একটু তির্যক রেখায় নামিয়া আসিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মনে হয় যেন ধারাগুলির আদি অন্ত সমস্তটাই দেখা যায়। ক্রমে শীকরবৃদ্ধির জন্য চারিদিক অল্প অল্প করিয়া ঝাপসা হইয়া আসিল, ক্রমে বেশি,— দূরে ময়ূরভঞ্জ পাহাড়ের নীল রেখা মুছিয়া গেল, তাহার পর আরও কাছের ঢেউ-খেলানো জমি, তারপর কাঁসাইয়ের ওপারের তটরেখাও। কতক্ষণ গেল, কাঁসাইয়ের জল আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একসময় হাওয়াও উঠিল মাতিয়া, শুকোর সময় যেমন ধূলিরাশি লইয়া মাতামাতি করে ঠিক তেমনিভাবেই কুয়াশার মতো জলের কণা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। একটুর মধ্যেই সমস্ত কাঁসাই নদীটাও দৃষ্টিপথ থেকে মুছিয়া গেল।

আমার মন থেকেও মুছিয়া গেল আর সবকিছুই, জাগিয়া রহিল শুধু এই বিক্ষুব্ধ বর্ষা আর যত বিরহিণীর হৃদয়ের এমনই বিক্ষুব্ধ বিরহবেদনা। কখন কাগজকলম আনিয়াছি, কখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সাড়ও হয় নাই।... সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিল।

৩

যখন অকালসন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক মলিন হইয়া আসিয়াছে, একটি বিপর্যস্ত ছাতার মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে ললিতবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম।

ললিতবাবু এখানকার স্কুলের গ্রাজুয়েট শিক্ষক। থানা, সাবরেজেস্টারি আর স্কুল লইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র কলোনিটির মধ্যে এই একটি লোকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হইয়াছে,— শুধু অন্তরঙ্গতা বলিলে সবটা বলা হয় না, আমরা এত নিগূঢ়ভাবে পরস্পরকে পাইয়াছি যে পরস্পরের ভরসাতেই এখানে টিকিয়া আছি বলা চলে।

প্রকৃত রসিক আর দরদী লোক। এদিকে আমার সমবয়সী; যখনকার কথা হইতেছে তখন তাঁহারও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কাজেই আমাদের আলাপ-আলোচনা বা ভাবের আদানপ্রদানের মধ্যে কোনো অন্তরালের প্রয়োজন ছিল না।

পুলকিত হইলেও একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজই চলে এলেন যে!"

হিন্দু-মুসলমানের পর্ব এবং আরও দু-একটা কি মিশাইয়া উঁহাদের স্কুলের সপ্তাহখানেকের ছুটি যাইতেছে, ললিতবাবু বাড়ি গিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হয় নাই অথচ ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ললিতবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "টুইশন আছে যে, মাস্টারের জীবন…"

হাতে পাইয়াও এমন বর্ষার দিনে যে নীরস উদরসংস্থানের জন্য ছাড়িয়া আসিতে হইল এর সমস্ত বেদনা ঐ কয়টি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল; আমি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহার পর অবশ্য দু-একটা হালকা রহস্যালাপ হইল, কিন্তু প্রথম আলাপের ঐ বেদানাটুকুই আমাদের সব আলাপ-আলোচনার মূল সুর হইয়া রহিল সেদিন। হইবার কথাও তো,—বর্ষা আমার মনে ঐ সুর তুলিয়াছিল, ললিতবাবুও ঐ সুরেরই বেদনা বাড়ি থেকে বহন করিয়া আনিয়াছেন, সম্ভব কি ও সুরকে আসরছাড়া করা?

অন্য একটি ক্যাম্বিসের চেয়ারে ললিতবাবুও শরীর এলাইয়া দিলেন। প্রথমটা একটু আলাপের চেষ্টা চলিল, নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এই যে দুজনেই একভাবে অভিভূত হইয়া গেছি এটাকে যেন কতকটা চাপা দিবার জন্যই। তাহার পর মৌন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল; তাহার পর অন্তর যখন কাঁসাই নদীর মতোই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আমরা দুজনেই একেবারে মুখর হইয়া উঠিলাম। অন্য একটু কারণও ছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগৎটা লুপ্ত হইয়া গেল আমাদের কাছে, জাগিয়া রহিল শুধু হাওয়ার সন্‌সনানির সঙ্গে বর্ষণের শব্দ আর ভেকের কলরব মিলিয়া এক বিচিত্র ঐকতান।

আপিসের পিয়নটাই চাকরের কাজ করে, আলো দিয়া গেল। ললিতবাবু বলিলেন, "নাঃ, এমন রাত্রিটাকে 'সেলিব্রেট্' করতেই হবে শৈলেনবাবু, নৈলে আপসোস থেকে যাবে; আপনার কবিতার বইগুলো বের করুন, রবিবাবুর আর যার যার আছে। এসরাজটাও বাঁধুন।"

আমাদের রীতিমতো কাব্যে পাইয়া বসিল। গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, ললিতবাবু এখানেই আহার করিবেন।

৪

কিন্তু এটা আমার বর্ষার গুণকীর্তন নয়, কাব্যের বিড়ম্বনার ইতিহাস। সেই সিক্ত বর্ষারাত্রে কাব্যের হাতে অমন নিরবশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম এইবার সেইটুকুই বলিয়া শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ পড়া হইল, কবিবরের বর্ষার কবিতাগুলি আমার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ললিতবাবু সুকণ্ঠ— যেমন গানে তেমনি আবৃত্তিতেও, বর্ষার মন্দ্রের সঙ্গে ছন্দ আর ধ্বনি মিলাইয়া একটি একটি করিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া চলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া নিজের সমস্ত সত্তাকে সেই দ্বৈত-সংগীতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া অন্য কবিদেরও বাছা বাছা কবিতা পড়া হইল।…

বাহিরে অন্ধকারের রন্ধ্র-রন্ধ্র সিক্ত করিয়া অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের শব্দ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে, যত বিরহিণীর হাহাকার সঞ্চিত করিয়া লইয়া দিকে দিকে দিতেছে ছড়াইয়া।··· অন্য কবিদের শেষ করিয়া আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়া আসিলাম।

এ পর্যন্ত বোধহয় তেমন ক্ষতি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া বৈষ্ণব কবিদের লইয়া পড়িয়াছি, কয়েকটি পড়া শেষ হইয়াছে, ললিতবাবুর আবৃত্তির মধ্যে গীতের আমেজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় গোপীনাথ আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আয়োজন করা হবেক, আজ্ঞে?"

আমরা আলো-জ্বালার পরই ঘরে আসিয়া বসিয়াছি; মনে হইল যেন গোপীনাথ খানিকক্ষণ থেকে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ হয় আমাদের পড়ায় বাধা দিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহার পর যখন দেখিল বৈষ্ণব কবিদের পালা আরম্ভ হইয়া একটু একটু সুরের রেশ জাগিয়া উঠিতেছে, বেশি বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া আর অপেক্ষা করিল না; নোটিসটা দিয়া দেওয়াই ঠিক করিল। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ। আমি ললিতবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বলেন, দেবে?"

বেশ একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। ললিতবাবু আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। একটু আগেই তাঁহাকে গোপীনাথের খিচুড়ি রসিকতার গল্প করিয়াছি; ওঁর হাসিতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট হইল, 'আপনিও শেষে গোপীনাথ হইয়া গেলেন?'

গোপীনাথকে বলিলাম, "আমাদের এখন দেরি হবে, তুমি ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘুমোতেও পার নিশ্চিন্দি হয়ে, ডেকে নোব'খন।"

গোপীনাথ প্রশ্ন করিল, "দোরটা ভেজিয়ে দেওয়া করব আজ্ঞে? জলের ছিটে আসচে বটে।"

বলিলাম, "তা বরং দাও।"

গোপীনাথ চলিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "এবার আপনার এসরাজটা নামান।"

সুরে-মূর্ছনায় কাব্য এবার সংগীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ললিতবাবু শুরু করিলেন, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর—"

পুরাতন গীত, অতিগীত হওয়ার জন্য বোধ হয় আরও পুরাতন; কিন্তু মনে হইল যুগ যুগ অতিক্রম করিয়া এ সেই প্রথম দিনটিতে চলিয়া গেছে যেদিন কবি নিজে রচনা করিয়া, মনের সমস্ত দরদটুকু নিংড়াইয়া নিজের কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন।··· ললিতবাবুর গলাও কোনোদিন এত মর্মন্তুদ হইয়া ওঠে নাই, মনে হইল রজনীর সমস্ত বিরহব্যথা দেখিতে দেখিতে গুটিকতক শব্দের মধ্যে মূর্তি ধরিয়া উঠিল।

বোধহয় এতেও ততটা ক্ষতি ছিল না। ললিতবাবু এর পর ভাটিয়ালি ধরিলেন একটা। গানের আগে, কতকটা মনের আবেগে একটু ভূমিকা করিলেন, বলিলেন, "শৈলেনবাবু, আমার এক-একবার মনে হয় ভাটিয়ালিই শ্রেষ্ঠ সংগীত,— সংগীতই বলুন বা কাব্যই বলুন; ও যেন নদীর তীরের আপনি হওয়া, আপনি বেড়ে ওঠা লতাটি; আপনার কি মনে হয়?"

সত্যই, গান যেন একেবারে মুক্ত বুকের ব্যথা লইয়া মাঠের ভাষায়, মাটির ভাষায় নিতান্ত সহজ লীলায় জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারে ঢাকা চারিদিককার এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে, এমন কি আমার এই মাটকোঠাটুকুর সঙ্গে ছন্দে সুরে যেন মিলিয়া গেছে। এ জায়গার প্রাণের সঙ্গে এমন করিয়া মেশানো আর অন্য কিছুই যেন হইতে পারিত না।···'বন্ধু গো, তুমি কাজের জন্যে খেয়া পেরিয়ে পারে গেলে, সন্ধ্যে হয়ে

এল ; একটা নদী মাঝে থেকেই আমায় পাগল করে দিয়েছিল, এখন আর-একটা নদী মাঝখানে এসে গেল— এই বর্ষা ; কি করি আমি বন্ধু, কোথায় যাই ?…'

এত স্পষ্ট, সহজ কান্না আর হয় না। মানুষের সেই আদিম কান্না, ভাষার আড়ম্বর যাহাকে আবিল করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেই আদিম নিরাভরণ ব্যথার সুর, কুটির থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সবার বুকেই যাহা এক থাকিয়া গেছে, আর অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। যাহাকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

বর্ষার সংগতে বিনাইয়া বিনাইয়া, সমস্ত দিনের সঞ্চিত আবেগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গাহিয়া চলিলেন ললিতবাবু। যখন শেষ হইল, রাত্রি প্রায় বারোটা।

গোপীনাথকে জাগাইতে বেগ পাইতে হইল না। জোরে কয়েকটা হাঁক দিতেই দুয়ার খুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ; চোখ দুইটা লাল হইয়া গেছে। খাবার দিতে নামিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "বেচারার প্রতি অত্যাচার হয়ে গেল একটু, ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজই অতটা পথ হেঁটে এসেছে।"

আহারের সময় ললিতবাবু গোপীনাথের রান্নার অজস্র প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, "দেরিতে পেলেন, কিন্তু ভালো লোক পেয়েছেন শৈলেনবাবু, ছাড়বেন না।"

বলিলাম, "আর খিচুড়ি যা রাঁধে! কাল সকালে এখানেই খাবেন ললিতবাবু, যেমন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ধরবে না, খিচুড়ি খাবার দিনই থাকবে।"

৫

সকালবেলা, একরকম ভোরেই, নিজেকেই ছাতা মাথায় দিয়া ললিতবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এ দুর্যোগে!— নেমন্তন্নর কথা মনে করিয়ে দিতে এলেন নাকি মশাই ? বামুন যে সেটা মনে নেই ?"

বলিলাম,"না, নেমন্তন্ন নিতে এলাম। ওদিকে আজ অষ্টরম্ভা।"

ললিতবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "মানে ?"

বলিলাম, "গোপীনাথ উধাও। কাল আমরা কাব্য করেছি আর ও-বেটা বারান্দায় বসে বসে কেঁদেছে। নেহাৎ যেগুলো সাহিত্যিক কবিতা সেগুলোতে ততটা ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়,— কাল্ করেছে আপনার ভাটিয়ালিতে।… সকালে খোঁজ করতে পিয়নটা বললে—এই রকম ব্যাপার, ক্রমাগতই নাকি চোখ মুছেচে আর বলেছে বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।…পালাবেই যে, পিয়নটা অতটা আন্দাজ করতে পারে নি। বউটা নাকি আবার দোজপক্ষের…"

ললিতবাবু বিস্মিতভাবেই বলিলেন, "তবে যে বললেন, নেহাৎ বেরসিক কাটখোট্টা-গোছের।"

দুঃখে হাসিয়া বলিলাম, "খুঁচিয়ে রস বের করেই যে বিপদ ডেকে আনা গেল মশাই। নইলে ও-বেটার সাতপুরুষেও বিরহ কাকে বলে জানে না। ভাটিয়ালিতেও আতঙ্ক ধরিয়ে দিলে। আপনারটাও পালায় নি তো ? এখানে এসে আর গানটান গেয়েছিলেন ?"

ললিতবাবু বলিলেন, "আমারটা বুড়ো।"

বলিলাম, "তবু গানটান একটু সমঝে-বুঝে গাইবেন, মশাই, বর্ষার এ-কটা দিন, কখন কি অঘটন ঘ'টে বসে বলা যায় না, দেশটা একটু বেয়াড়া-গোছের যেন।"

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা

শ্রীসুকুমার সেন

চন্দ্রকুমার দে-র উদ্যোগে, দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে পূর্ববঙ্গের পল্লীগাথাগুলি শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আসিয়াছে। এই ধরনের কোন গাথা পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি অধিগত একটি পুথিতে এইরূপ একটি পশ্চিমবঙ্গ-"গীতিকা" আবিষ্কার করিয়াছি।[1] গাথাটির নাম দামিনী-চরিত্র। কবির ভনিতা আছে সর্বশেষে,—"সরূফ", ইহা "স্বরূপ" হওয়াই সম্ভব।

"পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা"র সংসাহিত্যসুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্য ইহাতে নাই, অশিক্ষিত গায়নের অর্থহীন শৈথিল্যও নাই। আলোচ্য দামিনী-চরিত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথার অকৃত্রিম অতএব অনুজ্জ্বল সরল রূপটি পাইতেছি। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" কুত্রাপি দেবদেবীর বন্দনা বা দোহাই নাই। সুতরাং এটি একটি লৌকিক প্রণয়-গাথার দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

"শ্রীশ্রীগুরু শরণ" করিয়া লেখক (বা লিপিকার) একেবারে কাহিনীর মধ্যে অবগাহন করিয়াছেন—

সখীগণ সঙ্গে দামিনী সিনানেতে জায়ে,
রমকি ঝমকি নপুর বাজে দুটি পাএ।
সরোবরে নামিঞা দামিনী করয়ে সিনান,
তাহা দেখি সাধুর বালা হরিল গিআন।

সাধুপুত্র ঘাটে বসিয়াছিল কি দামিনীরই জন্য? দামিনীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধুর নন্দন শুধাইল,

কাহার ঘরের কন্যা তুমি কিবা তোমার নাম,
মাথা তুলি কহ কথা জুড়ুক পরান।

এই বলিয়া সে দামিনীর রূপবর্ণনা শুরু করিল মুখখানি আর একবার দেখিবার বাসনায়—

মাথার কজ্জল কেশ আকুল ভুমরা,
সিতায়ে সিন্দুর তোমার রকতের ঝারা।
নাসিকা দেখিল কন্যা কানুর হাথে বাঁশি,
বিজলি চমকে তোমার শশিমুখের হাসি।
নআনে কাজল তোমার কালমেঘের রেখা,
বারেক প্রসন্ন হইআ মোরে দেহ দেখা।

---

১ বর্ধমান সাহিত্যসভা পুথিসংখ্যা ১৯৯। লিপিকাল আছে তারিখ মাস ও বার; সালের উল্লেখ নাই। কাগজের অবস্থা ও লেখার ধরন দেখিয়া মনে হয়, লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। "এ পুস্তক লিখিতং শ্রীসেবকরাম মণ্ডল সাকিম খাঁহার পঠিতং শ্রীমধুসূদন খাঁএ সাকিম বৈনান।" বর্ধমান জেলার দক্ষিণপ্রান্তে খাঁহার গ্রামে এক বোঝা পুথির মধ্যে এই পুথিটি ছিল। সংগ্রহকর্তা শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল এম-এ। পুথির পত্রসংখ্যা ১২। পয়ার-ত্রিপদী ছত্র-সংখ্যা ৩৩০।

কপালে তিলক ভুরু দুই···
কামের কামান জেন দিয়া আছে চেড়া।
দুই কর্ণ দেখি তোমার আক্ষটির ফান্দ,
মুখখানি দেখি জেন গগনের চান্দ।
দুই কুচ তোমার বনের বিম্ব ফল,
হৃদয়ের মাঝে··· · ······উজ্জ্বল (?)।
দুই হস্ত দেখি তোমার মুদ্রিকা রাতুল,
···বিচিত্র তোমার এ দশ আঙ্গুল।
মাজা খিন দেখি তোমার শিকারি বাঘিনী,
রসে রসে কহ কথা দেখি কিছু শুনি।

সাধুপুত্রের হীন চাটুবাক্যে বিরক্ত হইয়া দামিনী ঘরে ফিরিয়া গেল—

এ বোল শুনিঞা কন্যা জায় নিজ ঘরে,
কন্যারে ছলিতে তবে চলিল কুমারে।
সাধুর বাড়িতে[২] কুমার অতিথ[৩] হইআ,
দুআরে বসিল তখন আসন করিআ।

দামিনী ভিক্ষা দিতে আসিলে অতিথি সময়োচিতভাবে প্রণয়ভিক্ষা করিল। তখন কার্তিকমাস—

কার্ত্তিক মাসেতে কন্যা নিরমলা রাতি,
নিশির স্বপনে দেখি তু হেন যুবতি।
আলিঙ্গন দেই মোরে করিআ পিরিতি,
আশীর্ব্বাদ নেহ তুমি রহুক খেআতি।

তরুণী দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল,

কি কাজ পিরিতি মোর ধর্ম্মে থাকুক মতি,
আলিঙ্গন দিব জখন আসিবেন পতি।
সাধু না বল হে আর,
পাথরের ঘরে কিবা ঘুণের পসার[৪]।

মাসেক পরে তরুণ অতিথি আসিয়া আবার প্রার্থনা জানাইল,

আঘ্যন মাসেতে কন্যা শীতের প্রকাশ,
আম জাম মঞ্জরিল ফুটিল পলাশ।
পলাশ ফুটিল কন্যা নাই তার বাস,
তেমতি তোমার হিআ দেখে লাগে হাস।

---

২ 'বাড়িল'। ৩ 'অতিত'—সর্বত্র। ৪ 'পরিসকার'—সর্বত্র।

দামিনী জবাব দিল,

কুসুম মল্লিকা তোমার ঘরের রমণী,
শিমুলের ফুল দেখে ভুল কেন তুমি।

পৌষমাসে সাধুপুত্র আসিয়া প্রলোভন দেখাইল,

পৌষ মাসেতে কন্যা জাড় মহাবলি,
পাটের পাছড়া দিব উড়িতে নেহালি।
তাড় কঙ্কণ দিব কানে মদনকড়ি,
পরিবারে দিব কন্যা ফুলিআর শাড়ি।

দামিনী সক্রোধে বলিল,

পাটের পাছড়া তোমার আগুনে পোড়াব৫,
তাড় কঙ্কণ তোমার দূরে ফেলে দিব।
তোমার রমণী কোথা [আছে] কড়ুই রাড়ি,
পরাহ তাহারে গিআ ফুলিয়ার শাড়ি।
সাধু না বল হে আর,
পাথরের ঘরে কিবা ঘুণের পসার।

মাঘমাসে তরুণ অতিথি আসিয়া বলিতে লাগিল,

মাঘ মাসেতে কন্যা শীত অবশেষ,
[অলপ] বয়সে৬ তোমার পিআ পরদেশ।
যুগল ডালিম্ব হইল গাছের উপর,
রাতুল-বর্ণি হইআ সেহ মাগে কর।

তরুণী উত্তর দিল,

মাগুক মাগুক অরে কুমার তোমার···
বিধাতার সৃজন ফল আমি করিব কি।
আমার সহিত তোমার কিসের [বেভার],
বৈদেশি কুমার তুমি না বল হে আর।

ফাল্গুনমাসে কুমারের প্রার্থনা,

ফাল্গুন মাসেতে কন্যা ফাগুনের চাসা,
আম জাম ভাঙ্গিআ কুকিলী করে বাসা।

কোকিলের কথা শুনিয়া দামিনী চমকিত হইয়া উঠিল,

কুকিলীর শব্দ শুনি চমকে রমণী,
প্রভু প্রভু করি তখন উঠিল কামিনী।

---

৫ 'আ পরাব'। ৬ 'বয়েতে'।

আত্মসম্বরণ করিয়া সে কুমারকে অনুনয় করিতে লাগিল,

আমার বচন কুমার কর অবধান,
নিবেদন করি আমি তোমা বিদ্যমান।
সাধুর কুমারী আমি বড় অভাজন,
আমার পিছে ফির তুমি বৃথা অকারণ।

চৈত্রমাসে সাধুনন্দন দামিনীর মনের আগুনে আবার ফুঁ দিতে আসিল—

চৈত্র মাসেতে কন্যা ধূপের প্রতাপ[৭]
তোমার পিয়ে ঘরে নাই মনে মনস্তাপ।
অন্তরে ভাবিআ কন্যা তনু কৈলে ছার[৮],
[তু] চক্ষু মুদিআ দেখ সংসার আসার।

দামিনী ধীরভাবে উত্তর দিল,

জে কথা বলহ কুমার কিছু মিথ্যা নয়ে,
পরনারী কখন কি আপনার হএ।
কুমার না বল হে আর,
ভরম চিন্তিআ দোষ খেমিলাঙ[৯] তোমার।

বৈশাখমাসে সাধুর নন্দন আসিয়া যাচিল,

বৈশাখ মাসেতে কন্যা পিপাসা বড়ই জ্বালা,
পিপাসা ঘুচাহ তুমি মোরে সাধুর বালা।

সাধু কন্যা দৃপ্তভাবে বলিল,

দেবী নই দেবতা নই বাঁচাইব[১০] আমি,
আপন সাগরে জল খাও[১১] গিআ তুমি।
আর বার বল যদি জানাইব রাহুবানি (?),
লুটা জাবে লক্ষের ধন হারাবে পরানি।

জ্যৈষ্ঠমাসে সাধুপুত্রের নির্বন্ধ—

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কন্যা নিরাগে পড়ে ঘাম,
তোমার সাধু ঘরে নাই খাও পাকা আম।
পাকা আম খাওইআ কন্যা বসাইত পাশে,
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন উড়িতে আকাশে।

দামিনী উত্তর দিল,

আম কাঠাল নহে কুমার খাইলে ফুরাবে,
জত দিনে প্রাণনাথ[১২] আসি নিজ ঘরে।

---

৭ 'অপ্রতাপ'। ৮ 'সার'। ৯ 'বংক্ষিলাঙ'। ১০ 'বাঁচাই'। ১১ 'খায়'। ১২ 'প্রননাত'।

দিনে দিনে যৌবন মোর অধিকারে[১৩],
এ ধন ভাণ্ডার তখন ভেটিব তাহারে।

আষাঢ়মাসে বৈদেশি-কুমারের উক্তি—

আষাঢ় মাসে কন্যা ল মেঘের ঘটা,
শান্তিপুরে সাধুর[১৪] তোমার মাথা গেছে কাটা।

দামিনীর প্রত্যুক্তি—

মরুক মরুক শত্রু মোর সাধুর বালাই,
জে বলে এমন কথা মুখে তার ছাই।
আমার সাধু মরিত জদি জানিতাঙ আমি,
সতেসরি হার মোর খসিত তখনি।

শ্রাবণমাসে কুমারের অনুযোগ—

শ্রাবণ[১৫] মাসেতে কন্যা ঘন বরিষণ,
জৌবন তোমার কন্যা কৃপণের[১৬] ধন।
খাও [না] খেলাও রাখ জুয়াচুরি (?),[১৭]
ভাণ্ডিলে আমারে তুমি করিআ চাতুরি।

দামিনীর প্রত্যুত্তর—

শুন শুন অহে সাধু বৈদেশি কুমার,
পুরুষ পরশ[১৮] তুমি না বল হে আর।

ভাদ্রমাসে কুমারের উক্তি—

ভাদ্র মাসেতে কন্যা তরঙ্গ দুকূল,
তেমতি জৌবন তোর কর‍্যাছে আকুল।
একুল উকুল নদী[১৯] উছলিল পানি,
ভাঙ্গিলে নদীর আঁট জানিবে তখনি।

কুমারীর প্রগল্‌ভ প্রত্যুক্তি—

শুন শুন অহে কুমার কিবা[২০] কর ঠাট,
কি করিবে পানি মোর কাদা বড় আট।
কাণ্ডারি দড় থাকে জার কিবা করে পানি,
কত কত সাধুর বালা থাকয়ে ওইমুনি।

বার মাস পরীক্ষা করিয়া দামিনীর দৃঢ়চিত্ততা ও ধর্মনিষ্ঠায় ফাঁক না পাইয়া সাধুপুত্র আশ্বিনমাসে আসিয়া তাহাতে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দিয়া বিদায় লইয়া নিছনি-নগরে নিজগৃহে চলিয়া গেল।—

১৩ 'অধিকর'। ১৪ 'সাধু'। ১৫ 'স্রাবন'। ১৬ 'ক্রপনের'। ১৭ 'রাখ্যছুবাচরি'। ১৮ 'পরেস'। ১৯ 'নদি'—সর্বত্র। ২০ 'কিব্যা'—প্রায়ই।

আশ্বিন মাসেতে কন্যা পুরিল বারমাস,
না রব তোমার হেথা[21] জাব আপন বাস।
বুঝিলাঙ তোমার মন পতিব্রতা[22] সতী,
আশীর্ব্বাদ দিলাঙ তোমাএ শুন ল যুবতি।
তোমার বাপমাএ মোর প্রণাম জানাইয়্য,
শঙ্খ[23]-দত্তের পুত্র আমি তাদের আগু কয়্য।
উজানি নগরে[24] ঘর শুনহ কামিনী,
পরিচয়ে পাবে তখন পুছিলে[25] জননী।
এ বোল বলিআ কুমার পথে মেলা দিল,
শুনিঞা দামিনী তখন মাএর কাছে গেল।

মায়ের কাছে গিয়া—

কহিতে লাগিল কন্যা শুন সমাচার,
তোমারে প্রণাম এক কহিল কুমার।
শুনিঞা বেন্যানী বলে কোথা তার ঘর,
তবে নাকি অন্ন[26]টাটি আইল তোর বর।
কিরূপে হইল দেখা কও মোর আগে,
কেমনে কহিলে কথা লাজ নাই লাগে।

মায়ের অভিযোগে—

দামিনী[27] কহেন মাতা নিবেদিব[28] কি,
সরোবর ঘাটে আমি নাইতে গিআছি।
হেন কালে কুমার আসি ঘাটে উপনীত,
আমারে দেখিআ সেহ হইলা মোহিত।
বাপার নাম জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনএ,
কহিলাঙ তাহারে আমি নামের উদএ।
উজানি নগরে ঘর কহিলা আমারে,
অন্তরে জানিবে কন্যা পুছিলে মাএরে।
এ বোল বলিআ কুমার ছাড়িল নিশ্বাস,
তখনি আমারে মাতা লাগ্যাছে তরাস।

বেনেনী কন্যাকে বলিল,

এ বার বচ্ছর তোমার পতি নাই ঘরে,
বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন দক্ষিণ সফরে।

---

২১ 'হিতা'। ২২ 'পতিব্রথা'। ২৩ 'সঙ্ক'। ২৪ 'লগরে'—সর্বত্র। ২৫ 'পুছিলেন'। ২৬
২৭ 'দামিন'। ২৮ 'নিবেদিইব'।

আচম্বিতে হেন কথা কহিলে আমারে,
ডাকিআ পুছিব মাতা তোমার বাপেরে।

স্বামী হরিহরের কাছে গিয়া—

কুমারীর বোল শুনি লহনা সুন্দরী,
কহিতে লাগিল কিছু শুন প্রাণের হরি।
কি বলে তোমার কন্যা শুন দিআ মন,
বৈদেশি কুমার এক দিল[২৯] সম্ভাষণ।
কি কারণে সেই কুমার প্রণাম কহিল,
প্রকারে প্রবন্ধ করি কন্যারে কহিল।
জামাতা[৩০] বিহনে এহার কেবলি বেআর,
জনেক পাঠাইআ দিআ জানিব সমাচার।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া হরিহর সাধু খবর জানিবার জন্য লোক পাঠাইল—

এ বোল শুনিল যখন সাধু হরিহর,
লোক পাঠাইল তখন জানিতে[৩১] খপর।

লোককে বলিয়া দিল—

বুঝিব তোমার বুদ্ধি কেমন সুজন,
প্রকারে বুঝিবে তুমি কুমারের মন।

রামায়েত সন্ন্যাসী সাজিয়া সাধুর লোক কুমারের গৃহে অতিথি হইল—

এ বোল শুনিঞা লোক করিল গমন,
নিছনি[৩২] নগরে গিআ দিল দরশন।
সাধুর বাড়িতে গিআ অতিথ হইআ,
জয় সীতারাম বলে দাণ্ডাইল গিআ।

অতিথির সাড়া পাইয়া কুমারের মা ভিক্ষা দিতে আসিল—

অতিথের শব্দ শুনি ভিক্ষা লইআ হাথে,
দাণ্ডাইল বেন্যানি অতিথ সাক্ষাতে।

বলিল,

ভিক্ষা নেহ অগো ঠাকুর করি নিবেদন,
আশীর্ব্বাদ দেহ তুমি হয়্যা তুষ্ট মন।

তাহার হাতে ভিক্ষা না লইয়া—

অতিথ বলেন মাতা তবে ভিক্ষা নিব,
তোমার কুমার আসি ভিক্ষা জবে দিব।

---

২৯ 'দিন'। ৩০ 'জামতা'—সর্বত্র। ৩১ 'জানিল'। ৩২ পাঠ 'উজানি'

দেখিব কুমার তোমার সাধুর নন্দন,
ভিক্ষা দিলে তুষ্ট হইবে অতিথের মন।
বেনানি চলিল তখন আপনার ঘরে,
কিছু বাণী কহে গিআ আপন বেটারে।
বৈদেশি অতিথ এক আইস্যাছে দুআরে,
আমারে কহিল সেই দেখিব কুমারে।
ভিক্ষা লয়্যা জাহ বাপু অতিথের পাশে,
তুষ্ট হইয়্যা ভিক্ষা নিব মনের হরিষে।
এ বোল শুনিঞা কুমার হাথে থাল লয়্যা,
অতিথের কাছে গেল হরষিত হয়্যা।
অতিথ দেখিআ সাধু দণ্ডবত করে,
আশীর্ব্বাদ দিল তবে সাধুর কুমারে।
আইস্য আইস্য অহে বাপু সাধুর নন্দন,
বাণিজ্য করিতে গেলেন দক্ষিণ পাটন।
কতদিন আইস্যাছ বাপু সফর করিআ,
সকল কথা কহ বাপু অন্তর খুলিআ।

সাধুনন্দন "অন্তর খুলিআ" সকল কথা বলিতে লাগিল—

বৎসর[৩৩] এক আসিআছি আপনার দেশে,
শান্তিপুরের ঘাটে নৌকা জলের উপর ভাসে।
ঘাটে নৌকা রাখ্যা আমি উঠিলাঙ ধারে,
ফিরিতে চলিতে গেলাঙ উজানি নগরে।
উজানি নগ:র ঠাকুর গেল বার মাসে,
মনেতে পড়িল নৌকা জলের উপর ভাসে।
তখনি ছাড়িলাঙ আমি উজানি নগরে,
পশ্চাৎ করিআ আনাইলাঙ আপনার ঘরে।

তাহার পর অতিথিকে প্রশ্ন করিল,

কোন দেশে নিবাস বাসা কোন স্থান,
আজি মোর ঘরে গোসাঞি করহ বিশ্রাম।
এবোল শুনিল জখন চরণ মহাবল,
পাইলাম তোমার তত্ত্ব জানিলাম সকল।

---

৩৩ 'বস্থর'।

আতিথ্যের আর আবশ্যক নাই জানিয়া—

অতিথ বলেন ওহে বাপু জাব নিজ স্থান,
কুশলমঙ্গলে থাকুক হউক কল্যাণ।

বিদায় লইয়া—

চলিল অতিথ তখন পথে দিল মেলা,
রাত্রিদিন চলি জায় নাহি তার জালা।

আসিতেই হরিহর জিজ্ঞাসা করিল,

কহ কহ সমাচার কুশল-বারতা ;

লোক বলিল,

মিথ্যা নয়ে সত্য বটে আইছে জামাতা।
কন্যারে ছলিতে কুমার আইস্যেছিল হেথা,
কুমার বুঝিল মন সতী পতিব্রতা[৩৪]।

জামাতার সংবাদ পাইয়া সাধু কন্যাকে অবান্তর ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বৈদেশি-কুমারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে।—

জামাতা-বারতা জখন পাইল[৩৫] সদাগর,
কন্যারে পুছেন তখন ভঙ্গি আবান্তর[৩৬]।
কহ কন্যা ওগো মাতা কুলবতী রাই,
কিরূপে এড়াইলে তুমি কুমারের ঠাই।
কুমারী বলেন বাপা[৩৭] শুনহ বচন,
বারমাস জামাতা তোমার বুঝে মোর মন।
অনেক প্রবন্ধ করি করিলেন আস,
কোন রূপে মোর গলে দিতে নারে ফাঁস।
জত কথা কহে কুমার তত উত্তর পায়,
মোর বাক্য শুনে কুমার স্তব্ধ হয়্যা রয়।
হারিয়া পালাইল জখন ছেড়ে মোর পিছে,
সম্ভ্রমে প্রণাম তোমায় শেষ কয়ে গেছে।
এই আবান্তর বাপু জানি জন্মদাতা,
চিনিতে না পারি আমি খায়্যা আপন মাথা।
শিশুকালে বিভা দিলে বৈদেশি কুমারে,
কত কটু[৩৮] কথা আমি বলিলাম তাহারে।

---

৩৪ 'পতিব্রথা'—সর্বত্র। ৩৫ 'পালা'। ৩৬ 'অঙ্গিয়াবাস্তর'। ৩৭ 'বাপু'। ৩৮ 'কট্টুর' <কটু+নিষ্ঠুর।

কন্যার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পিতা তাহাকে সান্ত্বনা দিল,

পতিব্রতা সতী বট জানিলাম অন্তরে,
বুঝিয়া তোমার মন সোআমী গেছেন ঘরে।
চিন্তা না করহ[৩৯] মাতা চিন্তা কর দূর,
প্রশংসা করিবে তোমার শাশুড়ি শ্বশুর।
এইসব কথা জখন হইবে প্রকাশ,
শুনিঞা শ্বশুর তোমার ছাড়িবে নিশ্বাস।
আপন বেটারে সাধু করিব ভর্ছন,
মুচ্ছ[৪০] হইআ ফির তুমি সাধুর নন্দন।

কন্যাকে প্রবোধ দিয়া হরিহর নিছনি নগরে তত্ত্ব করিয়া ঘটক পাঠাইল জামাইকে আনিতে—

সান্ত্বনা করিল সাধু আপন কন্যারে,
জামাতা আনিতে পাঠাএ নানা উপহারে।
ভারির কান্ধেতে ভার দিল সাধুবরে,
ঘটক চলিল তখন হরিষ-অন্তরে।
নিছনি নগরে গিআ দিন অবশেষে,
প্রবেশ করিল গিআ সাধুর আওআসে।

কুমারের পিতা ঘটককে অভ্যর্থনা করিল—

ভাটেরে দেখিআ সাধু প্রণাম করিল,
জয়ধ্বনি আশীর্ব্বাদ মুখেতে বলিল।
ভৃঙ্গারের জলে তার পদ পাখালিল,
উত্তম আসনে তখন ভাটেরে বসাল্য।
সাধু বলে কহ গোসাঞি বাড়ির মঙ্গল ;

ঘটক বলিল,

ঠাকুরের প্রসাদ সবে আছেন কুশল।
তোমার মঙ্গল চাই কুমার বৈদেশি,
আইস্যাছেন দক্ষিণ সফর[৪১] কহিল সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসীর মুখে শুনি এসকল বারতা,
আমারে পাঠাল্য সাধু লইতে জামাতা।

শুনিয়া সাধু পুত্রকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে আদেশ করিল—

শুনি সদাগর তখন ডাকয়ে কুমারে,
দুআদশ বচ্ছর বাপু ছিলেন সফরে।

---

৩৯ 'চিন্তা করহ'। ৪০ 'মুচ্য'। ৪১ 'হওর'।

ভাল হইল আইলে[৪২] তুমি আপনার দেশে,
শ্বশুর বাড়ি জাহ বাপু মনের হরিষে।
তোমার তত্ত্ব পায়্যা দেখ তোমার শ্বশুর,
লইতে পাঠাল্য দেখ ঘটক ঠাকুর।

পিতার অনুমতি পাওয়ায় কুমারের শ্বশুরবাড়ি যাইবার লজ্জা ভাঙিল—

এ বোল শুনিল যখন কুমার দুআরাজ,
জাইতে শ্বশুর ঘর কিবা হবে লাজ।
সাজিল কুমার তখন জাইতে শ্বশুরবাড়ি,
প্রণাম করিতে[৪৩] তখন শ্বশুর শ্বাশুড়ী।
নানা দ্রব্য অলঙ্কার চিকুর [কাঁকুতি],
লইল কুমার তখন আপন সঙ্গতি।
মণিমুকুতার হার লইল বান্ধিআ,

এই ভাবিয়া—

তুষিব কন্যারে তখন হার গলায় দিআ।
বিদায় হইল তখন মাবাপের কাছে,
ভাট চলে আগু আগু কুমার চলে পিছে।
ভাট সঙ্গে নানা রঙ্গে চলেন বেন্যার বালা,
পরমকৌতুকে পথে করে নানা খেলা।

উজানিতে পৌছিতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।

নগরে সামাইল[৪৪] কুমার বেলা অবসান,
কুঠারি (?) কুমারী কত আড়ে আড়ে চান।
নগরের নারী জত করে ধাওধাই,
কুমারের রূপ দেখি ভাটেরে শুধাই।
ভাট বলে শুন অগো পতিব্রতা সতী,
এই জে কুমার দেখ দামিনীর পতি।
ধন্য ধন্য বলে জত নগরের নারী,
জেন কন্যা তেন বর মিলাইল হরি।
ভাট সঙ্গে নানারঙ্গে কুমার চলিল,
জাইআ সাধুর বাড়ি উপনীত হইল।

হরিহর সাধু জামাতাকে সাদর সম্বর্ধনা করিলেন—

জামাতা দেখিআ সাধু উল্লাসিত হইল,
ভূমিষ্ঠ হইআ কুমার প্রণাম করিল।

---

৪২ 'আনে'। ৪৩ পাঠ 'করিল'। ৪৪ 'সন্ধান'—সান্ধাল্য।

বসিতে আসন দিল ভৃঙ্গারের[৪৫] জল,
পুছিলেন সদাগর বাড়ির মঙ্গল।
সুমুন্দি[৪৬] সকল আসি মিলিল তখন,
উঠিআ সাধুর বালা দিল আলিঙ্গন।

কুমার শাশুড়ীকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা জানাইল,

আমার বচন তোমরা শুন বন্ধু জন,
শাশুড়ির চরণে প্রণাম করিয়ে এখন।

এক শ্যালক তখন ভগিনীপতিকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল—

এ বোল শুনিল জখন সাধুর কুমার,
ভগ্নীপতি[৪৭] সঙ্গে চলে বাড়ির ভিতর।
জেখানে বেন্যানি আছেন লহনা সুন্দরী,

সেখানে গিয়া জামাতা শাশুড়ীকে প্রণাম জানাইল,

আশীর্ব্বাদ কর মাতা দণ্ডবত করি।

শুনিয়া—

শাশুড়ি বলেন প্রমাই বাড়ুক তোমার,
প্রাণ নখিন্দর তুমি আইলে আমার।
তোমারে দেখিতে বাপু জুড়াইল আঁখি,
সিংহাসনে[৪৮] বইস[৪৯] বাপু শ্যামরূপ দেখি।

জামাতা শাশুড়ীকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য দামিনীর প্রশংসা করিল—

জামাতা বলেন বাণী শুন ঠাকুরাণী,
বেহুলা সমান[৫০] সতী বুঝেছেন দামিনী।

বেনেনী কথা ঘুরাইয়া দিল—

বেন্যানি [বলেন বাপু] তোমার সুখ্যাতি,
অবলা অকীর্ত্তি কন্যা কিবা জানে সতী।
অগোচর জত কথা তোমার গোচর,
দামিনী রমণী তোমার তুমি তার বর।
জানিতে না পারে কন্যা তোমার ছলনা,
তেকারণে অহে বাপু পাইলে যন্ত্রণা।

জামাই শাশুড়ীর কাছে হারিবে কেন?—

কুমার বলেন মাতা দোষ নাঞি ধরি,
বাখানেছে সতী বটে তোমার কুমারী।

---

৪৫ 'ভিঙ্গারের'। ৪৬ 'সুবুদ্ধি'। ৪৭ 'ভঙ্গিপতি'। ৪৮ 'সিঙ্গাসনে'। ৪৯ 'বস্থে'। ৫০ 'সম্মান'।

ক্রমে রাত্রি হইল। কুমারের ভোজনও শেষ হইয়াছে।—

দামিনী সুন্দরী হাথে ঝারি করি
চলিল বাসর ঘরে,
সাধুর নন্দন করিআ ভোজন
বসেছেন পালঙ্ক উপরে।
সাধুর কুমারী কাঁপেন থরহরি
না জানি কি খেলা খেলে,
এ[৫১] রূপ যৌবন দেখিবে জখন
ভুমরা পড়িবে ভুলে।

স্বামীর নিকট আসিয়া দামিনী বিনীতভাবে আত্মপরিচয় দিল।—

পতিসন্নিধানে করে সম্ভাষণে
আশিষ করহ মোরে,
আমি তব দাসী নিকটেতে আসি
করজোড়ে স্তব করে।

কুমার আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইল—

এ[৫১] বোল শুনিঞা মুচুকি হাসিআ
পালঙ্কে বসাইল প্রিয়া,[৫২]
বাটার তাম্বুল জেন রাগে…[৫৩]
প্রাণ রাথ দেখা দিআ।

আর অনুনয় করিল,

সে সব উত্তর মনে নাই মোর
তারে না করিহ[৫৪] ভয়ে,
চিনাচিনি নাই তুমি মোর রাই
একে কি কলঙ্ক কয়ে।…
আমি তব পতি তুমি মোর সতী
অভিমান কর কারে।

দামিনীর ভয় তবুও ভাঙে না—

কন্যা কহে বাণী শুন গুণমণি
দুআদশ বচ্ছরে,
তুমি প্রাণ আমার আইলে নিজ ঘর[৫৫]
মধু পিয়ে পুষ্প পর।

---

৫১ 'ই'। ৫২ 'প্রিএ'। ৫৩ 'ষুন'। ৫৪ 'কর‍্য'। ৫৫ 'ঘরে'।

পুষ্প বিগাসিল　　ভ্রমরা আইল
ফিরে সে পুষ্পের পাশে,
পুষ্প হিলে দোলে　　বায়ুর[৫৬] হিল্লোলে
ভ্রমরা[৫৭] কি দিআ তোষে।

কুমার তখন মানভঙ্গের অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করিল।—

এ[৫৮] বোল শুনিঞা　　কুমার উঠিআ
লইল মুকুতার হার,
পিএ পিএ করি　　হাথে তার ধরি
গলে দিল পুনর্ব্বার।

পতিপত্নীর মিলন হইল। তাহার পর—

পূর্ব্বের কাহিনী　　কহেন রমণী
শুন প্রভু গদাধর,
ছলিলে আমারে　　অনেক প্রকারে
খেমা কর দোষ মোর।
আমি অভাগিনী　　তুমি গুণমণি[৫৯]
গিআছিলে পরবাসে,
দোষ[৬০] কর খেমা　　আমি তব বামা
চরণ বন্দিনু[৬১] কেশে।
কেশপাশ খোল　　যৌবন হিল্লোল
পুরুক মনের[৬২] আশ,
কোলে বসাইআ　　দেখ নিরক্ষিয়া
ঘুচিবে মনের ত্যাস[৬৩]।

কুমার বলিল,

তোমার বরণিমা　　নাহি[৬৪] তার সীমা
কহিলাঙ বহু তরে,

---

৫৬ 'বাউর'। ৫৭ 'না জানি ভ্রমরা'। ৫৮ 'ই'। ৫৯ 'গুণমুনি'—সর্বত্র। ৬০ 'এ দোষ'। ৬১ 'বন্ধিনু দুটি'। ৬২ 'পুরুক তোমার মনের'। ৬৩ 'ত্মাষ'; ইহা 'ত্যাস—তিয়াস হইতে পারে, 'ত্রাস' ও হইতে পারে। ৬৪ 'অধিক নাহি'।

তুমি বড় সতী আমি তব পতি
খেমা দেহ তুমি মোরে[৬৫] ।...

অতঃপর দামিনীর মনের তাপটুকু নিঃশেষে কাটিয়া গেল। কুমার-কুমারীর প্রথম মিলনের উপর রজনীর নৈঃশব্দ্য নামিয়া আসিল। কাহিনীও শেষ হইয়া গেল কবির এই ভনিতায়—

দামিনী চরিত্র রচিআ পবিত্র
সরূফে কহেন বাণী,
শুনিবেক জেই মজিবেক সেই
শুনহ রসিক গুণী[৬৬]।

কাহিনীর উপস্থাপনে অপ্রত্যাশিত কৌশল আছে। লেখায় কবিত্বের পরিচয় তেমন নাই, তবে বর্ণনার নবীনত্ব যথেষ্ট।

বিদেশপ্রত্যাগত পতি কর্তৃক পত্নীর পরীক্ষা বিষয় লইয়া অনুরূপ কাহিনী ভোজপুরিয়া ভাষায় নাটগীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় এখনকার দিনেও।

---

৬৫ পাঠ 'খেমা দেহ মোরে তরে'।

৬৬ 'রসিক যুনহ গান'। অতঃপর "ইতি দামিনির [চরিত্র] সপ্তম (_সমাপ্ত) ।......"।
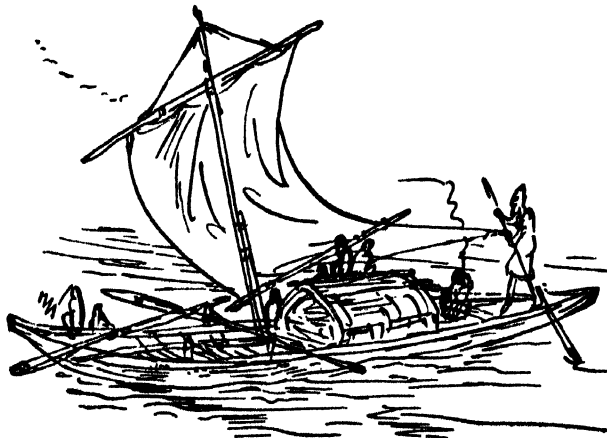
চর্যাগীতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

(১)

বৌদ্ধগান বা চর্যাগীতি[১] যে বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সে বিষয়ে বর্তমানে আর পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই। কিছুকাল পূর্বে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এবং পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ চর্যাগুলির ভাষা প্রাচীন মাগধী বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেন, কেহ বা প্রাচীন মৈথিলী, কেহ বা প্রাচীন উড়িয়াও বলতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই নিজস্ব উক্তি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন নাই, উক্তি সমর্থনযোগ্য নয় বলেই তা সম্ভব হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ পদগুলির পুঁথি নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালার অধ্যক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

শাস্ত্রীমহাশয় এই গ্রন্থের নাম দেন—"বৌদ্ধ গান ও দোহা"। বৌদ্ধ গানগুলি ছাড়া ঐ গ্রন্থে প্রাচীন অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত সরহপাদের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব নামক তিনখানি গ্রন্থ আছে। শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধগান ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা অভিন্ন মনে করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শাহীদুল্লাহের আলোচনায় এই দুই গ্রন্থের ভাষার বিভিন্নতা ধরা পড়ে। গানগুলির ভাষাই যে কেবল প্রাচীন বাংলা তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষা অপভ্রংশ। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষের ভাষার বিশদ্ আলোচনা করেন এবং এই দুই গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে অর্থবোধের চেষ্টা করেন (Les Chants Mystiques des Kānha et Saraha, Paris, 1928)। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুরূপ প্রণালীর দ্বারা ডাকার্ণবের পাঠ ও অর্থ নির্ধারণ করেন (Dakarnava, Calcutta Sanskrit, series 1935)। উভয়েই এ গ্রন্থগুলির ভাষাকে অপভ্রংশ বলেন। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকে বা তার পরেও নানা প্রাদেশিক অপভ্রংশ সাহিত্যের বাহন হয়েছিল। উত্তরভারতে শৌরসেনী অপভ্রংশের বাহুল্য লক্ষিত হয়। প্রাচ্য দেশসমূহে মাগধী অপভ্রংশেরও প্রচলন ছিল। কিন্তু সে অপভ্রংশের নিদর্শন খুব অল্পই পাওয়া যায়।

ডাঃ শাহীদুল্লাহ্ বলেন যে দোহাকোষগুলির ভাষা মাগধী অপভ্রংশ। যে সমস্ত পাঠের উপর নির্ভর করে তিনি এই উক্তি করেন দোহাকোষের নূতন পুঁথিতে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আমি ১৯২৯ সালে নেপালের পুঁথিশালায় অনুসন্ধানের ফলে দোহাকোষের কতকগুলি নূতন পুঁথি পাই। পুঁথিগুলি খুব প্রাচীন, খৃস্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগের, খুব সম্ভব মূলগ্রন্থের সমসাময়িক। এই পুঁথিগুলির

---

১ বৌদ্ধগানগুলির প্রকৃত নাম যে চর্যাগীতি ছিল তা আমি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছি। সাধারণতঃ এই গানগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়, আমিও পূর্বে তা করেছি। কিন্তু একে চর্যাগীতি বলাই প্রশস্ত, কারণ একটি চর্যাগীতির মধ্যে ৪।৫টি পদ রয়েছে, সেগুলিকে পদ ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সংস্কৃত টীকাতেও সেগুলিকে পদ বলা হয়েছে। গানগুলি হচ্ছে "চর্যাগীতি" আর সে গীতি কয়েকটি "পদে"র সমষ্টি নিয়ে গঠিত।

সাহায্যে যে নূতন পাঠ স্থির করা সম্ভব হয় তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে দোহাকোষের ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ। অতি প্রাচীনকাল হতেই শৌরসেনীর এই ব্যাপক প্রভাব হতে উত্তর ভারতের কোন সাহিত্যই মুক্ত ছিল না।

দোহাকোষের ভাষা চর্যাগীতির ভাষা হতে পৃথক্ হলেও উভয়ই যে একই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্প্রদায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট শাখা যাকে কখনো 'বজ্রযান' কখনো বা 'সহজযান' আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ বজ্রযান ও সহজযানের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকলেও এখনো তা স্পষ্ট ধরা যায় নি। এই দুই সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি ও প্রচলন বঙ্গ ও মগধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তা নেপাল ও তিব্বতে প্রচারিত হয়। সেই কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের পুঁথিপত্র বর্তমানকালে নেপাল ও তিব্বতেই বেশি পাওয়া যায়। ঐ সব দেশে বজ্রযানের পৃথক্ অস্তিত্বও রয়েছে, কিন্তু বঙ্গদেশ হতে তা লুপ্ত হয়েছে। তবে ঐ সম্প্রদায়ের সাধনার ধারা যে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার মধ্যে যথেষ্টভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

চর্যাগীতি বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলেও এ পর্যন্ত তার কোন প্রামাণিক সংস্করণ তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তার প্রধান কারণ চর্যাপদের একাধিক পুঁথি পাওয়া যায় নি। মূল পুঁথি আছে নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায়। শাস্ত্রী মহাশয় সেই পুঁথির যে অনুলিপি সংগ্রহ করে আনেন সেই অনুলিপিই ছিল তাঁর সংস্করণের মূল ভিত্তি। এই অনুলিপি Royal Asiatic Society of Bengalএর পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে। এই অনুলিপি প্রস্তুত করেন নেপালী পণ্ডিত। সেইজন্য নেপালীদের কয়েকটি সাধারণ লিপিকরপ্রমাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্করণে প্রবেশ করেছে। এই সাধারণ লিপিকরপ্রমাদের মধ্যে দু'একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'স' এর স্থানে 'ষ' (ষষহর, ষহজ), 'উ'এর স্থানে 'ত' (তআরি), 'ঢ়' স্থানে 'ট' (দিট, গটই, বট) ইত্যাদি। ১৯৩০ সালে নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালায় মূলপুঁথি আমার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে অনুলিপির মধ্যে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মূল পুঁথি ব্যতিরেকে ঐ গ্রন্থের কোন প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

চর্যাগীতির প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করায় আর-একটি অন্তরায় গ্রন্থের ভাষা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শহীদুল্লাহের আলোচনায় ঐ ভাষার সঙ্গে এখন আমাদের অনেকটা পরিচয় হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে এখনো যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এই অনিশ্চয়তার সমাধান তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন।

চরম সংস্করণ-প্রণয়নে আর একটি বাধা হচ্ছে অর্থবোধ। যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনপন্থা এই সব চর্যায় বর্ণিত হয়েছে সে সম্প্রদায় এবং তার ধর্মমতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো সীমাবদ্ধ। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ তাঁর দোহাকোষের ভূমিকায় এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রথম আলোচনা করেন (Les Chants Mystiqes…1928) এর কয়েক বৎসর পরে আমিও কতকগুলি প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের জটিল ধর্মমত আলোচনা করি (Some Aspects of the Buddhist mysticism in the Caryapadas, Some Technical terms of the Tantras, The Sandhābhāsā and Sandhāvacana). এই প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (Studies in the Tantras, Calcutta University 1939)। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা এ সম্প্রদায়ের ধর্মমত যে সমগ্রভাবে বোঝা গিয়েছে তা মনে

করবার কোন কারণ নাই। বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযান সম্প্রদায়ের অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এ ধর্মমত মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যবাদ বা পরবর্তীকালের নাথপন্থী ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনপন্থার সাহায্যে বোঝা যায় না। চর্যাপদের সাধনপন্থার দার্শনিক ভিত্তি যে প্রাচীন মহাযান ধর্মমতের মধ্যে অন্তর্নিহিত তাতে সন্দেহ নাই। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার মধ্যেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার দ্বারা ঐ সাধনপন্থার ঐতিহাসিক ক্রম নির্ণয় করাই চলে, তাকে সমগ্রভাবে বোঝা চলে না। তা ছাড়া ঐ সাধনপন্থার অনেকাংশ ছিল গুরুমুখী, সিদ্ধাচার্যদের সেই গুরুমুখী ধারা যে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় রক্ষা করেছে তা মনে করবার কোন কারণ নাই। পুঁথিপত্রের সাহায্যে এ অভাব খানিকটা দূর করা যায় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না।

কোন্ কোন্ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ এই সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করতে পারে তার কিছু উল্লেখ চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই টীকার প্রথমাংশ যতটা যত্নসহকারে রচিত হয়েছিল শেষাংশ তা হয় নি। প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ এই প্রথমাংশেই পাওয়া যায়। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। টীকার রচনাকাল আমরা জানি না। তবে মুনিদত্ত যে দ্বাদশ শতকের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। তিনি যে চর্যাসাধনার সমস্ত ধারার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন তা মনে করবারও কোন কারণ নাই। তাঁর টীকা চর্যাপদের ভাষাগত নয়, ভাবগত। সেই কারণে চর্যাপদের শব্দার্থ এই টীকায় পাওয়া যায় না, যদিও সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দুর্লভ নয়। টীকায় চর্যাপদের উল্লিখিত চর্যা বা সাধনপন্থাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সে ব্যাখ্যাও এত অস্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে যে অসম্প্রদায়িকের পক্ষে তার মধ্যে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নয়। যে সব গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা প্রামাণিক করবার চেষ্টা হয়েছে সে সব গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া গেল—

১। অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ, ২। আগম, ৩। অদ্বয়সিদ্ধি, ৪। অনুত্তরসিদ্ধি, ৫। একশ্লোক ভগবতী [প্রজ্ঞাপারমিতা], ৬। চতুর্দেবী পরিপৃচ্ছা মহাযোগতন্ত্র, ৭। জ্ঞানসম্বোধি, ৮। গুহ্যসমাজ, ৯। মাধ্যমক শাস্ত্র, ১০। প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ, ১১। প্রবন্ধ, ১২। দ্বিকল্প, ১৩। নামসংগীতি, ১৪। নিদত্তক, ১৫। যোগরত্নমালা, ১৬। রতিবজ্র, ১৭। বহিঃশাস্ত্র, ১৮। বজ্রজাপ, ১৯। বোধিচর্যাবতার, ২০। সূতক ২১। সহজসম্বর, ২২। সেকোদ্দেশ, ২৩। সম্পুটোদ্ভব তন্ত্ররাজ, ২৪। হেরুকতন্ত্র, ২৫। হেবজ্রতন্ত্র, ২৬। শ্রীসমাজ। এ ছাড়া নানা গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে,— আর্যদেব, নাগার্জুন, শান্তিদেব, দউড়ীপাদ [এই নাম লিপিকরপ্রমাদে নানাস্থানে দবড়ী, ইউড়ী, দড়তী ইত্যাদি রূপে দেখা যায়], মীননাথ, ধোকড়িপাদ, কৃষ্ণাচার্য, তিল্লোপাদ, বিরূপাক্ষ, ভুসুকু। উপরন্তু চর্যাপদগুলির রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের প্রণীত আরও অনেক গ্রন্থ হয় পুঁথিতে না হয় তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়। সেগুলিও সিদ্ধাচার্যদের সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করে। এই সমস্ত গ্রন্থ পুনরুদ্ধার না করলে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত সুস্পষ্ট ও সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

চর্যাপদের পাঠনির্ণয়ে দ্বিতীয় পুঁথি এবং শব্দগত টীকার অভাব দূর করা সম্ভব হয় তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান পূর্বেও করা হয়েছিল—কিন্তু সে অনুসন্ধান সফল হয় নি তার কারণ গ্রন্থের প্রাচীন নাম যে কি ছিল তা তখনো ঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তিব্বতী

'তাঞ্জুর' সংগ্রহে অন্য গ্রন্থের অনুবাদ সন্ধান করতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমি চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের খোঁজ পাই। অনুবাদের নাম—Spyod pa'i glu'i mdsod kyi 'grel pa shes bya ba (Tanjur, rgyud—'grel XLVII, 35)। অনুবাদে সংস্কৃত নাম উল্লিখিত হয়েছে—"চর্যাগীতিকোষবৃত্তি"। এই গ্রন্থে চর্যাপদের মূল ও টীকা উভয়েরই অনুবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্র ৪৭টি পদ পাওয়া যায়, পুঁথি খণ্ডিত বলে ২৪, ২৫ ও ৪৮নং পদ নাই। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে ৫০টি পদই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

এই তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে আমি প্রথমে চর্যাপদগুলির মূলের অর্থ ও পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করি ও আমার তুলনামূলক বিচারের প্রথম খণ্ড ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করি। (Materials for a critical edition of the Bengali Caryāpadas, part I. Journal of the Dept. of Letters 1938, pp. 1-156 ; Calcutta University)। এই প্রবন্ধে আমি তিব্বতী অনুবাদের একটি আনুবর্ণিক সংস্কৃত অনুবাদ এবং এই অনুবাদ এবং সংস্কৃত টীকার সাহায্যে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করবার চেষ্টা করি। গ্রন্থশেষে চর্যাপদের সংশোধিত পাঠও দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত টীকার তিব্বতী অনুবাদ আলোচনা করে টীকার পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের ইচ্ছা ছিল, কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু এখনো তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সংশোধিত পাঠ দেওয়া সত্ত্বেও আমার গ্রন্থ যে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই আমি আমার নিবন্ধের নামকরণ করি Materials for a critical edition। আমার নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েক বৎসর পরে ডাঃ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন Buddhist Mystic Songs (Dacca University Studies 1940)। তিনি তাঁর গ্রন্থে চর্যাগুলির যথাসম্ভব সংশোধিত পাঠ, বিশেষ বিশেষ শব্দের আলোচনা ও ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেন। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে আমার সংশোধিত পাঠগুলি তিনি গ্রহণ করেন এবং নূতন আলোচনার দ্বারা অনেক স্থলে সুসংগত নূতন পাঠও স্থির করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর এই গ্রন্থকে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি। এই সমস্ত প্রচেষ্টা যদি চর্যাপদের প্রাথমিক সংস্করণ-প্রণয়নে সাহায্য করে তা হলেই তাদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

সম্প্রতি মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় চর্যাপদের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (চর্যাপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৫১০+২১০)। এ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও গৃহীত হয়েছে। ভূমিকায় তিনি গ্রন্থপরিচয় দিয়েছেন এবং চর্যার ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, গ্রন্থশেষে শব্দসূচী এবং শব্দার্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে মূল পদগুলির ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ, মর্মার্থ এবং টীকা দেওয়া হয়েছে। মর্মার্থে প্রত্যেক পদের ধর্মতত্ত্ব এবং টীকার বিশেষ বিশেষ শব্দের আলোচনাও করা হয়েছে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তিনি সংস্কৃত টীকা অবলম্বন করে চর্যার পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রায় সর্বত্রই আমি এই টীকা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। চর্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই টীকাটি যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।"

মণীন্দ্রবাবু এই নূতন সংস্করণ-প্রণয়নে যে পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর এই

গ্রন্থ সুধীসমাজে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে বলেই তার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ এই আলোচনা কিংবা সমালোচনার দ্বারাই চর্যাপদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্ধারণের দিকে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে পারি। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থকারেরই কোন মৌলিকত্বের দাবি রাখা সংগত নয়, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে সে দিকে দৃষ্টি রেখে তার পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করা প্রয়োজন।

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে প্রায় ৩৪২টি নূতন পাঠ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪০টি আমার সংশোধিত পাঠ। যদিচ তিনি তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি তাতে কিছু আসে যায় না। আমার প্রচেষ্টা যে তাঁর পাঠনির্ধারণে সাহায্য করেছে তাতেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করি। আমি পূর্বেই বলেছি যে আমার পাঠ নির্ধারিত হয় মুখ্যতঃ তিব্বতী অনুবাদের এবং অংশতঃ সংস্কৃত টীকার সাহায্যে। যদিও মণীন্দ্রবাবু আমার এইরূপে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদের উপর তাঁর কোন আস্থা নাই। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন (পৃঃ ।৶০)—"কিন্তু প্রবোধবাবু লিখেছেন I found out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of the Tibetan text (খ, পৃঃ ৬)। এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। চর্যাপদগুলির এবং তাহাদের টীকার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। টীকা রচিত হইবার কতকাল পরে এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ধর্মতত্ত্বে প্রবেশাধিকার কিরূপ ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। এ অবস্থায় মূল সংস্কৃত টীকাটি যে তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত টীকার ব্যাখ্যা ও অর্থের সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে অনুবাদক যেন অনেক স্থানেই অর্থগ্রহণ করিতে পারেন নাই।"

মণীন্দ্রবাবুর এ উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে তিব্বতী অনুবাদের কোন মূল্য থাকে না। তিব্বতী অনুবাদ দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকে করা হয়েছিল। সে অনুবাদ যে ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী নয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তিব্বতী অনুবাদও করেন তিব্বতী লামার সহায়তায় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত। এই পণ্ডিতের নাম মহাপণ্ডিত কীর্তিচন্দ্র। অনুবাদের স্থান নেপালের স্বয়ম্ভুনাথ (Cordier, Catalogue II. p. 225)। সুতরাং সেখানে যে আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অতএব অনুবাদক যে চর্যাপদের অর্থবোধ করতে পারেন নি তা মনে করা অসংগত। তিব্বতী অনুবাদকের নিকট যে অন্য একখানি পুঁথি ছিল তাতেও সন্দেহ নাই। কারণ চর্যাপদের বর্তমান পুঁথিতে যে তিনটি চর্যা নাই (সংখ্যা ২৪, ২৫, ৪৮) তিব্বতী অনুবাদে তা পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ চর্যার মূল বর্তমান পুঁথিতে আছে, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে তা নাই।

তিব্বতী অনুবাদের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে মণীন্দ্রবাবু যে উদাহরণ দিয়েছেন তার বিচার করা প্রয়োজন। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে ৩৩ সংখ্যক চর্যায় প্রথম চার পঙ্‌ক্তি—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥

বেঙ্গ (গ) সংসার বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি চেণ্টে ষামাঅ॥

তিব্বতী অনুবাদকে সংস্কৃতে রূপান্তর করলে এইরূপ দাঁড়ায়—"নগরমধ্যে মম গৃহং, প্রতিবেশী নাস্তি। মৃদ্ভাণ্ডে ওদনং নাস্তি নিত্যং আবেশনং। ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ। দুগ্ধদুগ্ধং কিং গোস্তনং প্রবিশতি।" তৃতীয় পঙ্‌ক্তির সংশোধন না করলে অর্থ হয় 'বেঙ্গের সংসার বেড়ে যায়।' তা হলে তিব্বতী অনুবাদ কি ভ্রমাত্মক? আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে তিব্বতী অনুবাদকের নিকট ভিন্ন পাঠ ছিল। মণীন্দ্রবাবু বলেছেন যে সংস্কৃত টীকার সাহায্যে বেশ বোঝা যায় যে তিব্বতী অনুবাদক লাইনটির কদর্থ করেছেন। সংস্কৃত টীকায় আছে—"বিগতমঙ্গং যস্য স ব্যঙ্গঃ, অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাস্বরং বোদ্ধাব্যং। অঙ্গস্য ষড়গতৌ সয়তি গচ্ছতীতি স সয়ঃ তদেব বায়ুরূপং। তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিত।" এখানে 'ব্যঙ্গ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া হচ্ছে, "যার অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে বা যা শূন্যস্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রভাস্বর।" টীকার তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে যে "সেই ব্যঙ্গ বা প্রভাস্বরের দ্বারা বিজ্ঞান চালিত হচ্ছে।" এই বিজ্ঞানকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে কথা দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে—"সয়তি গচ্ছতীতি স সয়ঃ, তদেব বায়ুরূপং"। মণীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনায় এ লাইনটির কোন উল্লেখ করেন নি, কারণ তার অর্থবোধ করা যায় না। অথচ "মমার্থ"-নির্ধারণে এ লাইনটির যে বিশেষ তাৎপর্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই অংশটির পাঠনির্ণয় টীকার তিব্বতী অনুবাদ হতেই সম্ভব হয়— এর তিব্বতী অনুবাদ হচ্ছে—brgyaṅ śiṅ 'go ba'i phyir sbrul lo ; de ñid rluṅ gi ṅo bo. একে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়— "সর্পতি (সন্তয়তি বা) গচ্ছতীতি সর্পঃ ; তদেব বায়ুরূপং"। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে টীকায় "সয়তি" এবং "সয়ঃ" লিপিকরপ্রমাদ— টীকার তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে তাদের সংশোধন করতে হবে "সর্পতি" এবং "সর্পঃ"। এই সর্পকে তার বিশেষ গতির জন্য বায়ুর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিজ্ঞানের' সাংবৃতিক রূপও তাই ; বিজ্ঞান = বায়ু = সর্প ; বেঙ্গ = ব্যঙ্গ = প্রকৃতিপ্রভাস্বর। এই প্রকৃতি-প্রভাস্বরের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ সর্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে— অতএব "ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ"। সেই কারণেই আমি মূলপাঠ সংশোধন করেছিলাম "বেঙ্গস সাপ বড়্হিল জাঅ"। অতএব যে টীকার সাহায্যে মণীন্দ্রবাবু তিব্বতী অনুবাদের মূল্য খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন সেই টীকাই এ পাঠকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। আমার এই প্রস্তাবিত পাঠের আর কোন সংশোধন প্রয়োজন আছে কিনা অর্থাৎ "বেঙ্গস সাপ" হবে না "বেঙ্গ সাপস" হবে তা ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বলতে পারেন। আমার নিকট অর্থ সুস্পষ্ট—"ব্যাঙ্গ ও সাপের মধ্যে যে লড়াই চলছে তাতে ব্যাঙ্গই সাপকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে"। এ অর্থেই paradox সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মণীন্দ্রবাবু তাঁর সংস্করণে ৩৪২ নূতন পাঠের মধ্যে আনুমানিক ১০০টি স্বতন্ত্র পাঠ দিয়েছেন। এ পাঠগুলিও ঠিক তাঁর নিজস্ব নয়, কতকগুলি পাঠে মূল পুঁথির লিপিকর-প্রমাদগুলিই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে যেমন—ষষহর, ষহজ (২৭) ; ষামাঅ, ষা, ষিআলা, ষিহে, ষম (৩৩) ; বুঝষি (৪১) ; বট (৩৬,৩৯)।[১] কতকগুলি নূতন পাঠের সমর্থনে কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই— খাঅ, চোরে (২) ; সান্ধ, কান্ধ (৩) ; ঘাণ্টি, পিবমি (৪) ; ভবণই পাটী (৫) ; দীসঅ (৬) ;

১ আমার সংশোধিত পাঠ— শশহর, সহজ, সামায়, সা, সিআলা, সিহে, সম, বুঝসি, বড়।

বাহিরি, জাহ সো, চৌষঠ্‌ঠী (১০) ; খন্টে (১১) ; লাগিরে (১৬) ; উছলিআ চলিআ (১৯) ; ফিটলিউ, অন্তউরি, ভইলেসি (২০) ; আকারা, আহারা, গাতি, কাল, তাবসে (২১) ; ভাইব (২৯) ; তৈলোত্র (৩০) ; করুণা, রাজই, পড়িভাসই, পইসই (৩১) ; ভাইলা (৩২) ; করুণরি, অলকৃখলকৃখই চিত্তা (৩৪) ; অচ্ছিলেঁা, মকুঁ, সব্বই, (৩৫) ; মা (৩৭) ; মেল (৩৮) ; বিদারঅ (৩৯) ; ভান্তিএঁ, সসরসিংগে, সহাব (৪১) ; তৈলোএ (৪২) ; ইত্যাদি।[১] এগুলি প্রধানতঃ মূল পুঁথির পাঠ ; কোথাও ছন্দের মিলের খাতিরে, কোথাও বা ব্যাকরণসাম্য রক্ষার জন্য এ সব পাঠগুলি সংশোধন করা হয়েছিল, কিন্তু মণীন্দ্রবাবু কোথাও মূল পাঠ রেখেছেন, কোথাও সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন, ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি। দুই একটি প্রমাণ দিলেই তা বোঝা যাবে। দীসঅ (৬)— আমি সংশোধন করেছিলাম 'দীসই', পরবর্তী লাইনের 'পইসই'র সঙ্গে ছন্দোগত মিলের জন্য। খন্টে (১১)— আমার সংশোধিত পাঠ 'খাটে', কারণ পরের লাইনে আছে 'বীরনাদে' (হয়ত শুদ্ধ পাঠ 'বীরনাটে') ; ভাইব (২৯)— আমার সংশোধিত পাঠ 'ভাবই' কিন্তু মণীন্দ্রবাবু বলেছেন ভাইব = ভাব্য ; মূল—লুই ভণই [মই] ভাইব কিসঃ সংস্কৃত টীকায় "ময়া কিং ভাব্যম্‌" ; মণীন্দ্রবাবু অনুবাদ করলেন—"মোর ভাব্য কিছু নাই"। এ অনুবাদ যে মোটেই ব্যাকরণসম্মত নয় তা মণীন্দ্রবাবুও স্বীকার করবেন। অন্তউরি (২০)—মূলে ছিল "অন্ত উড়ি", সংশোধিত পাঠ 'অন্তউড়ি', মণীন্দ্রবাবু লিখলেন—'অন্তউরি'। "র" ও "ড়"এর মধ্যে কি কোন ধ্বনিগত পার্থক্য নাই ? এই কয়েকটি উদাহরণ হতেই তাঁর বানানগত সংশোধনের ভিত্তি যে অতি শিথিল তা বোঝা যাবে।

বাকি কতগুলি পাঠে মণীন্দ্রবাবু মৌলিকত্ব দাবি করতে পারেন। অতএব সে পাঠগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। মূল পুঁথিতে কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি শব্দের প্রাকৃত রূপ যথা—কাড্‌ডিঅ, নিয়ড্ডী (৫) ; মোড্‌ডিউ (৯)। এগুলিকে তিনি সংশোধন করেছেন ফাড়িঅ, নিয়ড়ি, মোডিউ। এ সংশোধনের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ ওগুলি প্রাকৃত শব্দ হিসাবেই গ্রহণ করা চলে।

(৩) মূল— স ডুলী, লিপিকরপ্রমাদে 'ঘ' 'স' হয়েছে— আমার সংশোধিত পাঠ ঘড়ুলী, সংস্কৃত টীকায়— ঘড়ুলী ; মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন ঘড়লী এবং তার পূর্বে "সে" শব্দ যোগ করেছেন।

(৫) মূ[২]—কোহিঅ, মণীন্দ্রবাবু—কোরিঅ—অর্থ 'দৃঢ় কর'। কিন্তু টাঙ্গীর কাজ ত দৃঢ় করা নয়, কাটা। সুতরাং 'কোহিঅ' এমন কোন শব্দ যার অর্থ ছিল "কাটা।" তিব্বতী অনুবাদে—phugs "ভিন্ধতাম্‌" ; শহীদুল্লাহ—'কোহিঅ' শব্দকে সংশোধন করেছেন—"কোড়িঅ"। পূর্ব পংক্তির "জোড়িঅ" শব্দের সঙ্গে তার মিল খুব বেশি। তিনি বলেছেন যে Middle Bengalীতে √কোড় = খোঁড়া (digging) অর্থে পাওয়া যায়। তাঁর এ সংশোধন অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তবুও সন্দেহ থাকে— টাঙ্গী দিয়ে খোঁড়া হয় না, কাটা হয়।

---

১ আমার সংশোধিত পাঠগুলি যথাক্রমে—খাই চৌরী (২), সান্ধে, কান্ধে (৩), ঘাণ্ট, পীবমি (৪), ভবনই, পটি (৫), দীসই (৬), বাহিরে, জাইসো, চৌষঠী (১০), খাটে (১১), লাগেলি রে (১৬), উছলিলা, চলিলা (১৯), ফিটলে, অন্তউড়ি, ভইলে সি (২০), অচারা, অহারা, গাতী, কালা, তবসে (২১), ভাবই (২৯), তিলোএ (৩০), করুণ, রাজঅ, পড়িভাসঅ, পইসঅ (৩১), ভইলা (৩২), করুণ রে অলকৃথ লকৃথই চিএ (৩৪), অচ্ছিল, মোকু, সর্ব্বদাই (৩৫) নাহি (৩৭), মেলি (৩৮), বিদারিঅ (৩৯), ভন্তিএঁ, সসসিংগে সহাবা (৪১), তিলোএ (৪২)

২ মূ—মূলপাঠ ; প্রঃ—আমার সংশোধিত পাঠ।

(१) মু—মোহিঅই, প্রঃ—মো হিঅহি, তিব্বতী—bdag gi sñeṅ mi—"মম হৃদয়ে", মণীন্দ্রবাবু—মোহহেতু ; তাঁর মতে মোহিঅই = সংস্কৃত মোহিতোঽপি।

(১৮) মু— ডোম্বী তআগলি, প্রঃ—ডোম্বী ত আগলি,—"রে তোম্বী তোর চাইতে"। শহীদুল্লাহও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। পূর্ব পদেও ডোম্বীকে সম্বোধন করা হয়েছে—"তোহোরে বিরুআ বোলই··· তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই"। মণীন্দ্রবাবু—"ডোম্বীত আগলি"— তিনি যুক্তি দিয়েছেন "অধিকরণে প্রযুক্ত অস্ত-জাত ত-যোগে এখানে অপাদানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে"। অপাদান না হয়ে সম্বোধন হলে এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য থাকে কিনা তা তিনি বিচার করেন নি।

(২০) মু—জান জোবন মোর ভইলেসি পূরা— প্রঃ—জা ন জোবন মোর ভইলে সি পূরা— "আমার যে নবযৌবন তা পূরা [= সার্থক] হইল"। তিব্বতী অনুবাদও এই অর্থ সমর্থন করে। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু—"জাণ জোবন ···" = "বিজ্ঞান যৌবন মোর যবে পরিপূর্ণ হ'ল"। বিজ্ঞান কি করে 'জাণ' হয় তা বোঝা শক্ত। চর্যায় প্রথমে "পহিল বিআণ" এবং আনুসঙ্গিক আনন্দ ও অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। নবযৌবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করলে অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

(৩০) মু—এত বিষারা, প্রঃ—এত বি সারা—"এই-ই সার (পদার্থ)"। তিব্বতীও এইরূপ পাঠ সমর্থন করে। মণীন্দ্রবাবু—"এত বিসারা—এতই বিস্তার"। কিসের বিস্তার? মণীন্দ্রবাবু বলেছেন "আনন্দের"। কিন্তু পদে 'আনন্দের' কোন উল্লেখ নাই। 'এ তৈলোএ এত বি সারা'। সংস্কৃত টীকার 'নান্যোপায়োঽস্তি'র অর্থও হচ্ছে— এইটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। মণীন্দ্রবাবুর পাঠের সমর্থন সংস্কৃত টীকাও করে না।

(৩২) মু—গজিই, প্রঃ—মজিই ; টীকায়—"সংসারসমুদ্রে মজ্জন্তি", তিব্বতী অনুবাদে—সানন্দে যায় অর্থাৎ 'মজে'। মণীন্দ্রবাবু মূলপাঠ 'গজিই' রেখেছেন, অনুবাদ করেছেন—"যায়" ; শব্দসূচীতে লিখেছেন "গজিই ? টীকা—অনুগম্যতে।" টীকায় কোথাও 'অনুগম্যতে' নাই। 'গজিই' পদ সম্বন্ধে যদি সন্দেহই থাকে তবে মজিই পাঠ গ্রহণ করায় আপত্তি কি ?

(৩৩) মু—সো ধনি বুধী ; প্রঃ—সো ধনি বুধী, আমার এ সংশোধিত পাঠ ভুল, কারণ তিব্বতীতে আছে—"যঃ প্রাজ্ঞঃ স এব প্রজ্ঞাহীনঃ" = "জো সো বুধী সো নিবুধী"। মণীন্দ্রবাবুর "শোধ নিবুধী"র 'শোধ' অর্থহীন।

(৩৫) মু—পণিআঁ ; প্রঃ—পাণিআ ; তিব্বতী অনুবাদের অর্থ—"গগনসমুদ্র আমার দ্বারা ভক্ষিত হইল"। মণীন্দ্রবাবু পণিআ সংশোধন করে পসিআ লিখেছেন। তাঁর মতে পদটি হচ্ছে—"মই অহারিল গঅণত পসিআ" = "গগনসমুদ্রে আমি করেছি প্রবেশ"। এ অনুবাদ যে কি করে হয় তা বলা কঠিন। 'অহারিল'—প্রধান ক্রিয়া ; তার কর্ম কোথায় ? 'পসিআ' = 'প্রবেশ করিয়া' ; তার অর্থ 'করেছি প্রবেশ' কি করে হয়। "গঅণত" = "গগন হইতে" কিন্তু মণীন্দ্রবাবু লিখলেন "গগনে সমুদ্রে" ? "আমার দ্বারা গগন হইতে পাণি আহার করা হয়েছে"—অর্থ ই সুসঙ্গত নয় কি ?

(৩৬) মু—"সঅল সুফল করি"—আমার সংশোধিত পাঠ "সঅল মুকল করি", কারণ তিব্বতী অনুবাদে "সকলং মুক্তীকৃত্য"। সংস্কৃত টীকায় "জ্ঞানেন···সকলং ত্রৈলোক্যং পরিশোধ্য"। মণীন্দ্রবাবু "সুফল"ই রেখেছেন। অর্থ করেছেন—"সুফল করি" কিন্তু ত্রৈলোক্যের বিশুদ্ধীকরণ আর সুফল

করা এক কথা নহে। পদের অষ্টম পংক্তিতে মূলে ছিল "ঘোরিঅ অবণাগমন"। আমি সংশোধন করি "ঘোলিঅ—" তিব্বতীতে 'মিশ্রীকৃত্য', 'ঘোলিঅ' শব্দের এ প্রয়োগ চর্যা ও দোহার নানা স্থানেই পাওয়া যায়। মণীন্দ্রবাবু ঘোরিঅ পাঠই রেখেছেন, অর্থ করেছেন "গমনাগমন ঘানি…"। নিজের টীকায় লিখেছেন "ঘোরিঅ—ঘানিকেতি"। কিন্তু সংস্কৃত টীকায় ঐ অর্থে ঘানিকা ব্যবহৃত হয় নি। এই পদের শেষ পংক্তিতে মূলে "পাখি" আছে, আমিও সেই পাঠ রেখেছি, কারণ অর্থ হচ্ছে "সন্নিধানং"—'নিকটে'। আমি অনুমান করেছিলাম 'পাখি' < 'পক্ষ' হিসাবে গ্রহণ করা চলে। মণীন্দ্রবাবু সংশোধন করেছেন 'পাশি' <পার্শ্ব। এ সংশোধনের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ মূল পুঁথির পাঠই যথেষ্ট অর্থদ্যোতক।

(৩৭) মূ—অছিলে স, প্রঃ—ইছিলেসি ; তিব্বতী অনুবাদে "যেমন ইচ্ছা কর"। সংস্কৃত টীকায়—"নিঃশঙ্কং সিংহরূপেণ ভ্রম"। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন—"অছিলেসি"—"যেমন ছিলে" ; এর কোন সমর্থন আছে কি ?

(৩৮) মূ—"মেলি মেল সহজে"—প্রঃ—"মেলি মেলি সহজে"—কারণ তিব্বতীতে "মিলিত্বা মিলিত্বা"—মণীন্দ্রবাবু মূল পাঠ রেখেছেন কিন্তু অনুবাদ করেছেন—"সহজ পথেতে চল"। কিন্তু শব্দসূচীতে 'মেলি' শব্দের অর্থ দিয়েছেন—মেল ধাতু+ই (ত্বাচ্ হইতে)। মেল ধাতুর অর্থ পূর্বপদে দিয়েছেন—"পরিত্যাগ করা"। এ অর্থ কোথা হতে এসেছে বোঝা কঠিন।

তিনি এ ছাড়া আরও ১০।১২টি মৌলিক পাঠ নির্ধারণ করেছেন। সেগুলির আর বিশদ আলোচনা করবার প্রয়োজন নাই। পূর্বের পাঠালোচনা হতেই বেশ বোঝা যাবে যে পাঠ নির্ধারণে মণীন্দ্রবাবু কোন একটা সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ করেন নাই। যে সমস্ত পাঠ তাঁর প্রদত্ত মৌলিক পাঠ হিসাবে গৃহীত হতে পারত সেগুলি ব্যাকরণ, অর্থসংগতি, সংস্কৃত টীকা, বা তিব্বতী অনুবাদ কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে বিচার করে কাযে অগ্রসর হতেন তাহলে তাঁর এই পরিশ্রম সার্থক হত, আমরাও চর্য্যাপদের একটি প্রামাণিক সংস্করণ না পেলেও অন্ততঃ তার দিকে অনেকটা অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু যেরূপে তাঁর এই সংস্করণ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সেই কারণে সে সংস্করণ কোন প্রামাণিকতার দাবি করতে পারে না।

(৩)

চর্যাপদসংগ্রহ গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে এখনো কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছানো গিয়েছে একথা মনে করবার কারণ নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের নাম "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে এ নামকরণ ঠিক নয়, কারণ 'চর্য্যাচর্য্য' কথার কোন সুসংগত অর্থ পাওয়া যায় না। তিনি অনুমান করেন যে গ্রন্থের সঠিক নাম ছিল "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়"। এ নাম তিনি পেয়েছেন প্রথম চর্যাপদের টীকা হতে—"শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে"। তাঁর প্রদত্ত নামের সমর্থনে বলা চলে যে তিব্বতী অনুবাদেও এই অংশটি অনূদিত হয়েছে—"the most wonderful Carya songs"। ডাঃ শহীদুল্লাহ ও নির্বিচারে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' নামই সঠিক বলে গ্রহণ

করেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে পুঁথির উপর 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম কোথা থেকে এল ? নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত নয়। আমার মনে হয়েছিল যে মূলে এই নামটি ছিল "চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়" —লিপিকরপ্রমাদে ঐ নামটি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' রূপ নিয়েছে। এই সংশোধনেও সংস্কৃত টীকায় উল্লিখিত নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা চলে। ছন্দের খাতিরে "চর্য্যাশ্চর্য্য" টীকার শ্লোকে 'আশ্চর্য্যচর্য্যা' হয়েছে। তা ছাড়া টীকার ঐ শ্লোকে মূল নামটি যে পুরাপুরি উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে করবারও বিশেষ কারণ নাই। বিশেষতঃ মঙ্গলাচরণের শ্লোকে তা করাই হয় না। এই কারণে বলেছিলাম যে গ্রন্থের "চর্য্যাশ্চর্য্য-বিনিশ্চয়" নাম করাই বিধেয়।

মণীন্দ্রবাবু তাঁর ভূমিকায় মূল পুঁথির উপরে লিখিত নামের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, "চর্য্য অর্থে আচরণীয়, এবং অচর্য্য অর্থে অনাচরণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিষয়ের নির্দেশ যে গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। মণীন্দ্রবাবুর এই অর্থ যে সুসংগত হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের যে নাম দিয়েছিলেন অর্থাৎ 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'—সে নাম সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য ও নির্ভুল বলেই মনে হয়। কিন্তু গ্রন্থের এ নাম যে সাধারণে প্রচলিত ছিল একথা মনে করা যায় না। চর্যাপদের এই সংগ্রহ ও সংস্কৃত টীকার রচয়িতা মুনিদত্ত যে নাম দিয়েছিলেন সে নাম হচ্ছে "চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি"। সুতরাং চর্যাসংগ্রহের নাম ছিল "চর্য্যাগীতিকোষ", আর প্রত্যেক চর্যার নাম ছিল "চর্য্যাগীতি"। এই চর্যাগুলি নানা রাগ সংযোগে গান করা হত তার উল্লেখ গ্রন্থেই রয়েছে। সুতরাং 'চর্যাগীতি' নামই যে সুসংগত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

চর্যাপদের মূল পুঁথি ত্রুটিত বলে মাত্র ৪৭টি পদ পাওয়া যায়। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু তাঁর ভূমিকায় (পৃঃ ॥৵০—॥৶০) অকারাদিক্রমে যে সিদ্ধদের নাম ও পদসংখ্যার সূচী দিয়েছেন তাতে ৫০টি পদই রয়েছে। এর কারণ তিনি আমার প্রবন্ধের সূচীটি নির্বিচারে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, আমার প্রবন্ধে পদগুলির তিব্বতী অনুবাদেরই সূচী দেওয়া হয়েছে, তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে ৫০টি পদই পাওয়া যায়। যে তিনটি পদের মূল পাওয়া যায় নি আমি সেগুলির তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়া দিয়েছি, তা থেকে পদগুলির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাবে।

পূর্বেই বলেছি যে সিদ্ধাচার্যদের দুরকম রচনা পাওয়া যায়— অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষায় রচিত দোহা, এবং প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। তিব্বতী অনুবাদে সিদ্ধদের রচিত আরও অনেক গীতিকা সংরক্ষিত রয়েছে। হয়তো অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গীতিকাও তাদের মধ্যে ছিল। দোহাগুলি যে কোনদিন গান করে শোনানো হত তা মনে হয় না। পদগুলি নানা রাগে গীত হত। সে সব রাগের নামও গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালের সাধকদের রচনাবলীর মধ্যে এই দুই প্রকারের রচনা পাওয়া যায় কবীর-গ্রন্থাবলীতে যেমন রাগসংযুক্ত পদাবলী রয়েছে তেমনি সাখিসংগ্রহে প্রাচীন দোহার অনুরূপ বিবিধ বিষয়ে রচিত কাব্যও রয়েছে।

সিদ্ধদের রচিত দোহার ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত সরল। যে সাম্প্রদায়িক মতবাদ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাও বোধগম্য। কিন্তু চর্যাগীতিগুলির পরিসর সীমাবদ্ধ বলে তাদের ভাষা ও ভাব অনেক স্থলেই অত্যন্ত দুরূহ। তারপর এগুলি লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়েই

হয়তো সিদ্ধাচার্যেরা ইচ্ছা করে এগুলিকে হেঁয়ালিতে পরিণত করেছিলেন। কবীরের সাখিসংগ্রহ ও রাগযুক্ত পদের ভাষা ও ভাবের মধ্যেও ঐ একই পার্থক্য লক্ষিত হয়।

যে সব রাগে চর্যাগীতিগুলি গাওয়া হত তার মধ্যে প্রচলিত এবং অধুনালুপ্ত রাগের নামও পাওয়া যায়। রাগগুলির নাম দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

অরু (৪); ইন্দ্রতাল (২৪); কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২); গবড়া, গউড়া (২, ৩, ১৮); গুর্জরী, কাহ্নু গুর্জরী, গুঞ্জরী (৫, ২২, ৪১, ৪৭), দেবক্রী (৮), দেশাখ (১০, ৩২), ধনসী, ধানশ্রী (১৪), পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮), মল্লারী (৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯), মালসী, মালশ্রী (৩৯), রামক্রী = রামকেলি (১৫, ৫০), বঙ্গাল (৪৩), বরাড়ী, বলাড্ডি (২১, ২৩, ২৮, ৩৪), শবরী (২৬, ৪৬)। রাগের উল্লেখ থেকে পটমঞ্জরীই যে তখন খুব জনপ্রিয় রাগ ছিল তা অনুমান করা চলে। তবে এসব রাগের কাঠামো কি ছিল তা বলা শক্ত। সঙ্গীতরত্নাকর প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ। সে জন্য মনে করা যেতে পারে যে রত্নাকরের পদ্ধতি অনুযায়ীই এ রাগগুলি গাওয়া হত।

মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দু লাইনের শেষে "ধ্রু" কথাটিরও উল্লেখ আছে। "ধ্রু" কথাটির তাৎপর্য মণীন্দ্রবাবু বা ডাঃ শহীদুল্লাহ্ কেহই আলোচনা করেন নি। অথচ পদরচয়িতার কাছে এ কথাটির মূল্য যে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নাই। "ধ্রু" যে ধ্রুবপদের সংকেত তা সংস্কৃত টীকা হতে বোঝা যায়। ২, ৩, ৫ প্রভৃতি সংখ্যক পদের টীকায় 'ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন্' 'ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দমুদ্দীপয়ন্নাহ' ইত্যাদি উক্তিতে ধ্রুবপদের উল্লেখ রয়েছে। গীতিকার মধ্যে কোন্ পদটি ধ্রুবপদ ছিল তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ২য় গীতিকায় ও ৩য় গীতিকায় দ্বিতীয় পদকে ধ্রুবপদ বলা হয়েছে মনে হয়। কারণ টীকায় দ্বিতীয় পদের অর্থনির্দেশের প্রারম্ভেই ধ্রুবপদের উল্লেখ করা হয়েছে।—(২) ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বান্নাহ অঙ্গনমিতি [দ্বিতীয় পদটি হচ্ছে—অঙ্গন ঘরপণ ইত্যাদি], (৩) ধ্রুবপদেন পরমার্থ বোধিচিত্তং দৃঢ়ীকুর্বান্নাহ—সহজেতি [দ্বিতীয় পদটি সহজে থির করি ইত্যাদি], কিন্তু সংস্কৃত টীকায় এই ধ্রুবপদকে দ্বিতীয় পদ বলা হয় নাই। তৃতীয় পদকেই দ্বিতীয় পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ধ্রুবপদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গীতিকায় পদসংখ্যা যা খুশি হতে পারে, ৫, ৬, ইত্যাদি কিন্তু প্রথম পদের পর যে পদ উল্লেখ করা হয়েছে তার স্থান 'ধ্রুব' বা নির্দিষ্ট। সংস্কৃত টীকার তিব্বতী অনুবাদেও এই পদকে ধ্রুবপদ বলা হয়েছে dhu'i rkaṅ pa, অর্থাৎ "ধু পদ।" ধু শব্দ ধ্রুব শব্দেরই প্রাচীন বাংলারূপ, এর থেকেই পরে 'ধুয়া' শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

প্রত্যেক পদের শেষেই 'ধ্রু' কথার উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে প্রত্যেক পদ গাইবার পর ধ্রুবপদটি গাইতে হত। এপদটি বর্তমানে প্রচলিত সংগীতের "স্থায়ীর" স্থান অধিকার করত। প্রাচীন সংগীতপদ্ধতিতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা অর্থাৎ গীতের প্রথম পদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পদ 'স্থায়ী' হিসাবে গৃহীত হত কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত।

চর্যাগীতিকায় ধ্রুবপদের আর একটি প্রয়োজনও দেখা যায়। ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এই পদটিতেই চর্যায় উল্লিখিত সাধনপথের সূত্রটি দেওয়া হয়েছে এবং সাধককে তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণে একথা স্পষ্ট হবে।

২য় গীতিকার ধ্রুবপদ— অঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরী নিল অধরাতী ॥

৩য় গীতিকার ধ্রুবপদ— সহজে থির করি বারুণী সান্ধে
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় চাঝে। ইত্যাদি

গীতিকাগুলির পরবর্তী পদগুলিতে এই সূত্র অনুসরণ করেই সাধনপন্থার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই কারণে এই ধ্রুবপদের বার বার উল্লেখে শ্রোতার মনে কোন বিরক্তির উন্মেষ হত না। বরং মূল সূত্রের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি উত্তরোত্তর বেশি আকৃষ্ট হত। উত্তরভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে স্থায়ীর কাজও দুই প্রকার। প্রথমত স্থায়ী বার বার উল্লেখে রাগের প্রধান স্বরসন্নিবেশে শ্রোতা পুনঃ পুনঃ রাগের সূত্রের সন্ধান পান, দ্বিতীয়ত গানের প্রথম কথাগুলি বার বার ফিরে আসবার দরুণ শ্রোতা মানসপটে ছবি এঁকে নিতে পারেন, বাকি কথা না বুঝলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। চর্যাগীতিকার ধ্রুবপদেরও এই প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই মনে হয়।

ময়ূরাক্ষী। শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

দর্শন

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বর্তমান রচনাটি ঠাকুর-পরিবারের হাতে-লেখা "পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তক" হইতে সংকলিত। খাতাখানি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। খাতার সূচনাতেই নির্দেশ আছে, "ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলেই (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন) আপন আপন মনের ভাব—চিন্তা— স্মর্তব্য বিষয়— ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।" ১৮৮৮ সালের ৫ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুস্তকের সূচনা করেন; ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 'শুভবিবাহ'-রচয়িত্রী বা "লাহোরিণী" শরৎকুমারী চৌধুরানী, সরলা দেবী প্রভৃতি বহু জন মিলিয়া এই খাতায় লঘুগুরু নানা বিচিত্র বিষয়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক রচনা রবীন্দ্রনাথের; তাহার কতকগুলি ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্টগুলি ক্রমশ প্রকাশ করা হইবে।]

বেদান্তশাস্ত্র "রজ্জুতে সর্পভ্রম" এইরূপ কতকগুলা মোটামুটি উপমাদ্বারা জগদ্‌ভানের স্বপ্নবত্তা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছে কিন্তু তাহা আধুনিক কালের উপযোগী সর্ব্বলোকের বুদ্ধিসুলভ রকমে বুঝাইয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে বুঝাইয়া দেওয়া বিধেয়—

স্মৃতিস্বপ্ন	ক্ষণিক দৃশ্য	আশাস্বপ্ন
ভূত জগৎ	বর্ত্তমান জগৎ	ভবিষ্যৎ জগৎ

ক্ষণিক দৃশ্যরূপী (ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিকদৃশ্যরূপী) বর্ত্তমান জগৎকেই আমরা বাস্তবিক বলি, তা ভিন্ন স্মৃতির স্বপ্নদর্শন এবং আশার স্বপ্নদর্শন এই দুইরূপ স্বপ্নদর্শন যে স্বপ্নের ন্যায় বস্তুশূন্য মানসিক ব্যাপার-মাত্র (অর্থাৎ subjective মাত্র) এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষণিক দৃশ্য যাহাকে আমরা বাস্তবিকতার পত্তনভূমি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি তাহা শুদ্ধ কেবল একটি শূন্য জ্যামিতিক বিন্দুর উপরে— পলায়মান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকুর উপরে— ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু শূন্যের উপরে ভর করা কিরূপ? কিছু-না'র উপর ভর করা কিরূপ? কিছু-না'র উপরে ভর করা আর কিছুরই উপর ভর না করা— এ দুয়ের অর্থ একই। "বর্ত্তমানের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে হস্তগত করো" এটা লঙ্‌ফেলো'র কবিতাতেই শুনায় ভাল— কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের চুলই নাই তার আবার চুলের ঝুঁটি! মাথা নাই তার আবার মাথাব্যথা! বস্তুর বাস্তবিকতা শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছে— পলায়মান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের উপরে দাঁড়াইয়া আছে— জ্যামিতিক বিন্দুর উপরে দাঁড়াইয়া আছে — এ কথাটি নিতান্তই আত্মঘাতী, কেননা এ কথা যদি সত্য হয় যে, বাস্তবিকতা শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছে তবে দাঁড়ায় যে, বাস্তবিকতা শূন্যমূলক—অমূলক—অবাস্তবিক। অতএব বস্তুর বাস্তবিকতা পলায়মান

মুহূর্ত্তের উপরে— জ্যামিতিক শূন্যের উপরে— দাঁড়াইয়া আছে, এ কথার বিস্‌মোল্লায় গলদ। বস্তুর বাস্তবিকতা যদি শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া নাই— বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকুর উপরে দাঁড়াইয়া নাই— তবে তাহা কিসের উপরে দাঁড়াইয়া আছে? এইটিই হচ্চে এখন জিজ্ঞাস্য। জগৎ হইতে যদি বর্ত্তমানের দৃশ্য অংশটুকু বাদ দেওয়া যায় তবে তাহার কি অবশিষ্ট থাকে? রুই মাছ হইতে যদি তাহার পেটী-অংশ বাদ দেওয়া যায় তবে তাহার কি অবশিষ্ট থাকে? অবশ্য ল্যাজা-মুড়া! জগৎ হইতে যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের দৃশ্যদর্শন বাদ দেওয়া যায় তবে কি অবশিষ্ট থাকে? অবশ্য (১) ভূতকালের স্বপ্নদর্শন এবং (২) ভবিষ্যৎকালের স্বপ্নদর্শন— (১) স্মৃতিস্বপ্ন এবং (২) আশাস্বপ্ন—এই দুই অংশ অবশিষ্ট থাকে। জগতের বাস্তবিকতা যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকুর উপরে দাঁড়াইয়া নাই, তবে কি তাহা ভূতকালের স্মৃতিস্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের আশাস্বপ্ন এই দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে? তাহা যদি সত্য হয় তবে, একে তো দুই নৌকায় পা দিয়া দাড়ানো তাহাতে আবার নৌকা দুটি স্বপ্নের নৌকা! ইহারই নাম গোদের উপর বিষফোড়া! যদি বলা যায় যে, বস্তুর বাস্তবিকতা— অংশহীন, আয়তনহীন, শূন্য মুহূর্ত্তের অদৃশ্য দৃশ্য-অংশের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে দাঁড়ায় যে, বাস্তবিকতা শূন্যমূলক = অমূলক = অবাস্তবিক। আবার, যদি বল যে, বস্তুর বাস্তবিকতা— স্মৃতিস্বপ্ন এবং আশাস্বপ্ন এই দুই স্বপ্নের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে দাঁড়ায় যে, বাস্তবিকতা = স্বপ্নমূলক = অবাস্তবিক। উভয় পক্ষেই দাঁড়ায় যে, বাস্তবিকতা = অবাস্তবিকতা। সুতরাং উভয় পক্ষেরই বিস্‌মোল্লায় গলদ। অতএব এক দিকে বর্ত্তমানের দৃশ্য-ভান (ভান অর্থাৎ phenomenon) এবং আরএক দিকে ভূত-ভবিষ্যতের স্বপ্ন-ভান (i. e., স্মৃতিস্বপ্ন এবং আশাস্বপ্ন) এ দুয়ের কোনোটিই বাস্তবিকতার মূল বলিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অতএব বাস্তবিকতার মূল ত্রিকালে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না— অকালেই তাহার মূল অন্বেষিতব্য। বেদান্তের মতে তাই কালাতীত পরব্রহ্মই সকল বাস্তবিকতার মূল— ত্রৈকালিক জগৎ ভান-মাত্র। All this amounts simply to this truism: Phenomenon is phenomenon, Noumenon is Noumenon, —only this and nothing more.

বেদান্তদর্শনের মত সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

উপরে যাহা বলিলাম তাহার তাৎপর্য্য আর কিছু নয় শুদ্ধ কেবল এই যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকু লইয়াই বস্তুর বাস্তবিকতা— dead past এবং unborn future, both are destitute of বাস্তবিকতা। Now, যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকুকে জাপটিয়া ধরিয়া তাহার দুইটা ডানা ছাঁটিয়া ফেলা যায়— বর্ত্তমান হইতে যদি ভূত এবং ভবিষ্যৎ উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়— তবে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটি জ্যামিতিক বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে,

বর্ত্তমান = Geometrical point = Zero

i. e., বর্ত্তমান = অবর্ত্তমান which is absurd.

তুমি হয় তো বলিবে যে, বর্ত্তমানকাল-মুহূর্ত্তটিই যেন zero, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তের ঘটনাগুলা তো আর zero নহে। কিন্তু আমি পরীক্ষায় প্রমাণ পাইতেছি যে, zero মুহূর্ত্তে যাহা ঘটে তাহাও = 0; যথা—
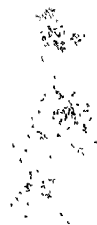
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যক্ষ দেখো, পতঙ্গটা অগ্নিশিখার এপার হইতে ওপারে এমনি দ্রুতবেগে উত্তীর্ণ হইয়াছে যে, তাহার গায়ে একটুও আগুনের আঁচ লাগে নাই।[১] ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অতীব অল্পক্ষণস্থায়ী উত্তাপ = অতীব অল্প উত্তাপ ; অতএব zero-মুহূর্ত্ত-স্থায়ী উত্তাপ = O। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ডানাছাঁটা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটুকুই যে কেবল = zero, তাহা নহে, সেই zero-মুহূর্ত্ত-স্থিত ঘটনাও = zero।
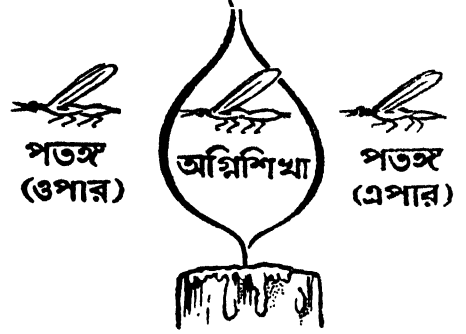
অথচ আবার দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে যাহা ঘটে সেই ঘটনাকেই আমরা বাস্তবিক বলি,—ঘটিবার সময়েও তাহাকেই আমরা বাস্তবিক ঘটনা বলি, —ঘটিবার পরেও তাহাকেই আমরা বাস্তবিক বলি। কিন্তু প্রমাণ হইয়াছে যে—

Zero-মুহূর্ত্ত-স্থায়ী ঘটনা = Zero
বর্ত্তমানমুহূর্ত্ত = Zero-মুহূর্ত্ত
অতএব, বর্ত্তমানমুহূর্ত্তস্থিত ঘটনা = Zero
কিন্তু, বর্ত্তমানের ঘটনাকেই আমরা বাস্তবিক বলিয়া নির্দ্দেশ করি,
& বর্ত্তমানের ঘটনা = O
অতএব, আমরা Zeroকেই বাস্তবিক বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

এ যাহা বলিলাম তাহা একরূপ Algebrical হেঁয়ালি— আসল কথাটা কি দেখা যাক্।

আসল কথা এই (fact এই) যে, সম্পূর্ণরূপে ডানা-ছাঁটা বর্ত্তমানমুহূর্ত্ত, যাহা zero বই আর কিছুই নহে, সেরূপ নিছক বর্ত্তমানমুহূর্ত্তের ঘটনাকে—"ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" রকমের বর্ত্তমান-মাত্রটিকে— আমরা বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করি না ; তাহার সাক্ষী স্বপ্ন। স্বপ্নের ঘটনা zero অপেক্ষা অনেক বেশী কাল ধরিয়া প্রবাহিত হয়— সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও স্বপ্নের ঘটনা-সকলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে কোনোপ্রকার শৃঙ্খলা দৃষ্ট না হওয়াতে ও স্বপ্নের ল্যাজা-মুড়া-স্থিত জাগ্রৎকালের সহিত স্বপ্নের কোনোপ্রকার মিল দৃষ্ট না হওয়াতে আমরা স্বপ্নকে অবাস্তবিক বলিতে বাধ্য হই। কিন্তু যে স্বপ্নের আগা-পাছতলার মধ্যে ভালরূপ মিল থাকে ও দুইপ্রান্তস্থিত দুই জাগ্রৎকালের সহিত যাহার আনুপূর্ব্বিক যোগ থাকে— সেরূপ স্বপ্ন বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, শুদ্ধ কেবল বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তটুকু— ডানা-ছাঁটা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত— নিছক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত— বাস্তবিকতার নির্ভরস্থল নহে। তবে কি ? না ভূতকালের স্মৃতিগর্ত্ত এবং ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা (expectation)-গর্ত্ত এমন যে বর্ত্তমানমুহূর্ত্ত— দুই-ডানাওয়ালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ত্তমানমুহূর্ত্ত— বাস্তবিকতার নির্ভরস্থল।

ভূতকালের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎকালের প্রতীক্ষা আপাততঃ বাস্তবিক না হইলেও আমরা বলি যে, "এ ঘটনাটি really ঘটিয়াছে" বা "এ ঘটনাটি will really take place" ; বর্ত্তমানের লক্ষণ দৃষ্টে আমরা

ভবিষ্যতের reality অবধারণ করি এবং তাহা দৃষ্টে ভূতকালের realityও অবধারণ করি। as for instance—

দুর্গম অরণ্য

(১) ক ——— পথ ——— ক (২)

দুর্গম অরণ্য

চতুর্দ্দিকে দুর্গম অরণ্য, মধ্যে একটি সুঁড়ি পথ ; ক্ষণপূর্ব্বে আমি ক'কে প্রথমস্থানে দেখিয়াছিলাম ; এখন ক'কে দ্বিতীয় স্থানে দেখিতেছি ; ইহাতে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, ইতিপূর্ব্বে 'ক' ঐ সুঁড়ি-পথটিতে really পদার্পণ করিয়াছে।[১]

ক [বৃক্ষে-বাঁধা হরিণ] খ ব্যাঘ্র

খ ক'য়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছে ইহা দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, কিয়ৎ পরেই খ ক'কে লাফাইয়া ধরিবে।[১]

এদিকে আমরা বলি যে, ভূতকাল স্মৃতিস্বপ্ন, ভবিষ্যৎকাল আশাস্বপ্ন ; ওদিকে আমরা বলি যে, ভূতকাল (by ভূতকাল I mean ভূতকালের ঘটনা) really হইয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যৎকাল really আসিবে। যেখানে আমরা বলি যে, ভূতকাল স্বপ্ন সেখানে আমরা mean করি এই যে, ভূতকাল in a great measure is unconnected with বর্ত্তমানকাল। "বাল্যকালের ছেলেখেলা" এখন স্বপ্নবৎ, why ? because the connecting link between the past and the present is totally lost to my sight in the present instance। Otherwise, Past is no স্বপ্ন। Crossing the Alps was no স্বপ্ন to Nepoleon so long as he was engaged in the wars of Italy (I mean, the first Italian Campaign) ; but during his confinement in St. Helena it no doubt appeared to him as স্বপ্ন। এতে প্রমাণ হচ্চে এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান themselves বাস্তবিকতার মূল নহে— তবে কি ? না— the connecting link that binds together ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এইটিই হচ্চে বাস্তবিকতার মূল। reality is not to be found in অসম্বদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান— Reality is to be sought for in সুসম্বদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান। তবেই হচ্চে, the essence of reality ত্রিকালের এক অদ্বিতীয় বন্ধনসূত্রের মধ্যেই অন্বেষিতব্য ; not in unconnected খণ্ড খণ্ড ত্রিকাল। ত্রিকালের বন্ধনসূত্র অবশ্য ত্রিকাল নহে— তাহা ত্রিকালের উপরের বস্তু। Negatively speaking, তাহা **অকাল**— Positively speaking, তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। This may be viewed as a rationale of বেদান্তদর্শন। But I don't go so far as to deny the reality of the world in toto, as some Raw Vedantists do ; another time I will give out my opinion on the ভেদাভেদ between **The Reality** & phenomenal reality— between সৎ & সত্ত্বগুণ। Enough for the present।

---

১ রচনাটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত তিনখানি চিত্র আছে। তন্মধ্যে একখানির অনুকৃতি মুদ্রিত হইল।

প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব মূর্তি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুদিগের প্রধান পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য নামে খ্যাত; ইহাদের মুখ্য পূজার দেবতা যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, শক্তি (দুর্গা, মহালক্ষ্মী, কালী ইত্যাদি), সূর্য ও গণপতি। এইসকল এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা-অনুষ্ঠানে উপাসকগণ নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যানধারণাদির সুবিধার জন্যই দেবমূর্তি-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এইসব মূর্তি মৃৎ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি নানারূপ উপাদানে দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত হইয়া মন্দির বা দেবগৃহ-মধ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণের দ্বারা নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে পূজিত হইত। প্রাচীন বাংলার ধাতু, প্রস্তর আদি আপেক্ষিক স্থায়িত্বশীল দ্রব্যে গঠিত অনেক মূর্তি পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুরাতন কালের এই মূর্তিনিচয় অনুশীলন করিলে আমরা সে যুগের ধর্মনীতি ও শিল্পের বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হই। জাতির সংস্কৃতির এই বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলির সহিত পরিচিত হইবার অন্যতম প্রধান উপায় ইহার প্রাচীন দেববিগ্রহাবলী। আবার এগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতত্ত্ব অনুশীলন করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপকরণ।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মসম্প্রদায়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সেকালের বাংলার দেবপ্রতিমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে এখানকার পুরাতন বৈষ্ণব মূর্তির কথাই মনে পড়ে। এই জাতীয় মূর্তি এদেশের বিভিন্ন অংশে যত অধিক সংখ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ আর কোনও সম্প্রদায়ের দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ। ভিন্ন প্রকারের বঙ্গীয় বৈষ্ণব প্রতিমার বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিবার পূর্বে এই ধর্মের পুরাতন নাম, ইহার উৎপত্তি এবং প্রধান মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ এবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে মূর্তিগুলির বিশেষত্ব বুঝিতে অসুবিধা হইবে। বেদের আদিত্য দেবগণের অন্যতম বিষ্ণু হইতেই বৈষ্ণব নামের উৎপত্তি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মের প্রধান দেবতা এই বৈদিক আদিত্য নহেন। পৌরাণিক যুগে তিনি অন্যতম আদিত্যরূপে দ্বাদশাদিত্যদিগের মধ্যে স্থান পাইলেও আদিত্য-বিষ্ণু, এবং বৈষ্ণবদিগের মুখ্য দেবতা বিষ্ণু এক নহেন। বস্তুতঃ 'বৈষ্ণব' নামটি খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এই ধর্মের পরিচায়ক বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইত না। ইহার পূর্বে এবং পরেও যেসব নামের দ্বারা ইহা পরিচিত ছিল, উহার মধ্যে সাধারণতঃ সাত্বত, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত প্রভৃতি নাম প্রসিদ্ধ। সাত্বতবংশীয় ক্ষত্রিয়-বীর ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই এই অন্যতম ভক্তিধর্মের উৎপত্তি। তিনি যে ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান মহাবীরের ন্যায় একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে এখন সকলেই প্রায় একমত। তবে তৎপ্রবর্তিত ধর্মের ক্রমিক বিকাশে কয়েকটি বৈদিক ও পৌরাণিক কল্পনাপ্রসূত দেবতার প্রভাবও যে প্রভূত কার্যকারী হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত। ইহাদের মধ্যে বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, ও মহাভারত গ্রন্থাদিতে কল্পিত নারায়ণ এবং হরিবংশ, পুরাণাদিতে বর্ণিত গোপাল-কৃষ্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে সুপ্রাচীন যুগের যেসব বৈষ্ণব মূর্তি পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই উল্লিখিত দেবতানিচয়ের একক বা মিশ্ররূপ। পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত-ধর্মের উপাসকগণ তাঁহাদের ইষ্টদেবতা বাসুদেব-

বিষ্ণু-নারায়ণকে পঞ্চরূপে ভাবনা করিতেন। এই রূপ-পাঁচটির নাম যথাক্রমে—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা। অর্চা অর্থাৎ অর্চনীয়া,—শ্রীবিগ্রহ, প্রতিমা বা মূর্তিরই অন্য নাম। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই উপাসকদিগের নিকট তাহাদের ইষ্টদেবতার মূর্তি তাঁহার প্রতীকমাত্র নহে, পরন্তু তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট সত্তা। এই বিশেষ সত্তা আবার দেবতার অন্য তিনটি রূপ যথা পর, ব্যূহ ও বিভবের প্রকাশক। অন্তর্যামীর বাহ্য পরিকল্পনা অনাবশ্যক, কারণ এরূপে তিনি সাধকের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে অবস্থানপূর্বক তাহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। পর, ব্যূহ ও বিভব এই রূপ-তিনটি কি? পর বলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়—ইহাই তাঁহার বাসুদেবরূপ। সাত্বত বাসুদেবই যে পাঞ্চরাত্রধর্মের আদি প্রবর্তক সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বাসুদেব-বিষ্ণুমূর্তির কতকগুলি বাসুদেবরূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। ব্যূহরূপে ভগবান প্রধানতঃ চারি অংশে কল্পিত—যথা বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; ইঁহারা মনুষ্যপ্রকৃতি পঞ্চ দেবতা এবং পঞ্চ বৃষ্ণিবীর[১]। বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও সংকর্ষণ (বলদেব) বসুদেবের দুই পত্নী দেবকী ও রোহিণীর গর্ভজাত; বলদেব জ্যেষ্ঠ ও কৃষ্ণ তাঁহার অনুজ। প্রদ্যুম্ন বাসুদেবের পুত্র, তাঁহার অন্য নাম কামদেব বা মন্মথ; প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। এই চারি ব্যূহ হইতে পাঞ্চরাত্রগণকর্তৃক আরও কুড়িটি ব্যূহ কল্পিত হইয়াছে। সর্বসমেত এই চতুর্বিংশতি ব্যূহের মধ্যে প্রধান চারিটি হইলেন ভগবান বাসুদেব এবং তাঁহার তিনজন নিকট আত্মীয়; অপরগুলি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত বাসুদেবেরই কতকগুলি সম্মানিত নাম, যথা—হরি, কৃষ্ণ, মাধব, কেশব, মধুসূদন, উপেন্দ্র, অচ্যুত, পদ্মনাভ, অধোক্ষজ, ত্রিবিক্রম ইত্যাদি। বাসুদেব-বিষ্ণুর এই যে ব্যূহরূপী চতুর্বিংশতি মূর্তি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশের উপায় কি? শ্রীবিগ্রহের চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা এই তিনটি আয়ুধ ও পদ্ম বা পদ্মাঙ্ক সর্বসমেত এই চারিটির ভিন্নরূপ সংস্থানের দ্বারাই এই বিভেদ সূচিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এইজাতীয় যে-সকল বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ত্রিবিক্রম-রূপই সচরাচর চেনা যায়। ইহার নিচের দক্ষিণহস্তে পদ্ম বা পদ্মাঙ্ক, উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা, নিম্নবাম ও উচ্চবাম হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র। ভগবানের বিভবরূপ তাঁহার বিভিন্ন অবতারসমূহ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের অবতার অসংখ্য; শিষ্টের পালন ও দুষ্টের শাসন এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পাঞ্চরাত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থে এই বিভবরূপের কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা দেখিতে পাই। সাত্বত, অহির্বুধ্ন্যাদি পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় ভগবানের উনচল্লিশটি অবতার নির্দিষ্ট হইয়াছে; ভাগবতপুরাণে ইহার সংখ্যা কোথাও বাইশ কোথাও তেইশ। কিন্তু সাধারণতঃ এইগুলির মধ্য হইতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাঘবরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটি মুখ্য অবতার বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অবতারের পৃথক মূর্তি আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কখনও কখনও দীর্ঘ একখণ্ড প্রস্তরে যথাক্রমে ক্ষোদিত মৎস্যাদি দশ অবতারের মূর্তিও পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রধর্মের প্রধান মতবাদ-সম্পর্কিত উপর্যুক্ত প্রতিমাবলী ব্যতীত অন্যপ্রকার বৈষ্ণব মূর্তিও এদেশে অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের

---

১ পঞ্চবৃষ্ণিবীর সম্বন্ধে জানিতে গেলে *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, (Vol. X, pp. 65-8)-তে প্রকাশিত মৎপ্রণীত প্রবন্ধ The Holy Pañcaviras of the Vṛṣṇis পাঠ করা আবশ্যক।

মধ্যে কতকগুলি যে বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রভূষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। গুপ্তযুগের শেষদিকে উৎকীর্ণ পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে পাথরের ও পোড়ামাটির (terracotta) এজাতীয় অনেকগুলি বৈষ্ণব মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এগুলি সাধারণতঃ গোপাল কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সম্পর্কিত ঘটনাবলী চিত্রিত করে।

পাঞ্চরাত্র-মতবাদ-সম্পর্কিত বিষ্ণুমূর্তিভেদের কথা উপরে বলা হইল। অন্যতম পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ বৈখানসাগমে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর প্রধান বিগ্রহ (ধ্রুববের) গুলি অন্য একপ্রকারে বিভাগ করিবার প্রথা বর্ণিত আছে। প্রথমতঃ ধ্রুববেরগুলি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়; ভাগ-তিনটি যথাক্রমে স্থানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান, আসন এবং শয়ন। এই দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া বিভাগের প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন বৈষ্ণব উপাসকের পূজার ফলকামনা অনুযায়ী চারি অংশে বিভক্ত, যথা—যোগ, ভোগ, বীর এবং অভিচারিক। যোগক্ষেমের অভিলাষী বৈষ্ণবসাধক যোগমূর্তির, ভোগবাসনাসক্ত উপাসক ভোগমূর্তির, বীরত্ব ও শৌর্যকামী পূজক বীরমূর্তির, এবং নিজ শত্রুর অনিষ্টাচরণে ইচ্ছুক অভিচারক্রিয়াশীল বৈষ্ণব অভিচারিক বিষ্ণুমূর্তির পূজা করিতেন। এই দ্বাদশ প্রকার প্রধান বিষ্ণুমূর্তির প্রত্যেকটি পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মধ্যস্থ বিষ্ণুবিগ্রহের পার্শ্বে উৎকীর্ণ অনুচরদিগের সংখ্যার আধিক্য ও অল্পতানুযায়ী উত্তমাদি উপবিভাগ-তিনটি কল্পিত। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বৈখানসাগমোক্ত বৈষ্ণব ধ্রুববেরের সর্বসাকুল্যে এই ছত্রিশটি উপবিভাগের প্রত্যেকটিরই নমুনা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিগুলির মধ্যে চেনা যায় তাহা নহে। ইহার প্রধান কারণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মূর্তিশিল্পীগণ সকলেই বিষ্ণুমূর্তিনির্মাণে একই আগমশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণভারতের কোনও কোনও অংশে আবিষ্কৃত বিভিন্ন যুগের বিষ্ণু মূর্তিগুলির ভিতরে বিশেষতঃ মাদ্রাজ-প্রদেশান্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী মহাবলীপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বৈষ্ণবমূর্তিনিচয়ের মধ্যে ইহাদের কয়েকটিকে যে চিনিতে পারা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলাদেশেও ইহাদের এমন দুই একটি অপূর্ব নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ভারতবর্ষের অপর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বিষ্ণুমূর্তি-নির্মাণে বঙ্গীয় শিল্পীগণ সাধারণতঃ বৈখানসাগমোক্ত প্রণালী অনুসরণ করেন নাই। বরং এদেশের প্রাচীন বৈষ্ণব বিগ্রহগুলি অনুশীলন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ও অগ্নিপুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্নপ্রকার শ্রীবিগ্রহনির্মাণপ্রণালী বাংলায় অনুসৃত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থানে এই রীতিই প্রচলিত ছিল এবং ইহা দক্ষিণভারতীয় রীতি হইতে কিছু ভিন্নপ্রকার। উত্তর ভারতের ও বাংলার অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তিগুলির দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মকরা লক্ষ্মী (শ্রী) ও বামপার্শ্বে বীণাধরা সরস্বতী (পুষ্টি) দেবী দণ্ডায়মানা; দেবীদ্বয় উচ্চতায় প্রধান বিগ্রহের উরুমাত্র। অগ্নিপুরাণের প্রতিমালক্ষণ নামক অংশে বিষ্ণুমূর্তিবর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ বিগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে; যথা—'শ্রীপুষ্টিচাপি কর্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে। উরুমাত্রোচ্ছি তায়ামে…॥' দক্ষিণভারতের প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিগুলিতে কিন্তু দেবতার পার্শ্বচারিণী দুইজন—যথাক্রমে পদ্মকরা লক্ষ্মী এবং নীলোৎপলহস্তা ভূদেবী। বৈখানসাগমের বিষ্ণুমূর্তিবর্ণনায় এই প্রকার বিধিই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে আরও দু'এক বিষয় উল্লেখযোগ্য। কখনও কখনও দেবতার দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতীর পরিবর্তে আমরা চক্রপুরুষ ও গদাদেবী

অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই; আবার শঙ্খ ও পদ্ম-পুরুষও কচিৎ দৃষ্টিগোচর হন। ইহারা আয়ুধপুরুষ; বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং তাঁহার আয়ুধাদির মানবোচিত রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। বাংলায় সেকালের এইরূপ বিষ্ণুবিগ্রহ সুলভ না হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। প্রামাণিক মূর্তিশিল্পশাস্ত্রে এরূপ প্রতিমারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বাংলায় এপ্রকার বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে যাহার বর্ণনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত কোনও প্রতিমালক্ষণসংক্রান্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে এই-জাতীয় অনেক গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

এইবার পৌর্বাপর্য অনুসারে বাংলার কতকগুলি প্রাচীন বৈষ্ণবমূর্তির ধারাবাহিক আলোচনা করিব। প্রথমেই পাহাড়পুরে প্রাপ্ত এই জাতীয় কয়েকটি মূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যদিও এইগুলিকে বাংলার প্রাচীনতম বৈষ্ণবমূর্তি বলা চলে না, তাহা হইলেও ইহাদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহারা গুপ্তযুগের শেষ ও মধ্যযুগের আদি সময়ের। পূর্বে বলা হইয়াছে যে এগুলি গোপালকৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর বাল্যলীলা নানাছন্দে চিত্রিত করে। প্রথমেই কৃষ্ণরাধা বা কৃষ্ণ ও রুক্মিনী বলিয়া বর্ণিত প্রস্তরচিত্রের কথা ধরা যাক। একটি দেবমিথুন লীলায়িত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। ইহারা যে সাধারণ মনুষ্যমিথুন নহেন, তাহা তাঁহাদের পিছনের 'শিরশ্চক্র' হইতে বুঝিতে পারি। দেবতার ও দেবীর দক্ষিণ হস্তদ্বয় যথাক্রমে 'অভয়' ও 'বরদ' মুদ্রায় অবস্থিত; অপর হস্তদ্বয় পরস্পরের স্কন্ধাসক্ত। দেবতার কেশ ও বেশের বৈশিষ্ট্য, দাড়াইবার বিশেষ ভঙ্গী এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রস্তরচিত্রাবলী হইতে ইঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে অসুবিধা হয় না। সুদক্ষ শিল্পী অতি নিপুণতার সহিত কৃষ্ণ ও তাঁহার পার্শ্বচারিণীর প্রেমবিহ্বল মধুরভাব প্রস্তরফলকে প্রস্ফুট করিয়াছেন। অপর একটি প্রস্তরফলকে আমরা কৃষ্ণের অগ্রজ বলদেবের চতুর্ভুজ মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। সপ্তফণ সর্পাচ্ছাদিত দেবতা পানপাত্র, মূষল এবং হল ধারণ করিয়া আছেন; চতুর্থ হস্ত কটির উপর ন্যস্ত। তাঁহার দক্ষিণে সুরাভাণ্ড ও পানপাত্রধারিণী সহচরী এবং বামে পুরুষ-সঙ্গী দণ্ডায়মান। দেবতার অঙ্গসজ্জা ও কেশবিন্যাস লক্ষ্য করিবার মত। বৃহৎ সংহিতার বর্ণনানুযায়ী তিনি এককুণ্ডলী—তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ ই কেবল কুণ্ডলশোভিত, বামকর্ণ কুণ্ডলহীন; মূর্তিশাস্ত্রের বিধানমত তাঁহার চক্ষুদ্বয় পানোন্মত্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে শিল্পী দেবতার চক্ষুদ্বয় ঈষৎ ধ্যানস্তিমিত ও আনন স্মিতহাস্যশোভিত দেখাইয়াছেন। অল্প ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিলে বাঙালী ভাস্কর এখানেও তাঁহার শিল্পদক্ষতা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অপর কয়েকটি প্রস্তর-ফলকে কৃষ্ণের যমলার্জুনবধ, কেশীদৈত্যনিধন, এবং কৃষ্ণবলরামকর্তৃক কংসপ্রেরিত মল্লদ্বয় চানুর ও মুষ্টিকের হত্যা ইত্যাদি দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এগুলি ভাস্কর্যের দিক হইতে পূর্ববর্ণিত প্রস্তর-চিত্রদ্বয়ের মত প্রশংসনীয় না হইলেও একেবারে নিন্দনীয় নহে। উপরন্তু মূর্তিতত্ত্বালোচন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর-লীলাবিষয়ক এই চিত্রাবলী বিশেষ অর্থপূর্ণ।

বাংলায় যে সকল বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। ইহার উপরের দক্ষিণহস্ত, নিচের বামহস্ত এবং পদদ্বয় ভগ্ন; নিচের দক্ষিণ ও উপরের বাম হস্তে যথাক্রমে পদ্মকোরক এবং শঙ্খ দেখিতে পাই। ইহার তক্ষণভঙ্গী আমাদিগকে কুষাণযুগের মথুরা-ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও ইহা একরূপ

সুনিশ্চিত যে মূর্তিটি কোনও বাঙালী শিল্পীর দ্বারাই ক্ষোদিত। আপাতঃদৃষ্টিতে ইহার শিল্প উচ্চস্তরের মনে না হইলেও আমরা ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে ভাস্কর ইহাতে মথুরাশিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দক্ষতার সহিত রূপায়িত করিয়াছেন। বরিশাল জেলার লক্ষণকাটী গ্রামের নিকটে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তি শিল্পোৎকর্ষ এবং মূর্তিতত্ত্ব এই উভয়দিক হইতেই অপূর্ব। চতুর্ভুজ গরুড়াসনস্থ বিষ্ণুর উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্ত-তুইটি প্রস্ফুট পদ্মের নাল ধরিয়া রহিয়াছে; পদ্মদ্বয়ের কর্ণিকামধ্যে যথাক্রমে পদ্মকরা কমলা বা গজ-লক্ষ্মীর এবং বীণাধরা সরস্বতীর ক্ষুদ্র মূর্তি আসীন দেখিতে পাই; দেবতার সম্মুখস্থ দক্ষিণহস্তে সুদর্শনচক্র, উহার মধ্যে 'চক্রপুরুষ' পরিদৃশ্যমান, তাঁহার সামনের বাঁহাতে ক্ষুদ্রকায়া 'গদাদেবী' আসীনা। তাঁহার মস্তকস্থ 'কিরীটমুকুটে'র মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 'যোগাসন'স্থ চতুর্ভুজ দেবমূর্তি আসীন। সমস্ত মূর্তিটির একটি অনাড়ম্বর সারল্য, সরস্বতীর হস্তধৃত বীণার গঠন (ইহা অনেকটা গ্রীক lyre বা harp এর মত দেখিতে— এইরূপ আকৃতির বীণা আমরা গুপ্তযুগের ও তাহার পূর্ববর্তীকালের ভারতীয় ভাস্কর্যে দেখিতে পাই) এবং ইহার পিছনের সাদাসিধা 'প্রভাবলী' হইতে আমরা ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। আমাদের মনে হয় ইহা মধ্যযুগের গোড়ার দিককার বঙ্গীয় ভাস্কর্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন। মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতেও ইহার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সহজেই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। এমন কোনও মূর্তিশাস্ত্র এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে এইরূপ বিষ্ণুবিগ্রহের বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষণকাটীর এই অপরূপ বিষ্ণুমূর্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে বর্ধমান জিলার চৈতনপুর গ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুর কথা মনে পড়ে। অপূর্বত্বের এবং প্রাচীনত্বের দিক দিয়া ইহা প্রথমোক্তটির সমকক্ষ হইলেও (এই তুইটি বিষ্ণুমূর্তির অনুরূপ বিষ্ণু ভারতের আর কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই) মূর্তিতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পিছনের দক্ষিণ ও বাম হস্ত যথাক্রমে গদা ও চক্রের উপরে ন্যস্ত, আয়ুধতুটির সম্মুখে গদাহস্তা 'গদাদেবী' এবং দণ্ডহস্ত 'চক্রপুরুষ'; বিষ্ণুর সম্মুখের দক্ষিণহস্তে পদ্মকোরক এবং বামহস্তে শঙ্খ। প্রধান বিগ্রহ স্বল্পাভরণভূষিত এবং ইহার কণ্ঠে হার বনমালাদির পরিবর্তে 'কবচের' মালা ঝুলান রহিয়াছে; পরিধানের বস্ত্র কটি হইতে অদ্ভুতভাবে বিন্যস্ত; মুখমণ্ডল অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি; চোখতুটি যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চায়; পেশী এবং অস্থি যেন গাত্রচর্ম ভেদ করিয়া দেখা যায়; ইহার উদর বিশুষ্ক ও কুক্ষিগত। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা একরূপ নিঃসন্দেহ হইতে পারি যে ইহা পূর্বকথিত বৈখানসাগমোক্ত বিষ্ণুর 'ধ্রুববের'দিগের মধ্যে অন্যতম 'অভিচারিক স্থানক' মূর্তি। আগমকার বলিতেছেন, 'অভিচারিক-স্থানকং দেবং দ্বিভুজং চতুর্ভুজং বা ধূম্রবর্ণং শ্যামবস্ত্রধরং শুষ্কবস্ত্রং শুষ্কাঙ্গং তমোগুণান্বিতমূর্ধ্বনেত্রং ব্রহ্মাদি দেববিবর্জিতং ...কারয়েৎ'। অনেকাংশে এই বর্ণনার সহিত চৈতনপুর বিষ্ণুর সাদৃশ্য দেখা যায়। পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় ইহাকে গুপ্তযুগের একটি নিকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মূর্তিটির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিচার না করিয়া তিনি এই মত পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার আনুমানিক কাল খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।[২]

---

২ চৈতনপুরে প্রাপ্ত এই অপরূপ বিষ্ণুমূর্তিটির বৈশিষ্ট্য মদ্‌রচিত 'An Abhicārikasthānakamūrti of Viṣṇu' নামক একটি প্রবন্ধে প্রথম প্রদর্শিত হয়। প্রবন্ধটি *Journal of the Indian Society of Oriental Art* (Vol. VIII, pp. 159-61)-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গাধিপ প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের তৃতীয়বর্ষে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধে, ক্ষোদিত একটি মনোহর 'স্থানক' বিষ্ণুমূর্তি ত্রিপুরা জিলার বাঘাউরা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ 'লেখ' হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইহা নারায়ণের মূর্তি (নারায়ণ ভট্টারকাখ্য)। কিন্তু ইহার চারিহস্তের 'আয়ুধসংস্থান' মূর্তিশাস্ত্রানুযায়ী (নিম্নদক্ষিণ—পদ্ম, উঃদঃ—গদা, উঃবাঃ—চক্র, নিঃবাঃ—শঙ্খ) ইহাকে চতুর্বিংশতি মূর্তিভেদের 'ত্রিবিক্রম' বিষ্ণুরূপে পরিচিত করে। শাস্ত্রমতে নারায়ণ-বিগ্রহের আয়ুধসংস্থিতি উল্লিখিত পর্যায়ে এইপ্রকার, যথা—শঙ্খ, পদ্ম, গদা এবং চক্র। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রোক্ত চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্তিভেদ বঙ্গদেশে জানা থাকিলেও (কারণ এইপ্রকার কয়েকটি বিভিন্ন বিষ্ণুপ্রতিমা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে) শিল্পীরা এই জাতীয় বিগ্রহাবলীর নামকরণে সম্ভবতঃ অন্যমত পোষণ করিতেন। শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও যে এবিষয়ে ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল তাহা 'অগ্নি' 'পদ্ম' ইত্যাদি পুরাণের এইরূপ বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা হইতে জানিতে পারি। সাগরদিঘি গ্রামে প্রাপ্ত, অধুনা কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত একটি চতুর্ভুজ 'আসন' বিষ্ণুমূর্তির চারিহস্তের আয়ুধসংস্থান উক্তক্রমে পদ্ম, চক্র, গদা এবং শঙ্খ। অগ্নিপুরাণমতে ইহার নাম হওয়া উচিত 'শ্রীধর', কিন্তু পদ্মপুরাণানুযায়ী ইহা 'হৃষীকেশ'; শিল্পী ইহাকে কি নামে পরিচিত করিয়াছিলেন এখন আমাদের উহা জানিবার উপায় নাই—কারণ ইহার কোন অংশে ইহার পরিচিতি উৎকীর্ণ নাই। মূর্তিতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার অপর এক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; চক্র, গদা এবং শঙ্খ এই আয়ুধত্রয় প্রস্ফুট পদ্মমধ্যে স্থাপিত, দেবতা পদ্মের নালগুলি মাত্র তাঁর বিভিন্ন হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমরা লক্ষণকাটী বিষ্ণুর পরিচয় প্রদানকালে আয়ুধসংস্থানের উক্তরূপ ভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে দিনাজপুর জিলার সুরোহোর গ্রামে আবিষ্কৃত অপর এক চতুর্ভুজ 'স্থানক' বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা করিতে পারি। ইহার পিছনের হাত-দুটিতে প্রস্ফুট পদ্ম স্থাপিত—উহাদের কর্ণিকামধ্যে গদা এবং চক্র খোদিত আছে, কিন্তু সামনের হাত দুটি 'শঙ্খ' এবং 'চক্র' এই দুটি 'আয়ুধপুরুষের' মস্তকোপরি ন্যস্ত; এক্ষেত্রে শ্রী ও পুষ্টি দেবতার পার্শ্বচারিণী নহেন—তৎপরিবর্তে উপযুক্ত আয়ুধপুরুষদ্বয় তাঁহার পার্শ্বচর। এই মূর্তিটির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না। প্রধান বিগ্রহ একটি সর্পের প্রসারিত সাতটি-ফণার ছত্রতলে দণ্ডায়মান; মাঝের ফণাটির ঠিক উপরেই ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের মত যোগাসনে উপবিষ্ট একটি ক্ষুদ্র মূর্তি, পাদপীঠের মধ্যস্থলে আবার একটি নৃত্যরত ষড়্‌ভুজ শিব। এইরূপ মূর্তি আরও যে দুই একটি পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ মূর্তির পরিচয়জ্ঞাপক কোনও মূর্তিশাস্ত্রের নির্দেশ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বিগ্রহগুলি যে বিষ্ণুমূর্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের উল্লিখিত নানাপ্রকার মূর্তিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের মঞ্জুশ্রী,লোকেশ্বরাদি কতকগুলি মহাযান বৌদ্ধমূর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রকার মিশ্র ধরণের মূর্তি হইতে যে আমরা এদেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের সমন্বয়-প্রচেষ্টার আভাস পাই, ইহা সুনিশ্চিত। অনুরূপ মহাযানবৌদ্ধ ও অন্যান্য মূর্তি আলোচনা করিলে আমরা এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।

'স্থানক' বিষ্ণুমূর্তির বিচারপ্রসঙ্গে রংপুরে প্রাপ্ত অধুনা কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ব্রোঞ্জ্‌ বা অষ্টধাতুনির্মিত একটি অপরূপ চতুর্ভুজ 'ত্রিবিক্রম' বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ আবশ্যক। ইহার সদৃশ আরও চারিটি ধাতব মূর্তি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রংপুরের একটি কৃষক ভূমিকর্ষণকালে

বিষ্ণু

সাহেবগঞ্জ । রংপুর

মৎস্যাবতার

বজ্রযোগিনী । ঢাকা

আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে

রাধাকৃষ্ণ

পাহাড়পুর । রাজশাহী

বলরাম

পাহাড়পুর । রাজশাহী

আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে
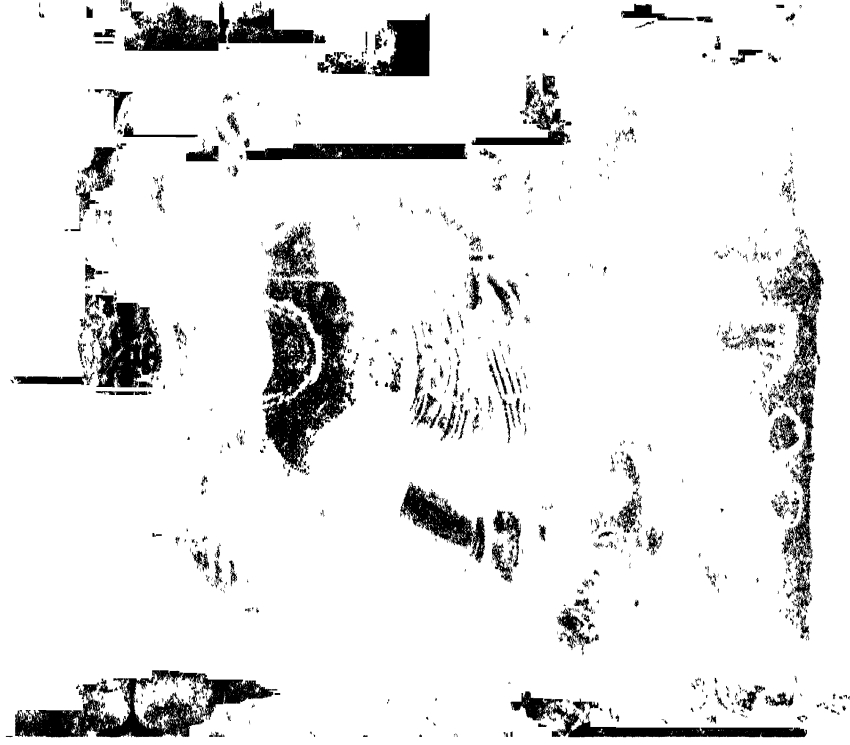
ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করে। শিল্পকলার দিক দিয়া এই পাঁচটির মধ্যে তিনটি অতি অপূর্ব—ঐ তিনটিই কলিকাতা মিউজিয়মে সংরক্ষিত। ইহাদের মধ্যে আলোচ্য মূর্তিটি মূর্তিতত্ত্বানুশীলনের দিক হইতেও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উত্তরপূর্বভারতের মধ্যযুগের এইপ্রকার বিষ্ণুমূর্তির দুইপার্শ্বে আমরা সাধারণতঃ শ্রী ও পুষ্টি দেবীকে দণ্ডায়মানা দেখি ; কিন্তু এক্ষেত্রে দেবতার দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মকরা শ্রীদেবীকে দেখা গেলেও ইহার বামপার্শ্বে বীণাধরা পুষ্টির পরিবর্তে নীলোৎপলধারিণী বসুমতী বা ভূদেবী দণ্ডায়মানা। বিষ্ণুর বামপার্শ্বে ভূদেবীর অবস্থান যে দক্ষিণভারতীয় বিষ্ণুমূর্তিনির্মাণ-শৈলীর অনুযায়ী এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বাঁকুড়া জিলার সারণগড় গ্রামে একটি সুবৃহৎ দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকটি অংশ ভাঙিয়া গেলেও, যাহা নষ্ট হয় নাই উহা হইতে আমরা এক বিশিষ্ট প্রকার বৈষ্ণব মূর্তির সন্ধান পাই। ইহার 'প্রভাবলী' একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের মত ; প্রভাবলীর মধ্যে বিষ্ণুর দশটি অবতার পর পর ক্ষোদিত আছে। প্রধান বিষ্ণুবিগ্রহের পিছনে দশাবতারের মূর্তি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা ভারতবর্ষের অন্যস্থানেও প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মুদ্রাধারণ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে, যে-ব্যক্তি নিজ শরীরে বিষ্ণুর অবতারচিহ্ন ধারণ করে তাহার শরীর বিষ্ণুরই শরীর বলিয়া জানা উচিত, উহা সামান্য মানবশরীররূপে জ্ঞান করা উচিত নয়। আমার মনে হয় যে অবতারচিহ্নসমেত বিষ্ণু-মূর্তিগুলিও বৈষ্ণবদিগের বিশেষ পূজার পাত্র ছিল।

উপরে প্রধানতঃ কয়েকটি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তির বিষয় আলোচনা করা হইল। এখন 'আসন' ও 'শয়ন' শ্রেণীর কতিপয় বিষ্ণুবিগ্রহের অনুশীলন করা যাক। প্রারম্ভেই ইহা বলা যাইতে পারে যে এই দুই শ্রেণীর বিষ্ণুমূর্তি বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত অল্পই পাওয়া গিয়াছে। বগুড়া জিলার দেওরা গ্রামে প্রাপ্ত, অধুনা রাজশাহী মিউজিয়মে রক্ষিত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর একটি আসন বিষ্ণুমূর্তির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু এখানে তাঁহার বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আসীন। লক্ষণ-কাটীর গরুড়াসন বিষ্ণু এবং অন্য দুই একটি গরুড়স্থ বিষ্ণুর বসার ভঙ্গী অনেকটা স্বাভাবিক—দেবতা তাঁহার বাহনের দুই স্কন্ধের উপর দিয়া পাদদ্বয় ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষ্ণু ললিতাসন ভঙ্গীতে গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি বসিয়া রহিয়াছেন—ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ঢাকা জিলাস্থ বাস্তা গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ-বিগ্রহে দেবতার অনুরূপ উপবেশনভঙ্গী দেখিতে পাই। এই মূর্তিটি খুব বেশিদিনের পুরাতন না হইলেও উল্লেখযোগ্য, কারণ লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তি সাধারণতঃ খুব অল্পই পাওয়া যায়। দেবতার বাম ঊরুর উপরে লক্ষ্মী আসীনা ; ইঁহাদের বাহন গরুড় চতুর্ভুজ, উহার সামনের হাতদুটি নমস্কারমুদ্রায় প্রদর্শিত এবং পিছনের হাতদুটিতে দেবতা ও দেবীর এক-এক পদ ন্যস্ত। এখানে আরও একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা দিনাজপুর জিলার এসনাইল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে কিন্তু দেবতাদ্বয় গরুড়োপরি আসীন নহেন—ইঁহারা একটি 'বিশ্বপদ্ম'র উপর বসিয়া আছেন। সাধারণভাবে লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তিগুলি উমা-মহেশ্বর বিগ্রহের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। 'আসন' বিষ্ণুমূর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে দিনাজপুর জিলার ইটাহার গ্রামে প্রাপ্ত একটি পাদপীঠের কথা বলা আবশ্যক। ইহার উপরিভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট ও হস্তদ্বয় ধ্যানমুদ্রায় ক্রোড়োপরি স্থাপিত এক দেবমূর্তির নিম্নাংশমাত্র দেখা যায়। মূল বিগ্রহের আর সব কিছুই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাদপীঠের নিচের কোণে গরুড়ের রূপ ক্ষোদিত থাকায় এবং মূল বিগ্রহের হস্তদ্বয় ধ্যানমুদ্রায় প্রদর্শিত হওয়ায় আমরা নিঃসন্দেহে

বলিতে পারি যে ইহা অক্ষত অবস্থায় যোগাসন-বিষ্ণুবিগ্রহ ছিল। উপরে যে অপর কয়টি আসন-বিষ্ণুমূর্তির আলোচনা করিয়াছি, উহাদের সবগুলিই 'ভোগাসন' শ্রেণীর; কারণ প্রায় সব কয়টিতেই দেবতা সস্ত্রীক। কিন্তু যোগাসন শ্রেণীর বিগ্রহ উত্তরভারতে খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা সোনারঙে আবিষ্কৃত কাষ্ঠনির্মিত একটি সুন্দর আশ্রয়স্তম্ভের শীর্ষ (bracket capital) সেজন্য বৈষ্ণব মূর্তিতত্ত্ব আলোচনার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ এই স্তম্ভশীর্ষমধ্যে আমরা যোগাসন-বিষ্ণুর মূর্তি ক্ষোদিত দেখি। পাহাড়পুরে পোড়ামাটির মূর্তিগুলির (terracotta sculptures) মধ্যেও আমরা একটি আসন-বিষ্ণুমূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই।

সেকালের 'শয়ন' বিষ্ণুমূর্তি এদেশে পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে। আমরা এই জাতীয় মূর্তির আধুনিক চিত্রের সহিত পরিচিত আছি। চতুর্ভুজ দেবতা বিশাল জলরাশিমধ্যে অনন্ত নাগের দেহোপরি লীলায়িত ভঙ্গীতে শয়ান—প্রসারিত পদপার্শ্বে লক্ষ্মী নিজ স্বামীর পদ-সংবাহনরতা; দেবতার নাভি হইতে উত্থিত প্রস্ফুট পদ্মোপরি কমলযোনি ব্রহ্মা আসীন। ইহাকে বাংলাদেশে অনন্তশয়নমূর্তি বলা হয়। দক্ষিণ-ভারতের অনেক বৈষ্ণবমন্দিরের 'গর্ভগৃহে' রঙ্গস্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত এইরূপ বিষ্ণুমূর্তিই প্রধান বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণিত 'নারায়ণ' নামই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মনুসংহিতায় এই নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ : 'আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ। তা যদস্য অয়ণং পূর্বং তস্মান্নারায়ণংস্মৃতম্॥' বিরাট জলরাশি বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ইঁহার আশ্রয়স্থল ছিল বলিয়াই ইঁহার নাম নারায়ণ। ইনিই সকল সৃষ্টির মূলাধার, ইঁহা হইতে সকল কিছুই উদ্ভূত এবং ইঁহাতেই সবকিছু লয়প্রাপ্ত। এই মূল পুরুষের বিরাট পরিকল্পনা আমরা সর্বপ্রথমে ঋগবেদের দশম মণ্ডলের ৮২তম সূক্তের দুইটি শ্লোকে (৫-৬) পাই—'বিরাট জলরাশি সেই আদি কারণকে ধারণ করিয়াছিল—ইঁহাতেই সকল দেবতা প্রচ্ছন্ন ছিলেন। সেই অজের নাভির উপরে সকল সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ একটি (পাত্র) অবস্থিত ছিল।' অনন্তশায়ী বা জলশায়ী নারায়ণের রূপ কল্পনার মূল যে এইখানে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক যুগে বটপত্রশায়ী বালগোপাল-মূর্তির পরিকল্পনার আদিও ইহাই। মধ্যভারতের ঝাঁসি জিলার অন্তর্গত 'দেওগড়' গ্রামের গুপ্তযুগে নির্মিত দশাবতার-মন্দিরগাত্রে শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্তির একটি অপরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রমতে ভগবান্ বাসুদেব-বিষ্ণুর পাঁচটি রূপের মধ্যে তাঁর 'বিভব' বা অবতাররূপ যে অন্যতম ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন সেকালের বাংলার এই জাতীয় কয়েকটি মূর্তির আলোচনা করা আবশ্যক। এদেশের বিভিন্ন স্থানে দশাবতারমূর্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থাৎ বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের মূর্তিগুলিই সাধারণতঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ দেখা যায়। অপরগুলি প্রায় একটি প্রস্তরখণ্ডে বা বিষ্ণুপট্টে পাশাপাশি ক্ষোদিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির যে পৃথক মূর্তি পাওয়া যায় নাই তাহা নহে, তবে বরাহাদি তিনটি অবতারবিগ্রহের তুলনায় ঐগুলি খুবই অল্প। ঢাকার বজ্রযোগিনী এবং রানীহাটি গ্রামে প্রাপ্ত মৎস্য ও পরশুরাম-অবতারের মূর্তি দুটি সেজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্তটির উপরিভাগ মনুষ্যাকৃতি এবং নিম্নভাগ মৎস্যসদৃশ; হস্তচতুষ্টয়ে দেবতার আয়ুধ যথারীতি সংন্যস্ত। চতুর্ভুজ পরশুরাম তাঁহার সম্মুখের দক্ষিণ হস্তে পরশু ধরিয়া রহিয়াছেন, অপর তিনটি হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা পরিদৃশ্যমান। এই দুটি মূর্তিই সেনরাজগণের রাজত্বকালে

নির্মিত বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ঢাকার বাঘড়া গ্রামে এখনও পূজিত সেকালের একটি অপরূপ বলদেবমূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা এই জাতীয় অন্য মূর্তি হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া দেয়। এই বিগ্রহটি প্রথম দৃষ্টিতে একটি স্থানক ধরনের সাধারণ বিষ্ণুমূর্তি বলিয়াই মনে হয়, কারণ ইহার তিনটি হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা স্থাপিত; কিন্তু ইহার সম্মুখস্থ দক্ষিণহস্তে আমরা একটি লাঙ্গল দেখিতে পাই, এবং ইহাই মূর্তিটির সঠিক পরিচয় জানাইয়া দেয়। ইহার মস্তকোপরি সাপের ফণার পরিবর্তে একটি সাধারণ ছত্র খোদিত রহিয়াছে। ইহাও বিগ্রহটির একটি বৈশিষ্ট্য। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত বলরাম (পূর্বে ইহার কথা বলিয়াছি) এবং রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত বলরাম হইতে এইসব কারণে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির মূর্তি। শেষোক্ত দুটি— সাপের প্রসারিত ফণার ছত্রতলে দণ্ডায়মান এবং তাহাদের তিনটি হাতে যথাক্রমে পানপাত্র, গদা এবং লাঙ্গল স্থাপিত, চতুর্থ হস্তটি কটিদেশে স্থিত। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনটি মূর্তিই এক; প্রত্যেকটির দক্ষিণকর্ণের কুণ্ডল বামকর্ণভূষণ হইতে পৃথক্। এইরূপেই বোধ হয় শিল্পী শাস্ত্রমতে যে বলদেব 'এককুণ্ডলী' উহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঘড়ার বলরাম-বিগ্রহের তক্ষণকৌশল অতি মনোহর।

বরাহ, নরসিংহ ও বামন, বিষ্ণুর এই তিনটি অবতারমূর্তির প্রাচুর্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালায় এবং কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাংলার বরাহমূর্তিগুলিতে সাধারণতঃ দেবতার মুখই কেবল বরাহের মত এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবোচিত দেখা যায়। গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের মধ্য ভারতীয় শিল্পীরা দেবতাকে এভাবেও দেখাইতেন আবার কখন কখনও সম্পূর্ণ বরাহের আকারেও দেখাইতেন। বগুড়া জিলার সিলীমপুর গ্রামে প্রাপ্ত এবং অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত বরাহ-বিগ্রহটি তক্ষণকৌশলের দিক দিয়া অপূর্ব। বিগ্রহের বরাহমুখটি সহসা দেখিলে মনে হয় যেন একটি শঙ্খ আড়াআড়ি ভাবে গ্রীবার উপর বসান রহিয়াছে। পৃথিবীদেবী ইঁহার বামস্কন্ধাসক্তা; এইরকম সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণতঃ দেবী অবতারের বাম কনুইএর উপর উপবিষ্ট দেখা যায়; হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ও অগ্নিপুরাণ মতে ইহাই প্রকৃষ্ট (বামকূর্পরস্থা)। এই মূর্তিটি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। রাজশাহী চিত্রশালার আর একটি বরাহমূর্তির (৭৯৯ নং) একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দেবতার পায়ের নিচে যে ছোট একটি দৃশ্য ক্ষোদিত আছে তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে দৈত্য-হিরণ্যাক্ষকে যেন পূর্ণ শূকররূপী দেবতা তাড়া করিয়া যাইতেছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল নরসিংহমূর্তি পাওয়া যায় বাংলাদেশের বিগ্রহগুলিও ঐ প্রকারের। বীরভূম জিলার পাইকোর গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিটিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মস্তক দেবতার বাম উরুর উপরস্থিত, তাঁহার শরীরের অন্ত্রসকল দেবতা নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছেন। ঢাকায় প্রাপ্ত এই জাতীয় মূর্তিগুলির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলিতে দেবতা ষড়্ভুজ, তাঁহার প্রধান হাতদুটি দৈত্যের অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট, মাঝের দুইহাতে উহার মস্তক ও পদদ্বয় ধৃত এবং শেষ হাত দুটিতে 'অভয়' ও 'তর্জনী' মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। বামন-অবতারের বিগ্রহগুলিতে দেবতার বিরাট রূপেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার বামপদ উচ্চদিকে প্রসারিত, এই পদপ্রান্তে ব্রহ্মা বসিয়া আছেন; ভূমিস্থিত দক্ষিণপদের বামদিকে দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক বামনদেবকে ত্রিপাদভূমিদানের দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

জোড়াদেউল গ্রামে প্রাপ্ত এবং অধুনা ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্তিটি এই প্রকারের। ছত্রদণ্ড-পুস্তকধারী মাত্র বামনরূপী দেবতার পৃথক মূর্তি বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে! সেইজন্য পুরাপাড়ার চতুর্ভুজ বামনাবতারের প্রতিমা উল্লেখযোগ্য। দেবতার দুইপার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধরা শ্রী ও পুষ্টি দণ্ডায়মানা; এখানে ভূমিদানের দৃশ্য প্রদর্শিত হয় নাই। রাঘবরাম, পরশুরাম, ও কল্কি প্রভৃতি অবতারের পৃথক্ মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে। বুদ্ধের যে বহু পৃথক্ মূর্তি এদেশে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনার প্রতীক। পূর্বে কল্কি বলিয়া পরিচিত কয়েকটি অশ্বারোহী মূর্তি যে সূর্যপুত্র রেবন্তের বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নহে উহা এখন সঠিক জানা গিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রাম-অবতারের একটি পৃথক মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। বিগ্রহটি সুপ্রাচীন নহে; প্রায় তিনচারিশত বৎসর আগেকার। ইহা ঈষৎ রক্তাভ বেলে পাথরে নির্মিত। ধনুর্বাণধারী রাম নৌকার উপর দণ্ডায়মান; তাঁহার দুই পার্শ্বে সীতা ও লক্ষ্মণ। নৌকার দ্বারা বোধ হয় শিল্পী রামের লঙ্কা হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয় সূচিত করিয়াছেন।

মূর্তিতত্ত্বানুশীলনের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য আরও দু একটি বৈষ্ণব মূর্তির কথা এখন বলা আবশ্যক। রাজশাহী চিত্রশালার বিংশতি হস্তযুক্ত স্থানক বিষ্ণুমূর্তিটির কথাই ধরা যাক্। দেবতা বনমালা বা বৈজয়ন্তী হার এবং অন্যান্য অলঙ্কারদ্বারা শোভিত হইয়া ঋজুভাবে দণ্ডায়মান; তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি বিশালোদর পুরুষ আসীন; দেবতার দক্ষিণ ও বাম হস্তগুলিতে গদা, অঙ্কুশ, খড়্গ, মুদ্গর, শূল, শর, চক্র, খেটক, ধনু, শঙ্খ ও পাশাদি নানা প্রকার আয়ুধ এবং 'বরদ' ও 'তর্জনী' মুদ্রা প্রদর্শিত। রূপমণ্ডন নামক গ্রন্থে চতুর্মুখ ও বিংশতিহস্তবিশিষ্ট বিশ্বরূপ নামক একপ্রকার বিষ্ণুমূর্তিভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই বিগ্রহের একটু সাদৃশ্য আছে; তবে ইহার মুখ মাত্র একটি। 'বিশ্বরূপ' নামটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার-কর্তৃক বর্ণিত অর্জুনসমক্ষে বিশ্বরূপ গ্রহণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবতার এই রূপকল্পনা তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য ও শক্তির বিষয়ই অতি সামান্যভাবে জানাইয়া দিতেছে। এই প্রকার মূর্তি বোধ হয় বাংলায় একটিই পাওয়া গিয়াছে।

কামদেব বা প্রদ্যুম্ন বাসুদেবের পুত্র। ভগবানের প্রধান চারিটি ব্যূহের ইনি অন্যতম। কিন্তু ইহার যে দুই একটি প্রাচীন বিগ্রহ বাংলাদেশে পাওয়া যায় সেগুলিকে ব্যূহপর্যায়ে ফেলা চলে না। দেওপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত এবং অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় সংরক্ষিত খ্রীস্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর একটি মন্মথমূর্তির পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিভঙ্গ-লীলায় দণ্ডায়মান দ্বিভুজ দেবতার এক পার্শ্বে ভৃঙ্গারহস্তা একটি দেবী এবং অন্য দিকে শরপূর্ণ তূণীর-সহ একটি পুরুষমূর্তি ক্ষোদিত; দেবতার বামহস্তে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এবং দক্ষিণহস্তে তীরফলকের ন্যায় একটি দ্রব্য ন্যস্ত; পাদপীঠে মনে হয় যেন একটি মূষিক চিহ্নিত রহিয়াছে। প্রায় অনুরূপ মন্মথমূর্তি এদেশে আরও দু-একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পুরাপুরি বৈষ্ণব মূর্তি না হইলেও এমন একটি মিশ্র বিগ্রহের কথা এখানে বলিতেছি যাহার বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত মধ্যযুগের এই বিগ্রহটি শিল্পকলার দিক হইতে নিকৃষ্ট হইলেও মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে অসাধারণ। ইহা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মিশ্ররূপ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কিংবা বিষ্ণু ও শিবের অভেদাঙ্গ মূর্তি পাওয়া গেলেও ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বিগ্রহটিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার পাশাপাশি

তিনটি মুখ ক্ষোদিত রহিয়াছে ; চার হাতে স্রক্, স্রুব, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ; এইগুলি ইহার ব্রাহ্ম অংশের পরিচায়ক। মূর্তির দুইপাশে বিষ্ণুশক্তি শ্রী ও পুষ্টি এবং আয়ুধপুরুষ শঙ্খ ও চক্রের অবস্থিতি, এবং কণ্ঠে দোলায়মান বনমালা ইহার বৈষ্ণব অংশের পরিচয় দিতেছে। ইহার পাদপীঠে দেবতাদ্বয়ের বাহন হংস ও গরুড় উৎকীর্ণ। এই স্থানক ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বিগ্রহের সহিত দিনাজপুর জিলার ঘাটনগর-গ্রামে প্রাপ্ত ও অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত ব্রহ্মামূর্তির তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত প্রতিমাটিও ত্রিমুখ-বিশিষ্ট (পশ্চাতের মুখটি দেখানো হয় না, কারণ এরূপ মূর্তিগুলি প্রায়ই 'অর্ধচিত্র'-জাতীয়), তাহার চারিটি হাতে অনুরূপ স্রক্ স্রুবাদি দ্রব্য ; দেবতা ললিতাসনে উপবিষ্ট ; পাদপীঠে ইঁহার বাহন ক্ষোদিত। এই প্রকার ব্রহ্মামূর্তি এদেশে আরও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব বিগ্রহের আলোচনা-প্রসঙ্গে, গরুড়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গরুড় সচরাচর বিষ্ণুপ্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ দেখা গেলেও, ইহার পৃথক্ মূর্তিও এদেশে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সাধারণতঃ গরুড়ধ্বজের 'স্তম্ভশীর্ষ'-রূপে ব্যবহৃত হইত। এই ধ্বজস্তম্ভগুলি বৈষ্ণবমন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত থাকিত। গরুড় মনুষ্য ও পক্ষীর মিশ্ররূপ ; ইহার মুখ এবং অবয়ব প্রায় মানুষের মত হইলেও, নাসিকা পক্ষীচঞ্চুর মত, হস্ত ও পদতল পক্ষীর ন্যায় নখরবিশিষ্ট এবং ইহার দুটি পাখা আছে ; ইহার হস্তদ্বয় 'নমস্কার'-মুদ্রায় সংযুক্ত ; সময় সময় ইহার একটি হাতে সর্পের ফণা থাকে। মূর্তিশাস্ত্র মতে গরুড় 'ফণিফণভৃৎ'। স্তম্ভশীর্ষরূপে ব্যবহৃত গরুড়মূর্তি কখনও একটি প্রস্তরখণ্ডের দুই দিকে এমনভাবে উৎকীর্ণ থাকে যাহাতে উভয় পার্শ্ব ই ইহার সম্মুখভাগ বলিয়া বোধ। গঙ্গাজলঘাটা নামক গ্রামে প্রাপ্ত অনুরূপ একটি মূর্তি শিল্পকলার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুশক্তিদিগের মধ্যে শ্রী ও পুষ্টি অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীই সর্বাপেক্ষা পরিচিত। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব মূর্তিগুলিতে ইঁহারাই যে সাধারণতঃ দেবতার পার্শ্বচারিণীরূপে অবস্থান করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহাদের পৃথক মূর্তিও এদেশে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের জন্য যে পৃথক মন্দিরও কখনও কখনও নির্মিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজ ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে 'কাদম্বরী দেবকুলিকা'র অর্থাৎ সরস্বতীমন্দিরের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীদেবীর একক মূর্তি 'গজলক্ষ্মী' পর্যায়ে ফেলা যায়। দেবীর দুই বা কদাচিৎ চার হাত ; তিনি পার্শ্বস্থিত দুটি দিগগজকর্তৃক স্নাপ্যমানা। এদেশের শক্তিপূজায় দশমহাবিদ্যার অন্যতমা 'কমলা'র যে ধ্যান বর্ণিত আছে, এই জাতীয় মূর্তি উহারই অনুরূপ। বাংলার গ্রাম্য সাহিত্যে বহুপ্রচলিত 'কমলে কামিনী' বা শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে এই মূর্তিরই একটু বিকৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত কালীদহে তদ্দৃষ্ট দেবমূর্তি রাজার নিকট বর্ণনকালে বলিতেছেন, সে দেবী যেন দুটি করীশাবক গ্রাস করিতেছেন। রাজশাহী চিত্রশালার চতুর্ভুজ গজলক্ষ্মীর কথা এখানে বলা যাইতে পারে। মূর্তিটি খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পকলার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দেবী ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছেন ; তাঁহার তিনটি হাতে 'মাতুলুঙ্গ', 'অঙ্কুশ' এবং 'ঝাঁপি' বা রত্নাধার ; চতুর্থ হস্তটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; দুইপাশে চামরহস্তে ব্যজনরতা তাঁহার দুইটি সঙ্গিনী ; উভয়পার্শ্বে হস্তীদ্বয় কলসজলে দেবীকে স্নান করাইতেছে। সরস্বতীমূর্তি সাধারণতঃ চতুর্ভুজ ; সামনের হাত-দুইটিতে বীণা, পিছনের দুটিতে 'অক্ষমালা' ও 'পুঁথি'। এদেশে এরূপ কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানকার ঐপ্রকার প্রতিমার কতকগুলির পাদপীঠে দেবীর বাহন হংসের পরিবর্তে চঞ্চল একটি মেষ উৎকীর্ণ দেখা যায়।

লক্ষ্মীর লাঞ্ছন যেমন পেচক, সরস্বতীর তেমনি হংস বা পদ্ম ; হংস বা পদ্ম আবার ব্রহ্মার বিশেষ চিহ্ন এবং সরস্বতী জ্ঞান বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বেদবিদ্যার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্যধারণের অধিকারিণী। কিন্তু এই মেষচিহ্নের তাৎপর্য যে কি তাহা ঠিক জানা যায় না। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেবনদী সরস্বতীর বিবরণপ্রসঙ্গে মেষের উল্লেখ আছে ; জানি না ইহা বাংলার সরস্বতীমূর্তির উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর কোনও আলোকপাত করে কিনা। বগুড়া জিলায় প্রাপ্ত, অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত সরস্বতীমূর্তি শিল্পচাতুর্যের দিক হইতে অনবদ্য।

বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্তি ছাড়াও দেবতার অমূর্ত প্রতীক শালগ্রামশিলা বিষ্ণুপট্টাদিও ভক্তিসহকারে পূজা করিতেন এবং এখনও করেন। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শালগ্রামশিলা-পূজনের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উক্ত আছে। কাজেই শালগ্রামপূজা বহু পূর্ব হইতেই পাঞ্চরাত্র বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত। এই শিলাগুলি মনুষ্যনির্মিত নহে, এই বৃত্তাকৃতি এক বা একাধিক ছিদ্র (চক্র) সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ডসকল গণ্ডক নদীর গর্ভ হইতে সাধারণতঃ আহরিত হইয়া থাকে। অগ্নিপুরাণাদি গ্রন্থে ইহাদের আকৃতিগত অল্পবিস্তর পার্থক্যভেদে বিভিন্ন নামকরণের বিধান লিখিত আছে। মধ্যযুগের বিষ্ণুপট্ট কয়েকটি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি চতুষ্কোণ প্রস্তরফলক ; এক পিঠে দশাবতারাদির মূর্তি উৎকীর্ণ। বগুড়ায় প্রাপ্ত এইরূপ একটি বিষ্ণুপট্ট কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে ; ঢাকা চিত্রশালাতেও অনুরূপ কয়েকটি বিষ্ণুপট্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মথুরায় প্রাপ্ত শককুষাণযুগের জৈন 'আয়াগপট্ট'র সহিত ইহাদের তুলনা করিয়াছেন।

বাংলার আধুনিক বৈষ্ণব বিগ্রহের সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়া আমি এই আলোচনা শেষ করিব। এদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বৈষ্ণব মন্দির আছে ; এইসব মন্দিরস্থ বিগ্রহগুলি কিন্তু পূর্বালোচিত মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব মূর্তির অনুরূপ নহে। এগুলি প্রায়ই বাসুদেব-কৃষ্ণের বাল্য বা কৈশোর-লীলা সম্বন্ধীয়। 'বালগোপাল,' 'বেণুগোপাল', 'মদনগোপাল', 'রাধাকৃষ্ণ', 'শ্যামসুন্দর' 'যুগলকিশোর' প্রভৃতি বিগ্রহই এইসব মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত। এগুলি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যেন ইহাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি আরোপিত ভক্তের অন্তরের সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য, প্রেম প্রভৃতি ভাবের প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে ; আগের মত ভগবানের ঐশ্বর্যাদি গুণের উপর তত জোর দেওয়া হয় নাই। বর্ধমান জিলার অম্বিকা-কালনা একটি সমৃদ্ধ নগর। এখানে প্রাক্তন বর্ধমানরাজগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'লালজী', 'গোপালজী' প্রভৃতির অনেকগুলি বৈষ্ণবমন্দির আছে। ইহাদের সবগুলিতেই ঐরূপ কৃষ্ণমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খাস বর্ধমানেও এই জাতীয় অনেকগুলি মন্দির বর্তমান। উহাদের গর্ভগৃহেও এইরূপ বৈষ্ণব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। কোনও কোনও বিগ্রহের নাম আগের মত (যথা লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি) হইলেও ইহার রূপ আধুনিক রাধাকৃষ্ণেরই মত। বিষ্ণুপুরের 'শ্যামরায়'-মন্দির ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ; এই মন্দিরের মূল বিগ্রহও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা সম্পর্কিত। কথিত আছে যে কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত 'মদনমোহন'-মন্দিরের মূল বিগ্রহ পূর্বে ঐস্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের শেষ সময়ে বাগবাজারের গোকুল মিত্র তথা হইতে এই বিগ্রহ আনাইয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক বৈষ্ণব মূর্তিগুলির পূর্বালোচিত মধ্যযুগীয় ঐরূপ প্রতিমাবলী হইতে পার্থক্যের প্রধান কারণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। দাক্ষিণাত্যে যামুনাচার্য রামানুজকর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ বৈষ্ণব ধর্মের আদিরূপ

পাঞ্চরাত্র বা সাত্বত ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রামানুজের পরবর্তী কালের তদ্দেশীয় বহু বৈষ্ণব বিগ্রহ স্থূলতঃ আগের মূর্তিগুলির অনুরূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক মনীষী ভক্তের ধর্মসাধনার কেন্দ্র বৃন্দাবন। সেখানকার অধিকাংশ বৈষ্ণব মন্দিরের বিগ্রহও সেজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবপর্যায়ভুক্ত।[৩]

৩। এই প্রবন্ধে আলোচিত সবগুলি মূর্তিই পূর্বে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত '*Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Eastern School of Mediaeval Sculptures in India*, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী রচিত *Early Sculpture of Bengal* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। *Dacca History of Bengal, Vol. I*-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে আমি ঐগুলির এবং বাংলার অন্যান্য প্রাচীন দেবমূর্তির বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ঐসকল গ্রন্থে মূর্তিগুলির চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে মাত্র কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হইল।
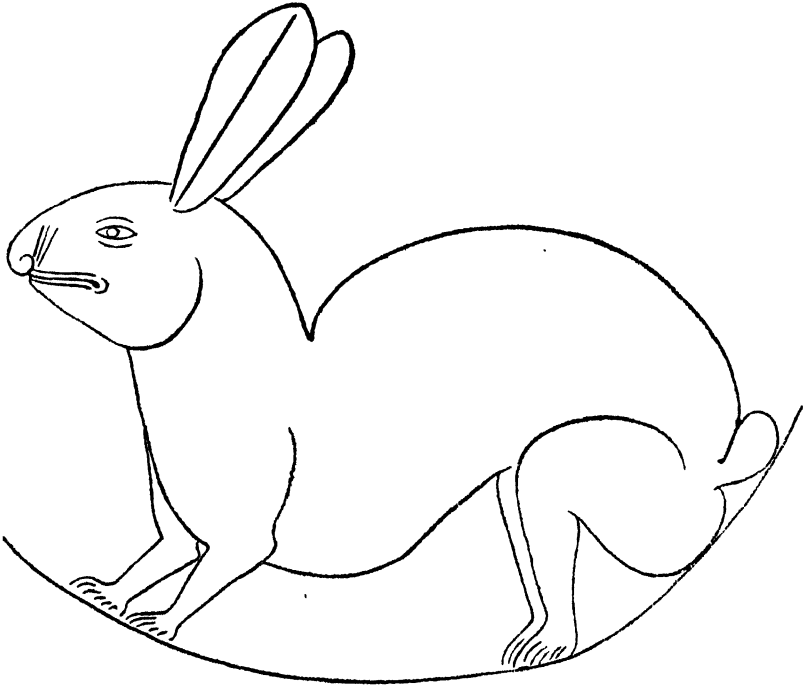
খরগোশ

সিংহলের লোকশিল্প

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সৌজন্যে

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে ॥

তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী ;
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে ॥

মনের বেদনা রাখো মা, মনে ;
নয়নবারি নিবারো নয়নে ;
মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে ;
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে ॥

শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গনি গনি
দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী ;
দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী,
নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

স্বরলিপি

II সা সা রা রা | রগা - রগা মা মা I পা - া - া - া |
কে ন চে য়ে | আ০ ০০ ছ গো I মা ০ ০ ০ |

| - া - া ধা পা I মা - গা মা - পা | - মা - জ্ঞা - রা - সন্া I
০ ০ মু খ I পা ০ নে ০ | ০ ০ ০ ০০ I

I সা সা রা রা | রগা - রগা মা মা I পা - া - া - া |
কে ন চে য়ে | আ০ ০০ ছ গো I মা ০ ০ ০ |

[- া - া]
| - া - া গা মা I পা না না - া | র্সা - া র্সা র্সা I
০ ০ এ রা I চা হে না ০ | তো ০ মা রে I

I নর্সা - নর্সর্রা র্সা ণধা | পা - া - া - া I পা ধর্সা র্সা র্সা |
চা০ ০০০ হে না০ | যে ০ ০ ০ I আ প০ ন মা |

| - ণা ধা পধা - পা I গরা গা মা - পা | মা - া - া - া I
০ য়ে রে০ ০ I না০ হি জা ০ | নে - - - I

I না না না - া | র্সা - পধা র্সা র্সা I ণা ধা র্সণা - ধপা |
এ রা তো ০ | মা ০য়্ কি ছু I দে বে না০ ০০ |

| পা পা ধা - পা I র্সা - া ণা ণা | - ধা পা পা পা I
দে বে না ০ I মি ০ থ্যা ক | ০ হে শু ধু I

I মা গরা গা - া | মা - পা মা - া II
ক ত০ কী ০ | ভা ০ নে ০ II

II { পা পা পা পা | পা পা পা - ধা I না না র্সা র্রা |
(২) তু মি ত দি | তে ছ মা ০ I যা আ ছে তো |
(৪) শূ ০ ন্য পা ০ নে চে য়ে প্র হ র গ

| র্স না - া র্সা - া I পা - না র্সা না | - র্সা র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা I
(২) মা ০ রি ০ I স্ব - র্ণ শ | ০ স্য ত ব I
(৪) নি - গ নি দে খো কা ০ টে ০ কি না

I র্সা - র্রা র্সা ণধা | র্সণা - ধা পা - া } I মা - ধা ধা ধা |
I (২) জা ॰ হ্ন বী॰ | বা॰ ॰ রি ॰ } I জ্ঞা ॰ ন ধ |
(৪) দী ॰ র্ঘ র॰ ॰॰ জ নী ॰ দুঃ ॰ খ জা

| - র্সণা ধা পা ধা I না - র্সা র্সা র্সা | - ণা ধা পা - া I
|(২) ॰ র্ম ক ত I পু ॰ ণ্য কা | ॰ হি নী ॰ I
(৪) ॰॰ না য়ে ॰ কী হ বে জ ॰ ন নী ॰

I না না না না | র্সা - পা পা ধা I র্সা র্সা ণধা - পা |
I (২) এ রা কি দে | বে ॰ তো রে I কি ছু না॰ ॰ |
(৪) নি • র্ম ম চে ॰ ত না হী ॰ ন॰ পা

| পধা পা মা - া I র্সা - া ধা র্সা | - ণা ধা পা পা I
|(২) কি ছু না ॰ I মি ॰ থ্যা ক | ॰ বে শু ধু I
(৪) যা ॰ গে ॰

I মা - গরা গা গা | মা - পা মা - া II
I (২) হী ॰॰ ন প | রা ॰ নে ॰ II

II সা রা রা রা | - া রা রা - া I রগা রা রা - গা |
II (৩) ম নে র বে | ॰ দ না ॰ I রা॰ খো মা ॰ |

| মা - া পা - া I পা ধা ণা ধণা | - র্সা ণা ণধা - পা I
| ম ॰ নে ॰ I ন য় ন বা॰ | ॰ রি নি॰ ॰ I

I পা - ধা পা মা | গমা - পা মা - া I পা না না - া |
I বা ॰ র ন | য়॰ - নে ॰ I মু খ লু ॰ |

| র্সা - া র্সা র্রা I র্সা - া ণা ধা | র্সণা - ধা পা - া I
| কা ॰ ও মা I ধূ ॰ লি শ | য়॰ ॰ নে ॰ I

I পা ধর্সা র্সা - ধা | র্সণা - ধা পা পা I মা - গা রা গা |
I ভু লে॰ থা ॰ | কো॰ ॰ য ত I হী - ন স |

| মা - পা মা - া I
| স্তা • নে • I

সরলা দেবীচৌধুরানী

সিন্ধুদেশের সূফী গুরু শাহ লতীফ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হিরাটে সৈয়দ মীর আলি শাহ নামে একজন সম্ভ্রান্ত দানবীর ধার্মিক লোক বাস করিতেন। দানের গুণে প্রবল পরাক্রান্ত তিমুরও তাঁহাকে সম্মান করিতেন। মীর আলির চারি পুত্র চারিটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পঞ্চমপুত্র হিরাটে পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি দেখিতেন। ষষ্ঠ পুত্র হায়দরকেও শাসনকর্তার পদ দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি পদগ্রহণ না করিয়া পিতার কাছেই রহিলেন। পিতা মীর আলি তখন সেনাপতিরূপে ভারতে যুদ্ধরত। কিছুদিন পরে সৈয়দ হায়দর শাহ পিতার নিকট বিদায় লইয়া সিন্ধুদেশের অন্তর্গত 'হালা' নগরে আসিয়া শাহ মহম্মদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

'হালা' বিখ্যাত স্থান। বহু জ্ঞানী-গুণী শিল্পী ও সাধকের এখানে বাস। শাহ মহম্মদের সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তার বনিবনা হইতেছিল না। তাই একবার শাহ মহম্মদ দারুণ রাজরোষে পতিত হন। এই বিপদে হায়দর তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই সূত্রে হায়দর ও শাহ মহম্মদের মধ্যে একটি গভীর প্রীতি ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

শাহ মহম্মদের কন্যা ফাতেমা ছিলেন যুবতী ও পরমা সুন্দরী। তিনি হায়দরকে ভালবাসিলেন, হায়দরও মুগ্ধ হইলেন। হায়দর ইতিপূর্বেই এক বিবাহ করিয়া সেই পত্নীকে হিরাটে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছিল। সে সব কথা কহিয়া তিনি ফাতেমাকে সাবধান করিলেন। তবু ফাতেমা ও শাহ মহম্মদ উভয়ে তাঁহাকেই পছন্দ করিলেন। ফাতেমাকে বিবাহ করিয়া হায়দর বেশ আছেন এমন সময় হিরাটের তাগিদ পাইয়া হায়দরকে দেশে ফিরিতে হইল। ফাতেমার তখন সন্তানসম্ভাবনা। যাইবার সময় হায়দর বলিয়া গেলেন যদি ফাতেমার গর্ভে পুত্র জন্মে তবে যেন সেই পুত্রকে হিরাটে প্রেরণ করা হয়। কে জানে তিনি আর কখনও ফিরিবেন কিনা।

হায়দর আর সিন্ধুদেশে ফিরিলেন না কিছুকাল পরে হিরাটেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ফাতেমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই হিরাটে গেলেন এবং আপন সম্পত্তির ভাগ লইয়া দেশে ফিরিলেন। ইনিই সিন্ধুদেশের বিখ্যাত সূফী কবি ও সাধক শাহ লতীফের পূর্বপুরুষ। হায়দরের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি শাহ লতীফের জন্ম। কাজেই মধ্যে অনেক পুরুষের ব্যবধান। শাহ লতীফের বৃদ্ধপ্রপিতামহ শাহ করীমও বিখ্যাত সূফী সাধক ও কবি ছিলেন। ইঁহারা বংশানুক্রমে সাধক ও বহু সম্ভ্রান্তবংশের কুলগুরু।

শাহ লতীফের পিতা শাহ হবীব বড় স্নেহময় ছিলেন। শাহ করীমের পন্থানুসরণ করিয়া তিনিও সাধনমার্গে গভীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। পুত্র শাহ লতীফের শিক্ষার ভার তিনি দিলেন বন্ধু নূরমহম্মদ ভট্টীর উপরে। নূরমহম্মদ ছিলেন মরমী লোক। বিদ্যাও তাঁহার ছিল অগাধ। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রেমভক্তি ও মর্মদৃষ্টিরই সমাদর বেশি করিতেন। তাঁহার শিষ্য শাহ লতীফও ছিলেন জন্মাবধিই মরমী ভক্তমানুষ। তিনিও উপযুক্ত গুরু পাইয়া সেই পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রেমদৃষ্টির গুণে

শাহ্ লতীফ কোরানের বাণীর ও নানা স্ফী-কবিতার যে সব সিন্ধী অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব। মূল হইতে অনুবাদের রস একটুও কম হয় নাই। এই সময় লতীফ বালকমাত্র।

দিনে দিনে বালক লতীফ বড় হইতে লাগিলেন। দিনে দিনে তাঁর ভাব-ঐশ্বর্যও বাড়িয়া চলিল। লতীফ আর কোলাহল ভালবাসেন না। পিতা হবীব পুত্রের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া 'হালা' শহর ছাড়িয়া কোতরী নামে একটি নির্জন গ্রামে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানটি মনোরম, শাহ্ লতীফের ভাব ও সাধনার অনুকূল।

এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মির্জা মূল বেগ। শাহ্ লতীফের বংশ ইঁহাদের কুলগুরু, তাই বিশেষরূপে পূজনীয়। মির্জার কন্যা পীড়িত হইলে হবীবের ডাক পড়িল। গুরুরাই তখন শিষ্যদের আশীর্বাদ দিয়া এবং ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিতেন। বৃদ্ধ হবীব নিজে আসিতে না পারায় পুত্র লতীফকে পাঠাইলেন। কন্যা রোগমুক্ত হইলেন। লতীফ তখন তরুণ, কন্যাও তরুণী। উভয়ের মধ্যে প্রীতির উদয় হইল। তখনকার দিনে গুরুর বংশে কন্যার বিবাহ দেওয়া গৌরবের বস্তু ছিল। প্রতিভাবান কবি লতীফের জন্ম সৈয়দকুলে এবং হিরাটের প্রখ্যাত ধর্মগুরুদের বংশে। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে মির্জার পক্ষে লতীফের কাছে কন্যাদানই প্রশস্ত ছিল। কিন্তু পরমসুন্দরমূর্তি হইলেও লতীফের মধ্যে ফকির-জনোচিত ভাব লক্ষ্য করিয়া গর্বিত মির্জা এই বিবাহে মত দিলেন না। মির্জার পরিবারে সকলেরই ইচ্ছা, কন্যারও আগ্রহ এই বিবাহ হয়, কিন্তু মির্জা বাঁকিয়া বসিলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দস্যুদের হাতে মির্জা নিহত হন। মির্জাপরিবারের লোক মনে করিলেন, লতীফের মনে বেদনা দেওয়াতেই এইরূপ ঘটিল। বেদনা পাইলেও লতীফ কখনও কাহারও অকল্যাণ কামনা করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, তখন মির্জাপরিবারের সকলে আগ্রহ করিয়া ঐ কন্যাকে লতীফের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু বাঁচে নাই। লতীফের পারিবারিক জীবনের কথা বেশি কিছু জানা যায় না, তবে ক্রমে ক্রমে ফকিরের ভাবেই লতীফের জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ফকির হইলেও লতীফ প্রেমিক ও সৌন্দর্যের উপাসক। গাছপালা পশুপক্ষী সবার প্রতি তাঁহার মৈত্রী, মানবের জন্য তাঁহার প্রীতি ও সেবা এই সবই তাঁহার সাধনার সহায় হইল। প্রেমপথের পথিক হইলেও প্রকৃতি ও নীতির প্রতি লতীফ একটুও উদাসীন ছিলেন না।

হালা হইতে হায়দরাবাদ আসিতে টাণ্ডো-আল্লাহ্য়ার নামক স্থানের কাছে কতগুলি বালির পাহাড় আছে। স্থানটির নাম ভিট। ভিট পরম নির্জন ও শান্ত। এইখানে বাল্যকাল হইতেই লতীফ মনের ব্যাকুলতায় আসিতেন। অনেক সময় তাঁহাকে কোথাও না পাওয়া গেলে ভিটে পাওয়া যাইত। তাঁহার গান শুনিয়া দুই-একবার তাঁহার পিতাও এখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইখানে এক বিরাট গাছের মধ্যে একটা কোটর ছিল। লতীফের এক বন্ধু ছিলেন ছুতার। সেই ছুতারের সহায়তায় লতীফ সেই কোটরটিকে নিজের দেহ রাখিবার মত করিয়া লন। সেইখানেই লতীফ নির্জনতার আকর্ষণে আসিয়া বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর লতীফ এই স্থানটিকেই তাঁহার সাধনার জন্য নির্বাচন করিলেন।

এইখানে বসিয়া লতীফ যে-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনি পবিত্র।

এখানেই তাঁহার অপূর্ব সব বাণী ও গান রচিত। এই নির্জনের মধ্যে বাস করিয়াও লতীফের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সাধক ও কাব্যরসপিপাসুদের পক্ষে ভিট একটি পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠিল। লোকের মুখে ভিটশরীফের (মহাতীর্থ ভিটের) খ্যাতি আর ধরে না। সিন্ধু বেলুচিস্তান রাজপুতানা পাঞ্জাব কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যাকুল অনুরাগীর দল এই মহাতীর্থে আসিতে লাগিলেন। এখনও ভিটশরীফ ভক্তগণের এক মহাতীর্থ।

মহাসাধক লতীফের মূর্তিটিও ছিল পরম সুন্দর, ব্যবহারও অতি মধুর, গানগুলিও মনোজ্ঞ, কণ্ঠের স্বরও অপূর্ব। যে আসে সে-ই আকৃষ্ট না হইয়া যায় না। এমন লোকেরও কি শত্রু থাকে? লতীফ কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করিলেও দেশপতি নূরমহম্মদ কলহোরা দিন দিন ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁরও বহু অনুবর্তী লোকলশকর ছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এই লতীফের প্রভাবে আমার সব সেবকই আমাকে ছাড়িয়া লতীফকে আশ্রয় করিবে। এখন তবে কি করা যায়?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ঠিক করিলেন, "ধর্মের প্রেরণাতেই তো সকলে লতীফের কাছে যায়। যদি সংকীর্ণমতি ধর্মব্যবসায়ীদের মন বিষাইয়া তুলিতে পারি তবে তাহারা সকলে মিলিয়া লতীফের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এবং কুসংস্কারপ্রবণ লোকেরা তাহাতেই বিভ্রান্ত হইয়া লতীফের বিরুদ্ধে যাইবে।" নূরমহম্মদ তখন মোল্লা ও মৌলবীদিগকে লতীফের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। ধর্মের নামে এইরূপ অধর্মাচরণ চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে।

প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহারা "ধর্ম গেল ধর্ম গেল" বলিয়া চিৎকার করেন তাঁহারাই ধর্মকে সর্বাপেক্ষা অপমান করেন। নিজেদের নীচ স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা ধর্মকেই প্রতিহিংসার জঘন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। লতীফ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সাধক। ভণ্ডামি ও ধর্মধূর্ততার বিরুদ্ধে বার বার তাঁহার বাণী তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন। কাজেই তাহাতে বহু ধর্মব্যবসায়ীর ব্যবসায়গত স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে। সেই সব ক্ষুদ্রমতি নীচের দল তাহাতে খেপিয়া উঠিল আর স্বার্থপর নূরমহম্মদ তাহাদিগকেই দিনরাত্রি উসকাইতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা ছুতায় লতীফের মুখে বেফাঁস সব কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন আসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, শাস্ত্রাচারপালন করাতে কোনো লাভ আছে কি?" লতীফ বলিলেন, "ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পার, কিন্তু প্রেমময়কে পাইতে হইলে অন্য পথ আশ্রয় না করিয়া উপায় নাই।"

এইসব সত্ত্বেও লতীফের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা টলাইতে পারা গেল না। তখন তাঁহার শত্রুর দল অন্য পথও ধরিতে চেষ্টা করিলেন। নূরমহম্মদ ছিলেন একজন ছোটখাট রাজা। তিনি তাঁহার প্রাসাদে লতীফকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সরলহৃদয় লতীফ কোনো অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রাত্রিকাল, লতীফ আহারান্তে নির্জন ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, একদল পরমা সুন্দরী নর্তকী ঘরে প্রবেশ করিয়া লতীফকে মোহিত করিতে চাহিল। লতীফ সৌন্দর্যের উপাসক হইলেও এইরূপ ফাঁদে আত্মহারা হইবার মত মানুষ নহেন। চক্রান্ত ব্যর্থ হইল। নূরমহম্মদ অন্তরে অন্তরে আরও বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

সৌন্দর্যের উপাসনাই সুফীদের সাধনার মুখ্যপথ। কিন্তু কামনা অন্তরে থাকিলে আর সৌন্দর্যের উপাসনা কি হইল? তাহা ছাড়া ইন্দ্রিয়সেবার পথে কে কবে আনন্দকে পাইয়াছে। তাই সাধক চরণদাস (জন্ম ১৭০৩) বলিয়াছেন, "যে ইন্দ্রিয়ের বশ হইল সে আর আনন্দকে পাইলই না।"

জো ইন্দ্রিনকে বশ ভয়ো পাবৈ না আনংদ।

স্থফীদের মতে এই অনুরাগ হইল ইশ্‌ক মিজাজী বা দৈহিক ভালবাসা। ইশ্‌ক হকীকী হইল সাচ্চা প্রেম। তাহা পরম পবিত্র বস্তু। তাহাতে সৌন্দর্যকে কামনার উর্ধ্বে রাখিয়া অন্তরে অন্তরে ভগবৎপ্রসাদের মত সেবা করিতে হয়। স্থন্দর বস্তু খুবই আদরণীয়, কিন্তু কামনার দ্বারা চর্বণ করাকেই তো আদর বলা যায় না। বসোরার গোলাপবাগানের মধ্যে ছাগল ঢুকিয়া পরম আগ্রহে যদি সব গোলাপ চিবাইয়া খাইতে থাকে তবে তাহাকে তো সৌন্দর্যের উপাসনা বলা চলে না। লতীফ বলেন,

দেখ্‌ম তু সেঁ তিন্ন হিজে মিজাজ্যা ন্হ্যঁ মুহমেঁ ॥

"কামনার নয়ন দিয়া দেখিলে প্রিয়তমকে পাইবে না। এই চক্ষু বুজিয়া অন্তরের নয়নে দেখিতে হইবে। সাবধান হও, নহিলে এই দৃষ্টিই তোমাকে বদ্ধ করিবে।" "তাঁর সৌন্দর্য তো ইন্দ্রিয়গম্য নয়। অন্ধকারের সাগরে ডুবিয়া সেই সৌন্দর্যকে পাইতে হইবে, ডুবুরি যেমন করিয়া অপূর্ব মুক্তার সন্ধান পায়।"

এইসব নীচমতি নর্তকীদের প্রতি বিরূপ হইলেও তিনি পরম সহৃদয় ছিলেন। নৃত্যগীত প্রভৃতি চারুকলার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তখন সেই দেশে গুলন নামে এক প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন। তাঁর যেমন রূপযৌবন তেমনি অপূর্ব কণ্ঠ ও সংগীতকলা। একবার গুলন আসিয়া সাধক লতীফকে গভীর অনুরাগতত্ত্বের চমৎকার সব গান শুনাইলেন। গানগুলি সবই স্থফী কবিদের রচনা। লতীফ গান শুনিয়া অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন, গুলনকে লতীফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার কি করিতে পারি?" গুলন কহিলেন, "যদি আমার উপর প্রসন্নই হইয়াছ তবে আশীর্বাদ কর যেন আমার এইরূপ জীবন হইতে আমি মুক্তি পাই।" লতীফ সেই আশীর্বাদই করিলেন। এই কথা শুনিয়া সিন্ধুদেশের অধিপতি গুলনকে বিবাহ করেন। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ দেশপতি গুলাম শাহ কল্‌হোরা এই গুলনেরই গর্ভে জন্মলাভ করেন। তবু গুলনের সংগীতে মুগ্ধ হওয়ায় একদল নীচ ধর্মব্যবসায়ী লতীফের নিন্দা রটাইতে লাগিলেন। সাধক হইয়া লতীফ কেন নর্তকীর গানে মুগ্ধ হইবেন? লতীফ গাহিলেন, "গায়িকার কণ্ঠে আমি প্রেমময়ের কণ্ঠ শুনিয়াছি। সমস্ত প্রকৃতির সর্বসৌন্দর্যে তাঁরই ব্যাকুলতা। এই যে নানা বরনের বিবিধ ফুল, সকলের মধ্যে সেই একই বেদনা। তাহাদের সবারই একই বাণী।"

যতকাল লতীফ বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন প্রেমময়ের সেই প্রেমসংগীত তাঁহার কর্ণে নিত্য বাজিয়াছে। বৃদ্ধবয়সে যখন লতীফ এই জগৎ হইতে বিদায় লইলেন তখনও এই গান শুনিতে শুনিতেই প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করিলেন।

সারাজন্ম লতীফ প্রেমের বেদনার গানই গাহিয়া গিয়াছেন। এই প্রেম বাহিরে মেলে না, মেলে অন্তরে; তাই লতীফ গাহিলেন, "অন্তরে দেখো চাহিয়া। বাহিরে কি তাহা মেলে? পশুর মত বাহিরে তাহা খুঁজিও না। ঘরে এসো, দ্বার বন্ধ করিয়া দাও।"

মুহ কর মংঝাণা,
বাহিরা ঢূংঢ ন ঢোর জ্যঁ ॥

"প্রেমময়ের লীলার রহস্য বুঝা কঠিন। কখনও আসিয়া দেখি তিনি দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া, কখনো দেখি তিনি দ্বার খুলিয়া প্রতীক্ষমান। কখনো আসি, প্রবেশ পাই না। কখনো তিনি আপনি আসিয়া লইয়া

যান ভিতরে। কখনো তাঁর একটু স্বর শুনিবার জন্য আমি ফিরি ব্যাকুল হইয়া। কখনো দেখি তিনি আমাকে রহিয়াছেন আলিঙ্গন করিয়া।" সিন্ধীতে তাঁর প্রসিদ্ধ গানের মধ্যে এই বেদনাই বাজে—

কডহিঁ তাকুঁ ডীন কডহিঁ খুলন্ন— দর দোস্তন জাঁ।॥

ইহার সঙ্গে তুলনীয় বাউল মদনের গান—

আমার আজব অতিথি···
তার নাইরে সময় নাই অসময় তবু তারে ঠেলতে পারি না।
(যখন) পাতিয়া সেইজ জ্বালাইয়া দীপ, সারা রাইত জাগি।
তখন মোরে দেয় না গো দেখা আমার আজব অতিথি।
(যখন) উঠাইয়া সেইজ নিবাইয়া দীপ থাকি গো সখি,
(তখন) মোর ঘরেতে আসন মাঙ্গে আমার অতিথি।··

তাঁর প্রেমেতে এইরূপ খামখেয়ালির আর অন্ত নাই। তবু তো তাঁকে অস্বীকার করা চলে না। এইসব খেয়ালের জন্যই তিনি যে আরও প্রিয়। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে যে আমার প্রেম সে তো আজকার নয়। সৃষ্টিরও পূর্ব হইতে এই প্রেম। লতীফ বলেন, "সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবার মূলে তাঁর বাণী—'হউক'। সেই 'হউক' মন্ত্রটি যখন উচ্চারিত হয় নাই তখনও প্রেমময়কে প্রেমের আলোকে দেখিয়াছি বিরাজমান।"

ন কা কুন ফৈকুন হুঈ ন কা হুংগন হুঁ।
সজন তইঁ সাইথ মেঁ ভেটে ডিঠো সুঁ॥

ইহাতে মনে পড়ে কবীরের বাণী—

ব্রহ্মা নহিঁ জব টোপী দীন্হা বিষ্ণু নহিঁ জব টীকা।
শিব শক্তি জব জন্মো নাহিঁ তবহী জোগ হম সীখা।
হম তবকে অহী বৈরাগী, হমরী সুরতী ব্রহ্মসে লাগী॥

অর্থাৎ ব্রহ্মারও মুকুটধারণের, বিষ্ণুরও রাজ্যারম্ভের, শিবশক্তিরও জন্মের পূর্বে আমার বৈরাগ্য। ব্রহ্মের সঙ্গে আমার তখন হইতেই প্রেমধ্যানের যোগ।

বাল্যকাল হইতে লতীফ সত্য ও নীতি-পরায়ণ, করুণা ও প্রেমে পূর্ণ। তার উপর আসিল ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা। ভগবৎকৃপায় ভগবৎসঙ্গও পাইলেন। "আনন্দলোক হইতে যোগী সমাগত। পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁর রূপ দীপ্যমান। সব অন্ধকার হইল দূর। তাঁহার সৌরভে পৃথিবী উঠিল ভরিয়া। প্রেমলোকে তিনিই আমায় দিলেন জাগাইয়া। নবারুণের মত দীপ্যমান আমার প্রেমময়ের বদনখানি। কী শোভাই দেখিলাম।"

রাণেজে রিহাণ মাঁ কো আদেসি আয়ো। ইত্যাদি

সাধনার প্রতি ও সাধু-যোগীদের প্রতি লতীফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্বে লতীফ তাঁর শিষ্য আব্‌দুল রহীমকে উপদেশ দিয়া যান যেন তিনি গিরনার পর্বতে গিয়া এক অতিবৃদ্ধ যোগীর কাছে সাধনার উপদেশ লন। সাধু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "রহীম, তুমি তো লতীফের শিষ্য, তোমরা তো আমার আপন লোক।"

ওঁকার মন্ত্রের সাধনায় লতীফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। লতীফ বলিয়াছেন, "যদি গুরু তোমাকে এই

একাক্ষর বক্কিম মন্ত্রটি দয়া করিয়া দেন তবে গৃহে লম্বমান প্রদীপের মত তাহাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহের সকল অন্ধকার দূর করিবে।

হিকু জে অখড়ো বীংগড়ো গুর তুসি জে তোয়ে ডিয়ে।
ও অংধারি ঘর ডেরড়া ফিব ফির জোত করে।

"মিম্" অক্ষরটি মনে রাখিও, তার পূর্বে বসাইও "অলিফ" অর্থাৎ ওঁ।

নূরমহম্মদ যখন তাঁহাকে নর্তকীর ফাঁদে ফেলিতে চাহিয়াছিলেন তখন লতীফ বলিয়াছিলেন, "যে-জন ভগবানের দয়ায় যোগের প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাকে কি কোনো ঝুঠা মায়ায় বাঁধা যায়?"

সাধনার পথে, লতীফ বলেন, তিনটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে সবকিছু স্বীকার করিয়া সাধন করিতে হয়। তারপর আসে ক্রমে ক্রমে সবকিছু ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার সাধনা। তারপর এই "নেতি"র পর নূতন "অস্তি"র হয় আবির্ভাব। রাত্রির অন্ধকারের পরে আসে এই নব অরুণোদয়।

লতীফ বলেন, "নিশ্বাস যেমন প্রাণরূপে দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তেমনি সুফীসাধক আপনাকে সর্বহৃদয়ে করিবেন প্রসারিত।"—

সূফীয় সৈর সভন মেঁ জিয়ঁ রগন মেঁ সাহ।

মুসলমানদের প্রধান দুই সম্প্রদায়— সিয়া ও সুন্নী। সুফীরা তো দলাদলির ধার ধারেন না। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "লতীফ, তুমি কি সিয়া, না, সুন্নী?" লতীফ বলিলেন, "এই উভয়ের মাঝখানে আমি আছি।" তাঁরা বলিলেন, "তার মাঝে তো কিছুই নাই।" লতীফ বলিলেন, "সেই 'কিছুই-না'-ই তো আমি।"

শিষ্য লতীফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া সেই পরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করিব?" লতীফ বলিলেন, "প্রত্যক্ষ করিবার লোভ কেন করিবে? দিক্‌চক্রবাল কখনো স্পর্শ করিয়াছ? যতই অগ্রসর হইবে, ততই তাহা দূরে সরিবে। প্রত্যক্ষ করিবার অহংকার ছাড়। শিশুর মত আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিলীন কর। অধিকার করার কথা ভুলিয়া যাও। এইসব অহংকার এই সাধনার জগতে অচল। 'অহম্' একটি বিষম বোঝা। এই বোঝা ঘাড়ে লইয়া কেহ কখনো সেই সাগর পার হইয়া প্রেমের কূলে পৌঁছিতে পারে নাই। এই বোঝা ঝাড়িয়া ফেলো। তারপর দেখিবে প্রেমে ও সৌন্দর্যে তুমি তাঁর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছ। অথচ 'অহম্'কে যে পাইয়াছ সেও এক মহাসৌভাগ্য। সেই 'পরম-অহম্'এর মধ্যে তোমার 'অহম্'কে ডুবাইয়া দাও। সমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই হইল নদনদীর সার্থকতা। মানুষেরও না আছে আদি না আছে অন্ত— তাই তাঁর সঙ্গে দিব্য মিলিয়া যাইবে।"

ন কা ইব্‌তদা অব্‌দজী ন কা ইন্‌তহা।

বিরাটের ডাক নিত্য তাঁর কানে বাজিত। তাই তিনি সদাই ছিলেন সাগরের জন্য ব্যাকুল। আবার ক্ষুদ্রকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না। "তরবারির যত প্রশংসাই কর, সে শুধু পারে ধ্বংস করিতে। আমি সূচীকেই বলি ধন্য, সে অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কিন্তু সে সব ছিদ্র ছিন্নতার সংস্কার করিয়া নিত্য চলিয়াছে সৃষ্টি করিয়া।" তাঁর আশীর্বাদ ছিল "সূচীর মত অকিঞ্চন হও"।

দুঃখকে সাধনার জগতে তিনি সবচেয়ে বড় সহায় মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "উপাসনার

পূর্বে যে আপনাকে ধৌত করিতে চাও তাহা কি সাধারণ জলে হয়? দুঃখের জলে হৃদয়কে ধৌত কর। প্রিয়তমের মুখ তবেই দেখা যাইবে।”—

দুখ সা ধোয় জো দিল।

দুঃখে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারাই হইল প্রেমের সার্থকতা।

“আপনাকে প্রেম-অগ্নির পতঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও? তবে আগুন দেখিয়া পলাইও না।”

পতংগ চরাঈ পাণ খে ত পসি মচ ম মোট।

“হে হংস, মুক্তা যদি চাও তবে তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া লাভ কি? অগাধের তলে ডুব দাও। অতল গভীরে আপনাকে হারাইয়া ফেল।”

“কামনার অতীত গভীর লোকে ডুব দাও। দেখিবে সেখানে প্রেমময়ের পথ মধ্যাহ্নসূর্যদীপ্ত দিনের মত দীপ্যমান।”

প্রেমের জগতে কখনো কখনো মিলনও একটা বাধা। তাই লতীফ বলেন, “চিরদিন যেন খুঁজিয়াই চলি। কখনও যেন মিলনের দুর্ভাগ্যে সেই ব্যাকুলতার অবসান না হয়।”

এইসব কথা লোকে হয়তো ঠিক না-ও বুঝিতে পারে, তবু এই কথাই চরম সত্য। পাপের ভয়ে বা পুণ্যের লোভে সাধক যেন বিচলিত না হন। লতীফ বলেন, “পাপ যদি করি তবে মানুষ হয় রুষ্ট, পুণ্যের লোভ যদি করি তবে প্রিয়তম যে রুষ্ট হইয়া ফিরাইবেন মুখ।”

অরগুণ রুস্‌সে সভকা
পীরীঁ গুনীঁ রুঠাঁ মেঁ।

“প্রিয়তমকেই যখন চাই তখন লোকের-মন-রাখা পথে চলিয়া লাভ কি? কাজ কি আমার পুণ্যসঞ্চয়ে?”

লতীফ বলেন, “লোকপ্রিয় সিধা পথেই সকলে যাইতে চায়। আমি চাই সেই সাধককে যে কঠিন সর্বজননিন্দিত বাঁকা পথে অগ্রসর হইবার সাহস রাখে। সোজা পথ ছাড়ো। সেই কঠিন পথে চলো, সর্বনাশ যদি হয় তো হউক। বিশেষ সৌভাগ্য যদি না থাকে তবে এই সর্বনাশা পথে কে চলিতে সাহস পায়?”

“লোকের স্তুতিনিন্দা গ্রাহ্য করিয়া লাভ নাই। তাহারা কিছুই বুঝিবে না। তাহাদিগকে তোমার ভিতরের কথা জানিতে দিয়াই বা লাভ কি?” “সকলের উল্টাদিকে চাহিবি, উল্টাপথে চলিবি, লোকে যে-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় সেই স্রোতের বিরুদ্ধে তুই উজানপথে চলিবি।”

অখ্‌খ উলটি ধার বাঁও উলটো আমসে।
জে লহরারো লোক রহে ত তু উঁচো রহ উভার॥

ইহাতে মনে পড়ে চণ্ডীদাসের বাণী—

যাইবি দখিনে থাকিবি পছিমে বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পীরিতি গোপন রাখিবি থাকিবি মনের সুখে।

—নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পদ ৭৯৭

প্রেমলোকের কথা বলিয়া কি কোনো লাভ আছে? কেহ কি কিছু বুঝিবে? এখানে সবই রহস্যময়। এমন কি, স্বয়ং প্রিয়তমের ব্যবহারও এখানে এমন যাহার কোনো অর্থ আমি নিজেও বুঝিতে

অক্ষম। তাই লতীফ বলেন, "প্রিয়তম আমাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া সাগরের মধ্যে করিলেন নিক্ষেপ। আর কূলে দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'সাবধান, কাপড় যেন না ভেজে।' হে গুরু, জলে থাকিয়া কেমনে কাপড় না ভিজাইয়া পারি? সেই পথ আমাকে দাও তো দেখাইয়া।"

লতীফের এই বাণীতে চণ্ডীদাসের পদটি মনে পড়ে—

কলঙ্কসাগরে সিনান করিবি এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি সম সুখ দুখ ক্লেশ।

—নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পদ ১৯১

এই চণ্ডীদাসেরই পরবর্তী পদেও আছে—

সমুদ্রে পশিবি নীরে না ভিজিবি নাহি সুখ দুখ ক্লেশ।

—ঐ, পদ ১৯৮

লতীফের মূল পদটি এই—

পিরূ ন মাথে বধী ব্রিধো পাতারমেঁ।
উভা ইঁয়ে চয়ন মছ ণ পংধ পোসাঁইয়ে॥

লতীফ বলেন, "এই সাধনার আসল কথা হইল, যদি প্রেম চাও তবে এমন কাজ কখনো করিও না যাহাতে লোকের সুলভ প্রশংসা কুড়াইতে পার। নিন্দা ও বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হও, সারা সংসার তোমাকে নিন্দাগ্লানি ও নির্যাতন করুক।" তাহাতেই তুমি ধন্য হইবে। প্রেমপথের এই তো আশীর্বাদ।

কমু ন সো আশিক করেঞ্জ জেহমাঁ তুইঁজি সারাহ থিসে
খণ মলামত কা মথে মর ডেহ তো তানাঁ ডিয়ে॥
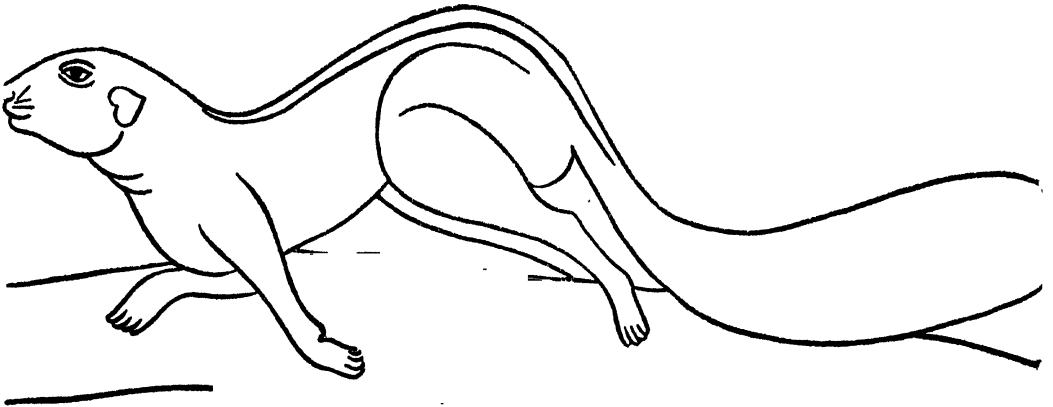
কাঠবিড়ালি
সিংহলের লোকশিল্প
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সৌজন্যে

আলোচনা

"রাজনারায়ণ বসুর জীবনের এক অধ্যায়"

বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের "রাজনারায়ণ বসুর জীবনের এক অধ্যায়" প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বক্তব্য খুব স্পষ্ট না হওয়াতে পাঠকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি।

১। যোগেশবাবু লিখিয়াছেন :

"তিনি [রাজনারায়ণ] এতদিন কলিকাতার বাহিরে থাকিলেও বরাবর ইহার [আদি-ব্রাহ্মসমাজের] সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, কাজেই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ইহার কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে ওয়াকিবহাল করিয়া লইলেন।"

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে আসিবার পূর্বে কি আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারার সম্পর্কে রাজনারায়ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন না ? আমরা কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব হইতেই কলিকাতাস্থ মূল সমাজের কর্মধারার সহিত রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও উহার কর্মধারার প্রতি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকার প্রমাণ রাজনারায়ণের আত্মচরিত ও মহর্ষিদেবের আত্মচরিতে পাইতেছি।

রাজনারায়ণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন তাহার পরের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন

"দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ি পাঠাইতেন।" আত্মচরিত—৪৭ পৃ.

তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে রাজনারায়ণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারার অন্যতম নিয়ামক ছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু এই যোগের আরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লিখিয়াছেন :

"১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলে ওই কার্য্য ছয় মাস করিলে তৎপর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হই।"

কাজে কাজেই পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কাজের সহিত লিপ্ত হন এবং সেই সূত্রেই তখনই তিনি উহার কর্মধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। এই সময় হইতেই রাজনারায়ণবাবু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন যে,

"বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমার দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত তাহার বক্তৃতা জ্ঞান-প্রধান ছিল। আমার বক্তৃতাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয় এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি।"

রাজনারায়ণ যে শুধু আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারায় সহিত এই সময় হইতেই যুক্ত ছিলেন, শুধু তাহাই নহে, ইহার ভাবধারার অন্যতম নিয়ামক ও স্রষ্টা ছিলেন। রাজনারায়ণের এই নিজস্ব উক্তির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় মহর্ষির আত্মচরিতে। তিনি লিখিয়াছেন যে,

"অবশেষে তিনি [রাজনারায়ণ] ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগি পাইলাম। তখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে কিছু ইংরেজী লেখাপড়ার প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার তাঁহার উপর দিলাম।"—আত্মচরিত, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১১১ পৃ.

রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানমূলক ব্যাখানের পরিবর্তে প্রেমমূলক ব্যাখান প্রবর্তনের যে দাবি করিয়াছেন, তাহা ঘটে ইং ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজ গৃহের নূতন ত্রিতলের উদ্বোধন-উপলক্ষে। মহর্ষিদেব সেই ব্যাখ্যান পাঠ করেন। মহর্ষিদেব এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

"এই স্তোত্রটি ফরাসিস ব্রহ্মবাদি ফেনেলন মহাত্মার রচিত। এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ইহা সুনিপুণরূপে অনুবাদ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আমি উপযোগী উপনিষদ্‌বাক্য প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছি। এই স্তোত্র পাঠের পর দেখিলাম যে অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহার পুর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এপ্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।"—আত্মচরিত, পৃ. ১৯০

১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর বেদ 'ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কিনা' এই বিষয় লইয়া বিচার হইতে প্রথমে দুর্বলাকারে প্রত্যাদিষ্ট অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বাক্যই কেবল ইহাতে আছে সেজন্য প্রত্যাদিষ্ট এই মত, ও পরে বেদে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে অতএব বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে এই ধারণায় উপনীত হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা বিচারে রত ছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের কাজের সম্পর্কে যে শুধু ওয়াকিবহালই ছিলেন, তাহাই নহে, উহার ভাবধারা ও কর্মধারার অন্যতম সংগঠকই ছিলেন, সেজন্য মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসের জন্য আগমনের পর আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারার সহিত কোনও নূতন পরিচয়ের তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

২। যোগেশবাবু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহবিধি-সম্পর্কে যে ইতিহাস খাড়া করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি কি তিনি বলেন নাই; কিন্তু সমসাময়িক কাগজপত্র, সরকারী গেজেট ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ারবুকে এ সম্পর্কে যে ইতিহাস পাইতেছি, যোগেশবাবু প্রদত্ত ইতিহাসের সহিত তাহার বহু অমিল দেখিতেছি।

এই সমস্ত কাগজপত্রে বিবাহবিধি-আন্দোলনের ইতিহাস এইরূপ: ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নূতন বিবাহপদ্ধতি-অনুসারে তাঁহার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। এই বিবাহে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, সপ্তপদীগমন ও কুশণ্ডিকা হয় নাই ও শালগ্রাম শিলাও ছিল না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত এইরূপ আচারে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, যদিও কাশীস্থ কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহও শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল তবুও ঈশ্বরচন্দ্রাদির মতকে উপেক্ষা করা সহজসাধ্য নহে, এরূপ অভিমত অনেক ব্রাহ্মের হয়। তাহার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ছাত্রমহলে মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুপরিচিত পার্বতীচরণ দাসগুপ্ত নামক একজন তরুণ ব্রাহ্ম গুরুচরণ দাস নামক একজন বৈষ্ণবের কামিনী নাম্নী এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। একাধারে অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ নবপদ্ধতিতে হওয়াতে ইহার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ব্রাহ্মগণ তীব্র আন্দোলন তুলেন। তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য প্রসন্নকুমার সেন রাজলক্ষ্মী মৈত্র নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ

করেন। এই বিবাহে আবার দেবেন্দ্রনাথরচিত নবপদ্ধতির কিছু রদবদল হয়। কন্যা-সম্প্রদানের স্থানে বর ও বধূর পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম, অর্থ ও কামে অতিক্রম না করিবার সঙ্কল্প ও স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে পরস্পরকে গ্রহণ করিবার সম্মতি প্রবর্তন করা হয়।

রক্ষণশীলদল এই সমস্ত আচারের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। ইহার অধিবেশনে স্থির হয় যে এইরূপ বিবাহগুলি একটি রেজিস্টারভুক্ত করিবার জন্য সমাজের সম্পাদকমহাশয়কে সমাজ হইতে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাব প্রতি আরও নির্দেশ দেওয়া হইল যে এই সমস্ত বিবাহের বৈধতা সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মত গ্রহণ করিবেন। এই নির্ধারণগুলি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তখন পর্যন্ত কোনও গণ্ডগোল দেখা দেয় নাই।

বাঙ্গলার অ্যাডভোকেট জেনারেল কাউই (Cowie) সাহেব এই মত প্রদান করেন যে ব্রাহ্ম বিবাহ-পদ্ধতি যখন দেশপ্রচলিত কোনও প্রথা অনুসরণ করিয়া চলে না, তখন এই সমস্ত বিবাহ বিধিসংগত নহে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় ব্রাহ্মগণ-অনুষ্ঠিত এই প্রকার বিবাহ আইনসিদ্ধ করাইয়া লইবার জন্য সরকারপক্ষের নিকট এক আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ সম্পর্কে আইনসচিব স্যার হেনরী সামনার মেনের সহিত কেশববাবুর আলাপ আলোচনা চলিতে থাকার সময় কেশববাবু স্বীকার করেন যে ব্রাহ্মের কোনও সঠিক সংজ্ঞা তখনও নির্ধারিত হয় নাই। সেইজন্য মেন সাহেব ব্রাহ্ম-বিবাহবিধির পরিবর্তে সাধারণভাবে যে-সমস্ত ব্যক্তি দেশপ্রচলিত কোনও বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে চাহেন না সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য এক সাধারণ বিবাহবিধি রচনা করিতে চাহেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মদিগের ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না; তাঁহারা প্রথমে সিভিল বিবাহ করিয়া তাহার পর তাঁহাদের ধর্ম ও সামাজিক মতকে অনুসরণ করিয়া ধর্মবিবাহ নিজেদের পদ্ধতি-অনুসরণে করিতে পারিবেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে মেন সাহেবের বিল প্রণয়ণের উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে।

এই বিল সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের কমিটির সভ্যদের মধ্যে বিভেদ হওয়া দূরের কথা এইরূপ বিলে আদি ব্রাহ্মসমাজেরও আপত্তির কারণ ছিল না। পরে স্টিফেন সাহেব যখন ব্রাহ্মবিবাহ বিল আনিতে চাহেন তখন আদি-ব্রাহ্মসমাজ তাহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি জানাইয়া দরখাস্ত করেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখেন যে,

"If a general bill be introduced, avoiding the defects of Mr. Maines, *neither we nor we beleive the orthodox Hindu community at large, will offer any opposition* to it."

আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে নাই বলিয়া স্টিফেনের ব্রাহ্ম বিবাহ বিলে আপত্তি করিয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বিল সাধারণ বিল ছিল, সে বিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তির কোনও কারণ ছিলনা; কিন্তু সে বিল সিলেক্ট কমিটিতে যে রূপ লয় তাহার সম্পর্কেই আপত্তি দেখা যায়।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন যে "এ-সমস্ত কারণে আলোচনা কিছুদিন স্থগিত থাকে," তাহার পর 'অকস্মাৎ' ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বিবাহ বিল বিধিবদ্ধ করিবার এক প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিলেন।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মেন সাহেব বিলের যে খসড়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্থগিত থাকে নাই ও সরকারপক্ষ 'অকস্মাৎ' কোনও প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন বাহির করেন নাই। মেন সাহেবের বিল যথারীতি ব্যবস্থাপক সভাকর্তৃক সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার্থ প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের অর্থই এই যে বিলের মূল উদ্দেশ্য গৃহীত হইল। সিলেক্ট কমিটিতে বিলের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে বহু তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনা চলিতে থাকে, সেজন্য উহার সিদ্ধান্ত বাহির হইতে বহু সময় লাগে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ সিলেক্ট কমিটি ঐ বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন। সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন যখন চলিতেছিল তখন হিন্দু ও পার্শী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সাধারণ বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকায় সিলেক্ট কমিটি কেবলমাত্র ব্রাহ্মদিগের জন্য বিলটি রচনা করিবার পক্ষে মত প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া স্টিফেন সাহেব মেন সাহেবের খসড়ার পরিবর্তন সাধন করিয়া "ব্রাহ্ম বিবাহ বিল"-এর খসড়া রচনা করিলেন।

তখন এই নূতন খসড়ার বিপক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রবল আপত্তি উঠিল। ভারতে সর্বশুদ্ধ ৬৫টি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, তন্মধ্যে ৫৩টি এই নূতন খসড়ার পক্ষে ও তিনটি বিপক্ষে মত দেয় এবং নয়টি সমাজ অভিমত-দানে বিরত থাকেন।

ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইতে আপত্তি দেখিয়া স্টিফেন সাহেব একটু বিব্রত হইলেন এবং ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধির পরিবর্তে আবার সাধারণভাবে যাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা পার্শী ধর্ম-সম্প্রদায় অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের জন্য সাধারণ বিধি প্রস্তুত করিলেন। এই সাধারণ বিল আনিবার আর-একটি কারণও এই সময়ে দেখা দেয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসের নেতৃত্বে একদল অজ্ঞেয়তাবাদী যুবক এই দাবি জানাইলেন যে তাঁহারা ব্রাহ্ম পদ্ধতিতেও আস্থাবান নহেন, সেজন্য ব্রাহ্ম বিবাহ বিলে তাঁহাদের কোনই সুবিধা হইবে না। তাঁহারা সাধারণভাবে আইন চাহেন।

এইরূপ সাধারণ বিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি নাই, একথা তাঁহাদের মেমোরিয়ালে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন; সনাতনধর্মরক্ষিণী সভাও ঘোষণা করিলেন যে,

"They have no objection to the enactment in the present form."

কিন্তু এই বিল যাঁহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন সেই অগ্রসরশীল ব্রাহ্মদের অনেকেরই এই ভাবের বিলে আপত্তি ছিল ও এখনও আছে। তাঁহারা বিলের নেতিবাচক অংশ বিশেষ আপত্তিজনক মনে করেন। ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিকে প্রাধান্য না দিয়া সিভিল বিবাহকে আইনতঃ সিদ্ধ করাতেও তাঁহাদের ধর্মবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই বিল সম্পর্কে রাজনারায়ণের আপত্তিও ঠিক অগ্রসরশীল ব্রাহ্মদিগের মত।

রাজনারায়ণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন:

"সিভিল আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রাহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যদ্বারা যে বিবাহক্রিয়া ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্য্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্পর্ক নাই অর্থাৎ Registrar, বলেন এই বিবাহ বৈধ।"

ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইতেও বার বার এই ত্রুটি-সংশোধনের দাবি করা হইয়াছে।

কিন্তু রেজিষ্টারের নিকট সিভিল বিবাহ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য একটি বিলে

আদি ব্রাহ্মসমাজের নবগোপাল মিত্র, হরিশচন্দ্র শর্মা প্রভৃতির কোনই আপত্তি ছিল না। তাঁহারা ব্রাহ্ম-বিবাহকে আইনসভাকর্তৃক সিদ্ধ বলিয়া আইন করাইবারই বিরোধীছিলেন। কাজে-কাজেই রাজনারায়ণের আপত্তি এবং ইহাদের আপত্তি একপর্যায়ভুক্ত নহে।

রাজনারায়ণবাবু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পুনরুত্থানপ্রয়াসী হিন্দুধর্মনায়কদিগের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি বিদেশীয়গণের মধ্য হইতে ভাল যাহা তাহাকে আত্মস্থ করিবার বিরোধী কোনও দিন ছিলেন না, এ বিষয়ে তিনি রামমোহনপন্থী, তাঁহারই অনুসরণে বিশ্বসামাজিক মনের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। রাজনারায়ণ অবশ্যই "Marked foreign customs and manners......Which are repugnant to general feeling of the nation," তাহাকে বিচার না করিয়া উৎসাহের আতিশয্যে গ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি যে বিদেশীর প্রাণপ্রদ আচার ও মন্ত্রকে আত্মস্থ করার বিপক্ষে ছিলেন না বরং গ্রহণ করার পক্ষেই ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১১ মাঘের ন্যায় উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি ফরাসী সাধক ফেনেলন হইতে উপদেশ অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্ম ভক্তগণকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার মতে যে পুস্তকটি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা সেই 'ধর্মসাধন' পুস্তক Upham's Interior Life নামক পুস্তক হইতে মূলতঃ গৃহীত। তিনি বাইবেল হইতে একেশ্বর-প্রতিপাদক ও সৎভাব-প্রবর্তক বচনগুলি তুলিয়া "Hindu Theist's Brotherly Gift" রচনা করেন।

তাঁহার জীবনে জাতীয় ও সার্বভৌমিক এই উভয় দিকই ছিল।

রাষ্ট্রনীতিসম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, "মুসলমান ও ভারতের অন্যান্য জাতির সহিত আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব।"

অন্য ধর্মসম্পর্কে তাঁহার মত এই ছিল যে, "The law of Harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, "Old and new elements should both be united in Theistic service aud prayer books."

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে কেবলমাত্র বৈদিক বা ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ তিনি রক্ষা করিয়া চলিবারই পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহাকে ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী নূতন নূতন মন্ত্রগ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

কেবল তিনি চাইতেন সে গুলি জাতীয় রূপগ্রহণ করে, এই জন্য যে "to make them better understood and appreciated by their Country men."

ইংরেজ ব্রহ্মবাদী কার্ডিন্যাল নিউম্যান, মিস্ ফ্রান্সিস পাওয়ার কব ও মিস্ এলিজাবেথ সার্পের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ও পরস্পরের মধ্যে পত্রবিনিময়-যোগে গভীর আত্মিক মিলনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার জামাতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষকে তিনি লেখেন,—

"Our Kin in faith who not adoring man
And book, lead boldly true religious Van
Proclaiming Theism's creed in discourses free"

এদিকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যাহাতে তাঁহাকে প্রতীকোপাসক হিন্দু বলিয়া লোকে ভুল করিতে না পারে সেজন্য তাঁহার দৃষ্টি সজাগ ছিল। সনাতন-হিন্দুরক্ষিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহাকে সভ্য হইতে অনুরোধ করিলে তিনি "সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত" হন। সিমুলিয়া পাহাড়স্থ এক সাকারবাদী বাঙালী-সভার সভ্য হইতেও অনুরূপ কারণে তিনি বিরত থাকেন। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে যাহা কল্যাণকর তাহা মানিয়া চলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যাহা গ্লানিকর ও অকল্যাণের আকর তাহা বর্জনে তিনি ভীত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁহারই চেষ্টায় বিধবাবিবাহ করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতকে সমর্থন করিয়া Adi Bramho Samaj: Its views and principles পুস্তিকারচনাকালে তিনি স্পষ্টই লিলিয়াছেন যে "ব্রহ্মোপাসক স্বজাতীয় পাত্র না পাওয়া যাইলে প্রতীকোপাসক স্বজাতীয় পাত্রে কন্যা অর্পন করা ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নহে। সেক্ষেত্রে বরং অন্য জাতীয় সৎপাত্রে কন্যাকে অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "When Caste comes in collision with religion, the former must give way to latter." হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাসম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশিত হইলে পর ডাক্তার মারে মিচেল তন্ত্র হইতে কতকগুলি দুর্নীতিমূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়া সে সম্পর্কে রাজনারায়ণের বক্তব্য শুনিতে চাহিলে রাজনারায়ণ বলেন যে, "I am not a Tantrist and therefore decline to enter into a discussion on the merits and demerits of the Tantras" তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে ঐ ধর্ম "Contain monotheistic sentiments of the most exalted description".

ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণের মতামত যাচাই না করিয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মতামত তুলিয়া দেখিলে তাঁহাকে ভুল বুঝাই হইবে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবন্ধ-লেখকের উত্তর

১। "রাজনারায়ণ বসুর জীবনের এক অধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ১৮৬৯, সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯, সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রবন্ধের সূচনাতেই একথা বলা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু কলিকাতায় যখন নূতন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা মূল কলিকাতা ব্রহ্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদের ফলে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মূল কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নাম পরিগ্রহ করে। বলা বাহুল্য, বিচ্ছেদের পর হইতে এই ব্রহ্মসমাজদ্বয়ের কর্ম্মধারা দুইটি বিভিন্ন খাতে

চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত এই সময়কার ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার মূলক আলোচনাসমূহ হইতে পাঠকমাত্রেই ইহা জানিতে পারেন। বিচ্ছেদের সময় হইতে কলিকাতায় নূতন করিয়া বসবাস আরম্ভের কাল পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্গে রাজনারায়ণ বাবুর সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ইহার সম্বন্ধে নিজেকে 'ওয়াকিবহাল' করিয়া লইলেন। আমি এখানে শুধু আদি ব্রাহ্মসমাজের কথাই বলিয়াছি, পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মসমাজ বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কথা এখানে বলি নাই। প্রভাতবাবু আমার সহজ কথাটি এখন হয়ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

২। প্রভাতবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি, ১৮৭২ সালের তিন আইনের মৎপ্রদত্ত ইতিহাস সম্পর্কে। আমি আমার প্রবন্ধে এই ইতিহাস, যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু, অতি সংক্ষেপে মাত্র তেরটি পঙ্‌ক্তিতে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রভাতবাবু আমার প্রদত্ত ইতিহাসের নজীর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"সমসাময়িক কাগজপত্র, সরকারী গেজেট ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে এ সম্পর্কে যে ইতিহাস পাইতেছি, যোগেশবাবু প্রদত্ত ইতিহাসের সহিত তাহার বহু অমিল দেখিতেছি।"

এই উক্তি হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রভাতবাবুর নির্ভর বিশেষ ভাবে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক। একখানি ইয়ার বুকের কথাই প্রামাণিক নয়, বিশেষতঃ যখন ইহা প্রকাশের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার সমসময়ে প্রদত্ত এই আইনের ইতিহাসের সঙ্গে ইয়ার বুকে প্রদত্ত কাহিনীর যথেষ্ট গরমিল দেখিতেছি। আমি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইতিহাসকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার উক্ত তের পঙ্‌ক্তি তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। ১৭৯৪ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৮৭২, মে-জুন) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই ইতিহাস ইংরেজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রভাতবাবু যখন প্রধানতঃ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক হইতে এই কাহিনী সংকলিত করিয়াছেন (প্রধানতঃ বলিতেছি এইজন্য যে, সমসাময়িক কাগজপত্র ও সরকারী গেজেটের তারিখ বা সময়ের তিনি উল্লেখ করেন নাই) তখন ১৮৭২, মে-জুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে কোন কোন তথ্য এখানে বলা আবশ্যক মনে করি।

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ আইন সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

"১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন।......১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় ব্রাহ্মগণ অনুষ্ঠিত এই প্রকার বিবাহ আইনসিদ্ধ করাইয়া লইবার জন্য সরকারপক্ষের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৭২, মে-জুন) প্রদত্ত বিবরণের তাৎপর্য্য এইরূপ :

"ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সকল ব্রাহ্ম আমন্ত্রিত হন নাই। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্ম ভদ্রলোককে লইয়া সভায় একটি সমিতি গঠিত হইল, উদ্দেশ্য ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে আইন করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করার যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে বিবেচনা করা। সভা ব্রাহ্মসমাজের যথোপযুক্ত

প্রতিনিধিমূলক না হওয়ায় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কমিটিতে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী সভায় কমিটির রিপোর্ট পঠিত হইল। দেখা গেল, আইন করনার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা সম্পর্কে কমিটির সভ্যগণ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। পরে স্থির হইল যে, ব্রাহ্ম-সাধারণের অভিমত না লইয়া উক্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হইবে না। কেশবচন্দ্র এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি হিসাবে একাই ব্রাহ্মবিবাহ আইন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পেশ করিলেন।"

"Baboo Keshubchunder did not, however, act according to this resolution, but individually submitted a memorial to Government as the self-styled representative of the Brahmo Community for a Brahmo marriage law."

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন যে, মেন সাহেবের

"বিল সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের কমিটির সভ্যদের মধ্যে বিভেদ হওয়া দূরের কথা এইরূপ বিলে আদি ব্রাহ্ম-সমাজেরও আপত্তির কারণ ছিল না।"

ইহা আদৌ ঠিক নহে, আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৭৯৪ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণে আছে, "মেন সাহেবের বিলের বিরুদ্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, যেহেতু বিল বিধিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মদেরই সুবিধা করিয়া দেওয়া ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, সে কারণ তাঁহাদের মতে এই বিল বিধিবদ্ধ হইবার আদৌ প্রয়োজন নাই, কেননা হিন্দু শাস্ত্রে এবং দেশের সাধারণ রীতি, বিশেষতঃ যে-সব হিন্দু-সম্প্রদায় প্রচলিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলে না, তাহাদের রীতি-পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহও বৈধ বলিয়াই গণ্য। ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে সমাজে কিরূপ কুফল ফলিবে তাহাও আবেদনে প্রদর্শিত করাইয়া দেওয়া সাধারণ ভারতবাসী হিসাবে তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুধু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মবিবাহ বিলেই নহে, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞাপিত মেন সাহেবের সাধারণ বিলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ আপত্তি করিয়াছিলেন।

আমার 'অকস্মাৎ' কথাটিতেও প্রভাতবাবুর আপত্তি। আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ হিন্দুসমাজ এবং সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রই শুধু মেন সাহেবের বিলে আপত্তি জানান নাই, বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির নিকট মতামত যাজ্ঞা করিলে তাঁহারাও ভারত-সরকারকে একবাক্যে বলেন যে, এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অসন্তোষ উদ্রেক করিবে। এইরূপ প্রতিবাদের ফলে সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, বিলটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং এ বিষয়ে কোন আইনও সত্বর বিধিবদ্ধ হইবে না। কিন্তু ১৮৭১, ২৯শে মার্চ্চ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অকস্মাৎ জানিতে পারিলেন যে বিলের নাম বদলাইয়া 'ব্রাহ্মবিবাহ বিল'—এই নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং তার পর দিনই বিলটি আইনে পরিণত হইবে!

"On the 29th march 1871, the Members of the Adi Brahmo Samaj came *suddenly* to know that the name of the said bill has been altered to 'A Bill to legalize marriages between the members of the sect called the Brahma Samaj' and that it would be passed next day." (*Italics mine.*)

প্রভাতবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের পক্ষে উক্ত বিবাহ-আইনের বিরোধিতার মধ্যে তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথা নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে শুধু ব্রাহ্মবিবাহ আইনের বিরোধী ছিলেন না, হিন্দু তথা ব্রাহ্মদের বিবাহ আইন মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন তাহা উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে জানা যাইতেছে। রাজনারায়ণ বসু অন্যান্য সভ্যদেরই মত এরূপ আইনের বরাবর বিরোধী ছিলেন। উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে ইহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদের নিকট তাঁহার এক আবেদন পত্রেও তিনি ইহা পরিষ্কার বলিয়াছেন :

"There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that *the most important one.* For the first time in the history of India the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one." (*Italics mine.*)—রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ ১৮৮-৯।

রাজনারায়ণবাবু বলেন,

"উপরোক্ত উদ্দাপনা-পত্রীতে আমি লিখিয়াছি যে, ধর্ম্মবিষয়ে একবার গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইলে পুনঃ পুন যাইতে হয়।"—ঐ, পৃঃ ১৯১।

প্রভাতবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের 'দরখাস্ত' এবং সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার 'ঘোষণা' হইতে যে উদ্ধৃতি করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিতান্তই অবান্তর, কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজ বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে হিন্দু তথা ব্রাহ্ম নিরপেক্ষ যে-কোন সাধারণ আইনের বিরোধিতা করা মোটেই আবশ্যক ছিল না।

৩। প্রভাতবাবু দ্বিতীয় আপত্তির শেষাংশে যে-সব কথার অবতারণা করিয়াছেন সে-সব সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। প্রভাতবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে তথাকথিত 'অগ্রসরশীল' ব্রাহ্ম বলায় পাঠকের মনে ধোঁকা লাগিবে। কারণ সে যুগে 'অগ্রসরশীল' বা 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্ম বলিতে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিদেরই বুঝাইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রবীণ ব্রাহ্মগণ 'রক্ষণশীল' বলিয়া আখ্যাত হইলেও শেষোক্ত ব্যক্তিদের ধর্ম্ম বা সংস্কৃতিবিষয়ক বিদেশীয় উন্নত চিন্তা বা ভাবধারা আয়ত্ত করিবার মত যে উদারতা ছিল না এমন নহে। পরন্তু ইহার সাহায্যে তাঁহারাও স্বদেশীয় সমাজ ও ধর্ম্মকে সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেন। তবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই ধর্ম্মের সর্ব্বজনীন রূপকে চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে দেখিয়া স্বদেশীয় ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্পর্কেও আমার মতামতে প্রভাতবাবুর আপত্তি। সাকারবাদী হিন্দুরা এই বক্তৃতার জন্য রাজনারায়ণকে বিস্তর সাধুবাদ করেন। তাঁহাদের কোন কোন অনুরোধ রাজনারায়ণ বাবু এই ভয়ে রক্ষা করেন নাই যে, পাছে লোকে তাঁহাকে সাকারবাদী বলিয়া ভুল করে। কিন্তু প্রভাতবাবু আর একটি কথা কিন্তু বলেন নাই। রাজনারায়ণের উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ খ্রীষ্টীয় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই করেন নাই, মাত্র দুই জন ব্যতিরেকে তথাকথিত 'অগ্রসরশীল' বা 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মরাও সভা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আত্ম-চরিতে (পৃঃ ১৮১) এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। রাজনারায়ণও আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন :

"কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটী ও এলাহাবাদে একটী বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা এবং এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশববাবুর দলের ব্রাহ্মেরা বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপাত্র মিরার এমন দিন ছিল না যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশববাবুর দলের দুইজন ব্রাহ্ম মাত্র ঐ বক্তৃতার প্রতি অনুকূল ভাব দেখাইয়াছিলেন। সেই দুইজন অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসাম মিহির-সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।" (পৃঃ ৯০)

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, রাজনারায়ণের "জীবনে জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক উভয় দিকই ছিল।" রাজনারায়ণ বাবু কিন্তু তাঁহার "সারধর্ম্ম" পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"লোকের ধর্ম্মমত আক্রমণ না করিয়া ধর্ম্মে লওয়ানো ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে ব্রহ্মাস্ত্র; এই প্রণালী দ্বারা তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা দুই দলে বিভক্ত; বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ও স্বজাতি-পরবশ ব্রাহ্ম এই দুই দলেরই হিতার্থে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে লেখক শেষোক্ত দলভুক্ত।"

সুতরাং আমিও প্রভাতবাবুর সঙ্গে বলিতেছি যে, "ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণের মতামত যাচাই না করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ভুল বুঝা হইবে।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
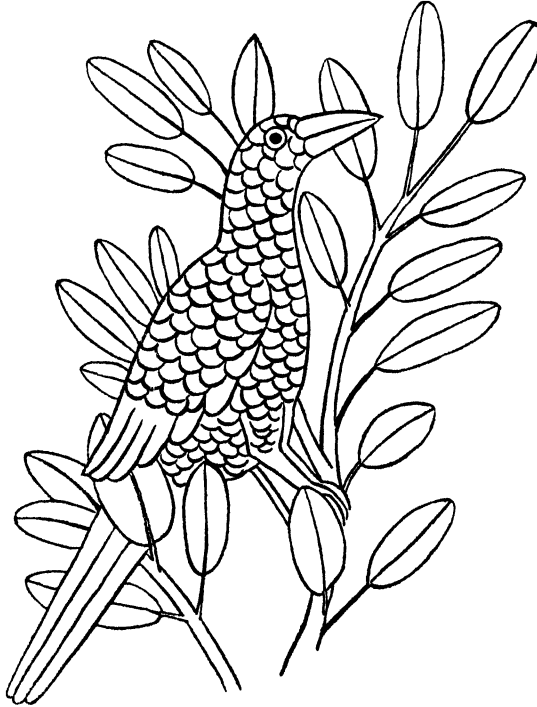
পাখি
সিংহলের লোকশিল্প
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সৌজন্যে

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫২

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা
  ঝ'রে-পড়া ফুলদল
ছেড়ে এসেছি
  ছায়া-করা বনতল—
ভুলায়ে নিয়ে এল
  মায়াবী সমীরণে।
    মাধবীবল্লরী
      করুণ কল্লোলে
পিছন-পানে ডাকে
  কেন ক্ষণে ক্ষণে।
মেঘের ছায়া ভেসে চলে
  চির-উদাসী স্রোতের জলে—
দিশাহারা পথিক তারা
  মিলায় অকূল বিস্মরণে।

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা
১৩৪৩

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৬

কলকাতা। সোমবার, ১১ই আষাঢ়। [১৩০২]

ক'দিন খুব রীতিমত বৃষ্টিবাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারি অভিভূত করত। ভিতরে ভিতরে এমন একটা কম্পান্বিত রকমের আনন্দ উপস্থিত হত সে আমি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক ষ্ট্রীটে গিয়েছিলুম। যাবার সময় বরাবর এক অমৃতবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম— ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল— এবং পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতই আছে— কেবল আমার আজকাল অবসর নেই। মাঠের উপর সকালবেলাকার সুকুমার রোদ্দুরটি বিষাদ শান্তি এবং সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ সরস নির্ম্মল নবীন শ্যামলশ্রীকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মত খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমল সুন্দর রাগিণী কম্পিত হয়ে বেজে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এখন এত রকমের বিষয় আমার চারদিকে ব্যূহ বেঁধে রয়েছে যে, জগৎটাকে সম্মুখে দেখ্‌তে পাইনে— একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যাচ্চে— বিশ্ববীণার যে যন্ত্রী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে দেয় এবং জলে স্থলে শূন্যে, গানে গুঞ্জনে কাকলীতে কুহরিত মুখরিত করে তোলে, সেই যন্ত্রীর সজীব সচেতন কম্পিত অঙ্গুলিগুলি আমার মনের তারকে স্বয়ং স্পর্শ করে আঘাত করচে না;— ভয় হয় পাছে এইরকম অনেকদিন হতে হতে মনের যে তারগুলো সর্ব্বদাই বেজে বেজে উঠ্‌ত সেগুলোতে ধুলো পড়ে মরচে পড়ে যায়— মনের ভিতরটা ক্রমে বুড়ো হয়ে অসাড় হয়ে আসে। অবিশ্রাম কাজকর্ম্মে মানুষকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়; সেটুকু শক্ত হওয়া দরকার জানি— সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশ্যক কিন্তু তবু সেটা আমার কাছে ভারি অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু "সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ং" ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে, অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে চারিদিকের সমস্ত অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্ত কার্য্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এখন অনেকটা তাই হয়েছে— কর্ত্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে— এবং তার চোখেও ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘুরপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে পৃথিবীতে একজন দরকারী জীব হয়ে উঠেছি— সঙ্গীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়— তাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময় আলোও জ্বলে। অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে পুনশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি— কাছারির চিঠিগুলি সম্মুখে পেশ হয়েছে— সাধনার প্রুফও স্তূপাকার জমেছে।

সাহজাদপুর। ৫ই জুলাই। [১৮৯৫]

কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত নহবতে কীর্ত্তনের সুর বাজিয়েছিল— সে বড় চমৎকার লাগছিল— আর, ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল— যেমন শাদাসিধে তেমনি সকরুণ। কাল রাত্রে বেশ মৃদুমন্দ বাতাস এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল আর নহবৎটি খুব ইনিয়ে বিনিয়ে বাজছিল। কাল জান্‌লা খুলে সেই বাজনা শুনতে শুনতে নিদ্রা দিয়েছি। আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল— তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত— এই নবাবীটা আমার লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম— পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিনরাত্রির মধ্যে তিনচার বার করে নহবৎ বাজ্‌ত— আমার তখন মনে হত আমি বড় হয়ে স্বাধীন হবামাত্রই একটা এইরকম নহবৎ রাখব। যে পাষাণ দেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহল সম্পূর্ণ বধির ভাবে শুনতে পারে তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মত ঠাকুরের জন্যে যদি কোন পুণ্যবান্ সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সঙ্গীতটা ব্যর্থ হয় না। তাহলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে— এবং দিনের কাজকর্ম্মগুলোতে এমন দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না। গান বাজনা শুনলেই তখনি বুঝতে পারি এতদিন আমি সঙ্গীতের জন্যে তৃষিত হয়ে ছিলুম— সেইজন্যে আমার ভারি ইচ্ছে করে আমার খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালরকম বাজনা শিখে নেয়।

সাহাজাদপুর। ৬ই জুলাই। [১৮৯৫]

কাল আমাদের এখানকার পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল— ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মেধা— সে একটি ডাকাত বিশেষ— লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মত ভালবাসে— সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি। চাঁদমুখ একথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বল্লে, কতদিন পরে দেখা— একবৎসর তোমায় দেখিনি। মেয়েদের ভালবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষ মানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা— এরও একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে— এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। শিশুর মত সরল, এবং মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষ মানুষ একে একে এসে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে চুমো খেতে লাগ্‌ল— কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালিগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে— বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় সুখে রাখতুম— এবং এদের ভালবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।

কলকাতা। ২০শে জুলাই। [১৮৯৫]

এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে[১], নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে সেটা আমি দেখলুম কোন পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি। আমি বলি, যে, মৃত্যু যদি না থাকত তাহলে বস্তু-জগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত— জগতের মধ্যে অনন্তের suggestion থাকৃত না। বস্তুজগৎটা হচ্চে অটল reality— তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না— তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়— সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে, সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতা-সম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা; বস্তুজগৎ যদি অটল কঠিন প্রাচীরে আমাদের ঘিরে রেখে দিত, এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত, তাহলে আমরা, যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কি হতে পারি তার আর সীমা নেই— এবং মৃত্যু পুরাতনকে অপসারিত করে দেয় বলেই অনাগত অসীম নূতন আমাদের ideal আশাকে পোষণ করতে থাকে। ভাল কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্চে তার suggestiveness। জগৎরচনার মধ্যে সেই suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে— সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি, যে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই পৃথিবীই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে— তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি— যদি মৃত্যু না থাকত তাহলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সুকঠিন ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম— মানবাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান— পরলোক এবং দেবলোক— যা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান— তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, মাঝে মাঝে যদি ছেদ না পেত তাহলে বিপর্য্যয় কুৎসিত হয়ে উঠত— একদিকে পরিষ্কার definiteness আর একদিকে অসীম suggestiveness এই দুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দর্য্য গঠিত হয়— মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে একদিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর একদিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোন সান্ত্বনা নেই —কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি সুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল। কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্ম্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভাল করে বোঝাতে পারিনে— বোঝানোও বিষম শক্ত।

কলকাতা। ৩রা অগষ্ট। [১৮৯৫]

লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে কিন্তু সর্ব্ববিধ মাদকতার মত খ্যাতির মাদকতায়ও ভারি একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে— প্রথম উচ্ছ্বাসের পরেই

১ "অপূর্ব রামায়ণ", সাধনা, আষাঢ় ১৩০২। পঞ্চভূত গ্রন্থে সংকলিত।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

শিলাইদহের প্রজাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

সমস্ত শূন্য এবং মিথ্যা মনে হয়— মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাকা উচিত— এই জিনিষটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মত না দাঁড়িয়ে যায়, সে জন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমতঃ লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তারপরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাচ্চি বলে ভাবি একটা অসন্তোষের উদয় হয়। অথচ আমি যে বাঙ্গলার পাঠক সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আন্তরিক বিশ্বাস নয়— এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু দিন দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়চে ততই একদিকে আমি খুসি হচ্চি, অন্যদিকে সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট্ বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্চে। সাধনায় প্রতিমাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারচি খ্যাতি জিনিষটা ভাল নয়— ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

শিলাইদহ। ১৮ই অগষ্ট। [১৮৯৫]

কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না— যদিও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্‌খাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তবু ডাঙ্গার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল— সেটা বেশ লাগ্‌ল— বসে বসে অনেকক্ষণ, প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোরু এবং ছাগলের চরাটা এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পর্য্যবেক্ষণ করে অনেকটা সময় কাটত। মানুষের যে অবস্থাটা গাছ পালা শস্য গোরু বাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন— এবং ধান কাটা, নৌকোয় খেয়া দেয়া, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত—সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুর্য্য অনুভব করা যায়। অনেকে বলে, ওদের মধ্যে যে সুখ আমরা কল্পনা করি সেটা ঠিক সমূলক নয়— কিন্তু সে কথা মিথ্যা। ওরা অনেকটা ছেলেমানুষের মত, সেইজন্যে ওরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সুখ বড় জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে— আমাদের মনে সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমরা আত্মবিস্মৃত হতে পারিনে— স্বল্পটুকুকে সরল কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে নিতে পারিনে— বরং অনেকখানিকে অসন্তুষ্ট বিশ্লেষণের দ্বারা কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা হতেও চাইনে— কেবল ওদের সন্তোষ এবং সরলতাটুকু চাই— আর, সমস্ত বুদ্ধিবিদ্যা নিজের যা পুঁজি আছে তাও ছাড়তে চাইনে।

শিলাইদহ। ২০শে অগষ্ট। [১৮৯৫]

মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্ম্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে। এ ক'দিন নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খুব প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব ধারণ করেচে, ওপারে চরের কাছে জেলেরা এক কোমর জলে নেবে মাছ ধরচে, এপারে নদীর ধারে গোরু চরচে,— একটি সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমুজ্জ্বল শান্তি জলে স্থলে শূন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে— অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মস্তক চুম্বন করচে। এইরকম সকালবেলায় অতীতকালের সমুদয় সুমধুর দিনগুলিকে আজকের দিনের

সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ড সমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোকে পূর্ব্বে একবার বলেছিলুম— আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে কেবল মতামত, বর্ণনা, এবং সৌন্দর্য্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধুর্য্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে— আমার পক্ষে সে একটা বৃহৎ বিস্তীর্ণ উপবনের মত বেড়াবার জায়গা হয়— যদি একসময়ে মনের সূক্ষ্ম সম্ভোগশক্তি হ্রাস হয়ে আসে, যদি নূতন জগৎ তার দ্বারগুলি একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে— তাহলে আমার সেই অমূল্য পুরাতন জগৎটি আমার কাছে পরম আশ্রয়ের মত থাকে। বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোন লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই— যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে— সেই অংশগুলি যদি পাই তাহলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

শিলাইদহ। ২৩শে অগষ্ট। [১৮৯৫]

এই বর্ষার বিপুল নদীস্রোত তার অবিশ্রাম কলশব্দ নিয়ে আমাকে এমন পরিপূর্ণ সঙ্গদান করে কেন তাই ভাবছিলুম। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারচি কিন্তু প্রকাশ করে বলা শক্ত। নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণপদার্থের মত— একটা প্রবল উদ্যমরাশি বহুদূর হতে গর্ব্বভরে কলস্বরে অবহেলে চলে আসচে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। একটা দুর্দ্ধর্ষ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা যায় তাহলে সেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে— এই নিত্যসঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা-তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়— এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে— সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো— এই ছন্দের যেখানে যতি পড়চে, যেখানে ঝঙ্কার উঠছে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্চে,— প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে, সৌন্দর্য্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তাহলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্জ্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য্য ভালবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি— নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না— আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি; আমার আর কোন যুক্তি নেই।

শিলাইদহ। ২৪শে অগষ্ট। [১৮৯৫]

এই যে অনাদি অনন্ত আকাশপূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অণুপরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়— হয়ত অনেকদিনের অভ্যাসবশতঃ কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে; কিন্তু সেটাকে প্রত্যক্ষ দীপ্যমান-ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারিনে— তখন ওটাকে কবিকল্পনা বলে ভ্রম হয়। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করার মত সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি আছে? কিন্তু অনেক সময় মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, কল্পনার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি রসাভাবে শুষ্ক হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্তগভীর পরিপূর্ণ প্রসরতা থাকে না, যার অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের সমস্ত দূরাগত ধ্বনিগুলি নিজেরই ভিতরকার কথাগুলির মত অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শোনা যায়। তখন সমস্তই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘুলিয়ে যায়, তখন কেবল বাইরের গোলমালগুলোকেই সত্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে। তা যদি না হত, যদি এই অনন্ত বিশ্বের সজীব আকর্ষণ চিরকাল স্পষ্ট এবং একান্ত সত্যভাবে অনুভব করতে পারতুম, তাহলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত? তাহলে পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে হৃদয়কে এই জগদ্‌ব্যাপী সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। দুঃখের বিষয় এই, যে, ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অখণ্ড শান্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, নিজের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারা যায় না। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে মফস্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সম্মুখে এক মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়— বাহ্য-প্রকৃতি আমার মনেরই জড়ত্ববশতঃ জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তাহলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানচি, সেইটেকে যৌবনকালের একসময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে— মনে হবে, বেশ একটি সুন্দর থিওরি; হয়ত প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেইগুলো দেখলে বোধ হয় শুষ্ক চিত্তের মধ্যে সরসতার সঞ্চার হতে পারবে— আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্মটি (religion) ফিরে পাব।

শিলাইদহ। ২০শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৫]

আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্দুর ওঠবার চেষ্টা করচে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে পারেনি। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পূবে হাওয়া খুব বেগে বইচে। ওপারে বিকশিত কাশবন আগুনের শিখার মত ক্রমাগত কাঁপচে। এখান থেকে দূরের পদ্মার গর্জ্জন শোনা যাচ্চে। কাল পর্শু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মত দৃশ্যটা হয়েছিল— ঝরঝর বরষে বারিধারা— ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে— অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা— নিবিড় নীরদ গগনে— ইত্যাদি। তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি ষ্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মস্ত রেশমের আলখাল্লা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত

হাস্যকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল— চোখের চষ্‌মা জল লেগে ঝাপ্‌সা হয়ে এল,— হাতে যে বই ছিল তার মলাটটা আমার করকমলে অবিরল রঙীন্‌ অশ্রুপাত করতে লাগ্‌ল। আমি কাল পর্য্যন্ত প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুণ বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা নূতন জীবন পেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল— চারিদিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল, এবং আমিও এই ঝড়বৃষ্টিবাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম। সঙ্গীতের মত এমন আশ্চর্য্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই— এ এক নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ত ভেবে পাইনে, সঙ্গীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে— না, এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে, যা মানুষকে এই কথা বলে, যে, তোমরা জগতের সকল জিনিষকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা কর না কেন, এর আসল জিনিষটাই অনির্ব্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্ম্মের মর্ম্মান্তিক যোগ, তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ এত সুখ এত ব্যাকুলতা।

চিত্রকর শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চলতি বনাম পোষাকী বাংলা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল-বিশেষের আটপৌরে কথাবার্ত্তার ভাষা আমাদের সাহিত্যের বাহন হবার মর্য্যাদা পেয়েছে। তার কারণ কেবল এ নয় যে শক্তিমান্ অনেক লেখক এ মর্য্যাদা তাকে দান করেছেন, অথবা কলকাতা বাংলা দেশের রাজধানী এবং কলকাতায় এ ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাশাপাশি দুটি ভাষা এত সহজে আমাদের সাহিত্যে চলত না যদি একটির সঙ্গে অন্যটির সৌসাদৃশ্য এত বেশী এবং তাদের সমগোত্রীয়তা এত নিবিড় না হত।

আসলে আমরা যে ভাষাকে আজকাল পোষাকী বাংলা, পণ্ডিতী বাংলা বা বাংলা সাধুভাষা ব'লে থাকি, তার কারিগরি, তার বুনন, এমন কি তার উপকরণেরও বেশীর ভাগ খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয়। গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের জন্মের পূর্ব্বে যে-ভাষায় রাঢ়-বঙ্গ-বরেন্দ্র-সমতট-চট্টলের লোক-সাহিত্য রচিত হত, দলিল সম্পাদিত হত, চিঠিপত্র লেখা হত, তাও মোটামুটি ভাবে এই পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা। কলকাতা আজ বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার আগে বহুকাল কলকাতার অনতিদূরবর্ত্তী নবদ্বীপ বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, এতে ক'রে এই ভাষা মার্জ্জিত হবার এবং বিদগ্ধজনের প্রীতি লাভ ক'রে লোক-সমাজে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। কলকাতা বা নবদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা ব'লে নয়, নিতান্ত তার নিজেরই গুণে এই ভাষা আবহমান কাল ধ'রে বাংলার সর্ব্বত্র সমাদর লাভ ক'রে এসেছে।

এই গুণগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় সেটি হচ্ছে এই, যে, এ ভাষা বাংলার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের কথোপকথনের ভাষা। আমি পোষাকী বাংলাকে আলাদা ক'রে আপাততঃ ধরছিই না, কারণ তার পশ্চিমবঙ্গীয় পুরুষানুক্রমিক ঢঙ্কো পোষাকটাকে একটু আঁটসাঁট, সময়োপযোগী ক'রে নিয়েই যেটা চলছে তার নাম চলতি বাংলা। ও দুটি একই ভাষার বিলম্বিত ও দ্রুত চাল। এ কথায় পরে আবার আসছি।

ক্ষুধা বোধ করলে মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, ডায়মণ্ড্ হারবার থেকে আসানসোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে কয়েক কোটি লোক বলে "খাব"। পশ্চিমেতর বঙ্গে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই সে জায়গায় "খামু", "খাইমু", "খাইয়াম", "খাইবাম", এবং "খাব না"-র জায়গায় "খাইতাম না" বলে। অন্যত্র অধিকন্তু "খাম", "খাইয়ুম" শুনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র যে ক্ষেত্রে চলে "আমাদের", পশ্চিমেতর বঙ্গে সেখানে "আমরার", "আমাগো", "আঁরার", "আঙ্গর", "আমাগোর" চলে। অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য পশ্চিম-বঙ্গের উপভাষার মধ্যে একেবারেই যে নেই তা নয়, কিন্তু পশ্চিমেতর বঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য এত বেশী, যে এক-একটি অঞ্চলের ভাষাকে স্বতন্ত্র উপভাষা ব'লে মান্য করতে হয়। পশ্চিমেতর বঙ্গের এই উপভাষাগুলির কোনওটিতে কয়েক লক্ষের বেশী লোক কথা বলে না।

পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষা বাংলার সর্ব্বত্র সমাদৃত হবার আর একটি কারণ, এতে তৎসম শব্দের ব্যবহার যত বেশী এত বাংলার আর কোনও উপভাষাতে নয়, এবং তৎসম শব্দ সম্বন্ধে বাংলার নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত

লোকদেরও মনে প্রবল একটা মোহ আছে। তাছাড়া এ উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি অপেক্ষাকৃত কম। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের, এবং পরে সেই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী কলকাতার প্রভাব এই বৈশিষ্ট্যের মূলে কতকটা হয়ত আছে।

এই উপভাষার আরও একটি গুণ, এতে ধ্বনিবৈচিত্র্য বাংলার অন্য সমস্ত উপভাষার চেয়ে বেশী। যেমন চন্দ্রবিন্দু, ড়, ঢ়। পশ্চিমেতর বঙ্গে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার প্রায় নেই। পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থলে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ প্রায় অজ্ঞাত বললেই চলে, এবং ও উ এ-দুয়েরই উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উ; যেমন, ঘোড়া-গু'রা; ঝোল-জু'ল; কোথাও বা ও হয়ে যায় অ, যেমন তোর-তর, তোরে-তরে, রোহিত-রউ।

পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার সবগুলিই গুণ এবং বাংলার অন্য সমস্ত উপভাষার সবই দোষ তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু যে গুণগুলি থাকলে একটা ভাষা সাহিত্যের বাহন হবার যোগ্যতা লাভ করে, এ উপভাষায় সেগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

এমন একসময় ছিল, যখন পশ্চিমবঙ্গে পোষাকী বাংলার ধরণের বিলম্বিত চালের একটি ভাষা কথোপকথনেও ব্যবহৃত হত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ইত্যাদিতে তার প্রমাণ অজস্র পাওয়া যাবে। নানা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের পথ ধ'রে এ ভাষার ব্যবহার অব্যাহত ভাবেই চ'লে আসছিল, অঞ্চল-বিশেষে প্রাদেশিকতার ছাপ অল্প-বিস্তর পড়ছিল সে ভাষার উপরে, গড় উইলিয়মের পণ্ডিতেরা ভাষার সেই নানামুখী ধারাকে সংহত ক'রে একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এটা সত্য যে পশ্চিম-বঙ্গীয় যে ভাষাকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ইত্যাদির ভাষা গ'ড়ে উঠেছিল, ততদিনে উচ্চারণ-সৌকর্য্য, ধ্বনি-সাশ্রয় ইত্যাদির খাতিরে তার আটপৌরে লৌকিক চেহারাটা অনেকখানি গিয়েছিল বদলে। পণ্ডিতেরা ভাষাকে সেই অভিনবত্বের ছাঁচে ষোল আনা ঢেলে গড়েননি।

আমার মনে হয়, লৌকিক ভাষাকে তাঁরা যে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি, তা কেবল প্রাচীনত্বের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ-ই নয়। পোষাকী বাংলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চলতি বাংলার তফাৎ সত্যই এত কম, যে, তাঁরা যে একটা কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করছেন এ খেয়ালই হয়ত তাঁদের হয়নি। তাঁদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, সন্ধি সমাস ইত্যাদির আড়ম্বর দেখে আমরা ভাষাটাকে কৃত্রিম মনে করি, সে-কৃত্রিমতাকে প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পোষাকী বাংলার বেশীদিন সময় লাগেনি।

যে ভাষায় লেখাপড়া করছি, ধ্বনিসংক্ষেপ এবং উচ্চারণ-সৌকর্য্যের কয়েকটি বাঁধাধরা নিয়মে তারই কতকগুলি শব্দকে একটু বদলে কথা বলছি, এ ব্যবস্থায় তাঁরা হয়ত মারাত্মক দোষের কিছু দেখতে পাননি। মারাত্মক দোষের কিছু ছিলও না। যদি থাকত, চলতি বাংলায় সাহিত্য-রচনা সুরু হবার ঢের আগেই এত প্রাণবান্ এবং এতবড় সমৃদ্ধ সাহিত্য আমাদের দেশে গ'ড়ে উঠতে পারত না।

পোষাকী বাংলা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে চলতি বাংলাই যদি আমাদের একমাত্র ব্যাবহারিক এবং সাহিত্যিক ভাষা হয়ে আজ চলে তাতে অন্ততঃ পশ্চিমেতর বাংলার লোকদের দুঃখ করবার কিছু থাকবে না, কারণ তাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এ দুইই সমান। ও দুটিই পশ্চিম বাংলার জিনিষ এবং ও দুটিই আয়ত্ত করা তাঁদের কাছে সমান কঠিন বা সমান সহজ। বরঞ্চ পোষাকী বাংলার চালটা বিলম্বিত, কিন্তু চলতি বাংলার চালটা দ্রুত ব'লে সেটা বর্ত্তমান যুগোপযোগী বেশী। তাছাড়া, নিতান্ত মাথা খারাপ না হলে পোষাকী বাংলায় আজকাল আর কেউ কথা বলে না, কিন্তু বাংলার বেশীর ভাগ

লোক যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা বলে, সেটা চলতি বাংলা, সে-হিসাবে চলতি বাংলারই শ্রেষ্ঠত্ব সকলের স্বীকার করা উচিত।

এই দুটি ভাষার মধ্যে ব্যবধান যে বাস্তবিক কত কম তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে। আবহমান কাল ধ'রে আমাদের দেশের কবিরা, ছন্দের খাতিরে, মিলের খাতিরে, কখনো বা অকারণেই এই দুই-ভাষাকে অবলীলায় মিশিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন। যাঁরা সে কাব্য পাঠ করছেন, তাঁরা কেউ কখনও বোধ করেননি যে একটা জগাখিচুড়ি কিছু হচ্ছে।

দৃষ্টান্ত দেবার খুব যে বেশী দরকার আছে তা নয়, তবু কিছু কিছু দিচ্ছি। বাংলা কবিতার যে-কোনো একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ হাতে ক'রে বসলে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত সবাই সংগ্রহ করতে পারবেন।—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ,
…পায়ে ধরি কিজানি কুম্ভীরে যাবে ল'য়ে।
　　ভারতচন্দ্র রায়, ১৮শ শতাব্দী।

যার যাতে মজে মন, সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ করে তাহারে।
　　কালী মির্জ্জা, ১৮শ শতাব্দী।

মা মা বলে আর ডাকব না,
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
　　রামপ্রসাদ সেন, ১৮শ শতাব্দী।

মান করে বসে র'ব, সাধিলে না কথা ক'ব।
　　রামনিধি গুপ্ত ১৮-১৯শ শতাব্দী।

আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী
　বেজেছিল সই কাননে,
কুল-লাজ-ভয় হরিল তাহাতে
　মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে।
　　নিত্যানন্দ বৈরাগী, ১৮-১৯শ শতাব্দী।

আমায় কোথায় আনিলে,
আনিয়ে সাগর মাঝে তরী ডুবালে।
　　রামমোহন রায়, ১৮-১৯শ শতাব্দী।

সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
　নইলে পারবে কেন?
　　গোবিন্দ অধিকারী, ১৯শ শতাব্দী।

যাদের সনে গোচারণ
করিতাম কানন মাঝে সুখে,
…খেয়ে ফল দিত মোর মুখে।
　　কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ১৯শ শতাব্দী।

লেশ না রাখিল শেষ ও,
কোথা সে গৌরব নিকুঞ্জ-সৌরভ ?
হল পরিণত শত কাহিনী ও।

গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৯শ শতাব্দী।

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শ শতাব্দী।

দূর অতিদূর দুপাখা ছড়ায়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ১৯শ শতাব্দী।

ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনেব কলধ্বনি,
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে যেন তার হারামণি।

সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মন-কোকনদে।

চল ভাসি' প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ
···কমলিনী কোন্ ছলে থাকিবে ডুবিয়া জলে।

হায় লো দোলাবি সখি কার গলে
মালা গাঁথিয়া।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৯শ শতাব্দী।

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে···

মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯শ শতাব্দী।

বিফলে ছুটিয়া আসা, বিফল সে বোঁটা,
অলির অসাধ্য খেতে রস একফোঁটা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শ শতাব্দী।

আজি যে করিব প্রেম··· কালি হবে অশ্রুজল।
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু, বাজে তার মরমে।

নবীনচন্দ্র সেন, ১৯-২০শ শতাব্দী।

কভু বা বনবিড়াল বাহিয়া উঠি' ডাল,
লয়ে লুটের মাল লাফায় গায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯-২০শ শতাব্দী।

পড়ে আছে একপাশে কালিঝুল মাখিয়া শরীরে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন, ১৯-২০শ শতাব্দী।

গোপন হৃদয়ে করেছে প্রকাশ
তুমি এসে ভালবাসিবে।

উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১৯-২০শ শতাব্দী।

মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনাব কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে।

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায়···

যে প্রেম সমুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে।

আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯-২০শ শতাব্দী।

"শেষের কবিতা" চলতি বাংলায় লেখা উপন্যাস, কিন্তু তার মধ্যেকার কবিতাগুলিতে পাচ্ছি—

বার্ত্তা আনিয়াছি বিধাতাব।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর···

মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি' শুধালেম···

মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে;
ছিন্ন হবে ডোর—

সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি।

যে-শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ।

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া ;
প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি'।

এমন আরও অনেক আছে।

এরপর একেবারে "রবীন্দ্রোত্তর" যুগে চ'লে আসা যাক। আমার সামনে "১৩৫১-র সেরা কবিতা" বলে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ রয়েছে। ৪৪টি কবির একটি ক'রে লেখা আছে এই গ্রন্থে। কবিতা বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, চিরকাল যা বুঝিয়ে এসেছে এবং আমি নিজে যা বুঝে কথাটা ব্যবহার করছি সে অর্থে গোটা-দশেক লেখাকে বাদ দিয়ে হিসাব করা যেতে পারে। ৩৪টি কবিতার মধ্যে ১৪টিতে পোষাকী-আটপৌরের মিশ্রণ ঘটেছে, ২০টিতে ঘটেনি। কিন্তু যাঁরা কেবল আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাঁরা কেউ লিখেছেন 'নাই', কেউ বা লিখেছেন 'নেই'। কোথাও পাচ্ছি 'হিসাব,' কোথাও বা পাচ্ছি 'হিসেব'। লিখা-লেখা, বিকেল-বিকাল, ভিখিরী-ভিখারী মিশে গিয়েছে। উঁচু যদি ত উঁচানো কেন, উঁচোনো নয় কেন ? 'বনিয়াদ, থমকি', এগুলো পোষাকী স্তরের শব্দ।

কবিতায় অনেক জিনিষ চলে যা গদ্যে চলে না, তা ঠিক। কিন্তু চলতি বাংলা আমাদের চোখের উপর আমাদের পোষাকী গদ্যের ভাষাকে কি গভীর এবং কত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে, তারও কিঞ্চিৎ নমুনা এইবারে আমি দেব।

কথোপকথনের ভাষায় যে সমস্ত তৎসম শব্দ চলে না, তাদের ব্যবহার পোষাকী গদ্যে ক্রমেই ক'মে আসছে। ৬০।৭০ বৎসর আগে খুব প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যে, প্রীতি করেন, দৃষ্টি করেন, স্থিতি করে, মনুষ্যসকল, চোখে পড়ত ; আমরা সে জায়গায় এখন সোজাসুজি, ভালবাসেন, দেখেন, থাকে, মানুষেরা, লিখে থাকি। এক্ষণে বহুকাল হ'ল এখন হয়ে গিয়েছে। অস্মদ্দেশে, ত্বদীয়, এখন আর পণ্ডিতেরাও লেখেন না। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ আজকাল ভাষায় একেবারে অচল।

ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের যে সূত্রগুলি ধ'রে প্রাচীন পোষাকী ভাষা এ যুগের আটপৌরেতে বিবর্ত্তিত হয়েছে সেগুলিকে মোটামুটি ভাবে তিনটি আলাদা পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এক, ধ্বনি-সংক্ষেপের পর্য্যায় ; দুই, উচ্চারণ-সৌকর্য্যের পর্য্যায় ; তিন, কতগুলি ধ্বনির প্রতি বিরাগ এবং অন্য কতগুলি ধ্বনির প্রতি অনুরাগ -বশতঃ অকারণ-বিকৃতির পর্য্যায়। এই পর্য্যায়-ক্রম অনুসরণ ক'রে আমি আমার বক্তব্য বলছি।

ধ্বনি-সংক্ষেপ

চলতি বাংলা যে এত সহজে পোষাকী বাংলাকে হঠিয়ে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠছে, তার একটা কারণ পোষাকী আর চলতি বাংলা একই ভাষার শ্লথগতি এবং দ্রুতগতির চাল, তা আগেই বলেছি। তা সত্ত্বেও চলতি এত সহজে চলত না যদি তাতে ধ্বনির সাশ্রয় না হয়ে ধ্বনিবিস্তার হত।

সপ্তমী বিভক্তির এতে-র তে বর্জ্জন ক'রে আমরা পোষাকীতেও এখন কেবল এ ব্যবহার করছি; অমৃতেতে, দূরেতে কেউ আর সহজে লেখেন না। কেবল 'দুয়েতে' চলে। আমারদিগের থেকে আমাদিগের, আমারদের থেকে আমাদের-এ এসে উত্তীর্ণ হয়েছি, আমাদিগকের জায়গাতেও আমাদের-ই এখন চলছে। পোষাকী বাংলার বিবর্ত্তনের গতি এখন নিঃসন্দেহ অপ্রচলিত তৎসম শব্দ বর্জ্জন এবং সাধ্যমত ধ্বনিসংক্ষেপের দিকে। ধ্বনিসংক্ষেপের সবকটি সূত্র নিয়েই আলোচনা ক'রে আমি দেখাব, পোষাকী বাংলা সংক্ষিপ্ত ধ্বনির রূপগুলিকে কেমন অবলীলায় আত্মসাৎ ক'রে চলেছে।

ই-ধ্বনির লোপ। আমিষ-আঁইষ-আঁষ, আলি-আইল-আল, আইড়-আড়, আজি-আজ, কালি-কাল, তিনি-তিন, চারি-চার। (চলতি বাংলাতে এই সমস্ত লুপ্ত ইকারের স্বীকৃতি পরোক্ষে এখনও কোথাও কোথাও রয়েছে। এখানকার, সেবারকার; কিন্তু ইকারের ভূতটা ঘাড়ে চেপে আছে ব'লে আজকের, কালকের। পাঁচটা, সাতটা, আটটা, ত্রিশটা; কিন্তু তিনটে, চারটে।) আলিপনা-আলপনা, কিট্ট-কাইট-কাট, কটাহ-কড়াই-কড়া, খলি-খইল-খল, গালি-গাল, খাইদ-খাদ, গাঁইট-গাঁট, জাতি-জাত, ডাকাইতী-ডাকাতী, ডাহিন-ডাইন-ডান, ডাইল-ডাল, তাঁইত-তাঁত, একুইশ-একুশ, সাতাইশ-সাতাশ, আটাইশ-আটাশ, পাঁইজ-পাঁজ, পাইণ-পাণ (মিশ্রধাতু), পাইল-পাল, পানিকৌড়ি-পানকৌড়ি, বাইচ-বাচ, বাইড়-বাড়, বহিন-বইন-বোন, এইদিকে-এদিকে, সেইদিন-সেদিন, ভাইজ-ভাজ, লাগাইল-নাগাল, সতিনী-সতীন, ভাগিনা-ভাগনা-ভাগনে (কিন্তু কেবল ভাগনী, পোষাকীতেও ভাগিনী চলে না, বেশী পোষাকী করতে হলে ভাগিনেয়ী লিখতে হয়)। রাতি-রাত, রাশি-রাশ, পড়িশী-পড়শী, যুক্তি-জুত্তি-জুইত-জুত, শুঁইঠ-শুঁঠ। বিদেশী শব্দে ইস্তিরি-ইস্ত্রি, লিগাইত-নাগাৎ, মারিফৎ-মারফৎ, রাইয়ত-রায়ত, ফরমাইশ-ফরমাশ (কিন্তু ফরমাইশী), কাইঞ্চী-কাঁচি, কলিমহ-কলমা, বেবাকী-বেবাক। এ ছাড়া, দুআনি, দুতলা, দুপর-দুপুর ইত্যাদি, এবং ফাজলামি, মাটকোঠা, নাতবৌ, নাপতিনী ইত্যাদি অসংস্কৃত প্রত্যয়ান্ত এবং সমাসবদ্ধ শব্দ।

ই-ধ্বনি-বর্জ্জিত সংক্ষিপ্ত রূপগুলিই পোষাকীতে এখন চলছে। কয়েকটির বেলা ই-বর্জ্জিত বানান সুরু থেকেই চলছিল।

উ-ধ্বনির লোপ। আউথ-আক, ওতু-ওত, দাউদ-দাদ, ধাতু-ধাত, চৌদ্দ-চোদ্দ (ঔকে আমি ওউ এই যুগ্ম-ধ্বনি ব'লে ধরছি), ডৌল-ডোল, বৌল-বোল, শৌল-শোল, কৌড়ি-কড়ি, চৌক-চক, চক্ষু-চৌখ-চোখ, চাউল-চাল, পাংশু-পাঁউশ-পাঁশ, পাউড়ি-পাড়ি, অংশু-আঁউশ-আঁশ, ফাগু-ফাগ, মাগু-মাগ, আঙুঠি-আংটি, ছাদনী-ছাঅনি-ছাউনি-ছানি (চক্ষুরোগ); এছাড়া বিদেশী শব্দে তাবাকো-তামাকু-তামাক, মুআফিক-মাফিক, মুআমলহ্-মামলা, মুআফ-মাফ-মাপ, মুঅক্কল-মক্কেল, মুঅয়নহ্-ময়না, মউজুদ-মজুদ-মজুত।

উ-ধ্বনি-বর্জ্জিত রূপগুলিই পোষাকীতে চলছে। কয়েকটির এই সংক্ষিপ্ত রূপ সুরু থেকেই চলছিল।

এ-ধ্বনির লোপ। এক্কল-একেলা-একলা, পন্নরহ-পনের-পনর, সত্তরহ-সতের-সতর। একার বানান আর বড় চলে না।

ও-ধ্বনির লোপ। তাপ-তাও-তা, বাম-বাঁও-বাঁ, গ্রাম-গাঁও গাঁ, গাত্র-গাত-গাও-গা,

ঘাত্ত-ঘাঅ-ঘাও-ঘা, পাদ-পাও-পা, শাবক-ছাও-ছা। দিবার-দিওয়ার-দেওয়াল-দেয়াল, নেওয়ার-নেয়াড়, বেওকুফ-বেকুব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলতি ভাষার বানানকে অবলম্বন ক'রেই পোষাকী সুরু হয়েছিল।

চন্দ্রবিন্দু। পূর্ব্ববঙ্গে নাকী কান্না এবং ব্যঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার প্রায় নেই; একমাত্র চট্টলে অল্প-বিস্তর আছে। ওটা প্রায় সর্ব্বৈব পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষারই নিজস্ব জিনিষ।

বর্গীয় অনুনাসিক ও অনুস্বার লুপ্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় অনেক জায়গায় চন্দ্রবিন্দু রূপ পরিগ্রহ করে। ধ্বনিসংক্ষেপের দিক্ থেকে এটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি এবং তার দৃষ্টান্ত দেবার দরকারও নেই। পোষাকী বাংলায় কাইঞ্চী, রান্ধা, তাম্বু, চান্দা, চলে না; কাঁচি, রাঁধা, তাঁবু, চাঁদা-ই চলে। তা ছাড়া, এ নিয়মের ব্যতিক্রম যে-সমস্ত জায়গায় আছে, সে-সব জায়গাতেও পোষাকী সম্পূর্ণভাবেই চলতির হাত-ধরা। লম্ফ লাঁফ নয়, লুণ্ঠন লুঁঠ নয়, কেননা ল-য়ে চন্দ্রবিন্দু হয় না। টঙ্ক-টাকা কিন্তু পোষাকী আটপৌরে দুয়েতেই টাঁকশাল এবং দুয়েতেই বাঁদী কিন্তু বান্দা, গোড়া কিন্তু গুঁড়ি। শব্দের গোড়ায় ছাড়া চন্দ্রবিন্দু হয় না (একমাত্র ব্যতিক্রম যা মনে আনতে পারছি তা হচ্ছে বারোঁয়া), যে জন্যে অভ্যাস-বশে অনেকে জাঁহাপনা, রেঁস্তরা লিখে থাকেন। তাই সেবন্তী সেউতি নয়, সেঁউতি, পোষাকী আটপৌরে দু-এতেই। আচমন আচাঁনো নয় আঁচানো; ছুছুন্দরী-ছুচোঁ নয়, ছুঁচো।

যুক্ত (কোনো কোনো জায়গায় বিযুক্ত) ব্যঞ্জনের যে কোনো একটি লুপ্ত হয়েও অনেক জায়গায় চন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। এটা ঠিক স্বাভাবিক পরিণতি নয়, তবে কতগুলি শব্দে প্রাকৃতেই অনুনাসিকের আগম হয়ে গিয়েছিল। পোষাকী বাংলা এই ধ্বনিবিকৃতিকে সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে। যেমন: অক্ষি-আঁখি, অর্চ্চি-আঁচ, অস্থি-আঁঠি, অর্ব্বুদ-আঁব, ইষ্টক-ইঁট, উচ্চ-উঁচু, ওষ্ঠ-ঠোঁট, কর্কট-কাঁকড়া, কর্কোটিকা-কাঁকুড়, কচ্চা-কাঁচা, কক্ষ-কাঁখ, কৃকলাস-কাঁকলাস, ঘট্ট-ঘাঁটা, ঘর্ষণ-ঘেঁষা, কুক্কুট-কুঁকড়া, কূর্চ-কুঁচি, কুঞ্জ-কুঁঙ্গ, কুর্দ্দ-কোঁদা, কুক্ষি-কোঁখ, চর্চরী-চাঁচর, ছিত্বর-ছেঁচড়, ছিদ্র-ছেঁদা, জর্জ্জর-ঝাঁজরা, ঝর্ঝর-ঝাঁজর, তর্ক-টাঁক, ধৃষ্ট-ঢেঁটা, তুত্থ-তুঁতিয়া, ত্রোটি-থঁতি, পিচ্চট-পাঁচড়া, পিঁচুটি, পর্পট-পাঁপড়, প্রোষ্ঠী-পুঁঠি-পুঁটি, প্রোত-পুঁতি, প্রোথ-পোঁতা, প্রভুচ্ছ-পোঁছা, স্ফুট-ফোঁটা, ফোঁড়া, ফোঁড়, বক্র-বাঁকা, বুদ্বুদ-বুঁদি, বর্তুল-বাঁটুল, ভাঁটা, শস্ত-শাঁস, সিক্ত-স্যাঁতসেঁতে, ক্ষত-খুঁৎ, পুস্তক-পুঁথি, চ্যুত-চোঁতা, সপ্ত-সাত কিন্তু সাঁইত্রিশ, হুক্কহ্-হুক্কা-হুঁকা। আবুকী-আঁবুই, কুচিক-কুঁচে, কুটীর-কুঁড়ে, গুটিকা-ঘুঁটি, চিপিটক-চিঁড়া, ছুপ্-ছোঁওয়া, যূথিকা-যুঁই, পুত্তিকা-পুঁই, পেচক-পেঁচা, পিপীলিকা-পিঁপিড়া-পিঁপড়ে, অযুক্ত ব্যঞ্জন চন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হবার উদাহরণ।

অজ্ঞাতমূল এবং দেশজ যে সমস্ত শব্দে পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হয়, পোষাকী বাংলায় সেই চন্দ্রবিন্দু রক্ষিত হয়েছে। এরও উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকে অকারণে ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

কতগুলি তদ্ভব ও বিদেশাগত শব্দের উচ্চারণে পশ্চিমবঙ্গে অকারণে চন্দ্রবিন্দু যোগ ক'রে দেওয়া হয়। পোষাকী বাংলা নির্ব্বিচারে এই বিকৃত বানানকেও গ্রহণ ক'রে চলেছে। যেমন: কুজা-কুঁজা, কূট-খুঁটি, গোং-গোঁং-গুঁতা, সূচ-ছুঁচ, শৌচ-ছোঁচান, জুট-ঝুঁটি, তাবি-তাঁবে, তুষ-তুঁষ, তুত-তুঁত, পাদ-পা কিন্তু পাঁইজোর পাঁয়তারা, পাও-পাঁউরুটি, পাচন-পাঁচন, পজাবহ্-পাঁজা, পুয-পুঁজ, পেচ-পেঁচ, পাপায়া-পেঁপে, পিয়াজ-পেঁয়াজ, পাশ-ফাঁস, ফাশ-ফাঁস (কথা ফাঁস ক'রে দেওয়া), বিধ-বিঁধানো, বড়িশ-বঁড়শী, বুক্চহ্-বোঁচ্কা, উদ্র-ভোঁদড়, সত্য-সাঁচ্চা, হোশ-হুঁশ, হাশিয়া-হাঁসিয়া, হাসিল-হাঁসিল, হস্পিটাল-হাঁসপাতাল। প্রাচীন বাংলার উছট হয়েছে হোঁচট।

কতগুলি শব্দের চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত এবং চন্দ্রবিন্দুহীন দুরকম বানান অভিধানে পাচ্ছি। যেমন: ইচড়-ইঁচড়, ইট-ইঁট, খোপা-খোঁপা, টেপারি-টেঁপারি, ঘোট-ঘোঁট, ঘুষি-ঘুঁষি, চোতা-চোঁতা খেউড়-খেঁউড়, আখর-আঁখর, কুচিলা-কুঁচিলা, ফোড়-ফোঁড়, ফোড়া-ফোঁড়া, ফোপল-ফোঁপল, আচোট-আঁচোট, আটাল-আঁটাল, আটি-আঁটি, উচোট-উঁচোট, কাচ-কাঁচ, কুচি-কুঁচি, কুড়ে-কুঁড়ে, কোচ-কোঁচ (কিন্তু দেশের নামের বেলায় শুধু কোচবিহার), কোদা-কোঁদা, খিচ-খিঁচ, খিচানো-খিঁচানো, খুটি-খুঁটি; এমন আরও অনেক আছে। অকারণ চন্দ্রবিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গীয় গ্রাম্যতা যদি নাও বলা যায়, তবু একটা ধ্বনিচিহ্ন কমালে যদি ক্ষতি কিছু না থাকে ত এই বিংশ-শতাব্দীর কর্ম্মব্যস্ততার দিনে কমানোই কর্ত্তব্য মনে করি। কয়েকটি শব্দের বৈকল্পিক চন্দ্রবিন্দু নিয়ে একটা ফয়সলাও করা যেতে পারে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও কথাটা এইখানে ব'লে নিচ্ছি। বৈকল্পিক বানানের দুটিকে দুরকম অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে; যেমন, কুড়ে-অলস, কুঁড়ে-কুটীর; হাত-পা খিঁচানো, দাঁত খিচানো; কোদা-লাফানো, কোঁদা-ভ্রমিযন্ত্রে গোল করা; দোঁহা-দুইজন, দোহা-couplet; বণ্টন-বাঁটা, মসলা বাটা; ভাটি-নামাল, ভাঁটি-kiln; আগুনের সেক, জল সেঁক; গর্ত্ত বোজানো, চোখ বোঁজা; ছোড়া-নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া-ছোকরা; পাচন যা পরিপাক করায়, পাঁচন-পাঁচরকম গাছগাছড়ায় তৈরি ওষুধ। আরবী তূত (ফল)-কে তূত রেখে তুথ-তুঁত হলে ভাল। তুঁতিয়া, তুঁতে অকারণ ধ্বনিবিস্তার।

আ+ই-এ। অবিধবা-আইহ-আইয়ো-এয়ো, বাতিঙ্গন-বাইগন-বেগুন,পাজিয়ামি-পাইজামি-পেজোমি।

ই+আ-এ। পিঁপিড়া-পিঁপড়ে, আঁইষটা-আঁষটে, দহিয়াল-দয়েল, চালিতা-চালতে, ভাগিনা-ভাগনে, ছালিয়া-ছেলে, মাইয়া-মেয়ে, নাইয়া-নেয়ে, হাঁড়িশাল-হেঁশেল, উড়িয়া-উড়ে (উড়িষ্যা সংক্রান্ত), বানিয়া-বেনে, জালিয়া-জেলে, গাঁজিয়াল-গেঁজেল, ঘাসিয়াড়া-ঘেসেড়া, ছাতারিয়া-ছাতারে, টানাপড়িয়ান-টানাপড়েন, বাদিয়া-বেদে, গড়িয়ান-গড়েন। সংক্ষিপ্ত রূপগুলিই পোষাকীতে চলে। পোষাকীতে কন্যা চলে, কনে চলে না; কিন্তু ধন্যাপাতা চলতি-পোষাকী দুয়েতেই ধনেপাতা, শিক্যা দুয়েতেই শিকে!

'ইয়া' প্রত্যয়টি উচ্চারণে 'ইআ' ব'লে চলতি বাংলায় য় বর্জ্জন ক'রে উপরোক্ত সূত্র অনুসারে 'এ' হয়ে যায়। কিন্তু পোষাকী বাংলাতেও 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত শব্দ এখন আর প্রায় চলে না। এইদিকে পোষাকী বাংলার বিবর্ত্তনের অভিমুখীনতা এত বেশী যে, মূলতঃ 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অনেকগুলি শব্দ অভিধানেও এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। পোষাকী আটপৌরে দুয়েতেই এখন 'এ' প্রত্যয় চলছে। 'এ' প্রত্যয়ের পূর্ব্বেকার আ এ হয়ে যায়, সেই বিকৃতিও পোষাকী বাংলায় চ'লে গিয়েছে। যেমন: ধাড়ি-ধাড়িয়া-ধেড়ে, নেড়া-নেড়িয়া-নেড়ে, আলসিয়া-আলসে, আঁড়িয়া-এঁড়ে, আটপহরিয়া-আটপৌরে, একঘরিয়া-একঘরে, আমড়াগাছিয়া-আমড়াগেছে, ডুবিয়া-ডুবে।

'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত এই শব্দগুলি অভিধানে পাচ্ছি, কিন্তু পোষাকী বাংলাতেও সেগুলির 'এ' প্রত্যয়ান্ত চলতি রূপই এখন চলছে:—একলসাড়িয়া, কচকচিয়া, কড়িয়া, কনকনিয়া, কপালিয়া, করকরিয়া, কুঁড়িয়া, কেউটিয়া, কোন্দলিয়া, খটখটিয়া, গড়ানিয়া, গুড়গুড়িয়া, ঘোলাটিয়া, চটপটিয়া, চাকরিয়া, চাষাড়িয়া, ছিপছিপিয়া, জঙ্গলিয়া, জিবিয়া গজা (!), যোগাড়িয়া, জালানিয়া, ঝগড়াটিয়া, ঝলমলিয়া, টনটনিয়া, টুকটুকিয়া, ঠকানিয়া, ঠেঙ্গাড়িয়া, ডগডগিয়া, ডানপিটিয়া, ডিবিয়া, তরতরিয়া, তেআঁঠিয়া,

থমথমিয়া, থলথলিয়া, ধকধকিয়া, নেকড়িয়া (!), পাঁশুটিয়া, পাছাপাড়িয়া, পিটপিটিয়া, পুঁইয়া, (পুচ্ছক+ইয়া) পুঁচকিয়া, পোড়ানিয়া, ফচকিয়া, ফুটফুটিয়া, ফেসাদিয়া, ফ্যারফেরিয়া, বওয়াটিয়া, বখাটিয়া, ডিগডিগিয়া, বানরিয়া, বারমাসিয়া, বালিয়া, বাহাত্তরিয়া, বিদ্‌কুটিয়া, ভূতুড়িয়া, ভুলানিয়া, মাটিয়া, মিটমিটিয়া, রাক্ষসিয়া, লম্বাটিয়া, হড়বড়িয়া, হাভাতিয়া, হাঁড়িয়া।

এই শব্দগুলির পোষাকী রূপ প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এগুলিও মূলতঃ 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত :—হলদে (হলুদ+ইয়া-হলুদিয়া-হলদিয়া), ভাবুনে, অলক্ষুণে, একগুঁয়ে, পূবে হাওয়া, উত্তুরে হাওয়া, গুবরে, খাইয়ে (ভোজনপটু ; হিন্দীতে খবাইয়া, পূর্ব্ববঙ্গে খাওঅইয়া, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে পাচ্ছি খাওয়াইয়া), গাইয়ে (গায়ক), নাচিয়ে (নৃত্যনিপুণ), ভাউলে। কাস্তে কথাটার কাস্তিয়া বানান অভিধানে পাচ্ছি, কিন্তু ওটা পোষাকীতে কখনও কেউ ব্যবহার করেছেন ব'লে জানা নেই। ভেড়ে, বেড়ে (হিন্দীতে বাঢ়িয়া, বাঙালীর কানে বাঢ়িয়া), মেজে, হাতুড়ে, হেলে।

বাস্তবিকই 'ইয়া' প্রত্যয়টিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে এবার ভাষার আসর থেকে বিদায় করবার সময় এসে গিয়েছে। এখনো অনেকে পোষাকী বাংলায় একচেটিয়া সাপুড়িয়া আটপহরিয়া লিখতে না পারলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

উ+আ=ও। পোষাকী বাংলায় কুয়া চলে, কুয়ো বা কো চলে না ; কিন্তু কর্ণকূপ-কানকুয়া কানকো, কানকোই চলে, কানকুয়া কেউ কোথাও ব্যবহার করেছেন ব'লে ত জানি না। আবুড়াখাবুড়া অভিধানে পাচ্ছি, কিন্তু পোষাকীতে চলে কি? মালপুয়া পোষাকীতেও এখন মালপো। খেকুয়া-খেরো দুইই চলে। পুত্র পুয়া-পো, ঠাকুরপো চলে, ঠাকুরপুয়া যদি কেউ লেখেন তাঁকে নিশ্চয় রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা হবে।

উয়া উচ্চারণে উআ ব'লে চলতিতে ও হয়। উয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অভাব কিছু নেই বাংলা ভাষায়, কিন্তু সেগুলি এখন অভিধান ভারাক্রান্ত করা ছাড়া আর কোনো কাজে বড় লাগে না। পোষাকীতেও উয়ার জায়গায় ও প্রত্যয় চলছে। ও প্রত্যয়ের আগেকার আ এ হয়ে যায়, ও উ হয়ে যায়, তাতেও পোষাকীর আটকাচ্ছে না।

একচোখুয়া, ঠেকুয়া, ভেড়ুয়া, মাড়ুয়া, রাউয়া (রবাহূত), জলুয়া, পড়ুয়া বাড়ী, গোঁফুয়া (গোঁফো-গুঁফো), বনুয়া (বোনো-বুনো), হোলুয়া (হোলো-হুলো), চাটুয়া, পাঁচুয়া, তলুয়া হাঁড়ি, থলুয়া, দানুয়া, দাঁতুয়া, পাঁকুয়া, বাথুয়া শাক, মচুয়া, মাছুয়া, কাঠুয়া, আখুয়া গুড়, কাজুয়া, গাছুয়া, ঘাউয়া কুকুর, দন্ত-ডাঁফ+উয়া=ডাঁফুয়া (ডেঁপো), টাকুয়া মাথা, বানুয়া জল, ছাঁচুয়া কথা, বাতুয়া হাড়, ভাতুয়া বাঙালী, মাঠুয়া সুর, মাঝুয়া ভাই, শাঁখুয়া বিষ, ঠোঁটুয়া, ঝড়ুয়া হাওয়া, টোলুয়া পণ্ডিত, কেঁচুয়া, কোণুয়া (কুণো), কাঁধুয়া বাঘ, আলুয়া চুল, এর সবগুলিই অভিধানসম্মত বানান, কিন্তু অসমসাহসী না হলে কেউ আর পারবে এগুলিকে পোষাকী বাংলায় ব্যবহার করতে? রেঢ়ো বোঝাতে রাঢ়ুয়া কেউ লিখবে?

মাসীর স্বামী মাস্বাকে মেসো ব'লেই পোষাকী বাংলা প্রথম থেকে জানে। "কালুবীর বলেন সম্বন্ধে তুমি মাস্বা"-ধর্ম্মমঙ্গল।

চেটো, খেলো, খেকো, এগুলোও কি মূলতঃ উয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দ? মোট কথা উয়া প্রত্যয়ও

ভাষার থেকে আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবার পথে। পটুয়া, পড়ুয়া (পাঠশালার), এই রকম দু-তিনটি বানান এখন আর যদি কেউ না লেখেন ত ক্ষতি কি হয় ?

আ লোপ। আছিল-র আ, হাবালাৎ-এর মাঝের আ গোড়া থেকেই নেই। আধা-আধ, গোয়ালা-গয়লা, খাজানা-খাজনা, কিনারা-কিনার, হাঙ্গামা-হাঙ্গাম, বাঙ্গালা-বাঙ্গলা-বাংলা, পোষাকীতে আজকাল বিহিত বানান। ভুখাছানির একটি আ লোপ ক'রে এবং ধ্বনিবিপর্য্যয় ঘটিয়ে ভোচকানি, চলন্তিকায় ভোচকানিই কেবল পাচ্ছি। ঘরাও-ঘরাওয়া-ঘরোয়া, পেটাও-পেটাওয়া-পেটোয়া, পেঁচাও-পেঁচাওয়া-পেঁচোয়া, মাঝের রূপটা অচল।

আরও নানা ধ্বনির বিলোপ। রাঁধনা-রান্না, কাঁদনা-কান্না, সুরু থেকেই সংক্ষিপ্ত রূপদুটো চলছে। হাওয়াই-হাউই, হালুয়াই-হালুই-এর বেলাতেও তাই। মন্দার>মান্দার আর চলে না, মাদার বিহিত বানান। কয়েতবেল-কতবেল, ব্যবসায়-ব্যবসা, আমাশয়-আমাশা, তাকাজহ্> তাগাদা-তাগিদ দু প্রস্থ বানানের যেটা খুসি ব্যবহার করা চলে। ৭০ বৎসর আগেকার পোষাকী বাংলাতেও তাহার-তার, তাঁহার-তাঁর দুরকম বানান পাচ্ছি। "তাহার পর" বোধহয় কেউ এখন আর লেখেন না, মহা পণ্ডিতেরাও "তারপর" লিখে থাকেন। তৈয়ারী-তৈয়ার-তৈরি, তিন রকমই পোষাকীতে চলছে। খাদ্য অর্থে পোষাকীতেও কথাটা খাবার, খাইবার নয়।

গড়মালা, ঘুঁটে (গোবিষ্ঠা, প্রাকৃতে গোইঠ্ঠা, পূর্ব্ববঙ্গে গইঠা), শিকনি (সিঙ্ঘানিকা, পূর্ব্ববঙ্গে সিঙ্গাইল), বেণা (বীরণ, পূর্ব্ববঙ্গে বীন্না), উচ্ছে (পূর্ব্ববঙ্গে উইস্তা), ঢক্কো, নলেন গুড়, ফঙ্গবেনে, আস্কে (পিঠে), ডেয়ে বা ডেয়ো (পিঁপড়ে), বটের প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে যেগুলি বাস্তবিক পশ্চিম বঙ্গের সংক্ষিপ্ত ধ্বনির প্রাকৃত শব্দ ; কিন্তু এদের পোষাকী বাংলার স্তরের অপভ্রংশের রূপ অভিধানে নেই।

আশা করি যতটা লিখেছি তার থেকেই এইটুকু অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, যে, ধ্বনিসংক্ষেপের যে সূত্রগুলিকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীনপন্থী পোষাকী বাংলা চলতি বাংলায় বিবর্ত্তিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে আজকের দিনের পোষাকী বাংলা বেশ দরাজ হাতে নিজের কাজে লাগাচ্ছে। এইদিক্ দিয়ে পোষাকী বাংলা প্রায় সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ভাষা। ধ্বনিসংক্ষেপের খাতিরে তাকে দিয়ে না করানো যেতে পারে এমন কাজ প্রায় নেই, ফলে চলতি বাংলায় ধ্বনিসংক্ষেপ হয় একথা কিছুদিন পরে আর বলা চলবে না, যদি কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখা যায়।

একজন পাগলের কথা শুনেছি, কথাবার্ত্তা, চালচলন, কাজকর্ম্ম, সব কিছুতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ, কিন্তু যদি কখনও, কোথাও, কোনো অবস্থায় একটি ইট তার চোখে পড়ে তবেই আর রক্ষা থাকে না। সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে হয়ে যায় রাজা, ইটটি সিংহাসন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইটটি চেপে সে ব'সে থাকবে, তাকে টেনে তোলে কার সাধ্য ? ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে পোষাকী বাংলার ব্যবহার কতকটা এই রকম। আইয়ো-এয়ো লিখতে পার, কিন্তু যাইও-যেও লিখবার জো নেই। আঁইষটা-আঁষটে লেখা চলে, যাইস্না যাস্‌নে লিখলে ভাষা আর পোষাকী রইল না। কুঁড়িয়া-কুঁড়ে, নাইয়া-নেয়ের সূত্রে ঘুরিয়া-ঘুরে খাইয়া-খেয়ে লিখলে ভাষার জাত গেল। ধ্বনিসংক্ষেপের যে সব সূত্র পোষাকী বাংলায় ব্যাপক ভাবে গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে পোষাকী বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ থেকে চলতি বাংলার ক্রিয়াপদে উত্তীর্ণ হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা হবার উপায় নেই।

পোষাকী বনাম চলতি বাংলার ক্রিয়াপদের প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। একটি বইয়ে দেখলাম রয়েছে :—"'করছি' পদের মূলে 'করিতেছি' পদ নাই ; এটি পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার পদ।……বাঙ্গালা সাধু ভাষার 'করিতেছি' পদ পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষা হইতে আগত।" কিন্তু 'করিতেছি'র থেকে 'করছি' বিবর্ত্তিত হবার পথে বাধা কিছু নেই। করিতেছি-করতেছি-কর্‌ত্‌ছি, এবং তিনটি ব্যঞ্জনকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা বাংলার রীতি নয় ব'লে তারপর কর্‌ছি। করিছে-করছে, করিছিল-করছিল এইরকম ক'রে কথাগুলো এসেছে, গ্রন্থকার বলতে চান। 'করিছে'র ই লোপ হয়ে 'করছে' না হয় হল, 'হইছে' 'হচ্ছে' কি সূত্রে হল ? হছে কেন হল না ? হচ্ছিল, আঁকাচ্ছিল, দেখাচ্ছে, লাগাচ্ছিল, শানাচ্ছে, পাচ্ছিল, এ সমস্ত পদে চ্ আগম কেন হচ্ছে ? আসলে হইতেছিল-হতেছিল-হত্‌ছিল-হচ্ছিল, বিবর্ত্তনের ধারাটা এই। কুৎসা-কুচ্ছো, মুৎসদ্দী-মুচ্ছুদ্দী, দেখাত্‌ছে-দেখাচ্ছে। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর বেলায় তিনটি ব্যঞ্জন একসঙ্গে হয় ব'লে ত্ লোপ পায়, স্বরান্ত ধাতুর বেলায় সেটা হয় না, ছ-এর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ত্ চ্ হয়ে যায়। গাহ্, নাহ্, চাহ্, বাহ্ এইকটি ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর আচরণ একটু স্বতন্ত্র। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর নিয়মে ত্ লোপ হয়ে যায়, তারপর মহাপ্রাণ-ধ্বনি স্বল্পপ্রাণ স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে গাইছে-গাইছিল, নাইছে-নাইছিল, চাইছে-চাইছিল, বাইছে-বাইছিল। বিকল্পে হ্ ধ্বনিকে স্বরুতেই সম্পূর্ণ ছেঁটে দিয়ে স্বরান্ত ব্যঞ্জনের নিয়মে গাচ্ছে-গাচ্ছিল, ইত্যাদি। আমার মনে হয়, করছি, খাচ্ছি পদগুলির মূলে করিছি খাইছি নাই। ঘটমান বর্ত্তমানের রূপ হিসাবে পদ্যে ওগুলির ব্যবহার আছে তা সত্য, কিন্তু বাংলার অতি-অন্তরঙ্গ জ্ঞাতি ওড়িয়া এবং অসমীয়াতে ওগুলি পুরা ঘটিত বর্ত্তমানের রূপ। আমি দেখেছি, ওড়িয়াতে মুঁ দেখিছি, অসমীয়াতে মৈ দেখিছোঁ। পূর্ব্ববঙ্গে ই লোপ ক'রে আমি দেখছি। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সেটা ঘটমান বর্ত্তমানের রূপ হয়ে যাবার কারণ কি থাকতে পারে ? বাস্তবিক 'দেখছি' মূর্ত্তি লুকানো 'দেখ্‌চ্ছি।'

কিন্তু ক্রিয়াপদগুলিতেও পোষাকীবাংলা যে সর্ব্বত্র জাত বাঁচিয়ে চলতে পেরেছে তা নয়।

হয়েন, যাইল, যাইয়া অনেকদিনই হন, গেল, গিয়া হয়ে গিয়েছে। হইস-হ'স, হউন-হ'ন, হউক-হ'ক, দিউন-দিন, দিউক-দিক, শুইস-শুস, শুউক-শুক, লাফাউক-লাফাক, আইসে-আসে প্রভৃতি পদে ই উ লোপ পেয়ে গিয়েছে। 'বল'-র সঙ্গে তুলনায় 'বস'-র ব একটু ওকার-ঘেঁষা, ওইটুকু 'বইস'-র লুপ্ত 'ই'র স্বীকৃতি ; যেমন হ'ল-র ওকার ঘেঁষা 'হ'-এ হইল-র লুপ্ত ই-র স্বীকৃতি। 'বইস' পোষাকীতে আজকাল অচল।

উচ্চারণ-সৌকর্য্য

ধ্বনিসংক্ষেপের খাতিরে চলতি বাংলার বিবর্ত্তনের সূত্রগুলিকে পোষাকী বাংলা যত সহজে গ্রহণ করেছে, উচ্চারণ-সৌকর্য্যের খাতিরে ততটা পারেনি। ধ্বনির সাশ্রয় হচ্ছে না এমন কোনো প্রয়োজনে প্রচলিত বানান বর্জ্জন করা পোষাকী বাংলার ধাত নয়। তা সত্ত্বেও চলতি বাংলার প্রভাব এক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ কাটিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। প্রত্যেকটি সূত্র ধ'রে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সূত্রগুলির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ খুব সাধারণ ভাবে করব।

ই-র পরেকার আ এ হয়। বিশা-বিশে, একুইশা-একুশে, বাইশা-বাইশে, এমনি ক'রে

একত্রিশা-একত্রিশে, বত্রিশা-বত্রিশে। তারিখ বোঝাতে শা আর পোষাকীতে চলে না। অভিধানে মিনষা পাচ্ছি কিন্তু কথাটার ব্যবহার কোথাও দেখিনি, পোষাকী-আটপৌরে নির্ব্বিশেষে মিনষেই চলে। প্রাচীন বাংলায় এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে বিটকাল পোষাকীতে বিটকেল বিহিত বানান। বিটলা-বিটলে, ছিঁচকা-ছিঁচকে, একারান্তই বেশী চলে। কিরাতক-চিরাতা-চিরেতা, চিরেতাই বেশী চলে। মেসো যদি চলতে পারে ত পিসেই বা কি দোষ করল, ওটাও ক্ষেত্রবিশেষে চলে। চিটেগুড়, ছিনেজোঁক, নিদেনপক্ষে, চিলেকোঠা, গিলে করা, ভিয়েন, পোষাকীতে দেখছি। এমন আরও কিছু কিছু আছে।

ক্রিয়াপদে মধ্যম পুরুষ ভবিষ্যতের 'বা' অনেক দিন হ'ল পূর্ব্ববর্ত্তী ই-র টানে 'বে' হয়ে গিয়েছে। করিবা, দেখিবা, দিবা কেউ আর এখন লেখেন না। মধ্যমপুরুষ ক্রিয়া-বিভক্তিগুলির লা ঠিক এইরকম করেই লে হয়ে গিয়েছে। পোষাকী বাংলার ক্রিয়াপদের উপরে চলতি বাংলার এত স্পষ্ট এবং ব্যাপক প্রভাব আর কোথাও পড়েনি।

এর বাইরে পোষাকী বাংলা সূত্রটিকে আর মানতে রাজি নয়। এজন্যে যদি তার সংস্কৃতের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন হয়, তাও স্বীকার। পিলা শোনায় না ভাল, পিলে লেখা চলে না, সুতরাং প্লীহা। বিয়া বা বিয়ে নয়, বিবাহ। খিদা বা খিদে নয়, ক্ষুধা। এ এক বিচিত্র ব্যাপার।

উ-র পরেকার আ ও হয়। চুনোপুঁটি, কুচো চিংড়ি, শুখো চাকর, উড়ো খবর, দুয়ো দেওয়া, ভুয়ো, ঠুঁটো জগন্নাথ, ছুঁচো, মুলো, পোষাকীতে চলে দেখেছি। সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর গোড়া থেকেই ঐ রূপ। লুটাপুটি, হুটাপাটি ক'জন লেখেন? পোষাকীতে লুটোপুটি, হুটোপাটিই চলে; মুখোমুখি, ঘুঁষোঘুঁষি, চুলোচুলি, লুকোচুরি লিখলেও নম্বর কাটা যায় না।

কিন্তু বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। এর বাইরে পা বাড়াতে পোষাকী বাংলার মারাত্মক রকম আপত্তি। আ-কে ও করতে নারাজ ব'লে সে ছেঁদা দেখতে পায়, ফুটা দেখতে পায় না; নুড়া জ্বালতে পারে না, মুড়া ঝাঁটা ব্যবহার করতে পায় না। বাস্তবিক, আজকের দিনের অধিকাংশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মীর মত পোষাকী বাংলার কিসে যে জাত যায় আর কিসে যে যায় না বুঝতে পারা দস্তরমত শক্ত।

উ-র পরেকার অ এবং আ, কখনো বা প্রথমতঃ ও হয়ে কখনো বা সোজাসুজি উ হয়। উঁচা-উঁচু, দুপর-দুপুর, উকারের বানানটাই বেশী চলে। শুদ্ধ থেকে পূর্ব্ববঙ্গে এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন বাংলায় শুধা, তার থেকে শুধু, চলতি বাংলারই ধ্বনিবিকৃতির রূপ, পোষাকীতে খুব চলে; কিন্তু সুদ্ধ (সার্দ্ধম্, সহিত অর্থে) থেকে পূর্ব্ববঙ্গে ও হিন্দীতে সুদ্ধা, চলতি বাংলায় সুদ্ধু, সুদ্ধু পোষাকীতে অচল! উনান-উনুন দুটোই পোষাকীতে চলে, কিন্তু কুড়ুল চলে না, লিখতে হয় কুড়াল। ডুবডুব-ডুবুডুবু দুইই চলে, আবার চুমা-চুমু, রুখা-রুখু কোনোটাই চলে না, চলে চুম্বন, রুক্ষ। ঔষধ (ওউষধ)-ওষুধ পোষাকীতে চলে।

ই ঈ আগে থাকলেও অ আ ক্বচিৎ উ হয়, যেমন নীচা-নীচু, নিবনিব-নিবুনিবু। উ-র বানানটাই পোষাকীতে আজকাল বেশী চলছে।

ই ঈ বা ইয়া-জাত এ পরে থাকলে মাঝের অ আ ও তিনটি স্বরধ্বনিই উ হয়। আঁটনি-আঁটুনি, গাঁথনি-গাঁথুনি, বাঁধনি-বাঁধুনি, কাঁদনি-কাঁদুনি, আখটি-আখুটি, আগরি-আগুরি, কারচোবি-কারচুবি, ফক্কড়ি-ফক্কুড়ি, ফুলরি-ফুলুরি, সেমই-সেমুই, কাঁকই-কাঁকুই, নব্বই-নব্বুই, ছয়ই-ছউই, নয়ই-নউই,

চুলকানি-চুলকুনি, চড়াই-চড়ুই দুটি ক'রে বানানই পোষাকীতে চলে। বকুনি, টিপুনি, গাজুরি, খাটুনি, খিঁচুনি, এ কথাগুলির পোষাকী রূপ ব'লে আলাদা কিছু নেইই মোটে। অম্বরী-অম্বুরী, জহরী-জহুরী, কোলাকোলি-কোলাকুলি উকারের বানানটাই একমাত্র চলে। গলবাহিকা-গলই-গলুই, বর্বরী-বাবই-বাবুই-এর বেলাতেও তাই। পুরোহিত-পুরোইত-পুরুত, উকারের মধ্যে লুপ্ত ই-র স্বীকৃতি। আরবী হরাই-হাওয়াই-হাউই (পূর্ব্ববঙ্গে হাঅই), হলরাই-হালুই (পূর্ব্ববঙ্গে হালই) ; কিন্তু হরীতকী থেকে পাওয়া হত্তুকি পোষাকীতে চলে না। মুরব্বির চেয়ে মুরুব্বি, মুহর্‌রীর-মুহরীর চেয়ে মুহুরী, ববরচী-বাবর্চ্চীর চেয়ে বাবুর্চ্চী, মুলতবীর চেয়ে মুলতুবী, মুৎসদ্দীর চেয়ে মুচ্ছুদ্দী, চিরণীর চেয়ে চিরুণী, ধুনচির চেয়ে ধুনুচি, ডুবারীর চেয়ে ডুবুরী বোধহয় ত বেশীই চলে। কিন্তু কেবল সুপারি চলে, সুপুরি অচল। উড়ানী-উড়ুনী, ঘুঁটেকুড়ানী-ঘুঁটেকুড়ুনী, উকার দিয়ে বানান পোষাকীতে বড়-একটা দেখা যায় না।

বিচালির বিচুলি, পিটালির পিটুলি, নিদালির নিদুলি একেবারে চলে না, কিন্তু পিটানি অচল, পিটুনি লিখতে হয়।

ইয়া প্রত্যয় ছেড়ে যেখানেই চলতি বাংলার 'এ' প্রত্যয়কে পোষাকী বাংলা গ্রহণ করেছে, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তনের এই সূত্রটিকে মান্য ক'রেই তা করেছে। কীর্ত্তনিয়া-কীর্ত্তুনে, উত্তরিয়া-উত্তুরে, বাহাত্তরিয়া-বাহাত্তুরে, আটপহরিয়া-আটপৌরে, হিংসাটিয়া-হিংসুটে। ঝগড়াটে-র প্রয়োগ দেখেছি।

সামনে-পিছনে ই থাকলে মাঝের আ ই হয়। যেমন: পাইকারী-পাইকিরী, ভিখারী-ভিখিরী, জিলাপি-জিলিপি। ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের এই সূত্রটির প্রভাব পোযাকী বাংলার উপরে বিশেষ পড়েনি। গিটকিরি কেউ কেউ পোষাকীতেও লিখে থাকেন।

অ আ এ ও পরে থাকলে ই এ হয়। দীপরক্ষ থেকে দেরকো, দীপাবলী থেকে দেওয়ালী চলতি বাংলারই নিজস্ব এবং নিজের স্তরের কথা, পোষাকীতে চলছে। বিদেশাগত অসংখ্য শব্দের ই গোড়া থেকেই এ হয়ে পোষাকীতে চলছে: একরার, একতার, চেরাগ, এজমালী, এজাহার, জেহাদ, মেহেরবান, রেওয়াজ, রেকাব, রেয়াত, সেরেফ, জেয়াদা, মেয়াদ, কেতাব, এওজ, এস্তেজার, এজলাস, এলেম, কেচ্ছা, কেতা, খেয়াল, খেলাত, খেসারত, জেরা, তেজারত, জেল্লা, দেওয়ান, দেওয়াল, ফেরার, নেহাত, বেলোয়ারী, মেথর, পেয়াদা, পেয়ালা, পেঁয়াজ, মেরজাই, মেরাপ, মেহনত, রেহাই, রেহান, হেপাজত, কেরায়া, হেনা প্রভৃতি শব্দের গোড়ার এ এবং একার মূলতঃ ই এবং ইকার। বোধহয় ইংরেজীতে Zilla চলছে ব'লে জিলা-জেলা দুইই পোষাকীতে চলে। ইদানীং থেকে এদানী, পোষাকীতে লিখলে কেউ মারতে আসবে না। বিঘোর-বেঘোর, বিহার-বেহার, ফিরত-ফেরত, ফিরি-ফেরি, দুটো ক'রে বানানই পোষাকীতে চলে। তিতা, গিরার জায়গা বহুদিন হল তেতো গেরো দখল করেছে কিন্তু ভেতর, পেছন, পেতল, সেপাই এক্কেবারে অচল!

ক্রিয়াপদগুলি পোষাকী বাংলার খাস দখলের জিনিষ, সেগুলির অবস্থাটা কিপ্রকার তা দেখা যাক।

একস্বর ধাতুগুলির ইকার চলতি বাংলার প্রভাবে কতগুলি জায়গায় পোষাকী বাংলাতেও একার হয়ে গিয়েছে, খুব অল্প লোকেই আজকাল সেসব জায়গায় ইকার ব্যবহার ক'রে থাকেন। যেমন: সে কেনে, ছেঁড়ে, মেশে ; তুমি কেন, ছেঁড়, মেশ ; কেনা, ছেঁড়া, মেশা। দ্বিস্বর ধাতুর ওপর এ প্রভাব

পড়েনি, যেমন, কিনাও, ছিঁড়াও, মিশাও; কিনানো, ছিঁড়ানো, মিশানো। কিন্তু লিখাও লেখাও, লিখানো-লেখানো, দুরকম চলে, তার কারণ, বাংলায় লিখ্ এবং লেখ্ এই দুই ধাতু। কতগুলি বিভক্তি কেবল একটাতে, কতগুলি বিভক্তি কেবল অন্যটাতে, এবং আর কতগুলি দুটোতেই যুক্ত হয়। লিখিয়া-লেখিয়া, কিন্তু শুধু লেখা, লিখা নয়। লিখান-লেখান, কিন্তু লেখক, লিখক নয়। লিখিত, লেখিত নয়।

দ্বিস্বর ধাতুর ইকার সম্বন্ধে চলতি বাংলা কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত মন স্থির ক'রে উঠতে পারেনি। অতি-বিবৃত অতি-সঙ্কুচিত দুটি স্বরধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পশ্চিমী বাংলার মারাত্মক রকম আপত্তি। অনেকগুলি ধাতুর বেলায় হয় ই রেখে আ-কে অ বা উ করা হয়, নয়ত আ রেখে ই-কে এ করা হয়। ফিরনো-ফিরুবে-ফেরানো। বিভক্তি যোগ হয়ে আ লোপ হয়ে গেলে আপদ্‌ই গেল, ফিরিয়েছে, ফিরিয়েছিল, ফিরিও।

অ আ এ ও পরে থাকলে উ ও হয়। কুট-খুঁটা-খোঁটা, তুষ্কার-তুমার-তোমার, কুদ্দাল-কুদাল-কোদাল, ধূম-ধুমা-ধোঁওয়া, ওকার নিয়েই পোষাকী বাংলার সুরু, মাঝের রূপগুলি পশ্চিমেতর বাংলায় এখনও চলে। অসংখ্য বিদেশী শব্দের উ সুরু থেকেই ও হয়ে আছে, যেমন, ওজর, ওরফ, কোরবানি, কোরাণ, কোর্ত্তা, খোদা, খোঁয়ারি, খোরাক, খোলসা, খোবানি, খোসামোদ, গোমস্তা, গোসল, গোসা, গোলাব, গোস্তাকী, চোগা, চোস্ত, জোলা, জোলাপ, তোকমারি, তোড়া, তোফা, দোকান, পোক্ত, পোস্তা, বোঁচকা, মোরগ, মোলাকাত, মোলায়েম, মোল্লা, মোসাহেব, রোকা, লোকসান, সোপরদ্দ, মোকাবিলা, মোক্তার, মোগল (সম্প্রতি দু-এক জায়গায় মুঘল প্রয়োগ দেখছি), মোকররী, মোতাবেক, মোতায়েন, মোদ্দা, মোহর, পোলাও।

তুখড়-তোখোড়, ভুখাছানি-ভোচকানি, দুআনি-দোআনি, দুতলা-দোতলা, দুচালা-দোচালা, দুটানা-দোটানা, দুমনা-দোমনা, দুভাষী-দোভাষী, যে কোনো একটি বানান লিখলেই চলে। দুপাটীর চেয়ে দোপাটী বেশী চলে। দোকর, দোতরফা, দোপাট্টা, দোফলা, দোবারা, দোরোখা, দোশাল এগুলোর উকার বানান অভিধান থেকেই উঠে গিয়েছে। উঞ্ছ-ওঁছা, উছুট-হোঁচট, সুগন্ধ-সোঁদা লেখা যায়। কিন্তু উপরকে ওপর বা উলট-পালটকে ওলটপালট লিখবার জো নেই।

উকারান্ত একস্বর এবং দ্বিস্বর ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার পোষাকী বাংলায় হুবহু একস্বর এবং দ্বিস্বর ইকারান্ত ক্রিয়াপদগুলিরই মত। দ্বিস্বর ধাতুগুলিতে ধ্বনিপরিবর্ত্তনের এই সূত্রটিকে মান্য ক'রে উপরন্তু অনেকে গোছাইতে, শোনাইয়া ইত্যাদি লেখেন। ইকারান্ত ধাতুর বেলায় ফেরাইতে, চেনাইয়া চলে না। ণিজন্ত হলে কতগুলি ধাতুর উ পোষাকীতে ও হয়েই যায়, যেমন খুঁড়্ খোঁড়া, খুদ্-খোদা, চু-চোয়া, জুড়্-জোড়া, দু-দোয়া, ধু-ধোয়া, নু-নোয়া, শু-শোয়া। চলতি বাংলায় এগুলির সম্বন্ধে হুবহু একই রকম দুমনা ভাব। হয় উ-কে অবিকৃত রেখে আ-কে অ বা উ করা হয়, নয়ত আ-কে অবিকৃত রেখে উ-কে ও করা হয়। ঘোরাচ্ছে-ঘুরচ্ছে-ঘুরুচ্ছে।

এ-র পরবর্ত্তী আ ক্বচিৎ এ হয়। যেমন, সেখানে-সেখেনে, আদেখলা-আদেখলে। এ সূত্রের প্রভাব পোষাকীতে পড়েনি। খেলানা-খেলেনা দুইই এখন অচল, সর্ব্বত্র খেলনা চলে।

ও-র পরবর্ত্তী আ ক্বচিৎ অ বা ও হয়। খুলাসহ্>খোলাসা-খোলসা, গোলহ্‌অন্দাজ>গোলান্দাজ-গোলন্দাজ, দুটো বানানই পোষাকীতে চলে।

এ-র পরবর্ত্তী আ কচিৎ অ বা ও হয়। যেমন ডেঙ্গা-ডেঙ্গো, লেংটা-নেংটো, নেওটা-নেওটো। পোষাকী বাংলার উপর এ সূত্রেরও প্রভাব বিশেষ পড়েনি, যদিও তিতা থেকে তিত-তেতো এবং গিরা থেকে গেরোতে উত্তীর্ণ হতে এরও শরণাপন্ন হতে হয়।

ই পরে থাকলে এ কচিৎ ই হয়। দেশী-দিশী, বিলাতী-বিলিতী। পোষাকী বাংলা এ সূত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত।

ই পরে থাকলে ও কচিৎ উ হয়। রোগী-রুগী, গোষ্ঠী-গুষ্টি। এ সূত্রেরও প্রভাব থেকে পোষাকী বাংলা মুক্ত, যদিও রোহিত>রুই ধরণের কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের ও উ হয়েই সুরু হয়েছিল।

ও পরে থাকলে এ কচিৎ আ হয়। দেও-দাও, নেও-নাও, দুটো বানানই পোষাকীতে আজকাল চলছে।

উচ্চারণ-সৌকর্য্যের খাতিরে চলতি বাংলায় স্বরধ্বনির যে-সমস্ত অদলবদল হয় তার প্রায় সবগুলি সূত্র নিয়েই আলোচনা করা গেল। দেখা যাচ্ছে, এখানেও চলতি বাংলার সঙ্গে পোষাকী বাংলার তফাৎ অপেক্ষাকৃত বেশী হলেও খুব মারাত্মক কিছু নয়। অল্প-সংখ্যক কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে পোষাকী বাংলা, ইংরেজীতে যাকে বলে sensitive, তাই একটু বেশী, এই পর্য্যন্ত। বরঞ্চ, ধ্বনি-সংক্ষেপের সূত্রগুলির চেয়ে উচ্চারণ-সৌকর্য্যের সূত্রগুলির প্রভাব পোষাকী বাংলার ক্রিয়াপদগুলির ওপর অনেক বেশী ব্যাপকভাবে পড়েছে। ক্রিয়াপদগুলিই যে পোষাকী গোঁড়ামির প্রধান অবলম্বন সে ত জানাই কথা।

অকারণ বিকৃতি

চন্দ্রবিন্দু প্রসঙ্গে অকারণ চন্দ্রবিন্দু নিয়ে আলোচনা করেছি। চলতি বাংলার চন্দ্রবিন্দু-প্রীতি পোষাকী বাংলায় কি গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তাও দেখিয়েছি। উপরে উচ্চারণ-সৌকর্য্যের যে-সমস্ত সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হ'ল সেগুলিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, কতগুলি স্বরধ্বনির চেয়ে অন্য কতগুলি স্বরধ্বনি সম্বন্ধে পশ্চিমী বাংলার পক্ষপাতিত্ব এমনিতেই একটু বেশী। অতি-বিবৃত এবং অতি-সঙ্কুচিত ধ্বনিগুলির চেয়ে মাঝামাঝি ধ্বনিগুলি তার পছন্দ। অ এবং আ যত সহজে ও এবং এ হয়, এ এবং ও তত সহজে আ এবং অ হয় না। অন্যদিকে ই এবং উ যত সহজে এ এবং ও হয়, ও এবং এ তত সহজে উ এবং ই হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই পক্ষপাতের ফলেই অতি-বিবৃত এবং অতি-সঙ্কুচিত স্বরধ্বনিগুলি মাঝামাঝি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কয়েকটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রতি অতি মাত্রায় অনুরাগ এবং পদের আদিতে ভিন্ন অন্যত্র মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগ বশতঃও এই ধরণের রূপান্তর ঘটে। এই পরিবর্ত্তনগুলিকে জোর ক'রে উচ্চারণ-সৌকর্য্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না তা নয়, কিন্তু "অন্যধ্বনির প্রভাব নিরপেক্ষ পরিবর্ত্তন" ব'লে তবু এদের তারও মধ্যে একটা আলাদা ভাগেই ফেলতে হয়।

অ এ হয়। ফসাদ (সম্ভবতঃ ফাসাদ হয়ে) গোড়া থেকেই ফেসাদ। সর্-সেরা, রজাই-রেজাই, নখ্‌রহ্‌-নেকরা, জমাঅৎ-জমায়েত, ফতহ্‌-ফতে, একার বানান সুরু থেকেই চলছে। আরবী নশাতুন থেকে সম্ভবতঃ আগে নাশা হয়ে তারপর নেশা।

অ ও হয়। মণ্ডল>মোড়ল, ফারসীর লঙ্গর>নোঙর, ফারসীর কমর>কোমর, আরবীর

মহ্‌কম-মোক্ষম ওকার দিয়েই সুরু। মহন্ত-মোহন্ত, খস্তা-খোস্তা, গণা-গোণা, মহড়া-মোহড়া, মকাম-মোকাম, আলবলা-আলবোলা দুটো ক'রে বানান চলে। ঝরোকা, অঝোর, পটোল কেউ কেউ লিখছেন।

আ এ হয়। জন্নানহ্‌>জানানা-জেনানা, সলাম>সালাম-সেলাম, একার বেশী চলে। পোর্ত্তুগীজ তোয়াল্‌হা> তোয়ালা-তোয়ালে, ফারসী চমচহ্‌>চামচা-চামচে, গোড়া থেকেই কেবল একারের চলন। দেশী শব্দে খাংরা-খেংরা, খাঁদা-খেঁদা, একার বেশী চলে। চাঙাড়ি-চেঙাড়ি, চাটাই-চেটাই, আঠাল-এঠেল, সাঙ্গাত-সেঙাত, গাঁদা-গেঁদা, ছাতলা-ছেৎলা, যে-কোনো একটা লেখা যায়। করকরে, খরখরে, গনগনে, ঝরঝরে, টকটকে, তকতকে, টলটলে, তলতলে, থলথলে, ঢলঢলে, পানসে এই কথাগুলোর পশ্চিমেতর বঙ্গীয় রূপ করকরা, ঢলঢলা, পাংসা ইত্যাদি। তাই মনে হয় এগুলির পোষাকী স্তরের চেহারাটা আ প্রত্যয়ান্ত ছিল, ইয়া-প্রত্যয়ান্ত নয়। টাবা টেবো কি সূত্রে হয় জানি না; দুটোই পোষাকীতে চলে।

ই এ হয়। আখির গোড়া থেকেই আখের, অইশ-আয়েস, কায়িম-কায়েম, ইল্‌ম্‌-এলেম, গির্দ্‌-গের্দ, মানী-মানে, হস্ত্‌নীস্ত্‌-হেস্তনেস্ত, মুন্‌সিফ-মুন্‌সেফ। জিদ্দ্‌>জিদ-জেদ দুই চলে, বোধহয় জেদ বেশী চলে। দেশী শব্দে ঘির-ঘের, ফির-ফের, একারই একমাত্র চলে। মিল বিশিষ্টার্থে মেল, পোষাকীতেও চলে।

উ ও হয়। খুদ্‌-খোদ, গোড়া থেকেই ওকার। মুস্‌লিম-মোস্‌লেম দুই চলে। দিলখুশ দেলখোশ।

ল-এর জায়গায় ন। লোলক সুরু থেকেই নোলক। আরবী অভাবাত্মক 'লা' বাংলায় ধ্বনি-পরিবর্ত্তন সূত্রে 'না' হয়েছে, নয়ত আমরা নিজেদের অভাবাত্মক উপসর্গ বিদেশী কথার সঙ্গে জুড়েছি, যেমন, লাচার-নাচার, লাখেরাজ-নাখেরাজ। নোনতা, নাগাদ (লিগাইৎ), নাগাল (প্রাচীন বাংলায় লাগ—অসমীয়ায় লগ, পূর্ব্ববঙ্গে লাগল), নোয়া, নুন, নোনা, নোঙর (ফারসী লঙ্গর), নেংচানো (সংস্কৃত লঙ্গ্‌ ধাতুজ), এর কোনোটিতেই পোষাকী বাংলায় ল চলে না। উলঙ্গ হইতে লেঙ্গট চলে, কিন্তু নেংটি। নোটন পায়রা, নাড়ু, নাল পড়া চলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলিত উপাধি নস্কর আসলে লস্কর।

র-এর জায়গায় ড়। কোঁড় (অঙ্কুর বা কোরক থেকে), চুমকুড়ি (হিন্দী চুমকার থেকে), সড়ক (কথাটা সংস্কৃত সংসরক থেকে), সুড়ঙ্গ (সংস্কৃত সুরঙ্গ), ভোঁদড় (উদ্র), খিচুড়ি (খেচরান্ন), তাড়াতাড়ি (ত্বরা), শাশুড়ী (শ্বশ্রূ), কড়ার (আরবী করার), এই কথাগুলির ড় অকারণ, কিন্তু পোষাকীতে ড়-ই আবহমান কাল চলেছে। মরক-মড়ক, করচা-কড়চা, তুরুম-তুড়ুম, টেরা-টেড়া বা তেরা-তেড়া (তির্য্যক্‌ থেকে), নেয়ার-নেয়াড়, (হিন্দী নেওয়ার থেকে), পোষাকীতে চলতিরই মত দুটো বানানই চলে, কিন্তু ড় অকারণ।

ল-এর জায়গায় ড়। চঞ্চালী গোড়া থেকেই চেঁচাড়ী। কলায়>কলাই-কড়াই, আদুল-আদুড়, কোন্‌টা যে ঠিক বানান জানি না, দুটোই পোষাকীতে চলতে পারে। এলোপাথাড়ি হয়ত মূলে এলোপাথালি, যেমন আথালিপাথালি; (প্রাকৃত উথল্ল পথল্ল)।

পদের আদিতে ভিন্ন অন্যত্র মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগঃ রফু>রিপুকর্ম্ম, তফ্‌সিল>তপশিল, আফ্‌সোস>আপশোষ, বাজয়াফৎ>বাজেয়াপ্ত, দফ্‌তর>দপ্তর, সিফারিশ>সুপারিশ, জভা>জবাই, কমবখ্‌ৎ>কমবক্ত, জুল্‌ফ্‌>জুলপি, ইখ্‌তিয়ার>এক্তার, তখ্‌তহ>তক্তা, চর্‌খহ্‌>চরকা,

সফ>সপ (বড় মাদুর),বখ্সী>বক্সী, পুখ্তহ্>পোক্ত, তুখ্ম্-ই-রৈহান>তোকমারি, মস্খরহ্>মস্করা, গুস্তাখী>গোস্তাকি, ফারসী নখ থেকে লখ-লক (লক কাটা ঘুড়ি), তস্নস্ থেকে তছনছ-তচনচ, মুঘল-মোগল, হিফাজিত>হেফাজত-হেপাজত, অফিস-আপিস, মুআফ>মাফ-মাপ, অলগ্সে>আলগোছে-আলগোচে, দুরকম বানানই পোষাকীতে চলে। ফস্খ্>ফস্কা, খোয়ামখোআ>খামকা, কলফ>কলপ, গোড়া থেকেই মহাপ্রাণ বাদ দিয়ে চলছে। দেশী শব্দে স্কন্ধ>কাঁধ, কিন্তু কলার কাঁদি, কেঁদো বাঘ। ঘুঙ্ঘুর-ঘুঙ্গুর-ঘুঙুর, গোঁফ-গোঁপ, সুখতলা-সুকতলা, ভেখ-ভেক (ভৈক্ষ্য), লুঠপাট-লুটপাট, গাঁঠ-গাঁট (গ্রন্থি থেকে), হঠিয়া-হটিয়া (সংস্কৃত হঠ্ ধাতু), পুঁঠিমাছ-পুঁটিমাছ (প্রোষ্ঠী), শুঁঠ-শুঁট (শুণ্ঠি), গাঁধাল-গাঁদাল, পালখ-পালক, শাঁখচুন্নী-শাঁকচুন্নী, শেঁখোবিষ-শেঁকোবিষ, বখাটে-বকাটে, তিরিক্ষি-তিরিক্কি, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা-ঘোগের বাসা, মেছেতা-মেচেতা, চাঁছা-চাঁচা, গচ্ছা-গচ্চা, পোঁছ-পোঁচ, ওঁছা-ওঁচা, (বন্ধ্যা) বাঁঝা-বাঁজা, (সন্ধ্যা) সাঁঝ-সাঁজ, মেঝে-মেজে, আঠাল মাটি-আটাল মাটি, (বণ্ঠ) বেঁঠে-বেঁটে, কাঠরা-কাটরা, ডালমুঠ-ডালমুট, গাঁঠরি-গাঁটরি, জাঠ-জাট, হঠ ক'রে-হট ক'রে, গিঁঠ-গিঁট, ওষুধ-ওষুদ, আফসানো-আপসানো, ফোঁফানো-ফোঁপানো, জিভে গজা-জিবে গজা, দুটো বানানই পোষাকীতে চলছে। ঝর্ঝর-ঝাঁজর, প্রাচীন বাংলায় ফাঁফর হয়েছে ফাঁপর, ঝাঁঝা করার ভাব ঝাঁজ, পিষ্টক>পিঠা, কিন্তু পিটালি। ষষ্টি>ষাট, ষষ্ঠী>ষাঠ, ষেঠের কোলে, কিন্তু বালাই ষাট ষাট। মধ্য>মাঝ, কিন্তু মাজা, মেজো। এখো গুড়, কিন্তু আক।

হ বেচারার ত দুর্গতির একশেষ, তাকে আর এখন কেউ পোছে না। আহিস্তা গোড়া থেকেই আস্তে, সুরাহী সুরাই। বহানাহ্-বাহানা এখন বায়না, সহীহ্-সহি এখন সই, বহী-বহি বই, আলাহ্দা-আলাহিদা এখন আলাদা। দেশী শব্দে পঁহুছা এখন পৌছা, গোহাল গোয়াল, ডাহিন ডান, ডাহিনে ডাইনে, দুইপহর-দুপর দুপুর, রুহী রুই, ঠাহরানো-ঠাওরানো, দহি দই। বেহাই বেহান অনেক ক্ষেত্রেই বেয়াই বেয়ান, আটপহরিয়া আটপহুরে হয়ে তারপর আটপৌরে। কেহ-কেউ।

ক্রিয়াপদগুলিতে নহে-নয়, নহ-নও, নহি-নই ; কহ্, রহ্, বহ্, সহ্, গাহ্, নাহ্ প্রভৃতি ধাতুর বর্ত্তমান নিত্যবৃত্তের রূপগুলি আর কহি, সহ, গাহে নেই, কই, সও, গায় হয়ে গিয়েছে। কৃদন্ত রূপগুলিতেও মহাপ্রাণ এখন বিবর্জ্জিত, কহা, সহা, গাহা আর কেউ লেখে না।

পদের আদিতে মহাপ্রাণ বর্জ্জনের একমাত্র উদাহরণ যা মনে আসছে তা হচ্ছে ধাত্রী>ধাই-দাই।

মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগ যেমন আছে, অনুরাগেরও অভাব নেই। পদের অন্তে হসন্ত ব্যঞ্জন থাকলে মাঝের ই উচ্চারণ চলতি বাংলার বড় একটা ধাতে নেই, তাই আরবী সাইস কথাটা হয়েছে সহিস। ফারসী চাহবাচ্চ্ থেকে চৌবাচ্চা ; অনেকে লেখেন চৌবাচ্ছা। বাচ্চা কথাটাও ফারসী, বোধহয় সংস্কৃত বৎস শব্দের অপভ্রংশ মনে ক'রে সেটাকে অনেকে বাচ্ছা ক'রে দেন। সংস্কৃত অষ্ঠক, প্রাকৃতে অট্ঠঅ, তার থেকে প্রাচীন বাংলায় আঁঠু, কিন্তু পোষাকী-চলতি দুয়েরই হাঁটু। উচ্চাটন থেকে প্রাচীন বাংলার উছট, পোষাকী-চলতি দুয়েতেই হোঁচট। হাঁপানি, হাঁপানো, কিন্তু হাঁপ মাঝে মাঝে হাঁফ হয়ে যায়। কন্টকী>কাঁটাল হয় কাঁঠাল, ধুন্দুল-ধুঁদুল হয় ধুঁধুল। নির্ব্বাণ থেকে, নিবিয়া-নিভিয়া। ক্লাইব-ক্লাইভ, এবং সম্ভবতঃ ইংরেজীতে V দিয়ে লেখা হয় বলে মৌলবী (আরবী মৌল্বী) কারও কারও হাতে প'ড়ে মৌলভী হয়ে যায়। ঘর্ম্মচর্চ্চিকা-ঘামাচি হয় ঘামাছি, পক্ষের কাজ হয় পঙ্খের কাজ, পুঁতির মালা হয় পুঁথির

মালা, ভীমরতি হয় ভীমরথী। যে কথাটার হওয়া উচিত ছিল চাঁদনাতলা, সেটা ত সুরু থেকেই ছাঁদনাতলা হয়ে ব'সে আছে।

চলতি বাংলার আরও অসংখ্য ধ্বনি-বিকৃতি পোষাকী বাংলায় হয় সুরু থেকেই গৃহীত হয়েছে, নয় ত দ্রুতগতিতে গৃহীত হয়ে চলেছে। খট্টাশ অপভ্রংশের নিয়মে হওয়া উচিত ছিল খাটাশ, চলতির প্রভাবে হয়েছে খটাশ। পূর্ব্ববঙ্গে যে-কথাটা সাজ, হিন্দীতে অসমীয়াতে সেটা সাঁচ, রামপ্রসাদী গানে আছে সাঁচ, কিন্তু পোষাকী-চলতি দুয়েতেই সেটা ছাঁচ। ছাঁচিপান, ছুতার, জলছত্র, ছেঁকা, ময়দাছানা, আলগোছে, তছনছ, মিছরি, ছুঁচ, আকছার, ছয়লাপ, তছরুপ, প্রভৃতি স-শ ছ হবার নমুনা। কলগা>কলকা, চুগল>চুকলি, খরাব>খারাপ, রৱং-রপ্ত, ছাদ-ছাত, আদবে-আদপে, মজুত, গোলাপজল, চুপড়ি, বুজরুক প্রভৃতি বর্গের তৃতীয় বর্ণ প্রথমবর্ণে রূপান্তরিত হবার নমুনা। এছাড়া প্রথমবর্ণ তৃতীয়বর্ণে রূপান্তরিত হয়, ক্ষ খ হয়, গ ব হয়, ঙ্গ ঙ হয়, ঙ্গ ং হয়, য জ হয়, ত ট হয়, দ ড হয়, ধ ঢ হয়, দেশজ তদ্ভব ও বিদেশাগত শব্দের ণ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাদের জায়গায় ন-এর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ন ম হয়, ফ ব হয়, ব ম হয়, শ ষ স নিয়ে যথেচ্ছাচার চলতি-পোষাকী দুরকম বাংলাতে পাল্লা দিয়ে চলে, এবং খুসিমত বিসর্গের লোপ হয় অথবা হয় না। এক কথায় বলতে গেলে বানান সম্বন্ধে চলতি বাংলা এবং পোষাকী বাংলা এখন প্রায় সমান নিরঙ্কুশ, এবং পোষাকী এবিষয়ে চলতিরই হাতধরা।

এইভাবে যদি চলতে থাকে ত আর কিছুকাল পরে ক্রিয়াবিভক্তিতে ই আগম ভিন্ন পোষাকী বাংলার নিজস্ব পোষাক বলতে কিছু আর বাকী থাকবে না। ই-ও সর্ব্বত্র না থাকতে পারে।

ধ্বনিপরিবর্ত্তনের উদাহরণগুলিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, পদমধ্যবর্ত্তী ই-র পরে হসন্ত ব্যঞ্জন থাকলে ই-র মায়া কাটানো পোষাকী বাংলার পক্ষে বেশ সহজ হয়, স্বরান্ত ব্যঞ্জন পরে থাকলে হয় না, যেমন ডাইল-ডাল, কিন্তু খাইব। পোষাকী বাংলার বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান ধারাটা লক্ষ্য ক'রে দেখলে মনে হয়, যে, তা সত্ত্বেও কালক্রমে অসমাপিকার ইয়া য়ে হয়ে যেতে পারে। শুইত-শুত হইল-হল ধুইতে-ধুতে খাইব-খাব হয়ে যেতে পারত, যদি করব, ধরল শুনতে ইত্যাদির হসন্ত ব্যঞ্জনের সমস্যাটার সেই সঙ্গে উদয় না হ'ত। এমন স্বরধ্বনির বিলোপ সাধন করতে পোষাকীর সবচেয়ে বেশী বাধে যাতে পদের মাঝখানে হসন্ত ব্যঞ্জনের উদ্ভব হয়। অবশ্য ভবিষ্যতের পোষাকী বাংলা লিখিয়েরা করিব শুনিব-র পাশেপাশে হব খাব যদি চালিয়ে দিতে চান এবং দেন ত তাঁদের নামে কেউ মামলা দায়ের করবে না ব'লে আমার বিশ্বাস।

ক্রিয়াপদের কয়েকটি ব্যঞ্জন-বিধৃত স্বরধ্বনি ভিন্ন পোষাকীর আলাদা পোষাক বলতে শেষ অবধি কিছু যদি আর না-ই থাকে ত সেটাকেই আমি আমাদের ভাষার সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় পরিণাম ব'লে মনে করব। কেন করব, তার কারণগুলো ব'লে শেষ করছি।

একদিকে, পোষাকী বাংলা একেবারে লুপ্ত হোক এটা সত্যই কামনা করি না। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে স্বরধ্বনি-বাহুল্যের, ধ্বনিপ্রবাহের একটানা শ্লথ মন্থর গতির যে সুর, চলতি বাংলার ব্যঞ্জন-ব্যাহত গতিচ্ছন্দে তা পাওয়া যাবে না। অবিমিশ্র চলতি বাংলায় কাব্যরচনার রেওয়াজ যুক্তি ক'রে যাঁরা সুরু করেছেন, তাঁরা এইদিক্ দিয়ে আমাদের একটুও বন্ধুর কাজ করছেন না। পোষাকী-চলতি না মিশালেই চলে না বলছি না, এ-বিষয়ে কবিদের স্বাধীনতা-হানির প্রতিবাদ করছি। বাংলা কাব্যে একেবারে দুটো

ভিন্ন জাতের স্বরলোকের সন্ধান যে আমরা পাচ্ছি, সে আমাদের মহা-সৌভাগ্য ব'লেই আমি মনে করি এবং এ সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষার এই বিশেষত্ব, যে, তার দুটো চাল, একটা শ্লথ গতির, একটা দ্রুত গতির ; একটা অব্যাহত গতির, একটা আস্কন্দিত গতির।

অন্যদিকে, ভাষার এই দুই চালের মধ্যেকার অকারণ ব্যবধান যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলাই সকলের লক্ষ্যণীয় হওয়া উচিত। এমন দিন আসতে বিশেষ দেরি নেই, যখন আমাদের দেশের নিরক্ষর বহু কোটী মানুষ আমাদের দেশের সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে দলে দলে পরিচয় সাধন করতে আসবে। একথা তারা না তখন ভাবে, যে, আমরা, তাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা, তাদের দেশের ভাগ্যবান্ বুদ্ধিজীবীরা, এতকাল ধ'রে এই ভাষাকে নিয়ে অথর্ব্বের মত কেবল পিণ্ডি পাকিয়েছি। বহু শত বৎসরের নিরক্ষরতার পর দুর্ব্বল বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে একটা ভাষা আয়ত্ত করতেই তারা বেশীর ভাগ হিমসিম খেয়ে যাবে ; দুই প্রস্থ ভাষা, দুই প্রস্থ অভিধান, দুই প্রস্থ ব্যাকরণ তাদের হাতে তুলে দেওয়া অতিবড় কৃতঘ্নতা হবে।

চলতি ভাষার নামেই প্রকাশ যে সেটা চলে, চলতি ভাষা চলছে, চলতি ভাষাই চলবে, এর গতিরোধ করা কারও সাধ্য হবে না। পোষাকী বাংলাকে নিতান্ত পুরুষ-পরম্পরাগত জামিয়ারের মতই তুলে রাখতে চাই, ওটা কবিদের ব্যবহারে লাগবে। দুটো ভাষার মধ্যেকার সব ব্যবধানই প্রায় তুলে দেব, যাতে ক'রে একটি ব্যাকরণ দিয়েই ভাষার দুটো চালকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বিশেষ্য-বিশেষণ সর্ব্বনাম অব্যয় সব এক হবে, কেবল ক্রিয়াপদে স্বরধ্বনি আগমের গোটা-দুই সূত্র করলেই পোষাকী বাংলাকে যতটা আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তার নিজের স্বধর্ম্মে ততটা সে বেঁচে থাকবে।

এই সমীকরণ নিয়তই হয়ে চলেছে, এরও গতিরোধ করা কারও সাধ্য হবে না। আরও সহজে এবং দ্রুতগতিতে এই সমীকরণ হতে পারত যদি চলতি বাংলা লিখিয়েরা এ বিষয়ে একটু সহায়তা করতেন। কিন্তু তাঁরা তা মোটেই করছেন না।

কয়েকটা কথা তাঁদের মনে রাখতে বলি। (১) চলতি বাংলায় যথেচ্ছ বানান চলতে পারে এ তাঁদের ভুল ধারণা। কোনো সভ্য, বুদ্ধিমান্ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জাতের ভাষাতেই বানানে যথেচ্ছাচার থাকা উচিত নয়। চলতি বাংলার বানানে যথেচ্ছাচার, সমীকরণের পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা। (২) পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা যে সাহিত্যের ভাষা ব'লে আসমুদ্র-হিমাচল বঙ্গদেশে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মাটির গুণে হয়নি, ভাষার নিজগুণে হয়েছে। (৩) অকারণ ধ্বনি-বিকৃতি এই ভাষার একটা গুণ নয়, ওটা একটা দোষ। (৪) উচ্চারণ-সৌকর্য্যের খাতিরে যে ধ্বনিবিকৃতি তারও একটা সীমা কোথাও থাকা দরকার। যেমন ধরুন ভিক্ষে। চলতিতেও ওটা চলা উচিত নয় এইজন্যে যে পরমুহূর্ত্তেই ভিক্ষাজীবী লিখতে হতে পারে। দিশি লিখতে রাজি আছি, যদি বিদিশি লিখবার অনুমতি পাওয়া যায় ; সেখেনকার লিখতে পারি না ব'লে সেখেনে লিখব না। কিন্তু কে এসব কথা শুনছে ? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার একটা গুণ ছিল, উচ্চারণ-সৌকর্য্যের খাতিরে তারও মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে। আমরা এমনই আয়েসী জাত যে ই-র পরে আ, উ-র পরে আ উচ্চারণ করতে ঠোঁটের মুখের মাংসপেশীর সঙ্কুচন-প্রসারণের যেটুকু মেহনত তাও করতে আমরা নারাজ। অ ত প্রায় সর্ব্বত্রই ও হয়ে গিয়েছে। অতিবিবৃত বা অতিসঙ্কুচিত স্বর মাত্রেরই উচ্চারণে আমাদের আপত্তি। (৫) কতগুলি বিকৃতি ভাষায় চ'লে গিয়েছে ব'লেই বাকীগুলিকে জোর ক'রে চালাতে হবে

তার কিছু মানে নেই। পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো গ্রাম্যতাই সাহিত্যের আসরে আসন পাবার যোগ্য, এও একটা ভুল ধারণা। (৬) চলতি বাংলায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করা চলে না, এও একটা ভুল ধারণা এবং এ ধারণা যে মানুষের মনে জন্মেছে তার জন্যে চলতি বাংলা লিখিয়েরাই প্রধানতঃ দায়ী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবৃত-ধ্বনি বর্জ্জন, বিসর্গ বর্জ্জন, মহাপ্রাণ-ধ্বনি বর্জ্জনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধ্বনিগুলিতে ভাষার গাম্ভীর্য্য বাড়ে। বাংলা একেই দুর্ব্বল ধ্বনির ভাষা, মহাপ্রাণ প্রভৃতি বর্জ্জন ক'রে এ ভাষাকে আরও আধ আধ, মানে আদো আদো, ক'রে তোলা দস্তুর মতন একটি অপকর্ম্ম।

এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা বানান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধান্তরে পরে করব।

অভিধান বনাম অন্বয়

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কিছুদিন পূর্বেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখিতাম। তাহার পিছনে ছিল আর-একটা ব্যাপক বিশ্বাস। আমরা ভাবিতাম, ব্যক্তি আপনাতেই আপনি পূর্ণ না হইলেও তাহার মূল্য স্ব-তন্ত্র,—অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ। একটি আত্ম-সম্পূর্ণ অর্থ লইয়াই সকল ব্যষ্টি পরস্পরে মিলিত হইয়া একটি সমষ্টি-সত্তা লাভ করে, ইহাকেই আমরা বলি সমাজ। সমাজ-সত্তার অর্থ তাই প্রায় সবটাই নির্ভর করে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তার উপরে এবং ব্যক্তি-সত্তার অর্থের টুকরাগুলি একত্রে যোগ করিলেই মিলিবে সমাজের অর্থ।

কিন্তু এখন মনে সংশয় আসিয়াছে,—চিন্তারও ধারা বদলাইয়াছে। এখন আবার যে বিশ্বাসটা মনকে বেশী করিয়া পাইয়া বসিতেছে তাহা এই—আমাদের সমাজ-সত্তাটাই আগের কথা, ঐটাই আসল, ব্যক্তির সত্তা পরে। সমাজই অংশী, ব্যক্তি অংশ। সমাজের একটা অখণ্ড সত্তা এবং অর্থ আছে। সেই অখণ্ড সত্তা এবং অর্থের সঙ্গে নিবিড় যোগেই আমরা লাভ করি আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের অর্থ এবং মহিমা।

প্রশ্নটা তাহা হইলে মোটামুটি গিয়া দাঁড়ায় এই—আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কি একটি অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অর্থ বা অভিধান আছে, না আগে আমরা একটা বৃহত্তর সমাজ-জীবনে নিবিড়ভাবে যুক্ত বা অন্বিত হই এবং সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়া আমাদের ব্যক্তিগত অর্থ বা অন্বয় ফুটিয়া বাহির হয়। আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমরা আগে অভিহিত হই, তারপরে পরস্পর অন্বিত হই, না আগে পরস্পরে অন্বিত হই এবং সেই অন্বয়ের যোগে প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিগত অভিধান।

এই প্রশ্নটিই আশ্চর্যভাবে দেখা দিয়াছিল আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-বিচারকগণের মধ্যে শব্দ ও বাক্যের অর্থ- নির্ধারণে। একদলের মত ছিল এই, এবং আজ পর্যন্তও আমাদের মধ্যে এইটাই প্রচলিত বিশ্বাস যে, প্রতিটি শব্দের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, সেই শক্তিবলেই সে স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করে। একটি বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা যে তাহার একটি অখণ্ড অর্থ দেখিতে পাই, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা প্রতিটি শব্দের যে স্বতন্ত্র অর্থ তাহারই সমবায়ে গঠিত। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসক্তির বন্ধনে যখন কতগুলি স্বতন্ত্র শব্দ গ্রথিত হয় তখনই তাহারা একটি বাক্য রচনা করে; এই বন্ধনের ফলে শব্দগুলির ভিতরে যে একটি অন্বয় সাধিত হয় তাহারই ফলে জাগে বাক্যের অখণ্ড অর্থ। অপর দলে বলেন ঠিক ইহার বিপরীত কথা; অর্থাৎ একটি বাক্যের ভিতরে কোন শব্দই একেবারে স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করে না; তাহারা প্রথমে পরস্পরে অন্বিত হয় এবং সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়াই তাহারা খুঁজিয়া পায় তাহাদের নিজ নিজ অর্থ। তাহা হইলে দাঁড়াইল গিয়া সেই একই প্রশ্ন, বাক্যের ভিতরে শব্দগুলি প্রথমে অভিহিত হইয়া অন্বিত হয়, না, প্রথমে অন্বিত হইয়া পরে অভিহিত হয়। কাব্য-বিচারকগণ প্রথমোক্ত দলের নাম দিয়াছেন অভিহিতান্বয়বাদী, দ্বিতীয় দলের নাম দিয়াছেন অন্বিতাভিধানবাদী।

বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদের ভিতরে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা ইহা লইয়া বচসাই চলিতেছে,—আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি নাই। হয়ত ইহার কোনটাই একক সত্য নহে। কিন্তু তথাপি আজকাল আমাদের ঝোঁক সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। বৃহত্তর জীবনের এই সমাজতন্ত্রবাদই সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপ ধারণ করিয়াছে অন্বিতাভিধানবাদে। গদ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রবন্ধাদির বেলায় সংশয়ের অনেক অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষপাতিত্ব অন্বিতাভিধানবাদেরই দিকে।

আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকগণের মনকে এ-প্রশ্নটি নাড়া দিয়াছে বিশেষভাবে এবং এই জন্যে শব্দের 'অর্থ' সম্বন্ধে তাঁহারা করিয়াছেন অনেক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই সকল গবেষণার পরে তাঁহারা যে রায় দিয়াছেন সাধারণভাবে তাহাও এই অন্বিতাভিধানবাদেরই পক্ষে। তাঁহারা বলিয়াছেন, একটা একটা শব্দের 'অর্থ' বিশেষভাবে নির্ভর করে, তাহার অন্বয়ের (context) উপরে। এই 'অন্বয়' কথাটির ভিতরে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এই অন্বয় শুধু বাক্যগত শব্দগুলির সহিত একটা আপাত-সম্বন্ধ নহে। প্রত্যেকটি শব্দ তাহার ধ্বনির পক্ষে বহন করিয়া আনে অনেকখানি ইতিহাস; তাহার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভিতরে একটা বিশেষ যুগের একটা বিশেষ সমাজ-জীবনের বিবর্তন। একটি শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সহিত অন্বিত হয় তখন সে তাহার এই সমগ্র ইতিহাস লইয়াই জড়িত হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া কথা বলা যাক্। যেখানে বলা হইল—

'প্রেমেরি যমুনা বহিছে উজান।'

সেখানে চারিটি শব্দের যোগে একটি বাক্যার্থের যে অখণ্ড-প্রতীতি ঘটিয়াছে তাহা কিরূপ করিয়া লাভ করিলাম? প্রথমে অভিহিতান্বয়বাদের মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ত্র অভিধানিক অর্থ নির্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করুন— কোন অর্থ ই পাওয়া যাইবে না; আমার বিশ্বাস, তাহারা তাহাদের স্বতন্ত্র আভিধানিক অর্থ লইয়া আমাদের মনের ভিতরে সুষ্ঠুরূপে অন্বিতই হইবে না। এখানে প্রতিটি শব্দের যে অর্থমাধুর্য তাহা মুখ্যতঃ নির্ভর করিতেছে তাহাদের অন্বয়ের উপরে। সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়া শব্দার্থও একটি সুকুমার অভিধান লাভ করিয়াছে। শুধু এই অন্বয় নয়, এখানকার ব্যবহৃত 'প্রেম', 'যমুনা' প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি তাহাদের সহিত বহন করিয়া আনিয়াছে আমাদের বিশেষ একটি সমাজ-জীবনের অনেক সূক্ষ্ম ইতিহাস; সেই ইতিহাসই ইহাদের অন্বয়কে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক অন্বয়ের জন্যই আমাদের 'প্রেমের যমুনা' হয়, 'জ্ঞানের গঙ্গা' হয়—, 'প্রেমের গঙ্গা' এবং 'জ্ঞানের যমুনা' শুধু নিরর্থক নয়, আমাদের শ্রুতিপীড়াদায়ক। উপরি-উক্ত বাক্যটির অন্তর্গত 'বহিছে উজান' কথাটির প্রতিও লক্ষ্য করুন। 'উজান বওয়া' কথাটি এখানে তাহার কোন সাধারণ অভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—তাহারও একটি বিশেষ অর্থ আছে, এবং সে অর্থও নির্ভর করিতেছে তাহার অন্বয়ের উপরে।

একটা সমাজ-জীবনের ভৌগোলিক অবস্থানের উপরেও যে কাব্যের ভিতরকার শব্দের অর্থ নির্ভর করে সে কথাটাকে আমরা হয়ত সহসা মানিব না। কিন্তু যুক্তির ভিতরে সেরা যুক্তি দৃষ্টান্ত—তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। পদকর্তা গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

ইহার ভিতরে চিত্রবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যেটুকু অর্থ তাহা অখণ্ড। অখণ্ড বলিবার তাৎপর্য এই, ইহার অর্থকে প্রথমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ ভাগ করিয়া দেখিয়া পরে জুড়িয়া এক করা যায় না। সবটা জুড়িয়া এক হইয়া অবিভাজ্যরূপে একটি বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করিয়াছে, সেই অবিভাজ্য এক অংশীর অংশরূপেই প্রত্যেকটি কথার সার্থকতা। এই ত গেল শব্দগুলির পরস্পর অন্বয়ের কথা; তাহার পরেই আসিবে সমাজ-জীবনের সহিত তাহার অন্বয়ের প্রশ্ন। এই পংক্তিগুলির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন শুধু সেই মানুষ যে মানুষের একটি বিশেষ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে,—যে দেশে শ্রাবণের ঘনকৃষ্ণ মেঘ হইতে অবিরল ধারাবর্ষণে নীপকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিয়া সর্বাঙ্গে মুকুলের পুলক ধারণ করে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের সর্বাঙ্গ জুড়িয়া ভাবাবেগে ফুটিয়া ওঠে ফুল, তাহার বিহ্বল মধুগন্ধে সিক্ত বায়ু হয় মন্থর। এ দৃশ্য যাহার দেখা নাই, উপরিউক্ত কবিতার তাহার নিকটে কোন অর্থ নাই। প্রত্যয় না হয়, কবিতাটিকে কোনও একটি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে উপহার পাঠাইয়া দেখুন,—আমার বিশ্বাস সে উপহার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিবে। অনুবাদের ভিতরেই ধরা পড়ে এই সত্যটি।

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির প্রথম স্তবক—

"বেলা যে প'ড়ে এল, জল্‌কে চল্‌,"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে-ছায়া সখি, কোথা সে-জল।

এই 'জল্‌কে চল্‌'-এর ভিতরে যে একটি সকরুণ ব্যাকুলতা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের ভারতীয় পল্লীর সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। কথাটির সঙ্গে আমাদের কত দিনের কত স্মৃতি যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। 'জল্‌কে চল্‌'-এর ধ্বনিটি সেই স্মৃতির স্ফুট অস্ফুট সূক্ষ্ম সুকুমার তারগুলিতে গিয়া কত বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিয়াছে। দূর হইতে সেই সখীর ডাকের সুর, সেই 'অশথতল', সেই ছায়া, সেই উচ্ছল কালো জল— আর তাহার সঙ্গে মনের অবচেতনে সেই স্মৃতির বিচিত্র ঝঙ্কার— এই সকলকে বাদ দিয়া 'জল্‌কে চল্‌'-এর কোন অর্থ ই নাই।

কবিতার ভিতরে আমরা ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই ছন্দ-গ্রহণেরও একটা প্রধান কাজ কবিতার অন্তর্গত সমস্ত টুকরাগুলি এবং তাহার সহিত সকল অর্থগুলিকে একটা গভীর ঐক্যের ভিতরে বাঁধিয়া একটি অখণ্ড রসানুভূতির দিকে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করা। ছন্দ-তত্ত্বের মূলেও রহিয়াছে সঙ্গীত-তত্ত্ব। সঙ্গীতের ভিতরে কি দেখিতে পাই? সেখানে কথাগুলি যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই প্রধান হইয়া কেবল কথা বলিতে থাকে তবে আর যাহাই হোক, সঙ্গীত হয় না। সেখানে প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং ধ্বনি-সম্পদ্ একটা সুরের মূর্ছনার ভিতরে তাহাদের সকল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং ধ্বনি-সম্পদ্ এইরূপ একটি সুরের সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইয়াই একটি সঙ্গীতের সমগ্র

ফলশ্রুতি দান করে। সঙ্গীতের ভিতরে প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি ধ্বনির যেটুকু মূল্য তাহা সঙ্গীতের এই অখণ্ড ফলশ্রুতিরই যোগে।

ছন্দের আশ্রয়ে কবিতাও কম-বেশী সঙ্গীতধর্মী। এই সঙ্গীতধর্ম যে সকল কবিতায় প্রধান হইয়া ওঠে সুরের সহিত অন্বয় না করিয়া সেখানে সর্বদা শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যেমন ধরা যাক্ গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ রসের পদ—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লি[1] মালতি যুথি
　　মত্ত-মধুপ[2] ভোরণি।
হেরই[3] রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
　　কুলবতি-চিত চোরণি॥

এখানে 'ভোরণি' শব্দের অর্থ কি? টিপ্পনিকার পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'ভোর' (বিহ্বল, মত্ত) শব্দ হইতে 'বিহ্বলতা' অর্থে 'ভোরণি' শব্দ হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থে 'নি'-প্রত্যয়ের ব্যবহার আর কেহ কোথাও লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আসলে কিন্তু আমাদের মনে হয়, সমস্ত কবিতাটি জুড়িয়া অনুকূল ধ্বনির আশ্রয়ে একটা সুরের মূর্ছনা লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে; সেই সুরের সহিত গভীর ভাবে অন্বিত হইয়া কবির মনে ভ্রমরের গুঞ্জন 'ভোরণি' শব্দের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানে 'চোরণি' শব্দের 'নি'-কারও সেই সুরের অন্বয়েই সার্থক।

আমি আরও দুই-একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত লইতেছি। এই সঙ্গীতধর্মের সহিতই যুক্ত কাব্যের শব্দালঙ্কার। এই শব্দালঙ্কারের প্রতি আমাদের অনেক সময়ে একটা সুরুচিগর্ভ অবজ্ঞা রহিয়াছে। কিন্তু অতি সাধারণভাবে প্রযুক্ত শব্দালঙ্কারও কাব্যার্থের অর্থপ্রকাশে অনেক সময়ে কিরূপ অপরিহার্য হইয়া ওঠে তাহার সাধারণ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোবিন্দদাসের একটি অভিসারের বর্ণনা—

তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

এখানে 'বারি কি বারই' হইতে 'বারই' শব্দের পরিবর্তে বারণ করা, অর্থাৎ নিবারণ করা অর্থে অন্য একটি শব্দের ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন। প্রথম চরণে রহিয়াছে 'ত', 'দ', 'র', 'ল'-এর অবলম্বনে ঘন বর্ষার শ্রৌত রূপটি; এই বর্ষণধ্বনির ভিতরে শ্রীরাধিকার সম্বল রহিয়াছে 'নীল নিচোল'—বড়ই কোমল এবং তরল; অতএব এমনতর অবস্থায় কবির 'বারি কি বারই' ছাড়া কি কিছু আর বলিবার ছিল? তারপরে কবি বলিলেন—

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

---

১ মল্লিকা—পাঠান্তর। ২ মধুকর—পাঠান্তর। ৩ হেরত—পাঠান্তর।

'দামিনী' কথাটার আভিধানিক অর্থ কি? সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, 'দাম' অর্থ পর্বত; এই পর্বতের সহিত যুক্ত, অর্থাৎ পর্বতাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সহিত যুক্ত বলিয়া 'বিদ্যুৎ' দামিনী।[৪] বোধ হয় সংস্কৃত 'দামন্' শব্দের সহিতও ইহার কিছু যোগ থাকিতে পারে। 'দামন্' শব্দের এক অর্থ 'দড়ি'; বিদ্যুতের সহিত দড়ির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। 'দামন্' অর্থ 'মেখলা'ও হইতে পারে, বিদ্যুতের সহিত মেখলাবতী নারীর ভাবানুষঙ্গযোগ রহিয়াছে। ইহার কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহার বিচারের ভার আপাততঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া ছন্দের সুরের সাহায্যে এই 'দামিনী' কথাটিকে প্রথমের 'দশ দিশ' এবং পরের 'দহন বিথার'এর সহিত মিলাইয়া দিন, দেখুন অন্ধকার 'যামিনী'র বুকে এই 'দামিনী'কে দেখিয়া লোচন উচ্চকিত হইয়া ওঠে কি না।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যে 'প্রশ্ন' কবিতায় শিশুটি বলিতেছে—

আমি ত বেশ ভাবতে পারি মনে—
সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুরধারে এসে।
আঁধার হল মাদারগাছের তলা
কালি হ'য়ে এল দিঘির জল,
হাটে থেকে সবাই এল ফিরে
মাঠের থেকে এল চাষির দল।

পল্লীর মাঠে প্রান্তরে, বনে বাদাড়ে এতরকমের প্রসিদ্ধ গাছ থাকিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গিয়া হঠাৎ মাদারগাছের তলায় ঠাঁই লইল কেন? কণ্টকময় মাদারগাছ তেমন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতন সুন্দর নহে, তাহার তলায় অল্পতেই অনেক অন্ধকার জমিয়া উঠিতে পারে এমন সুদূরপ্রসারিত বা ঘনপল্লবিতও সে নয়; তাহাকে ঘিরিয়া তেমন কোন কবিপ্রসিদ্ধিও নাই; তথাপি যে সন্ধ্যায় সকল গাছ ছাড়িয়া 'মাদারগাছের তলা'র দিকেই কবির দৃষ্টি পড়িল তাঁহার কারণ ঐ 'আঁধার'। এই 'আঁধার' যোগে 'মাদার'এর (মঁাদার-মন্দার) নূতন অর্থলাভ ঘটিয়াছে।

'রভস' কথাটি একটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, ইহার অর্থ 'বেগ'; বাংলা সাহিত্যে ইহার বিরল প্রচার। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন, একটি স্থান 'ক্ষিতিসৌরভ-রভসে'। নিতান্ত আভিধানিক অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে 'ক্ষিতি-সৌরভ-রভস' যে খুব একটা সার্থক কথা তাহা বলা যায় না,— বরঞ্চ এখানে 'বেগ'-এর অর্থ লইয়া একটু বেগই পাইতে হয়। কিন্তু শুধু অভিধানের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধ্বনির দিক হইতে আগে 'সৌরভ'-এর সহিত 'রভস'-এর যোগটি অনুভব করুন এবং তারপরে তাহার আশেপাশের সমস্তগুলি ধ্বনির সহিত এই ধ্বনিটি মিলাইয়া লউন, দেখিবেন নবযৌবনা বর্ষার বর্ণনায় কথাটি এখানে কত সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

---

৪ দামা সুদামা নগঃ স একদেশত্বেন অস্ত্যস্ত ইনি ঙীপ্।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

এখানে অবশ্য একেবারে ধ্বনির উৎসব লাগিয়া গিয়াছে ; কিন্তু অনেক সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তের ভিতরেও দেখিতে পাই ধ্বনি-সংযোগে একটা অতি-অবজ্ঞাত সাধারণ শব্দও কাব্যে কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'ঘসি' (ঘুঁটে) শব্দটিকেও কি তেমন ভাল 'কাব্যোপযোগী' শব্দ বলিয়া মনে হয়? তাহার ব্যাবহারিক মূল্যও কম, ধ্বনি-সম্পদ্‌ও নগণ্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের

একে দহ দহ ঘসির আগুন
আরে কে না জ্বালে ফুঁকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পারিলুঁ
এ শেল রহিল বুকে।

এখানে 'দহ দহ' ধ্বনির যোগে ঘসির আগুনের জ্বালা তীব্র চারুত্ব লাভ করিয়া অপূর্ব সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

একটি শব্দের নিজস্ব ধ্বনি এবং আশেপাশের ধ্বনিগুলির সহিত তাহার সংগতি শব্দের অর্থ-নির্ধারণে যে কতখানি মুখ্য হইয়া ওঠে তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাংলা 'দাদুরী' কথাটির সমার্থক 'বেঙ' বা 'ভেক' কাব্যে সর্বদাই রহিল অপাংক্তেয়, কিন্তু কাব্যসামগ্রীর সম্মান লাভ করিল 'দাদুরী' তাহার ধ্বনি-মাধুর্যের জন্য। শুধু তাহার নিজস্ব ধ্বনি-মাধুর্যের জন্য নহে,—সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার সহিত তাহার গভীর অন্বয়ে। বিদ্যাপতি যেখানে গাহিলেন—

কুলিশ শত শত　　　পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী　　　ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

সেখানে দাদুরী 'বেঙ' বা 'ভেক' নামক কোন কদাকার প্রাণিবিশেষ মাত্র নহে; সেখানে ঘন বর্ষার ধারাসার, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, বজ্রের গর্জন, কেকা-কলরব, দশদিক ব্যাপিয়া ঘোর তিমির-রজনী, বিরহের বুকফাটা বেদনা—সেখানকার ছন্দ, শব্দ-ঝঙ্কার—সমস্তের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দাদুরী একটি সুরময় দেহ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কাব্যে যেখানে দাদুরীকে স্থান দিয়াছেন সেখানেও তাঁহাকে এইরূপ একটি আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে।—

যুথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।

এখানেও এই দাদুরীকে ঘিরিয়া একদিকে যেমন রহিয়াছে ঘনবর্ষার রজনী, তমালকুঞ্জের তিমির,

তাহার ভিতরে যূথী-পরিমলবাহী সজল সমীর—অন্যদিকে কুসুম-পরাগের মত ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কার।

চিত্রাঙ্কনের মধ্যে 'ল্যাণ্ডস্কেপ' অঙ্কন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ল্যাণ্ডস্কেপ অঙ্কনের একটা কৌশল এই যে, তাহার ভিতরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের অঙ্কন রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই সমগ্র ছবিখানির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু তাহারা সমগ্র ছবিখানি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কেহই তেমন সার্থক নহে। সমগ্র টুকরা টুকরা অংশগুলির অঙ্কনের পশ্চাতে চিত্রকরের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থান এবং তজ্জনিত একটি ভাবদৃষ্টি রহিয়াছে। চিত্রকরের এই মানসিক অবস্থানটিই সমগ্র চিত্রখানির ভিতরে একটি গভীর অন্বয়সাধন করে যাহার ফলে প্রত্যেকটি অংশ একটি সমগ্রতার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে। এই অন্বয় ব্যতীত কোন অংশেরই তেমন তাৎপর্য নাই, অথচ এই অন্বয়ের যোগে প্রত্যেকটি অংশই অর্থবান। কবিতার ভিতরেও এই জাতীয় চিত্রধর্মী কবিতা রহিয়াছে, যেখানে সমগ্রতার সহিত অন্বিত হইয়াই প্রতিটি বর্ণনা অর্থলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্ন' (চৈতালি) বা 'সুখ' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অংশগুলিকে সমগ্র বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার পিছনকার কবির মানসিক অবস্থান এবং ভাবদৃষ্টিকে বাদ দিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহাদের কাহারোই তেমন কোন একটা অপূর্ব চারুত্ব নাই; তাহারা স্বতন্ত্রভাবে অভিহিত হইয়া পরে অন্বিত হয় না,—তাহারা প্রথমে অন্বিত হইয়া সেই অন্বয়ের যোগেই তাহাদের অভিধান লাভ করে।

এক-একটি ভাল লিরিক কবিতা একটি অখণ্ড বস্তু। একটি বীজ-শক্তি যেমন করিয়া নিজেকে একটি শাখাবাহুপ্রসারিত বহুপল্লবিত এবং পুষ্পিত বৃক্ষে ছড়াইয়া দিয়া সেই সমস্ত অংশের ভিতর দিয়া বৃক্ষের একটি অখণ্ড সত্তাকে প্রকাশ করে, একটি লিরিক কবিতার বেলায়ও তাহাই ঘটে। কবির অন্তর্নিহিত গভীর রসানুভূতি এখানে বীজ-স্বরূপ, সেই বীজশক্তির বহিঃপ্রকাশে জাগিয়া ওঠে যত ছন্দ, শব্দ, অর্থ, যত বাগ্‌বৈকল্য,—তাহারা তাই অখণ্ডভাবে অন্বিত। গাছের একটি পাতা বা ফুল যেমন গাছের সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আপন অস্তিত্বকে জাহির করিতে পারে না, অথচ সমগ্রের সহিত অন্বয়ে তাহাদের ভিতরকার প্রতিটি রেখা প্রতিটি বর্ণ-বিন্দুই সার্থক, একটি ভাল লিরিক কবিতার সম্বন্ধেও সেই কথা। উপনিষদে বলা হইয়াছে, বিশ্বভুবনের ভিতরে যে দেব গূঢ় হইয়া আছেন—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' একটি লিরিক কবিতার ভিতরে নিহিত থাকে যে রসবেদনা তাহাই কাব্যদেহের প্রত্যেক কণায় কণায় ছড়াইয়া আছে, এবং তাহার সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইয়াই কাব্যদেহের প্রতিটি অংশ একটা সমগ্রতার ভিতরে অন্বিত হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটির মূল ভাবের সহিত নিবিড় অন্বয় ব্যতীত

পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

অথবা

তৃণদল

মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

প্রভৃতির কোন অর্থ করা যায় কি ?

রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' কবিতাটি এইরূপ একটি অখণ্ড কাব্য-বস্তু। প্রথমেই

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে।

প্রথমেই 'তিল ঠাঁই' কথাটির প্রতি লক্ষ্য করুন; অর্থের দিক হইতে এবং ধ্বনির দিক হইতে 'নীল নবঘনে'র সহিত যোগ না করিয়া তাহার ঠিক অর্থ পাওয়া যাইবে না ; আর এই অন্বয়ের দ্বারা 'তিল ঠাঁই'-এর যে অর্থ পাওয়া যাইবে কোন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন রাজনৈতিক সভার প্রসঙ্গে উল্লেখিত 'তিল ঠাঁই'-এর অর্থ হইতে তাহা অনেকখানি ভিন্ন। তার পরে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বলা হইয়াছে—

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি ?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

প্রথমেই সংশয় আসে 'বেলাটুকু' পোহায় কি করিয়া। 'পোহাল' শব্দটি আসিয়াছে 'প্রভাত' শব্দ হইতে, 'পোহাল' শব্দের অর্থ প্রভাত হইল। সুতরাং রাত্রিই পোহাইতে পারে, 'বেলাটুকু' পোহাইতে পারে না। 'বেলা পোহাইল' এরূপ ব্যবহারও বাংলায় কোথাও নাই। কিন্তু 'বেলাটুকু পোহালে' কথাটির অর্থ লাভ করিতে হইলে পূর্বের

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে॥

প্রভৃতির সহিত ইহাকে মিলাইয়া লউন। শেষরাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাত্রি যে কখন পোহাইয়া যায় তাহা যেমন বোঝা যায় না, এই বাদল-দিনের মেঘলা অন্ধকারের ভিতরে বেলাটুকু যে কখন ফুরাইয়া আসিতেছে তাহা কিছুই বোঝা যাইতেছে না; এই অর্থে 'পোহাল' কথাটা এখানে অভিনব চারুত্ব লাভ করিয়াছে। এই বাদলাদিনের ভিতরে চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে এবং সজল হাওয়ার ভিতরে রাখাল বালকের মনও যেন কেমন উদাসীন উন্মনা হইয়া গিয়াছে,—সে আজ ভাল করিয়া মন দিয়া মাঠে গরু চরাইতে পারে নাই—বনে-বাদাড়ে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেমন অকাজে যেন দিনটাকে কাটাইয়া দিয়াছে। এই অন্বয়ের সহিত রাখাল বালকের 'দিন খোয়ালে' কথাটাকে গ্রহণ করুন, তবেই সে সার্থক, নতুবা তাহার অর্থ আবিষ্কার করাও শক্ত হইবে। তেমনি করিয়াই

ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘন ঘন
পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে॥

প্রভৃতি সমগ্র বাদলাদিনের বর্ণনাটির সঙ্গে এক করিয়া না দেখিলে তাহার তাৎপর্যও আমরা একেবারেই হারাইয়া ফেলিব।

রবীন্দ্রনাথের 'দিনশেষ' কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকের পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোন অর্থ করা যায় কি?

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

ইহার পিছনে কোন গভীর তত্ত্বব্যাখ্যা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কবিতাটির সমগ্রতার সহিত অন্বিত হইয়া ফল-শ্রুতিতে সে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অনেক স্থানে দেখিতে পাইব, অন্বয় ব্যতীতও কাব্যাংশের একটা অর্থলাভ ঘটে বটে, কিন্তু অন্বয়ের দ্বারা সেই কাব্যাংশের পটভূমিকা রচিত হইলে সেই বাক্যাংশের এতখানি অর্থ-সম্প্রসারণ ঘটে যে, তাহার তুলনায় পূর্ববর্ত্তী অনন্বিত অর্থটি একেবারে নিস্প্রভ হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। আমি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি।

আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে।

পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না এবং সে অর্থ যে একেবারেই চারুত্ববর্জিত তাহাও নহে; প্রপত্তিমূলক বিরাগী ভক্তের আর্তি হিসাবে ভালই লাগে। কিন্তু ইহার পিছনে একটি পটভূমিকা রচনা করিয়া লউন—

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে;
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

দেখিবেন মুহূর্তে একটা বিশ্বসংগীতের পটভূমিকার উপরে পূর্বোক্ত পংক্তিগুলির অর্থ কি ব্যাপক মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রাণাডে ও ভারতীয় অর্থনীতি

শ্রীভবতোষ দত্ত

আমাদের দেশের অর্থনীতি-আলোচনায় যে বিশেষ একটি ধারা দেখতে পাওয়া যায় সেটা আমাদের জাতীয়তাবাদেরই অভিব্যক্তি বা পাদপূরণ। প্রায় সব দেশেই অর্থনৈতিক আলোচনা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্মানিতে যে 'জাতীয়' অর্থনীতির প্রচার দেখা গিয়েছিল তার মূল ছিল অগ্রগামী পশ্চিম-ইয়োরোপের পটভূমিকায় জর্মানির রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বলতা; আমাদের দেশের অর্থনীতি-চর্চায় যে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাও আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিরই একটা বিশেষ ফল। গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষে অর্থনীতি-সম্বন্ধে যে অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সংখ্যা অত্যন্ত কম; অধিকাংশ আলোচনারই বিশেষ লক্ষ্য ভারতবর্ষের সমসাময়িক আর্থিক অবস্থার মূলোদ্ঘাটন এবং সরকারী কর্মনীতির সমালোচনা।

এই বিশেষ ধরনের অর্থনীতি আলোচনার সূত্রপাত যাঁদের হাতে হয় তাঁদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নাম অগ্রগণ্য। গত শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মনীতির সমালোচনারও আরম্ভ হয়। প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি দাদাভাই নওরোজী; তাঁর রচিত 'পভার্টি অ্যাণ্ড্ আন্-ব্রিটিশ রুল ইন্ ইণ্ডিয়া' এবং অসংখ্য প্রবন্ধ বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিবিদের অবশ্যপাঠ্য বলে পরিগণিত হত। ভারতীয়দের মাথা-পিছু আয় সম্বন্ধে যে সংখ্যা-তাত্ত্বিক অনুশীলন নওরোজী করেছিলেন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকলেও এইজাতীয় প্রথম আলোচনার কিছুটা গুরুত্ব এখন পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়। রমেশচন্দ্র দত্তের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস—অর্থনৈতিক ইতিহাস বলতে ঠিক আজকাল আমরা যা বুঝি তা নয়,—ভারত-সরকারের রাজস্ব-সম্পর্কীয় কর্মনীতি এবং তার ফলাফলের আলোচনা। একবার তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে যুক্তিজাল বর্ষণ করে বাংলা দেশের বাইরে এই প্রথাটিকে সংস্থাপিত করানোর চেষ্টাও করেন। এই যুক্তিধারার মধ্যে আজকাল আমাদের চোখে অনেক দুর্বলতা হয়তো ধরা পড়ে, কিন্তু সরকারি নীতির অবশ্যপ্রয়োজনীয় সমালোচনা হিসাবে রমেশচন্দ্রের 'খোলা চিঠি' এককালে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি আলোচনায় আজকাল নওরোজী বা রমেশচন্দ্রের প্রভাব প্রায় নেই বললেই হয়। জাতির মাথাপিছু আয় সম্বন্ধে গবেষণায় আজকালকার সংখ্যা-তাত্ত্বিক নওরোজী-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করেছেন; নূতন করে যিনি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখবেন তিনিও আজকাল রমেশচন্দ্র দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ সম্ভবতঃ করবেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাণাডের প্রভাব আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। রাণাডের মৃত্যুর (১৯০১) চুয়াল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদের প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধে সেই সুর এবং দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায় যা একান্তভাবে রাণাডের। রাণাডের উল্লেখযোগ্য রচনার অধিকাংশই ১৮৯০ থেকে ১৮৯৪ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে লেখা। যে-সব সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা

করেছিলেন আজকালকার সমস্যা তার থেকে অনেক বিভিন্ন এবং জটিল; কিন্তু তবু আমাদের অধুনাতন কালের প্রায় সমস্ত লেখাতেই রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের অবলুপ্তির পাশাপাশি রাণাডের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণ দেখাতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পটভূমিকা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে এমন কিছু পরিবর্তিত হয়নি যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ রাণাডের প্রভাবের কারণ তাঁর রচনার স্থায়ী মূল্য নয়, এর কারণ পারিপার্শ্বিকের জড়ত্ব। কিন্তু একথাই যদি ঠিক হত তবে নওরোজীর গ্রন্থ আজকাল কারো হাতে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? বিখ্যাত বাজেট-বিশারদ গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের লেখা বা বক্তৃতার রিপোর্ট আজকাল কয়জন অর্থনীতির ছাত্র প'ড়ে দেখে? পারিপার্শ্বিকের স্থায়িত্ব খুব কম ক্ষেত্রেই লেখকের প্রভাবকে স্থায়ী করতে পারে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গত পঞ্চাশ বছরে বদলায় নি একথা বলা একটু বাড়াবাড়ি হয়; আর যদি একথা সত্যিও হত, তবুও নিজস্ব মূল্য না থাকলে ১৮৯০-৯৪এর রচনা আজ পর্যন্ত এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না।

যে সময়ে রাণাডে অর্থনীতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, আমাদের দেশে সে যুগ জন স্টুয়ার্ট্‌ মিলের যুগ। মিলের প্রধান গ্রন্থ ১৮৪৮-এ প্রকাশিত হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ধনবিজ্ঞানের শেষ সত্য মিলের পাতায় পাতায় নিহিত আছে। আজকালকার ছাত্র যখন 'মূল্যতত্ত্বে'র জটিলতায় হতবুদ্ধি হয়, তখন বোধহয় তার মনে পড়ে যে মিল নিজেই বলেছিলেন, দ্রব্যমূল্যের কারণনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে যা আছে তার পরে ভবিষ্যতে আর কারো নূতন কিছু বলবার থাকবে না। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানের চূড়ামণি রূপে মিলের স্থান পাকা ছিল বহুদিন।

১৮৭০-এর পর থেকে মিলের সিংহাসনে আঘাত পড়তে থাকে। অস্ট্রিয়ান পণ্ডিতদের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, জেভন্‌সের প্রান্তিক কাম্যতা, কেয়ার্ন্‌সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমষ্টির তত্ত্ব, সাম্যবাদীদের নূতন ভাবধারা এবং মার্শালের সমন্বয়-সাধন জন স্টুয়াট্‌ মিলের স্থান অনেকটা দূরে সরিয়ে দিল। আমাদের দেশে পণ্ডিত এবং সরকারি কর্মচারী এই দুই মহলেই কিন্তু তখনও মিলের প্রভাব পাকা—ঠিক মিলের প্রভাবও নয়, ফসেট নামধারী এক পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতার প্রভাব। রাণাডের আলোচনা যে-যুগে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিল সে-যুগে ফসেট ছিল আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কাছে সবচেয়ে বড় 'অথরিটি', এবং কর্মপন্থার চরম উৎকর্ষ ছিল অবাধ বাণিজ্য। দেশে ও দেশে, কালে ও কালে যে তফাৎ থাকতে পারে, ধনবিজ্ঞানের কর্মনীতির দিকটার সমস্ত সিদ্ধান্তই যে আপেক্ষিক সেটা ইংরেজ সরকার তো বুঝতে চাইতেনই না, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সহজে বুঝতেন না।

জন স্টুয়াট্‌ মিলের ফসেট-ভাষ্য যে ধারণার সৃষ্টি করেছিল সেটা মোটামুটি এই: ব্যক্তিস্বার্থের অনুপ্রেরণায় যাই ঘটে তাই মঙ্গলজনক, এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উপকার স্বার্থবুদ্ধির অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার ফলেই আসতে পারে; অর্থনীতির যে-নিয়ম এই স্বার্থপ্রণোদিত 'আদর্শ' সমাজে কাজ করে সেগুলি অভ্রান্ত এবং দেশকালনিরপেক্ষ; কারো পক্ষেই বেশীদিনের জন্য এই নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়, আর যদি সেটা সম্ভব হয়ও তবে শেষ পর্যন্ত তাতে অমঙ্গল আসতে বাধ্য; অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে-উৎপাদন হয় সেটাই আদর্শ উৎপাদন, যে-পথে দেশের মালমসলা ব্যবহৃত

হয় সেটাই আদর্শ ব্যবহার, যে 'জাতীয় আয়' সৃজিত হয় সেটাই লক্ষ্যস্থল হবার উপযুক্ত, যে অসাম্য আসে সেটাই বাঞ্ছনীয়। অতএব কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণই কাম্য নয়, কারণ তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাধা জন্মাবে, আর সবচেয়ে ভাল যার ফলাফল তাতে ব্যাঘাত ঘটালে অনুপকার তো হবেই।

এইজাতীয় যুক্তির সাহায্যেই সাধারণতঃ প্রমাণ হত যে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই দু'টি দেশের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য আনা উচিত নয়। অর্থনীতির নিয়ম অমোঘ এবং প্রত্যেক দেশেই সমানভাবে কার্যকারী; অতএব ইংলণ্ডের পক্ষে ১৮৩০-এ যা ভাল ছিল, ১৮৯০-তে ভারতবর্ষের পক্ষে তাই ভাল না হবে কেন? ইংলণ্ডে যদি শ্রমিকদের অন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াও বহুদিন চলে থাকে ভারতবর্ষে তা চলবে না কেন? ইংলণ্ডের শিল্প-বিবর্তনে রাষ্ট্রের সোজাসুজি কোনো হাত ছিল না, ভারতবর্ষেও শিল্প-বিবর্তন রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই হওয়া বাঞ্ছনীয়; আর যদি রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া বিবর্তন না আসে তবে তো সহজেই বোঝা গেল যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই পরিবর্তন কাম্য নয়, ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষিপ্রধান থাকাই অর্থনীতির বিধান। অবাধ বাণিজ্যে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল: ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিও অবাধ বাণিজ্যেই বাড়বে, আর যদি না বাড়ে তবে বুঝতে হবে যে দারিদ্র্যই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিধান।

এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য এবং সুদৃঢ় অভিযান আরম্ভ করেন রাণাডে। তাঁর 'ভারতীয় অর্থনীতি' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ অর্থনীতি-বিশারদের সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে জর্মান লেখকদের আপেক্ষিকতাবাদের সমর্থন করেন। জর্মানিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একদল লেখক অর্থনীতির বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের পরিবর্তে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে অর্থনীতির কোনো সাধারণ নিয়ম নেই; বিশেষ সময়ে, বিশেষ অবস্থায় কোন্ কর্মনীতি সব চেয়ে বেশী উপকারী হবে সেটা আবিষ্কার করাই অর্থনীতির কাজ। সুতরাং কার্যকারণ সম্বন্ধের সাধারণ নিয়মের অনুসন্ধান বৃথা; দেশের মঙ্গলের জন্য একমাত্র প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক এবং ঐতিহাসিক ধারার অনুধাবন। ১৮৭৯-তে ক্লিফ্-লেস্লি নামক একজন ইংরেজ লেখক অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জর্মান ঐতিহাসিক অর্থ-নীতিবিদদের যুক্তি সমূহ একত্রে ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। রাণাডের রচনায় ক্লিফ্-লেস্লির উল্লেখ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এঁরই রচনার মধ্যস্থতায় জর্মান 'জাতীয় অর্থনীতি'র সঙ্গে রাণাডের পরিচয় ঘটে।

অর্থনীতির আপেক্ষিকতার সমর্থনে ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের আর্থিক পটভূমিকার যে পার্থক্য রাণাডে দেখিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত তার মূল্য দূরীভূত হয় নি। ইংরেজদের 'ক্লাসিক্যাল' অর্থনীতিতে একটা বিশিষ্ট পরিবেশ ধরে নেওয়া থাকত; এই পরিবেশের বিশেষত্ব, ব্যক্তিস্বার্থের সমাজ-মঙ্গলকারী ক্রিয়া, অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের নিরঙ্কুশতা, শ্রম ও মূলধনের অত্যন্ত সহজে এক দিক থেকে আর-এক দিকে যাবার ক্ষমতা, ইত্যাদি। রাণাডে দেখালেন, আমাদের দেশের সাধারণ লোকের আচরণ ঠিক অর্থনীতিবিদের কল্পনার স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তির আচরণের মত নয়; ব্যক্তির চেয়ে আমাদের দেশে পরিবার বড়, পরিবারের চেয়ে বর্ণ এবং সমাজ; স্বার্থ-লাভ, ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির প্রচেষ্টা আমাদের দেশে আরো অনেক রকমের উদ্দেশ্যলাভের নীচে চাপা পড়ে যায়; প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে চিরাচরিত প্রথার মূল্য এদেশে বেশি— জিনিসের দাম, জমির খাজনা, টাকার সুদ, শ্রমিকের মজুরি এগুলি অনেক সময়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল না হয়ে বহুকাল ধরে অবধারিত প্রথা অনুসারে নির্ণীত হয়; এক ব্যবসায় থেকে আর-এক ব্যবসায়ে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে আমাদের দেশের লোককে নেওয়া শক্ত; সর্বোপরি, অধিকাংশ লোক

থাকে গ্রামে, চাষবাস করে, কোনো বছরে ভালো ফসল পেলে একটু খরচপত্র করে, তীর্থে যায়, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে, আবার যে বছর অজন্মা হয় সে বছর নিরুপদ্রবে দুঃখভোগ করে; জনসংখ্যা বাড়ে অবাধে, আবার দুর্ভিক্ষে মহামারীতে কমেও অবাধে। যে-সমাজে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এতটা 'মধ্যযুগীয়' পরিস্থিতি, সে-সমাজে পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী কর্মপন্থা চলতে পারে না; দেশের অবস্থার মাপকাঠিতে নূতন কর্মপন্থা তৈরি করে নিতে হবে।

যে কর্মপদ্ধতি রাণাডে সমর্থন করেন, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে তারই সমর্থন অসংখ্য বইয়ে এবং প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই কর্মনীতির মূল হল সরকারি অভিভাবকতায় এবং সাহায্যে দেশের মোট সম্পদের বৃদ্ধির চেষ্টা। এই মূলনীতির বিশেষত্বগুলি প্রথমেই দেখে নেওয়া ভালো। রাণাডে থেকে আরম্ভ করে আজকালকার অনেক লেখকই চান যে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থায়, শিল্প-উন্নয়নে, কুটিরশিল্পের পুনঃসংস্থাপনে ব্যক্তির প্রাধান্যই বজায় থাকুক, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানেই সরকারি সাহায্য আসা চাই সরকারি প্রচেষ্টায় স্থাপিত এবং পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র আমাদের অর্থনীতিবিশারদরা চান না; তাঁরা চান কৃষকই প্রধান থাকুক, কিন্তু তাকে পদে পদে অভিভাবকের মত সাহায্য করবেন সরকার—অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে, বাজারে সুবিধাজনক দাম মিলবার বন্দোবস্ত ক'রে, ভালো গরুবাছুর যাতে পাওয়া যায় তার চেষ্টা ক'রে, জলসেচনের নূতন প্রণালী অবলম্বন ক'রে। শিল্প-উন্নয়ন আনতেও শিল্পপতিরাই অগ্রণী হবেন, কিন্তু তাঁদের পদে পদে সাহায্য করবেন গভর্মেণ্ট, মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রে, শিক্ষাদানের জন্য টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন ক'রে, বৈদেশিক বৃত্তি দিয়ে, টাকার বিনিময়ের হার কমিয়ে এবং বিদেশী আমদানির উপরে সংরক্ষণ-শুল্ক বসিয়ে। অর্থাৎ যে-জিনিসটা রাণাডে চেয়েছিলেন এবং তাঁর অনুগামীরা এখনও চান সেটা সমাজতন্ত্র, কালেক্টিভিজ্‌ম্ বা স্টেট্-ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্ নয়, সেটা রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে ব্যক্তি-প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—স্টেট্-সোশ্যালিজ্‌ম্ নয়, স্টেট্-প্যাটার্নেলিজ্‌ম্ (state-paternalism)।

রাণাডে-প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব মোট-সম্পদের উপরে গুরুত্ব আরোপণ এবং বণ্টন সমস্যার প্রতি অবহেলা। রাণাডে চেয়েছিলেন, সরকারি সাহায্যে স্বল্পায়তন কৃষিক্ষেত্র বৃহদায়তনে পরিণত হোক, কৃষিকর্মের প্রাধান্য কমে গিয়ে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য আসুক, গ্রামের লোক যাতে শহরে আসে তার ব্যবস্থা হোক, গ্রামকে যথাসম্ভব শহরে পরিণত করা হোক, আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য কমিয়ে বহির্বাণিজ্য বাড়ানোর উপায় দেখা যাক, ভারতীয় শ্রমিককে বিদেশে যেতে উৎসাহিত করা হোক। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মূলে, দেশের মোট-সম্পদ বৃদ্ধির কামনা। এই 'মোট সম্পদ' কি ভাবে বণ্টিত হলে সবচেয়ে বেশি উপকার সে সমস্যার কোনো সন্ধান রাণাডের রচনায় পাওয়া যায় না—তাঁর পরবর্তীদের অনেকের রচনাই এ বিষয়ে নীরব, এমন কি মাত্র দেড়বছর আগে প্রকাশিত বহু-খ্যাত বোম্বাই-পরিকল্পনার প্রথম ভাগেও বণ্টন-সমস্যাকে অবহেলাই করা হয়েছিল।

হয়তো রাণাডের দিক থেকে এই অবহেলার কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ যে সময়ে রাণাডে অর্থনীতি আলোচনা করেন সে যুগে ইংরেজী অর্থনীতিতে বণ্টন-সমস্যাকে প্রায় কোনো গুরুত্বই দেওয়া হত না। জমির খাজনা, সুদের হার, শ্রমিকের মজুরি এগুলি কি কি কারণের উপরে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান যে হয়নি তা' নয়; কিন্তু ব্যক্তিগত ধনবিভাগ, বণ্টনের অসাম্যের ফল, অসাম্য দূরীভূত করা যায় কি না এসব বিষয়ে আলোচনা ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতরা করেন নি, রাণাডের পথ-প্রদর্শক জর্মান 'ঐতিহাসিক'রাও

করেন নি। বণ্টন-সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সমাজতান্ত্রিক লেখকেরা—সিস্‌মণ্ডি, ওয়েন, প্রুধোঁ, মার্ক্‌স্‌, হেনরি জর্জ। এঁদের অন্ততঃ কারো কারো রচনা হয়ত ১৮৯০-এর কাছাকাছি ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল, কিন্তু তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। বাংলাদেশের রায়তদের অধিকার বৃদ্ধির প্রসঙ্গে রাণাডে আপত্তি জানিয়েছিলেন শুধু এই বলে যে এ সব প্রস্তাব কেবল সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদীরাই সমর্থন করতে পারে।

বণ্টন-সমস্যা অবহেলার দ্বিতীয় কারণটি অন্য ধরনের। স্মিথ-রিকার্ডো প্রমুখ ইংরেজ লেখকেরা শিল্প-বিবর্তনের প্রথম যুগে লিখেছিলেন, যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সম্ভাবনায় হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল যে দেশের মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে তাতে সকলেরই উপকার—শিল্পপতির লাভ বাড়বে, ধনিক টাকা খাটাবার সুযোগ পাবে, শ্রমিকের কখনও কাজের অভাব হবে না। জর্মান 'জাতীয় অর্থনীতি'র প্রবর্তকদের কাছেও শিল্প-বিবর্তন আনাটাই সবচেয়ে বড় কাম্য বলে মনে হয়েছিল; অন্য সব সমস্যা শিল্প-বিপ্লবের পরের সমস্যা, সুতরাং সেগুলির সমাধানের চেষ্টা পরেও চলতে পারে, এই ধারণাই ছিল পাকা। শিল্প-বিবর্তনের ফলে ঐশ্বর্য বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ইংরেজ অর্থনীতিবিদ দেখতে পান উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমভাগে, জর্মান ফ্রেডারিক লিস্ট্‌ সেটা দেখেন ১৮৪১-এ, ১৮৯০-তে রাণাডের চোখে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সম্ভাবনাটাই এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল যে অন্য কোনো দিক তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি।

রাণাডের তথা ভারতীয় অর্থনীতিবিশারদদের উপরে সব চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন জর্মান লেখক ফ্রেডরিক লিস্ট্‌। লিস্টের বিখ্যাত বই 'ন্যাশন্যাল সিস্‌টেম অব্‌ পলিটিক্যাল ইকনমি' জর্মানির শিল্প-উন্নয়নের ধর্মশাস্ত্র। ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে শিল্প-বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে লিস্ট্‌ তাঁর নিজের দেশের অন্য এক সু-ব্যবস্থিত সংরক্ষণ নীতির প্রস্তাব করেন। আজ পর্যন্ত সংরক্ষণ নীতির আলোচনায় লিস্টের প্রভাব অসাধারণ। জর্মান আর্থিক ইতিহাসের যে অবস্থায় লিস্ট্‌ তাঁর বই লিখেছিলেন তার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাণাডের যুগের অনেক সাদৃশ্য ছিল। ১৮৪১-এ জর্মানি দুর্বল কিন্তু সবল হবার আশা রাখে; ১৮৯০-তে ভারতবর্ষেও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছে। কৃষি এবং কুটির শিল্পের বিবর্তনের যে অবস্থায় যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগে সে অবস্থা জর্মানিতে আসে লিস্টের যুগে, ভারতবর্ষে আসে রাণাডের যুগে। ১৮২৮-এ দেখা যায় জর্মানির বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য একটি অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হবার দিকে চলেছে—বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বাণিজ্য-চলাচল অবাধ হয়ে এসেছে কিন্তু বিদেশী জিনিসকে জর্মান নবগঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। যে-মনোভাব পরিবর্তন থেকে শুল্ক সমবায় (Zollverein)-এর সৃষ্টি তার সমর্থনে পণ্ডিতজন-গ্রাহ্য যুক্তিধারার প্রয়োজন ছিল এবং লিস্ট্‌ সেই প্রয়োজনই পূরণ করেন। ১৮৯০-তে ভারতবর্ষেও সেই অবস্থা। একটি দুটি করে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়ে চলেছে প্রতি বৎসরে, গঙ্গার দুই তীরে পাটের কলের চিমনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ভারতবর্ষের প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে রেলপথ স্থাপিত হয়ে দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি বদলিয়ে দিয়েছে, ডক্টর ওয়াটের রিপোর্টের ভারতবর্ষের বিরাট কাঁচামালের ভাণ্ডারের খবর জাতীয়তাবাদীর মনে আশা সঞ্চার করেছে। যে বিখ্যাত 'এইটিন-নাইন্‌টিজ্‌' ইংলণ্ডে বিবর্তনের প্রৌঢ়ত্বের ফলে বিনোদনের যুগ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাই আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল। সুতরাং এ যুগের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব রচনায়ই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে উৎসাহ বেশী, উজ্জ্বল আলোকের মোহে কোথায় কোন্‌খানে

কালো ছায়া তা আর কারো চোখে পড়ে নি। যে উৎসাহী এবং আশাবাদী মনোভাবে কংগ্রেসের জন্ম, সমাজ-উন্নয়নের চেষ্টা এবং কিছুকাল পরে স্বদেশী আন্দোলন, সেই উৎসাহেই রাণাডে-প্রবর্তিত ভারতীয় অর্থনীতি চর্চার জন্ম। উৎসাহ এবং আশাবাদের স্বরূপ আজকাল বদলিয়েছে; যে পটভূমিকায় রাণাডে লিখেছিলেন সেটা আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না; কিন্তু রাণাডের প্রদত্ত গতিবেগ আজ পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতি-আলোচনায় কাজ করে যায়।

একটি বিষয়ে অবশ্য রাণাডের বাস্তব বোধ উল্লেখযোগ্য। লিস্টের 'জাতীয় অর্থনীতি'র প্রভাব যাঁর রচনায় এত বেশী তিনি তাঁর স্বনামে প্রকাশিত রচনায় 'সংরক্ষণ শুল্ক' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। ভারতবর্ষের যন্ত্রশিল্পের উন্নতি আনতে হলে তাঁর মতে গভর্মেণ্টের প্রধান কর্তব্য—ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, গ্যারাণ্টি বা অর্থসাহায্য করে নূতন ফ্যাক্টরি স্থাপন, শ্রমিকদের চলাচলের সুবিধা করা, টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মজুরকে বিশেষজ্ঞ করে তোলা এবং গভর্মেণ্টের নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র যথাসম্ভব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা—অর্থাৎ সংরক্ষণ শুল্ক ছাড়া আর সব কিছু। অন্যদিকে ফ্রেডারিক লিস্ট প্রমুখ লেখকদের কাছে সংরক্ষণ শুল্কই যন্ত্রশিল্পের উন্নতির পথে প্রধান সহায়। রাণাডের এই মনোভাবের কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থায় ইংরেজ সরকার সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করতে কিছুতেই রাজি হতেন না; আমাদের দেশে তখন অবাধ বাণিজ্যের ন্যায্যতার নামে বিলাতি জিনিসের উপরে আমদানি কর কোনো কারণে বসানো প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে দেশী জিনিসের উপরে ট্যাক্স বসানো হচ্ছে, কারণ তা না করলে দেশীয় উৎপাদক বেশী সুবিধা পেয়ে যাবে, আর তাই যদি হয় তবে ইংরেজ উৎপাদকের উপরে কী অবিচার! মনের দুঃখে (মনে রাখা প্রয়োজন, রাণাডে সরকারি কর্মচারী ছিলেন) তিনি একস্থানে বলেছিলেন— যে উপায়ে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা সাফল্য লাভ করেছে সে উপায় অবলম্বনের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই; শিল্প-বিবর্তনের প্রথম যুগে শুল্কনীতির যথাযোগ্য পরিবর্তন করলে যে উপকার হতে পারে সে উপকার আমাদের ভাগ্যে আসবে না; ফ্রান্সে ও জর্মানিতে আমদানি শুল্ক এবং সোজাসুজি অর্থসাহায্য করে যে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল, আমাদের দেশে তা চাইতে গেলে বলা হবে যে ওসব হল সংধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকের কর্মপন্থা; অতএব, অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকুর চেষ্টা করাই ভালো।

তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই এই মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একবার যখন জর্মান এবং অন্য কয়েকটি ইয়োরোপীয় গভর্মেণ্ট নিজেদের দেশের চিনির কারখানাগুলিকে অর্থ সাহায্য করে ভারতবর্ষে সস্তায় চিনি চালান দিতে প্রণোদিত করেন, তখন আমাদের দেশের শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে রাণাডে বিদেশী চিনির উপরে কর বসানোর পক্ষে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। এই অভিমত প্রকাশিত হয় বোম্বাইয়ের 'টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনটি পত্রের আকারে, ১৮৯৯-এর মে ও জুন মাসে। লেখার নিচে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্‌স্" ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছিল। এই চিঠিগুলি যে রাণাডের লেখা তা অনেকেরই জানা ছিল না; কিছুদিন পূর্বে রাণাডের অন্যতম শিষ্য বামনগোবিন্দ কালে এগুলি প্রকাশ করেন।

এই চিঠিগুলির প্রকাশে রাণাডের রচনার এদিকটা পরিষ্কার হয়। তাঁর লেখা পড়ে প্রত্যেক পদে মনে হয় যে এইবার তিনি সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের উপরে জোর দেবেন; কিন্তু পাতার পর পাতা উল্টে

দেখা যায় যে 'জাতীয় অর্থনীতি'র যিনি ভারতীয় প্রবর্তক তিনি এই অর্থনীতির প্রধান অস্ত্র পরিহার করেই চলেছেন। এই পরিহারের কারণ এই নয় যে রাণাডে অবাধ বাণিজ্যের মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন; এর একমাত্র কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের সরকারি কর্মপন্থায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন তখন সম্ভব হত না। মনে মনে সংরক্ষণনীতির দৃঢ় সমর্থন করলেও প্রকাশিত রচনায় মনের ভাবকে অন্য রূপ দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

রাণাডের এই নিরুদ্ধ কামনা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয়, বিশেষ করে, বোম্বাইবাসী অর্থনীতি-লেখকদের হাতে মুক্তি পেল। গত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের অর্থনীতি আলোচনায় একটি মাত্র সুর দেখা গিয়েছে— সংরক্ষণ, আরো সংরক্ষণ, এবং তার পরেও যদি কিছু সম্ভব হয় তবে তা-ও। বাছাই করা শিল্প বিশেষকে আমদানি শুল্ক বসিয়ে সাহায্য করার নীতি ১৯২২-এ গৃহীত হয়। তার পর থেকে অল্প কয়েকজন লেখক বাদে আর সকলেই সংরক্ষণনীতির গুণগান করে চলেছেন—লিস্টের পুস্তক রচনার শতবার্ষিকীর যথাযোগ্য উৎসব যুদ্ধ না থাকলে বোধ হয় ভারতবর্ষেই মহাসমারোহে করা হত। সংরক্ষণ-নীতির সমর্থনে এই বিরাট অভিযান রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিণতি। রাণাডের বিরাট প্রভাবের প্রমাণ অবশ্য এতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনুশীলনের বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পথপ্রদর্শনের সার্থকতা এই নয় যে তাঁর দেখানো পথকেই একমাত্র পথ ধরে নিয়ে একাগ্র মনে আমরা সেই পথে চলব; পথপ্রদর্শকের সত্যিকারের সাফল্য আসে তখন, যখন আমরা নির্দেশিত পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নিজেদের দৃষ্টির প্রসার লাভ করি এবং নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নিতে পারি। রাণাডের রচনার আবির্ভাব ভারতীয় অর্থনীতি আলোচনার পথে প্রথম নির্দেশ। ১৮৯০-তে সম্পূর্ণ 'জাতীয়' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা পাওয়া ছিল দেশের সৌভাগ্য; কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছরেও রাণাডেকে অতিক্রম না করতে পারা আমাদের দুর্ভাগ্য। ১৮৯০তে রাণাডে যা' চেয়েছিলেন মূলতঃ আমাদের দেশের আজকালকার অর্থনীতির পণ্ডিত তাই পেলেই খুশি; রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ত্রুটি ছিল সে ত্রুটি আমাদের এখনও আছে।

রাণাডের প্রভাবের স্থায়িত্ব আমাদের দেশের চিন্তার দারিদ্র্য সূচিত করে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই; অন্যদিকে অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হয় যে নিজের কালকে অতিক্রম করে যিনি না দেখতে পান তাঁর লেখার প্রভাব বেশী দিন থাকে না। পরাধীন, কৃষিপ্রধান, পশ্চাদ্‌বর্তী দরিদ্র দেশের অর্থনীতি কি রকম হওয়া উচিত তাই ছিল রাণাডের প্রধান আলোচ্য। ১৮৯০-এর ভারতবর্ষ আমাদের অনেক পিছনে পড়ে আছে; কিন্তু দেশের মূল রূপটি এখন পর্যন্ত এমন আছে যে রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের চোখেই অস্বাভাবিক ঠেকে না। আধুনিক অর্থনীতি চর্চায় 'জাতীয়' দৃষ্টিভঙ্গী দোষের নয়, অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতীয়তার কাঠামোর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, আজকালকার আর্থিক সমস্যার জটিলতা আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। দেশের মোট-সম্পদ বাড়ানো সহজ নয় এবং বিশেষতঃ যদি ব্যক্তিপ্রধান সমাজে এই চেষ্টা করা হয় তবে সম্পদ বৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারে অল্প লোকেই। উৎপাদনের সমস্যা আজও বড় সমস্যা; কিন্তু তার সঙ্গে আরো অনেক প্রশ্ন ওঠে— উৎপাদনের কাজে প্রধান হাত থাকবে কার? ধনিকের, না মজুর-সমবায়ের, না জনসাধারণের প্রতিনিধি যে সরকার তার? উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের অসাম্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান কি করে হয়? ব্যবসায়ের তেজীমন্দার বিষময় ফল দূর করবার উপায় কি? কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দেশের লোকের প্রায় সকলকে কোনো

না কোনো কাজ দিয়ে রাখা যায়? 'কর্মখালি'র সংখ্যা থেকে যে দেশে সাধারণতঃ বেকার লোকের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী, সে দেশে কি উপায়ে বেকারের সংখ্যার চেয়ে কাজের সংখ্যা বাড়ানো যায়? আমাদের দেশের অর্থনীতি আলোচনায় যখন আজ পর্যন্ত দেখি খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি অভিভাবকত্বের বৃদ্ধি কামনা, যখন দেখি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টার অভাব, যখন দেখি নূতন চিন্তার প্রতি অবিশ্বাস বা বিশ্লেষণের প্রতি অমনোযোগ, তখন অনেক সময় মনে হয়, রাণাডের প্রভাব এখন কিছুটা কমিয়ে আনবার সময় এসেছে। ভারতীয় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাসে রাণাডের গৌরবময় স্থানের কথা আমরা ভুলব না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আশা আমরা যেন রাখতে পারি।

মহাত্মা গান্ধী

গান্ধী ও লেনিন

মানুষের মনকে যেমন চারিদিক হইতে বিপুল তমসা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তেমনই আবার সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকার জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মত ব্যক্তিরও কোনদিন ইতিহাসে অভাব হয় নাই। বারংবার এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা সংগ্রামও করিয়াছেন ও স্বীয় অন্তরকে তমসার স্পর্শ হইতে নিষ্কলুষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগে আমরা অন্তত দুইজন এমন পুরুষের সাক্ষাৎ পাই যাঁহাদের চরিত্র সংগ্রাম এবং বিজয়লাভের সার্থক চিহ্ন বহন করিয়া রহিয়াছে। কী অপরিসীম বেদনার আঘাত বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহারও সুস্পষ্ট ছায়া উভয়ের জীবনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। লেনিন এবং গান্ধী—কঠোর এবং অবিচ্ছিন্ন সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় ও দরিদ্র এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর মমতায় দুইজনের মধ্যে কি গভীর মিলই না আছে, অথচ অন্তরের বিশ্বাসে বা দৃষ্টির ভঙ্গীতে দুইজনের মধ্যে কতই না প্রভেদ বর্তমান।

লেনিন এবং গান্ধী উভয়েই মনে করেন সমগ্র পৃথিবীর বহু দুঃখের মূলে রহিয়াছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যাহার ফলে এক শ্রেণীর লোক অপর এক শ্রেণীর শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে শুধু যে নির্যাতিতের জীবনই জীর্ণ হয় তাহা নহে, শোষকশ্রেণীও অধঃপতনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের জীবনকে সুখে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপরোক্ত ব্যবস্থাটিকে নিঃশেষে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; এই পর্যন্ত গান্ধী এবং লেনিনের মতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব সে বিষয়ে দুইজনে বিভিন্ন মত পোষণ করেন; উপরন্তু যে মনোভাব লইয়া উভয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে চান সে মনোভাবের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে।

লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে এই অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়া রহিয়াছে কারণ রাষ্ট্রশক্তি শোষকশ্রেণীর আয়ত্তের অধীন রহিয়াছে। যদি কোন উপায়ে সেই শক্তি শোষিত শ্রেণীর অধিকারে আনা যায়, তবে তাহারা সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমাজকে এমন নূতনভাবে রচনা করিবে যেখানে পুরাতন অনাচারের পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব হইবে না। সেইজন্য লেনিনের সমস্ত বিপ্লব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল কি উপায়ে রাজশক্তিকে নিপীড়িতের আয়ত্তে আনা যায়, এবং ইহার জন্য তিনি কখনও বিপ্লবের রক্তকলঙ্কিত পথকে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অথচ অন্তরে তিনি এমনই দিনের স্বপ্ন দেখিতেন যখন মানুষে মানুষে ভেদ নাই, কলহ নাই এবং শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর রক্তমাখা দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটিয়াছে।

গান্ধী কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর লোপ সাধনের জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্য উপায়ে বিশ্বাস করেন! লেনিনের কর্মধারার মধ্যে কেন্দ্রে শক্তির পুঞ্জীকরণ অবশ্যম্ভাবী; গান্ধী কিন্তু ইহাতে আপত্তি করেন, কারণ কেন্দ্রের শক্তি যদি প্রধানত বাহুবলের উপরে নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহাতে বিকৃতি ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। যদি কেহ যুক্তি দেন যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সাধু অর্থাৎ নিঃস্বার্থ লোকের হাতে ন্যস্ত

BAPUJI
24 1930

থাকিবে তাহাকে গান্ধী জিজ্ঞাসা করেন, যদি তেমন অল্পসংখ্যক লোকও পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ লোকের সংখ্যা কোনও উপায়ে বৃদ্ধি করিয়া যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বিকেন্দ্রীকরণের অবস্থাতেও চালানো যাইবে না কেন ? রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সমস্যাকেই গান্ধী মূল সমস্যা বলিয়া মনে করেন না, রাষ্ট্রের অধিকার কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের হাতে গিয়াছে বলিয়াই যে এত গোলযোগ তাহাও তিনি ভাবেন না। রাষ্ট্রের পরিচালকগণ আজ অপর সমস্ত জনগণের জীবনের উপরে যে কর্তৃত্ব পোষণ করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে জনতার আলস্য, অজ্ঞতা এবং ভয়। ফলে শাসকশ্রেণী নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয় এবং শাসিতশ্রেণী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বর্তমান অস্বাভাবিক ও অকল্যাণকর সামাজিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। যদি মানুষ পীড়নের ভয়কে অন্তর হইতে বর্জন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে শারীরিক শ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া নূতন সমাজ রচনার জন্য যথাযোগ্য পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা হইলে মানুষকে সুস্থ কল্যাণকর সমাজব্যবস্থার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। নিজে শ্রমপরাঙ্মুখ হইব না, অপরের শ্রমের উপরের জীবনযাপন করিব না, এবং ন্যায্য অধিকার কেহ অপহরণ করিতে আসিলে অহিংসভাবে তাহার প্রতিরোধ করিব—এই প্রতিজ্ঞার উপরেই ভাবী সমাজ গড়িয়া উঠিবে। মানুষের অন্তরে আজ সেই প্রতিজ্ঞা এবং যথোচিত শিক্ষার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই ধনতন্ত্র আজ তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিয়া মনুষ্যসমাজকে নিপীড়িত করিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের ফলে ধনীদের শোষণের সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব হইয়াছে, মানুষের অন্তরে বহুবিধ তমসা সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া। অতএব সেই তমসাকে যথোচিত সাধনার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রশক্তির অধিকার লাভ গৌণবস্তু, সমাজের মুখ্য সমস্যা ইহার মধ্যে নিহিত নয়।

সমাজের বর্তমান রোগের নিদান সম্বন্ধে গান্ধী উপরোক্ত মত পোষণ করেন বলিয়া তাহার সকল চেষ্টা মানুষের মনের মধ্যে সঞ্চিত মলিনতাকে দূর করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। একদিকে গঠনকর্ম, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে উল্লিখিত আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। গান্ধীর বিশ্বাস, যদিও এ-জাতীয় স্বরাজসাধনাকে আপাততঃ মন্দগামী বলিয়া মনে হইতে পারে, তবু আসলে বিপ্লবের ইহাই দ্রুততম পন্থা, কেননা সত্যাগ্রহের দ্বারা সমাজে যে-পরিবর্তন ঘটে তাহা স্থায়ী পরিবর্তন। স্বরাজসাধনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ শক্তিশালী হইয়া উঠে, এবং আজ যে সকল শ্রেণী-স্বার্থ তাহাদের অভ্যুদয়ের অন্তরায় হইয়া আছে, সেগুলি সহযোগিতার অভাবে শুষ্ক নির্বীর্য তরুর মত একদিন ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়া যায়।

গান্ধী এবং লেনিনের কর্মধারার মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায় তাহা আসলে উভয়ের সমাজ-দর্শনের মধ্যে প্রভেদের কারণেই ঘটিয়াছে। লেনিন মনে করিতেন, মানুষ একান্তভাবেই অবস্থার দাস। অতএব মানুষকে যদি সৎ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে এমন সামাজিক অবস্থার মধ্যে রাখিতে হইবে যেখানে কোন অন্যায় করার সুযোগ নাই। তাহা হইলেই সাধুতা বা নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গের ভাব মানুষের অন্তরে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। সেইজন্য মানবসমাজের জন্য তিনি এমন একটি ব্যবস্থা নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যেখানে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সর্ববিধ শোষণ অপসারিত হইয়াছে এবং লোকে শোষণহীন পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমান-অধিকারসম্পন্ন জীবনযাত্রার অভ্যাস গঠনের সুযোগ লাভ করিয়াছে।

গান্ধী কিন্তু অভ্যাসের উপর রচিত সততার উপর আস্থা রাখেন না। তাঁহার মতে এরূপ সততা ক্ষণভঙ্গুর বস্তু। স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য মানুষের বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, এবং বুদ্ধির পরিশোধ অভ্যাস পরিবর্তনের দ্বারা হয় না। অতএব আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্তরের স্থায়ী পরিবর্তন কি উপায়ে আনা যায় সেইদিকে। নানামুখী কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা যখন অন্তর উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইবে, ভয়, আলস্য, লোভ প্রভৃতি তমসার নিগড় হইতে উত্তরোত্তর মুক্তিলাভ করিবে, সমাজের বহিরঙ্গের রূপও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। বহিরঙ্গের পরিবর্তন আত্মশুদ্ধির মানদণ্ড বলিয়াই আমরা বিবেচনা করিব; জোর করিয়া বহিরঙ্গের পরিবর্তন সাধন ঘটাইতে পারিলেই যে মানুষের অন্তর বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে, এ ভরসা গান্ধীজী কিছুতে করিতে পারেন না।

গান্ধীকে এইদিক হইতে ভারতীয় সাধনাধারার যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যায়। মূলত তিনি ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে বেশী জোর দেন, সমাজের বহিরঙ্গের পরিবর্তনের গুরুত্ব তাঁহার নিকট অপেক্ষাকৃত কম। সমাজ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের যে সাধনপন্থা গান্ধী রচনা করিয়াছেন তাহার বিশেষত্ব হইল এই যে, সেখানে সত্যাগ্রহী মূলে বহুজনের সহযোগিতার উপরে নির্ভর করেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি একাও চলিতে পারেন, এবং তাঁহার চলার ধরনই এমন যে, সে একা-চলা একদিন সমাজের সকলের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া সকলকে জাগাইয়া তোলে। মানুষ আজ অবশ্য অভ্যাসের দাস। লেনিন ইহার সুযোগ লইয়া সমাজের বহিরঙ্গে বিপ্লবসাধন করিয়া সেই অভ্যাসকে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গান্ধী মানুষের এই স্বভাবটির উপরে কিছু রচনা না করিয়া তাহার অন্তরের শুভ সম্ভাবনাকে জাগ্রত করিতে চান, এবং সেই সম্ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের কল্যাণসৌধ রচনার জন্য আগ্রহান্বিত হন। মানুষের বর্তমান দুর্বলতাকে আশ্রয় করিয়া কিছু রচনা করিলে সেই দুর্বলতা স্থায়ী হইয়া থাকিবে। ইহাই হইল গান্ধীর প্রধান আপত্তি। এক্ষেত্রে কাহার মত শ্রেষ্ঠ, কোন্ পথে মানুষ শেষ পর্যন্ত শোষণবিহীন নূতন সমাজ রচনা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা ইতিহাসের দেবতা ভিন্ন আজ কে বলিতে পারে?

লেনিনের মূর্তি ছিল এক মহা ক্ষত্রিয়ের মূর্তির মত। মানবসমাজের অভ্যুদয়ের পথে তিনি এক মহান আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর এক স্বর্ণযুগের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল, যেখানে মানুষের মধ্যে আলস্য-অবসাদ তিরোহিত হইয়াছে, সকলে পরস্পরের প্রতি প্রেমের আশ্রয়ে জীবন নির্বাহ করে এবং প্রত্যেকে স্বীয় প্রতিভা এবং পরিশ্রমের ফলাফল একান্তভাবে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করে। অন্তরে যে উজ্জ্বল আশার আলো লেনিন জ্বালিয়াছিলেন, বাহিরেও তাহার সমর্থনের তিনি সন্ধান করিয়াছিলেন। মাটির ধরণীতে, বাস্তবের পটভূমিতে অন্তরের বিশ্বাসের সমর্থন না পাইলে তাঁহার যেন স্বস্তি হইত না; এবং ইতিহাসের পটলেখায় স্বীয় আদর্শের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজিয়া লইতেও তাঁহার বিলম্ব ঘটে নাই। ইতিহাসের দেবতা আবির্ভূত হইয়া অঙ্গুলিসংকেতে লেনিনকে যেন মানবসমাজের অনিবার্য পরিণতির আভাস দিয়া গেলেন এবং ভাগ্যবিশ্বাসী বাস্তবে আমোদিতচিত্ত দার্শনিক সেই দর্শনের ফলে কঠিনতম শাসনের দ্বারা ইতিহাসের অনিবার্য গতির সহায়তার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ে মানুষের প্রতি একান্ত প্রেম বহন করা সত্ত্বেও লেনিনের পক্ষে নিষ্ঠুর বা নির্মম হইতে বাধে নাই। লেনিনের বিশ্বাস ছিল, আজ যদিও তাঁহার পথ হিংসা ও নিষ্ঠুরতার অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে, তবু ভবিষ্যতে এমন সুদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আর নরহত্যার প্রয়োজন হইবে না, তখন লৌহ-তলোয়ারের পরিবর্তে আমরা

শুধু মানুষের ব্যবহারের জন্য যাবতীয় যন্ত্র নির্মাণ করিব, কেননা তখন ত আর মানুষের পক্ষে মানুষকে ঘৃণা করিবার অবকাশই থাকিবে না। কিন্তু যতকাল সেই সুদিনের উদয় না হয়, ততকাল আমাদিগকে হিংসা এবং রক্তরঞ্জিত বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, ইতিহাসের ইহাই অমোঘ নীতি। লেনিন ছিলেন কর্মের মত্ততায় আবদ্ধ শিল্পীর মত। রাত্রির অন্ধকার আকাশের তলায় কামার যেমন স্বীয় কর্মশালার আগুনের আলোয় কাজ করিয়া, বারংবার হাতুড়ির আঘাতে নূতন নূতন অস্ত্র গড়িতে থাকে, লেনিন সমাজ-পরিবর্তনের সাধনায় ছিলেন তেমনই একাগ্রচিত্ত। স্বীয় কর্ম-ধারাকে আলোকিত করিবার জন্য, তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য তিনি নিজের হাতে ইতিহাসের উপাদানের সাহায্যে প্রয়োজনমত আলো জ্বালিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দূর গগনের অন্ধকারে যে-সকল তারকা নিথর নিশ্চল আলোক বর্ষণ করিয়া যায়, তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, প্রকৃতি-দেবীর নিকট সমগ্র মানবসমাজের উত্থানপতনের মূল্য যে সামান্যতম কীটাণুকীটের উত্থানপতনের চেয়ে সমধিক প্রিয় নয়, এ সম্ভাবনা তাঁহার মনে কোনদিন স্থান পায় নাই।

কিন্তু গান্ধী চলিয়াছেন চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মত। পথের তাঁর সমাপ্তি কোনদিন নাই, পরিব্রাজকের দণ্ড হাতে ধরিয়া এক অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সুদূর আলোকতীর্থের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহার আশার আলোয় উজ্জ্বল, চিরন্তন সত্যের মত সেই আশার নিকট তিনি একান্তভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কোথায় সেই আশার উৎপত্তি তাহা তিনি জানিতে চাহেন না। পরিশুদ্ধতম অন্তরের অন্তঃস্থলে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আশার বাণী শুনিয়াছেন। ইহাই গান্ধীর পক্ষে যথেষ্ট। অন্তরে অন্তরে তিনি জানেন, ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগ কোনদিন সত্য সত্যই আসিবে কিনা, এ-প্রশ্ন করার অধিকার তাঁহার নাই। পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার অন্তরে প্রকাশের বেগ যেমনভাবে দেখা দেয়, গান্ধীও অনুরূপ বেগের বশবর্তী হইয়া অবনতমস্তকে জীবনে আগাইয়া চলেন, স্বীয় দেহ-মনকে প্রকাশের উপযুক্ত আধারে পরিণত করার জন্য পরিশ্রম করেন, কেননা সাধকের কর্তব্য ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নহে।

গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস, ভাবীকালের রূপভোগের অধিকার ঈশ্বর মানুষকে কখনও দেন নাই। তিনি শুধু আমাদের যৎসামান্য স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহাও পথ-নির্বাচনের সম্পর্কে, কর্মের ফলাফলের উপরে নয়; এবং সে পথও প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে। তাই গান্ধীর সকল চেষ্টা হইল, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, সহজ শান্তির অবস্থাতেই হউক বা নিষ্ঠুর আত্মঘাতী কলহের মধ্যেই হউক, সেই প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। জীবনব্যাপী অবিচ্ছিন্ন অমিত চেষ্টার ফলে তিনি সেই পথও আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। সে পথ হইল অত্যাচারীর হৃদয়কে অহিংস উপায়ের দ্বারা আঘাত করা, পরিবর্তন করা; তবেই আজ যে শোষিত এবং আজ যে শোষক তাহারা উভয়ে সত্যাগ্রহের ফলে পরিবর্তিত অন্তর লইয়া ভবিষ্যতের শোষণবিহীন সমাজ রচনায় পরস্পরের সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে। গান্ধী বলেন, জানি এ পথ দুরূহ, কবে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিব ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তাহা জানে না; কিন্তু মানুষের পক্ষে কল্যাণের দ্বিতীয় পথ আর নাই। পথের সন্ধানেই গান্ধীর সকল শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

কিন্তু দুর্বল মানুষের মন পথের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে এবং ফলাফলের প্রতি ঔদাসীন্যের দ্বারা পীড়িত হইয়া উঠে। আমরা কাতর হৃদয়ে আরও দৃঢ় কোন অবলম্বনের সন্ধান করি। গান্ধীজীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে কি আশার আলোয় ছুটিয়া চলা আমাদের পক্ষে অন্যায়, কর্মফলের সম্বন্ধে সর্বথা আমাদিগকে উদাসীন হইতে হইবে? গান্ধী হয়ত উত্তর দেন, না, তাহা কেন? মানুষ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের সুখরাজ্যের স্বপ্ন দেখিবে, যখন কেহ স্বীয় শ্রমের উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত হয় না; কিন্তু শুধু সেই স্বপ্নে বিভোর না হইয়া সাধনোপায়ের প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ কর।

অতি অল্পসংখ্যক সুযোগ্য অধিকারী সাধকের নিকট কিন্তু গান্ধী অন্য কথা বলেন। গান্ধীর ধারণা, ঈশ্বর আমাদের শুধু আশার ছলনায় ভুলাইয়া নিজের অভীপ্সিত পথে চালিত করেন। এবং যখনই তাঁর ইচ্ছার উদয় হয় তখনই তিনি আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া অবর্ণনীয়-দুঃখের মধ্যে আমাদের নিক্ষেপ করিতে পারেন, কেননা ঈশ্বরের মত নিষ্ঠুরও বিশ্বসংসারে আর কেহ নাই। মানুষের কর্তব্য হইল, শুধু নিজের নির্দিষ্ট কর্মে একান্তভাবে পরিশ্রম করা এবং ফলাফলের চিন্তা না করিয়া মানবসমাজের অভ্যুদয়ের পথে সকল বাধার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রোধশূন্য হৃদয়ে অহিংস সংগ্রাম করা। ভগবানের রথ যে-পথ একদিন অতিক্রম করিয়া যাইবে আমরা শুধু সেই পথরচনায় নিয়োজিত মজুরের শ্রেণী, তাহার বেশী মূল্য মানুষের কিছু নাই। স্বীয় মাতৃভূমির সম্পর্কেও সেই জন্য গান্ধী নিষ্ঠুর আদর্শের প্রভাবে এ-কথা বলেন, 'স্বদেশবাসীর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের চাই বই কি, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত জনগণের জন্য অন্ন এবং বস্ত্রের আয়োজন আমাদের নিশ্চয়ই করিতে হইবে; কিন্তু সে-শুধু ভারতবর্ষের মানুষকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য সহমরণের বধূর সাজে সাজানোর মত।'

My idea of nationalism is that my country may be free that, if need be, the whole country may die, so that the human races may live.

কি ভয়ংকর বাণী! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী আবার আমাদিগকে আশ্বাস দেন যে, মানুষের তপস্যা-সহনের শক্তিও অসীম, অতএব আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। কেবল এই নশ্বর দেহের প্রতি আসক্তি যদি আমরা অতিক্রম করিতে পারি এবং সর্বশক্তিময় ঈশ্বরে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রেমের গুরুভার বহন করিবার শক্তি আমরা নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিব।

সহগামী তীর্থপথিকগণের নিকট ইহা ভিন্ন গান্ধীর আর কোন বাণী নাই। দূরান্তরবর্তী কোন স্বপ্নের আভাস দিয়া তিনি সহযাত্রীদের বৃথা সান্ত্বনা দেন না, শুধু পরিব্রজ্যার পথে কোন্ কণ্টকময় দুরূহ পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহারই সংবাদ গান্ধী বহন করিয়া আনেন। যে পথে মানুষ তপস্যার দ্বারা জীবনকে সমর্পণ করিয়া সমগ্র মানবজাতির পক্ষে পরিপূর্ণ জীবন সম্ভব করিতে পারে তাহারই সংবাদ তিনি মানুষকে শুনাইয়া থাকেন। পথের সন্ধান আজও তাঁহার শেষ হয় নাই; কিন্তু সেই পথের বন্ধুরতার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের খড়্গ যেন জলন্ত দ্যুতির ভাস্বর আবর্ত রচনা করিয়া ঘুরিতেছে। পথের বন্ধুরতাকে নমস্কার, উপরের অগ্নিময় খড়্গ, তোমাকেও নমস্কার। নিঃশেষে উভয়কে স্বীকার করা ভিন্ন মানুষের অপর কোন কর্তব্য নাই। ব্যক্তির সুখ এবং দুঃখ বিশ্বগ্রাসী পটভূমির সম্মুখে একান্ত তুচ্ছ সামগ্রীতে পরিণত

প্রার্থনারত গান্ধীজী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতন, ১৯৪৫

মহাত্মা গান্ধী

চীনদেশের শিল্পী জু পিঁয় কর্তৃক অঙ্কিত পেন্সিল-স্কেচ। ১৯৪০

হয় ; জীবন এবং মৃত্যু নিঃসঙ্গ যাত্রীর পদচিহ্নের মত পরম্পরায় আকার ধারণ করে— জীবনের আকর্ষণ অথবা মৃত্যুর বিভীষিকা দুইই সুদূরগামী পরিব্রাজকের নিকট পরিব্রজ্যার দণ্ডে পরিণত হয়।

জীবনের পথে যা কিছু দুঃখ, যা কিছু বেদনাময় তাহাকে গান্ধী তপস্যার অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের সহজ মন তাঁহার পথে বিরত হয়। কিন্তু গান্ধী যে কোনও মানসিক বিকৃতির বশে বেদনা ও তপশ্চর্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহা সত্য নয়। আলো এবং ছায়া, জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের পরিপূরক, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ডের একত্ববোধ হইতে। বিশ্বলীলার কোন অংশকেই তিনি খণ্ডিত করিয়া দেখিতে বা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। ব্যথা-যন্ত্রণার বাণীবাহী গান্ধীর দর্শনের এই দিকটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বারংবার আহত করিয়াছিল। তাঁহার চিরদিনই ভয় ছিল, গান্ধীর নেতিমূলক অসহযোগের বাণী ভারতের চিত্ত বিশ্বজনের সহিত সম্পর্ক-স্বীকৃতির পথে বাধা দিবে, তাহাকে কাঠিন্য ও সংকীর্ণতার নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু স্বয়ং গান্ধীর মধ্যে তপশ্চর্যা কোনদিন কালিমার চিহ্নটুকু পর্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ঈশ্বরের এবং মানুষের প্রতি প্রেমের নদীতে স্নানের দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিগত সকল বেদনার শেষ চিহ্ন হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া শুভ ও উজ্জ্বল হইয়া আছে।

গান্ধীর দর্শন যদি এমনই চরিত্রের হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত আশাবাদের কোন স্থান নাই, যেখানে মৃত্যুর নির্মম স্বীকৃতির দ্বারা পথ ছায়াশূন্য হইয়া আছে, তবে সহজেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ইহা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র মানুষ কেন এই নিষ্করুণ পথচারীকে অনুসরণ করিয়া থাকে? ইহার মূল কারণ গান্ধীর দর্শনে পাওয়া যাইবে না, পাওয়া যাইবে তাঁহার চরিত্রে। গান্ধীর চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা শুধু যে ভারতীয় বিপ্লবের ধারাকে বুঝিতে পারি তাহা নয়, বিশ্বের সকল বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানও সঙ্গে সঙ্গে পাই। লেনিনের চরিত্রকে বাদ দিয়া রুশ বিপ্লবকে বুঝা যায় না, খ্রীষ্টের চরিত্র পর্যালোচনা না করিলে তাঁহার প্রবর্তিত নীতি জগতে যে বিপ্লবের সূচনা আনয়ন করিয়াছিল তাহাও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তেমনই গান্ধীর নীতি বা দর্শনের যে কোন চরিত্রের পরিণতিতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া সেই নীতি বা তাহার প্রভাবকেও যথাযথ বিচার করা যায় না। যে-কোন আদর্শ ই হউক, তাহা মানুষের চরিত্রের সুষ্ঠু পরিণতির মধ্য দিয়াই শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে।

একা পথিকের মত গান্ধী নিঃসঙ্গ তীর্থপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, হৃদয় তাঁহার দীনতম মানুষের তুচ্ছতম ভারেও ভারাক্রান্ত, এবং সেই দুঃখ বিনাশের জন্য তিনি স্বীয় জীবনকে চরম হোমাগ্নির মধ্যেও আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত—এমন চরিত্র সহজেই জগতের দীনজনের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। আকাশে কোন হিমতারকাকে লক্ষ্য করিয়া পথিক আগাইয়া চলিয়াছেন তাহা মানুষে আর খুঁজিয়া দেখে না।

এমন মানুষ যে-যুগে জগতে জন্মিয়াছেন, সমাজের পরিবর্তন সাধনের জন্য বারংবার আত্মাহুতি দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, সে-যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া নিজেদের ধন্য মনে করি। কারণ মানুষের অন্তরে কী বল যে স্ফুরিত হইতে পারে, ইঁহারা তাহার সাক্ষ্য বহন করিয়া চলেন। এমন চরিত্রের প্রভাবে আমাদের অন্তরের শক্তিও বিকাশলাভ করে এবং স্বধর্মানুযায়ী আদর্শের পথে অগ্রসর হইবার সাহস এবং শক্তি আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

গান্ধীজী ও তাঁহার চরকা

কিছুদিন পূর্বে মিঃ পি স্প্র্যাটের লেখা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতেছিলাম। বইখানি রচনার জন্য লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া গান্ধীবাদকে বুঝিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু বইখানি পড়িয়া আমার ইহাই মনে হইল যে নিজের সংস্কারকে বৈজ্ঞানিকের মত চেষ্টা করিয়া যদি যথাসম্ভব বর্জন না করা যায় তাহা হইলে হয়ত অপরের মতকে ঠিকমত বোঝা যায় না। কোনও মতকে বোঝা এবং তাহার বিচার করা স্বতন্ত্র বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ গান্ধীজীর চরকাপ্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে।

পণ্ডিত জওহরলাল কলকারখানা বিস্তার এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের ভোগের পরিমাণে উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজিকার দিনে তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া চরকা প্রচলনের সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে আজ হঠাৎ চেষ্টা করিলেও ইচ্ছামত তাড়াতাড়ি কলকারখানা স্থাপন করা যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। উপরন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কলকারখানা বৃদ্ধি পাইলে হয়ত ভারতের সকল কর্মঠ মানুষকে কাজও দেওয়া যাইবে না এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও উত্তরোত্তর ধনীশ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহা জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কাহারও কাম্য নয়, কেননা ধনতন্ত্রের আওতায় কল-কারখানার প্রসার হইলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যে তিমিরে হয়ত সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। মিঃ স্প্র্যাটও তাঁহার বই-এ এ-কথা বলিয়াছেন যে, অনাহার-নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় চরকা চালানো যাইতে পারে। যেখানে মানুষকে আর কোন কাজ দেওয়া যাইতেছে না সেখানে অন্তত কিছু কাজ দিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহার দ্বারা কি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব? নানাদিক হইতে বিষয়টি বিচার করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী চরকার উপরে এত বেশী জোর কেন দেন তাহা বোঝা গেল না।

এই ত গেল যাঁহারা কলকারখানায় বিশ্বাস করেন অথচ অবস্থাবিপাকে চরকা চালাইতেও রাজি হইয়াছেন তাঁহাদের কথা। অপর পক্ষে গান্ধীজীর মতবাদ স্বীকার করেন এবং হয়ত চরকা-প্রচারের জন্য চেষ্টাও করিতেছেন এমন এক শ্রেণীর কর্মীও আমাদের দেশে আছেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ মনে করেন, গান্ধীবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এমন কিছু কর্মী চাই যাঁরা বৎসরে লক্ষগজ করিয়া সুতা নিয়মিতভাবে কাটিবেন। আজ যেখানে একজন বা দুইজন চরকায় অনুরাগী আছেন, সেখানে তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে আরও অনেকে হইবেন ; এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে ভারতবর্ষ হইতে শুধু চরকার সহায়তায় আমরা বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, শেষে এমন কি স্বদেশী মিলের তৈয়ারি কাপড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বর্জন করিতে সমর্থ হইব।

অথচ গান্ধীজীর লেখার মধ্যে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে যে তিনি চরকাকে এইজাতীয় মারণাস্ত্র বলিয়া কল্পনা করেন নাই। চরকা বলিতে তিনি কি বোঝেন এবং কেনই বা চরকার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক প্রীতি, সে-কথাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। সত্যই কি গান্ধীজী চরকার সাহায্যে দেশের গরিব লোকদের মুখে কেবল দুমুঠা অন্ন জোগাইতে চান, না ইংরেজ ও বোম্বাইএর

কলওয়ালাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতে চান, অথবা তাঁহার কল্পনায় আর কিছু আছে, ইহা আমাদের জানিতে হইবে।

ভালই হউক আর মন্দই হউক, গান্ধীজীর প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে কম নয়। বুদ্ধিমান কোন কোন বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে ভারতবর্ষের লোক আজও গুরুবাদে বিশ্বাস করে বলিয়া এবং ভেল্কির দ্বারা স্বরাজলাভের আশা পোষণ করে বলিয়া গান্ধীজীকে মানে। যতদিন না তাহারা এই মানসিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতেছে ততদিন আমাদের উদ্ধার নাই। অর্থাৎ, সোজা কথা, গান্ধীবাদের উচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলেও যে-বস্তুকে আমরা ধ্বংস করিতে চাই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়; নয়ত আমাদের সদিচ্ছা অনেক সময়ে ফলবতী হয় না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মনে হইয়াছে গান্ধীজী চরকা বলিতে ঠিক কি বোঝেন, এবং গান্ধীবাদের মধ্যে চরকার স্থান কোথায় সে-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা গান্ধীবাদকে মানি আর নাই মানি, তাহার সম্বন্ধে মুক্ত বিচার সকল সময়েই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকের মত সে-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞান আহরণের পর মানা না-মানার প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।

কিছুদিন পূর্বে শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়ের সঙ্গে ছবির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। নূতন শিল্পীরা অনেক সময়ে ছবির বর্ণবিন্যাসে ভুল করিয়া বসেন। হয়ত বিষয়বস্তু এমন যে সেখানে স্তিমিত রঙ ব্যবহার করাই সংগত। অথচ তরুণ শিল্পী হয়ত সে-বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া নানাবিধ উজ্জ্বল চড়া রঙের সমাবেশ করিয়া বসেন। যামিনীবাবু প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, এরূপ অবস্থায় গুরুস্থানীয় শিল্পী চিত্রের শুধু একটি জায়গায় তুলি দিয়া মোটা একপ্রস্থ রঙ লাগাইয়া দেন এবং শিক্ষার্থীকে বলেন, এইবার তুমি উহার সহিত সংগতি রাখিয়া অবশিষ্ট রঙগুলি সংশোধন করিয়া লও। গুরু শুধু মূলমন্ত্রের মত একটি নির্দেশ দেন, অবশিষ্ট কাজ শিষ্যকে নিজে করিয়া লইতে হয়।

গান্ধীজীর চরকা সম্বন্ধেও আমার অনেক সময়ে এই কথাটি মনে হইয়াছে। তাঁহার চরকা বর্তমান সভ্যতার দোষকে সামান্য রিপুকর্ম করিবার ব্যবস্থা নয়, তাঁহার চরকাকে বর্তমান সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সমগ্র সভ্যতা এবং সমগ্র জীবনধারার মূলমন্ত্রের মত ধরা যাইতে পারে। মিঃ স্প্র্যাট চরকাকে যেমনভাবে দারিদ্র্য-রোগের উপশমের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলিয়াছেন, গান্ধীজীর নিকট তাহা চরকার সপক্ষে প্রধান যুক্তি নয়। কোন কোন চরকা-বিশ্বাসী কর্মী লক্ষ লক্ষ গজ সুতার সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের বিষয়ে যেমন উৎসাহিত হন, গান্ধীজী ঠিক তেমনটি হন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। গান্ধীজীর নিকট চরকা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনধারার প্রতীক। সেই জীবন-ধারার সঙ্গে বিজ্ঞান, এমন কি কলকব্জার অনিবার্য বিরোধ নাই।

বহুদিন পূর্বে গান্ধীজীর মনে একটি ধারণা নৈতিক বিচার এবং অভিজ্ঞতার ফলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোনও মানুষের পক্ষেই অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। সকল মানুষকেই জীবন ধারণের জন্য অন্ন এবং বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কেহ বুদ্ধি বেচিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করে এবং অপরের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত অন্নবস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে, কেহবা অন্য কিছু বিক্রয় করে। মূল কথা হইল বর্তমান জগতে অনেকে পরের শ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে; এবং যাহারা স্বীয় শ্রমোৎপাদিত পদার্থের দ্বারা অপরের জীবনকে পোষণ করে, তাহারাও যে স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে

উপরওয়ালাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজে ধনবণ্টনের দুর্ব্যবস্থার প্রভাবে, দারিদ্র্যের নিপীড়নে, অথবা শারীরিক শাসনের ভয়ে, শ্রমজীবীগণ নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ স্বীয় ভোগের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের নানা উপায় আছে। কিন্তু প্রধান ও সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল, যাহারা বুঝিয়াছেন যে আমরা অপরের অনিচ্ছাদত্ত বিত্তের প্রসাদে বাঁচিয়া আছি, সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধে যে বৃদ্ধ ভর করিয়া বসিয়াছিল, তাহার মত শ্রমজীবীদের স্কন্ধের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া প্রথমে মাটির পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিতে হইবে। টলস্টয় এবং রাস্কিনের লেখা পড়িয়াই গান্ধীজী প্রথমে অর্থনীতির এই মৌলিক সত্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

বর্তমান সভ্যতার পরিবর্তে গান্ধীজী যে সভ্যতার কল্পনা করেন সেখানে ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক অথবা বৈশ্যই হউক, কেহ শরীরযজ্ঞের দায় হইতে মুক্ত থাকিবে না। প্রত্যেককে স্বীয় শরীরের বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্ন হউক অথবা বস্ত্র হউক, নিজের ব্যবহারে উপযোগী বা সমপরিমাণ পদার্থ সমাজের জন্য সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে কি বুদ্ধিধর্মী লোকের স্থান নাই? শিক্ষকের, শিল্পীর, সংগীতজ্ঞের স্থান সে-সমাজে হইবে না? গান্ধীজী মনে করেন, সকলের বিশেষ বিশেষ গুণের আদর ভবিষ্যৎ সমাজে নিশ্চয়ই করা হইবে। কিন্তু সেই গুণের জন্য তাঁহারা শরীরশ্রমের দায় হইতে মুক্তি পাইবেন কেন? বিশেষ গুণের জন্য তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মানলাভ হইবে, অন্তরেও স্বধর্ম পালনের দ্বারা তাঁহারা আনন্দলাভ করিবেন; কিন্তু প্রকৃতি সর্বমানবের উপর পরিশ্রমের যে-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। যদি নিতান্তই শিক্ষক, শিল্পী বা অপর কোন বিশেষজ্ঞ শরীরশ্রমের উপযোগী সময় বা অবসর না পান, তবে স্বীয় কর্মের জন্য তাঁহার পক্ষে সাধারণ মজুরের যে পরিমাণ অর্থের উপর অধিকার জন্মায় তদপেক্ষা অধিক বেতনের দাবি জন্মিবে না। সমাজে সকলের আয় যথাসম্ভব সমান হওয়া উচিত।

চরকা সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে। সেই জন্য গান্ধীজী ১৯৪০ সালে গান্ধী-সেবা-সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:

If Gandhism means simply mechanically turning the charkha, it deserves to be destroyed. Millions of women used in the past to spin regularly, but they were immersed in slavery. I would, therefore, repeat again that, even if you spin all the twentyfour hours mechanically, it will not do···We have to spin intelligently and with a full consciousness of all the implications of spinning. Then it will brighten your intellect, strengthen your mind and heart, and take you more and more towards the goal. (*Harijan*, 2-3-40).

অর্থাৎ যামিনীবাবু শিল্পের ভুল ছবির উপরে যে গুরুর এক প্রস্থ রং দেওয়ার গল্প বলিয়াছিলেন, গান্ধীজীর পক্ষে চরকা বর্তমান সভ্যতার উপরে সেই রকম রঙের একটি পোঁচ। ইহার সঙ্গে সংগতি রাখিতে হইলে, জীবনের অপরাপর সকল ব্যাপারকেই ঢালিয়া সাজিতে হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার পরিবর্তে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে ফিরাইয়া আনাই গান্ধীজীর লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ভারতেও যথেষ্ট ধনবৈষম্য ছিল, সামাজিক অত্যাচার ছিল। চরকাও ছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে নাই। গান্ধীজী যে-সভ্যতা গড়িতে চান তাহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহা যে পুরাতন সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করেন বলিয়া গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন:

১৯৪০। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা

ফটোগ্রাফ ঃ শ্রীনবীন গান্ধী

১৯২৫। শান্তিনিকেতনে অতিথিশালায় হাস্যালাপরত মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু

ফটোগ্রাফ : শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী
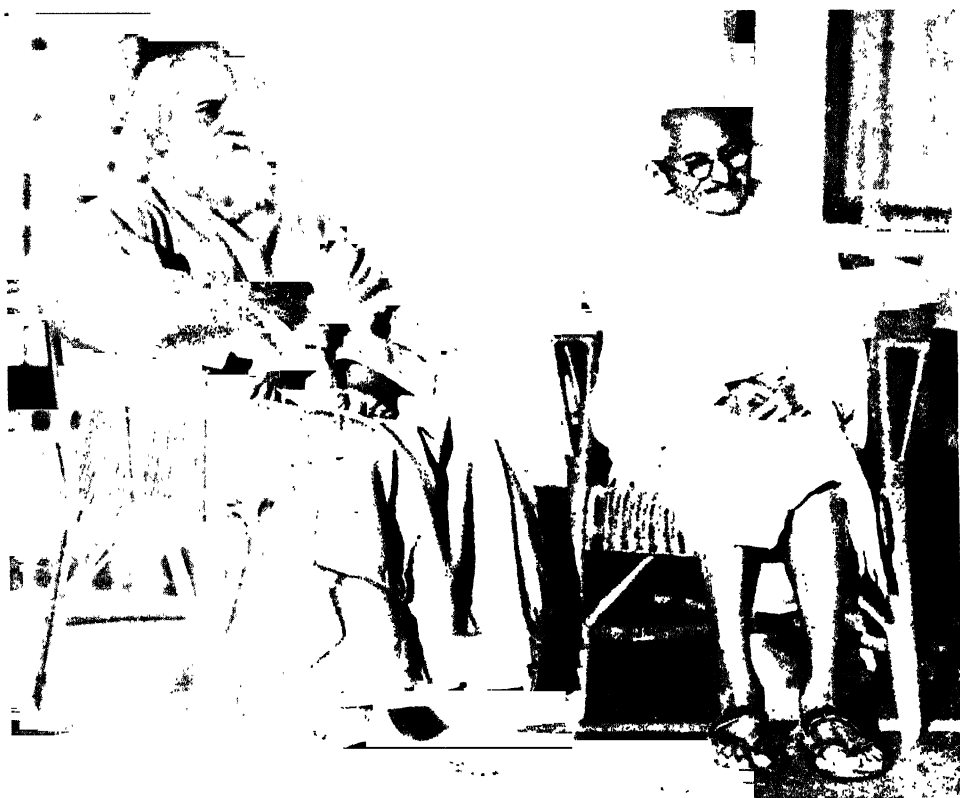
১৯৪০। শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথ

ফটোগ্রাফ : শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ

১৯৪০। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে শান্তিনিকেতনে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেছেন

১৯৪৫। মহাত্মাজী কর্তৃক শান্তিনিকেতনে কলাভবন পরিদর্শন

১৯৪৫। শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু-আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠাসভায় স্থানীয় সাঁওতালগণ কর্তৃক মহাত্মাজীর সংবর্ধনা।

১৯৪৫। মহাত্মাজী কর্তৃক দীনবন্ধু-আরোগ্যশালার ভিত্তিস্থাপন

Mediaeval times may have been bad, but I am not prepared to condemn things simply because they are mediaeval. The spinning wheel is undoubtedly mediaeval, but seems to have come to stay. Though the article is the same it has become a symbol of freedom and unity as at one time, after the advent of the East India Company, it had become the symbol of slavery. Modern India has found in it a deeper and truer meaning than our forefathers had dreamt of. Even so, if the handicrafts were once symbols of factory labour, may they now be symbols and vehicles of education in the fullest and truest sense of the term. (*Harijan*, 16-10-37)

যদি চরকার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে হয় তাহা হইলে সম্যক্ বিচারের দ্বারা উপরোক্ত সমগ্র জীবনধারাটি কেন ভাল নয়, অথবা বাস্তবজীবনে কার্যত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। গান্ধীজী যাহা বলেন নাই বা ভাবেন নাই, সেরূপ কাল্পনিক যুক্তি খণ্ডন করা বৃথাচর্চার মত হইয়া দাঁড়ায়। আজ হয়ত ভারতের সম্মুখে এবং জগতের সমক্ষেও এমন দিন আসিয়াছে যখন স্থির হইয়া আমাদের বিচার করা আবশ্যক, গান্ধীজীর প্রদর্শিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তৎসহ সমাজে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য সত্যাগ্রহের উপায় ভিন্ন মানুষের মুক্তির অপর কোনও উপায় আছে কিনা। কিন্তু সেই বিচারের পূর্বে কষ্ট করিয়া গান্ধীজীর মতবাদের সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য আহরণ করা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

রবীন্দ্র-তীর্থে মহাত্মা গান্ধী

ইংরেজি ১৯৩১ সালের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলির যে স্বর্ণগ্রন্থ Golden Book of Tagore প্রকাশিত হয় তার আরম্ভেই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বাণী। দুর্লভ বাক্‌সংযমের সঙ্গে গভীর মার্মিকতার এমন মণিকাঞ্চনযোগ ভাষার রাজ্যে দৈবাৎ ঘটে। সুদূর সাবরমতী আশ্রমে ব'সে চারটি মাত্র বাক্যের দৌত্যে তাঁর সম্পূর্ণ হৃদয়টিকে তিনি নিবেদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে।

> In common with thousands of his countrymen I owe much to one who by his poetic genius and singular purity of life has raised India in the estimation of the world. But I owe also more. Did he not harbour in Santiniketan the inmates of my *Ashrama* who had preceded me from South Africa? The other ties and memories are too sacred to bear mention in a public tribute.

তৃতীয় বাক্যের প্রশ্ন-ভঙ্গিতে এবং ওই একটি মাত্র 'harbour' শব্দের অন্তরালে আনন্দ ও বেদনার কী অপরিমেয় সঞ্চয় গোপন আছে তা আমাদের ধারণারও অতীত। উল্লিখিত ঘটনাটিকে অবলম্বন

ক'রে সেদিন এ যুগের বিরাট দুই সাধক তাঁদের একাকিত্বের পরম নিঃসঙ্গতায় পরস্পরের অলক্ষ্যে সহৃদয় দোসরজনার করস্পর্শ প্রথম লাভ করেন। অসংখ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে অথচ প্রীতি ও শ্রদ্ধার অনিবার্য আকর্ষণে সে আত্মীয়মিলন অবশেষে যে-মহনীয়তা লাভ করেছিল তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মহামূল্য সম্পদ। সে সম্পদের জন্যে অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতায় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের কাছে চিরদিন আমাদের ঋণী থাকতে হবে।

১৯০১-১৯১২ সাল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সে যেন শৈশব-কৈশোরের প্রারম্ভিক বাল্যলীলার কাল। এলো সে জীবনে বয়ঃসন্ধির অব্যর্থ লগ্ন। পরিমিত সীমার আশ্রমনীড়ে বিশ্বমানবের উপযোগী বৃহত্তর নীড়টি রচনা ক'রে তোলার প্রেরণা জাগল, নদীতে সিন্ধুর প্রেরণায় যেমন জোয়ার জাগে। ১৯১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় সুন্দর ছবিটি এঁকেছেন :

পনর বৎসর পূর্বে ছয়টি তরুণ ব্রহ্মচারীকে লইয়া ঠিক এই রকম যে একটি দিনে আমাদের আশ্রমের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ মনে পড়িতেছে। তখন আশ্রমের পারিবারিক গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ ছিল,— দশ-বারোটি ছাত্র ও অধ্যাপক লইয়াই ছিল তখনকার আশ্রম। আশ্রমের সুখদুঃখ এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, আশ্রমজননী সমগ্র দেশকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। এখন আশ্রমের আর সে মূর্তি নাই,— সমগ্র বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার একাধিক পরিবার আশ্রমের পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। দূর সিন্ধু, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বালকেরাও এখন আমাদের আশ্রমের ছাত্র। পরিবার বৃহৎ হওয়ার যে আনন্দ তাহা আমরা উপভোগ করিতেছি; ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিয়া এবং পরস্পরকে চিনিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহাও আমরা পূর্ণ মাত্রায় পাইতেছি।

উক্ত প্রতিবেদনের শেষে উল্লিখিত হয়েছে :

শ্রীযুক্ত মোহনলাল [দাস] গান্ধী মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন ভারতবাসী ছাত্রকে লইয়া একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আফ্রিকা ত্যাগ করার পরে সেই বিদ্যালয়ের কুড়িজন ছাত্র ও শিক্ষক আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। ইঁহাদের কর্মনিষ্ঠা ও শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ আমাদের আশ্রমবালকদিগের সুদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে।"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৩৬, মাঘ

এই অতিথিসমাগমের বৎসরকাল পূর্বেই আশ্রমগুরুর আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন মন্দিরে, ১৩২০ সালের (ইং ১৯১৩) পৌষ-উৎসব উপলক্ষ্যে। আশ্রমের মুক্ত উদার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন ক'রে তিনি তাঁর "মুক্তির দীক্ষা" উপদেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন :

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন? কোনো সম্প্রদায় নয়— এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে দলের পুজো থেকে আপনাদের রক্ষা ক'রে সকলেই আশ্রয় পাব— এই জন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশদেশান্তর দূরদূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন ক'রে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।"

—শান্তিনিকেতন, সপ্তদশ খণ্ড

আশ্রমগুরুর ও আশ্রমবাসীর আশীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছা ললাটে নিয়ে ইতিপূর্বেই (৩০ নভেম্বর ১৯১৩) দুই নবীন আশ্রমবন্ধু এণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন মুক্তির এই বাণী দক্ষিণ-আফ্রিকায় শান্তিনিকেতনের ভাবী অতিথিদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের শেষে প্রত্যাবর্তনের মুখে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লেখেন :

We are waiting for you, knowing that you are coming to us with your heart filled with the wisdom of death and the tender strength of sorrow. You know our best love was with you while you were fighting our cause in South Africa along with Mr. Gandhi and others. (Santiniketan, February 1914)

এ-কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে গান্ধীজি তখনও বিশ্ববাসীর কাছে 'মহাত্মাজি' নামে পরিচিত হন নি। তাঁর আত্মজীবনীতে অতি সরস ভঙ্গিতে তিনি নিজেই সে-কথা স্মরণ করেছেন :

I had fortunately not yet become 'Mahatma', nor even 'Bapu' (father); friends used to call me by the loving name of 'Bhai' (brother).

১৯১৪ সাল, নভেম্বর মাস। এণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে কয়েকমাস মাত্র হল শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। সহসা এণ্ড্রুজ ইংলণ্ড থেকে গান্ধীজির এক কেব্‌লগ্রাম পেলেন এই মর্মে যে, ফিনিক্স বিদ্যালয়ের (The Phoenix Settlement) ছাত্রের দল ভারতে ফিরছে। উপযুক্ত কোনো "আশ্রমে" তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

মহামতি গোখলের নির্দেশক্রমে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের অবসানে গান্ধীজি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন তিনি তাঁর ছাত্রদের পূর্বেই ভারতে পৌছতে পারবেন। কিন্তু তিনি লণ্ডনে পৌছবার ঠিক দুদিন আগেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আহত সৈনিকদের সেবার জন্যে তিনি সেখানে এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের কাজে জড়িয়ে পড়লেন। ফলে, নিরুপায় হয়ে তিনি এণ্ড্রুজের শরণাপন্ন হলেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আদর্শে ও পদ্ধতিতে গান্ধীজির থেকে ভিন্ন-মতাবলম্বী হয়েও এণ্ড্রুজের মারফত তাঁর সাদর আহ্বান অবিলম্বে জানালেন ফিনিক্স শিক্ষার্থীদের।[১] সে-বছরে আশ্রমের আর্থিক মন্দ অবস্থার সংবাদও তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি। তাঁর নিজের বাসা 'দেহলি'র পাশেই 'নতুন বাড়ি'তে অতিথিবালকদের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করালেন যাতে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে দিনযাপনের কোনো অসুবিধা না ঘটে, অথচ তাঁর স্নেহদৃষ্টি থেকেও যেন অধিক দূরে তাদের না থাকতে হয়। বালকদল ভারতে ফিরে আরম্ভের দিনকয়েক হরিদ্বারে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'গুরুকুল' আশ্রমে কাটিয়ে অবশেষে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লাভ করল। সে-সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'আশ্রম-কথা' বিভাগে এই অতিথিসমাগম-সংবাদ ছাত্রেরা পরম উৎসাহে ঘোষণা করেছিল :

সর্বত্যাগী লোকহিতব্রত শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ [দাস] করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়ের ফিনিক্সে যে বিদ্যালয় ছিল তাহার কতিপয় ছাত্র ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় এখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন— তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ১৬ জন ছাত্র আশ্রমে থাকিবেন। তাঁহারা লবণ, ঝাল, মিষ্ট প্রভৃতি কিছুই খান না— কেহ কেহ দুধ ঘি পর্যন্তও খান না। আশ্রমের সকল কাজে তাঁহারা নিয়মিত যোগদান করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের অভিভাবকরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মগনলাল গান্ধী মহাশয় ও আর একজন অধ্যাপক মহাশয় এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত বালকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের তিনটি পুত্র আছেন।　　—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শক ১৮৩৬ পৌষ

কয়েক মাস যেতে না-যেতেই আশ্রমবাসীরা তারযোগে শুভসংবাদ পেলেন যে গান্ধীজি দেশে এসে

১ এই প্রসঙ্গে The Visva-Bharati Quarterly পত্রিকার ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সি. এফ্. এণ্ড্রুজ-এর লেখা 'Borodada' প্রবন্ধের অংশবিশেষ দ্রষ্টব্য।

পৌঁছেচেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) তারিখে শান্তিনিকেতনে আসছেন। তাঁর ছাত্র-ব্রহ্মচারীদের কোনো সংবাদই গান্ধীজি এ কয়মাস জানতেন না। বোম্বাইয়ে পদার্পণ করে প্রথম তিনি জানলেন যে তারা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে রয়েছে—

It was only when I landed in Bombay that I learnt that Phoenix party was at Shantiniketan. I was therefore impatient to meet them as soon as I could after my meeting with Gokhale.

আশ্রমের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর-ভারত ভ্রমণ সেরে শিলাইদহ হয়ে কলকাতায় সদ্য পৌঁছেচেন। বলাকা কাব্যের নূতন ভাব নূতন ছন্দের প্রেরণায় তাঁর কবি-জীবনে তখন নবজন্মের পূর্ণ-উৎসব। বিদ্যালয় তথা আশ্রম-জীবনেও তখন সেবা ও কর্মের নানামুখী প্রেরণা বিকাশোন্মুখ। আশ্রমগুরুর অনুপস্থিতিতে নিরুদ্যম না হয়ে আশ্রমবালকেরা অতিথি-অভ্যর্থনার আয়োজন একাগ্র নিষ্ঠায় সম্পন্ন করল।

অভ্যর্থনার পূর্বদিন রাত্রি ১২॥ ও তৎপূর্বদিন রাত্রি ১০॥ পর্যন্ত ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করার জন্য শ্রম করিয়াছে। এমন উৎসাহের সহিত এমন আনন্দের সহিত তাহারা এই পরিশ্রমকে বরণ করিয়াছিল যাহা কখনও ভুলিবার নয়।

অতি সুচারু এই আয়োজন দেশীয় রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে এণ্ড্রুজকে তাঁর এক চিঠিতে যা লিখেছিলেন সে আশা আশ্রমবালকেরা ব্যর্থ হতে দেয় নি :

. . . I hope that Mahatma and Mrs. Gandhi have arrived in Bolpur, and Santiniketan has accorded them such a welcome as befits her and them. I shall convey my love personally to them when we meet. (February 18th, 1915).

গান্ধীজিও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

The teachers and students overwhelmed me with affection. The reception was a beautiful combination of simplicity, art and love.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমসাময়িক সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ যা প্রকাশিত হয়েছিল আজ তার বিশেষ মূল্য আছে :

...বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সায়াহ্নে গান্ধী মহাশয় সপত্নিক আশ্রমে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আশ্রমের নূতন তৈয়ারি পথের মাথায় একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করা হয়। তথায় তাঁহাকে যথারীতি পুষ্পচন্দনাদির অর্ঘ্য দানান্তে বরণ করা হয়। এই সময় ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের (এসরাজ ও সেতার) সহিত আশ্রমের সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গান করিয়াছিলেন। প্রথম কুট্টিম অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে দ্বিতীয় কুট্টিমে প্রবেশ করিলে সেখানে তাঁহাদের চরণ ধৌতার্থে সলিল নীত হয়। এই কুট্টিমে আশ্রমের মাতৃস্থানীয়া, দার্শনিক পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও অন্যান্য উপস্থিত মহিলাগণ গান্ধী-পত্নীকে হিন্দুরীতি অনুসারে যথাযোগ্য দ্রব্যদ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এই স্থান হইতে অবশেষে তাঁহারা আশ্রমের 'অন্তঃতোরণে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তোরণের সম্মুখে উত্তর অংশে একটি মৃত্তিকার পদ্মপুষ্পাকার আসন তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই আসনটিও বৈদিকযুগের অভ্যর্থনাকালীন আসনের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। এই আসনের পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকের কোণে যথারীতি চারিটি কদলীবৃক্ষ ও আম্রপল্লব-আচ্ছাদিত চারিটি মৃন্ময় জলকুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। এতদ্‌ব্যতীত ঐ আসনে উপবিষ্ট গান্ধী ও তাঁহার পত্নীর সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপের চারিটি বরণডালাও রক্ষা করা হইয়াছিল। এইখানে মহিলাবর্গের তরফ হইতে একটি বালিকা উপস্থিত অতিথিদ্বয়কে পুষ্পমাল্যদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া গান্ধীপত্নীর ললাটে সিন্দূর পরাইয়া দেন। সিন্দূর পরানো শেষ হইলে বালিকাটি

উভয়ের চরণরেণু মাথায় আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিল।...পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয় ও অন্য দুইজন মহারাষ্ট্র অধ্যাপক বেদমন্ত্র পাঠ ও তাহাকে বাংলা ও গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়া অভ্যর্থনা শেষ করেন।

প্রত্যেক তোরণে অতিথিদ্বয়ের প্রবেশের কালেই ক্ষিতিমোহন বাবু সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ করিলে তাহার পর উক্ত মহারাষ্ট্র অধ্যাপকগণ তাহার অনুবাদ করেন। শেষোক্ত অভ্যর্থনার শেষে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নায়কতায় আশ্রমের বালকগণ দুইটি গান করেন।

বলা প্রয়োজন যে তাঁর অন্যতম সেরা কর্মী দত্তাত্রেয় বা কাকা কলেলকর-এর সঙ্গে গান্ধীজির এই শান্তিনিকেতনেই প্রথম পরিচয় হয়। চিন্তামণি শাস্ত্রী ও তিনি তখন আশ্রমবিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে লোকচক্ষুর অন্তরালে আশ্রমতরুচ্ছায়ে অনুষ্ঠিত এই অভ্যর্থনায় শান্তিনিকেতন সেদিন একদিকে তার অন্যতম পরমাত্মীয়কে একান্ত আপনার বলে স্বীকার করেছিল, অপরদিকে সমগ্র বাংলাদেশের হয়ে ভারতের জনগণের ভাবীনায়ককে তাঁর কর্মজীবনের প্রভাতলগ্নের প্রথম অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল যথোপযুক্ত দেশীয় ভাষা ও রীতিতে। সেই আশ্রম-অনুষ্ঠানের প্রেরণা তাঁকে সেদিন শান্তিনিকেতনের প্রতি যে আগ্রহে ও আনন্দে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তা আজও সরস সজীব হয়ে রয়েছে তাঁর প্রাণে ; আশ্রমবাসীদের তিনি যেন তারই সদ্য প্রমাণ দিয়ে গেলেন গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৫)। প্রথম সেই অভ্যর্থনার উত্তরে গান্ধীজি যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্মটুকু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা গেল :

আজ যে আনন্দ অনুভব করিলাম ইতিপূর্বে সে আনন্দ অনুভব করি নাই। আজ আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সশরীরে যদিও এখানে নাই তথাপি তাঁহার সহিত প্রাণের যোগ অনুভব করিতেছি। ভারতীয় রীত্যনুসারে এখানে অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। বোম্বাইতে যদিও আমাদের খুব সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তবু তাহাতে আনন্দ অনুভব করিবার কিছু ছিল না। কারণ সেই অভ্যর্থনার মধ্যে পাশ্চাত্য রীতিকে বিশেষভাবে অনুকরণ করা হইয়াছিল। আমরা প্রাচ্য আদর্শের মধ্য দিয়াই আমাদের লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইব, বিদেশীয় আদর্শের মধ্য দিয়া নহে— যেহেতু আমরা প্রাচ্য। ভারতবর্ষের সুন্দর রীতিনীতির মধ্য দিয়াই আমরা মানুষ হইব এবং এই আদর্শের মধ্য দিয়াই আমরা ভিন্নাদর্শ-অবলম্বী জাতিকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিব। ভারত প্রাচ্য আদর্শের মধ্য দিয়াই পূর্ব ও পশ্চিমকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিবে। বাংলাদেশের এই আশ্রমে আজ আমি অত্যন্ত পরিচিত, আমি তোমাদের পর নহি। সুদূর আফ্রিকাও আমার ভাল লাগিয়াছিল কারণ সেখানে আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় ব্যক্তিগণ প্রাচ্য রীতিনীতিকে বিসর্জন দেয় নাই।
—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৩৬, চৈত্র

আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় থেকেই গান্ধীজি রেলপথে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ফলে, বোলপুর স্টেশনে কৌতুকজনক এক ঘটনা ঘটে :

Recently Mr. and Mrs. Gandhi visited Bolepur. Those who went to receive them at the railway station searched for them in the first and second class carriages of the train. Not finding them there, the party was about to leave the station disappointed, when the guests were seen to get down bare-footed from a third class carriage. So says the *Sanjibani*.—("Notes', The Modern Review, March, 1915).

স্টেশন থেকে আশ্রম পর্যন্ত তাঁরা দুজনেই খালিপায়ে হেঁটে এসেছিলেন। তাঁর সে-যুগের বেশভূষা সম্পর্কে আত্মজীবনীর এক জায়গায় গান্ধীজি যা বলেছেন তাতে সেদিনের এই চিত্রটুকু আরো সুস্পষ্ট ও সরস হয়ে ওঠে : **With my Kathiawadi cloak, turban and dhoti, I looked somewhat more**

civilized than I do today। ত্যাগের পথে বেশের যে একান্ত বিরলতায় আজ তিনি নগ্নপ্রায় হয়েও দীপ্ত সুসজ্জিত সেদিন সে বেশে বোলপুরে অবতীর্ণ হলে রহস্য কী পরিমাণ ঘনীভূত হত তাই ভাবি। গান্ধী-টুপির যুগ শুরু হতেও তখন বেশ কয়েক বছর বাকি।

গান্ধীজি আশা করেছিলেন, নির্বিঘ্নে কিছুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রমজীবন যাপন করতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) প্রাতে তিনি তার পেলেন যে গোখলের মৃত্যু হয়েছে। পুনায় গান্ধীজি গোখলেকে খুবই অসুস্থ দেখে এসেছিলেন, তবু এ সংবাদের নিদারুণ আকস্মিকতায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। পরলোকগত দেশকর্মীর স্মরণে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ হল। গান্ধীজির সভাপতিত্বে যে শোকসভা হয় সেখানে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে তিনি বলেন, "আমি ভারতে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ বীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একজন প্রকৃত বীর পাইয়াছিলাম— তিনি গোখলে।" সেইদিনই অপরাহ্ণে মগনলাল ও কস্তুরবা সমভিব্যাহারে গান্ধীজি পুনা রওয়ানা হলেন। এণ্ডুজ তাঁদের বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন। বর্ধমান থেকে কল্যাণ পর্যন্ত সেবারের যাত্রায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের পরিচয় তিনি সাক্ষাৎভাবে ষোলোআনাই পেলেন। তাঁর আত্মজীবনীর "Woes of Third class Passengers" পরিচ্ছেদে সে কাহিনী তিনি বিশদভাবে বলেছেন।

দিন তিনেক পরে (২২ ফেব্রুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমে ফিরলেন বালক অতিথিদের সঙ্গেই কেবল তাঁর দেখা হল ; গান্ধীজি পুনা থেকে ফিরলেন তার কয়েকদিন পরে।

এইবার আরম্ভ হল তাঁর প্রকৃত শান্তিনিকেতন আশ্রমবাস। বিশ্রামে নয়, কর্মের অদম্য আগ্রহে তিনি তাঁর আশ্রমজীবনের প্রত্যেকটি দিন সার্থক করে তুলতে চাইলেন। গান্ধীজির নিজের ভাষায় এই দিনগুলির সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মচরিতে :

> As is my wont, I quickly mixed with the teachers and students and engaged them in a discussion on self-help. I put it to the teachers that, if they and the boys dispensed with the services of paid cooks and cooked their food themselves, it would enable the teachers to control the kitchen from the point of view of the boys' physical and moral health, and it would afford to the students an object-lesson in self-help. One or two of them were inclined to shake their heads. Some of them strongly approved of the proposal. The boys welcomed it, if only because of their instinctive taste for novelty. So we launched the experiment. When I invited the Poet to express his opinion, he said that he did not mind it provided the teachers were favourable. To the boys he said, "The experiment contains the key to Swaraj".
>
> Pearson began to wear away his body in making the experiment a success. He threw himself into it with zest. A batch was formed to cut vegetables, another to clean the grain, and so on. Nagenbabu and others undertook to see to the sanitary cleaning of the kitchen and its surroundings. It was a delight to me to see them working spade in hand.
>
> But it was too much to expect the hundred and twenty-five boys with their teachers to take to this work of physical labour like ducks to water. There used to be daily discussions. Some began early to show fatigue. But Pearson was not the man

to be tired. One would always find him with his smiling face doing something or other in or about the kitchen. He had taken upon himself the cleaning of the bigger utensils. A party of students played on their *sitar* before this cleaning party in order to beguile the tedium of the operation. All alike took the thing up with zest and Santiniketan became a busy hive.

প্রতি বৎসর ২৬শে ফাল্গুন তারিখে শান্তিনিকেতনে আজও 'গান্ধী-দিবস' প্রতিপালিত হয়। সে-যজ্ঞের মূল-হোতার নিজের ভাষায় উপরের যে বর্ণনা, এই তার সজীবতম আদি চিত্র। There used to be daily discussions— অতএব স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, আশ্রমব্যবস্থায় এতবড়ো ওলটপালট নিরঙ্কুশ সহজ ছন্দে এক মুহূর্তের চেষ্টাতেই প্রবর্তিত হয় নি। কোনো প্রাণবান প্রতিষ্ঠানেই তা হওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের উদারতার কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর আদর্শের সঙ্গে উক্ত পন্থার সম্পূর্ণ সংগতি নেই জেনেও তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব কোনো পক্ষেই প্রয়োগ করলেন না। এই প্রাত্যহিক আলোচনার আবর্ত থেকে দূরে সুরুলে (অধুনা শ্রীনিকেতন) তিনি তখন তর্ক-পলাতক চিরনবীনদের ফাল্গুনী মধুচক্র রচনায় নিজেকে সরিয়ে রাখলেন— 'ফাল্গুনী' নাটক ও তার গান একের পর এক রচনা করে চললেন, এবং পরম ধৈর্যসহকারে শান্তিনিকেতনের কর্মের গতিও নিরুদ্বেগে অনুসরণ করতে লাগলেন। হয়তো অপেক্ষায় রইলেন, কবে আশ্রমবাসী ছাত্র-অধ্যাপকেরা তাদের নিজস্ব বিচারে নিরুদ্‌বেজিত শান্ত আলোকে সত্যপথের সন্ধান পাবে ; কবে 'অন্যের উপদেশ' তাদেরই আপন অন্তরের উপদেশটিকে উন্মীলিত করবে। রথীন্দ্রনাথকে লেখা এই সময়ের একটি তারিখহীন অপ্রকাশিত পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করলেই তাঁর অম্লান দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে :

…এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ভারি গোলমাল চলছে। ছেলেরা গান্ধির উপদেশে নিজেরাই রাঁধবার ভার নিয়ে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। এই নিয়ে সত্যমিথ্যা নানা কথা ও উত্তেজনার উৎপত্তি হয়েছে।…কাজটা দুঃসাধ্য অথচ আরম্ভ হয়ে গেছে। এতে আমাদের আর্থিক সমস্যা এবং নানা সমস্যার মীমাংসা হয়। সকলের চেয়ে এতে ছেলেদের শিক্ষা হবে এবং এতদিন পরে আমাদের আশ্রমের ভাবটি পুরাপুরি জাগবার আয়োজন হবে। ছেলেদের সকলেই উৎসাহী, শিক্ষকদের কেউ কেউ নারাজ।…কিছুদিন চুপ করে থাকলেই সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যে জটিলতা ঢের আছে কিন্তু সে সমস্ত আপনিই মিটে যাবে— আমরা ধৈর্য ধরে চুপ ক'রে থাকতে পারলেই কোনো মুস্কিল থাকবে না।…

এই ধৈর্যের পথেই একদিন সমস্যাটির অতি সহজ সমাধাও হল। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালোয়-মন্দে-মেশানো জটিল এই পরীক্ষা ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিজেদের সম্মতিক্রমেই দিন-কয়েক পরে বর্জিত হল। এই মীমাংসা সম্পর্কে গান্ধীজির মতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

The experiment was, however, dropped after some time. I am of opinion that the famous institution lost nothing by having conducted the experiment for a brief interval, and some of the experiences gained could not but be of help to the teachers.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরে উদ্ধৃত পত্রে ছাত্রদের শিক্ষার দিকটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজির মাত্র কয়েকটি দিনের সাক্ষাৎযোগের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির 'আশ্রমের ভাবটি পুরোপুরি জাগাবার' এই যে প্রথম 'আয়োজন', এর মূল্য আশ্রমের ইতিহাসে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

১১ই মার্চ তারিখে গান্ধীজি বিশেষ প্রয়োজনে রেঙ্গুন রওয়ানা হলেন। দিন কুড়ি পরে (৩১ মার্চ)

আশ্রমে ফিরে ৩রা এপ্রিল তিনি কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে হরিদ্বার যাত্রা করলেন সদলবলে। তাঁর ছাত্রদের মেলায় আহ্বান ছিল স্বেচ্ছাসেবক সংঘে যোগ দেবার— Our stay in Shantiniketan had taught us that the scavenger's work would be our special function in India। গান্ধীজির নিজের প্রধান আগ্রহ ছিল, সেখানে গুরুকুলে 'মহাত্মা মুনশীরাম' বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং তাঁর আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

মহাত্মাজির প্রথম শান্তিনিকেতন বাসের অধুনাবিস্মৃত বিবরণ একটু বিশদ করেই দেওয়া গেল, কারণ তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক শুভাগমনের মধ্যে এই প্রথম দিনগুলির অন্তরঙ্গতার স্মৃতি সহজাত নাড়ির টানের মতো কাজ করেছে। বস্তুত এর পর থেকে শান্তিনিকেতনকে তিনি আপনার দ্বিতীয় ঘর (second home) বলে সর্বদা উল্লেখ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আসেন আপনার লোকের মতো, কারণ এ আশ্রম তো তাঁর জীবনে অতিথিশালা মাত্র নয়— এ যে তাঁর 'বড়দাদা' 'গুরুদেব' 'পিয়ারসন' 'চার্লি এণ্ড্রুজে'র স্মৃতিবিজড়িত পরম আত্মীয়-ভবন।

১৯২০ সাল। সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সাঙ্গ করে উক্ত মাসের ১৩ তারিখে গান্ধীজি তাঁর ভারতপূজ্য মহাত্মা রূপে শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে। তাঁর হয়ে এণ্ড্রুজও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আত্মীয়-অতিথির অভিনন্দন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। তৎকালীন 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় এই উপলক্ষ্যে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা ভাবী গান্ধী-জীবনীকারদের পক্ষেও স্মরণীয় :

> …গত ২৬শে ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারতের নানা প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহাত্মাজির আগমন সংবাদ পাইয়া বোলপুর রেলস্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং শহরের লোকেরা স্টেশনের রাস্তাটি ফুল ও পাতা দিয়া সাজাইয়াছিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইলে কলাভবনে [অধুনা 'দ্বারিক'] তাঁহাকে সংবর্ধনা করা হয়। মহাত্মাজি একটু অসুস্থ শরীরে আশ্রমে আসিয়াছেন, যতদিন শরীর সুস্থ না হয় ততদিন সম্ভবত তিনি আশ্রমে থাকিয়া বিশ্রাম করিবেন। মহাত্মাজির সহিত তাঁহার পত্নী এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দেবদাস আশ্রমে আছেন। অতিথিগণের বিনোদনের জন্য আশ্রমের ছাত্রেরা আর একবার বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় করিয়াছিল।
>
> মহাত্মাজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সওয়াকত আলি মহাশয়ও আশ্রমে আগমন করেন। ·"
>
> —শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৭ ভাদ্র, পৃ ১০-১১

মহাত্মাজির সঙ্গে এবার অন্যান্য 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'দের অন্তরালে সে-যুগের নবীন দেশকর্মী জওআহরলাল নেহরুও যে ছিলেন পত্রিকার সংবাদদাতার দৃষ্টিতে সেদিন তা ধরা পড়ে নি। আজ সে সংবাদ কিন্তু আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। জওআহরলালজি নিজে দেখছি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন :

> On our way back from the Calcutta Special Congress I accompanied Gandhiji to Santiniketan on a visit to Rabindranath Tagore and his most lovable elder brother 'Boro Dada'. We spent some days there, and I remember C. F. Andrews giving me some books which interested and influenced me greatly.

রবীন্দ্রনাথ যে তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সে-কথা গ্রন্থরচনার সময় মনে হয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের কঠোর সাধনার আয়োজন চলেছে তখন। সে সংগ্রাম-প্লাবনের তরঙ্গাভিঘাত শান্তিনিকেতনের আশ্রমদ্বারেও একেবারে পৌঁছয় নি তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিদ্যালয় থেকে সাময়িক ভাবে উঠেও গেল এই আন্দোলনের প্রেরণায়। কিন্তু এবারেও শান্তিনিকেতন তার শান্তি সম্পূর্ণ হারাল না আশ্রমগুরুর অপরিসীম ধৈর্য ও সুদূরদৃষ্টির দুর্লভ গুণে। আশ্রমবাসীদের পালনের জন্য এবারেও তিনি কোনো নির্বিচার আদেশ জানান নি। এণ্ড্রুজকে ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে (১৯২০) প্যারিস থেকে শুদ্ধ এইমাত্র তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন :

> I find our countrymen are furiously excited about Non-co-operation. It will grow into something like our Swadeshi movement in Bengal. Such an emotional outbreak should have been taken advantage of in starting independent organizations all over India for serving our country.
>
> Let Mahatma Gandhi be the true leader in this; let him send his call for positive service, ask for homage in sacrifice, which has its end in love and creation. I shall be willing to sit at his feet and do his bidding if he commands me to co-operate with my countrymen in service and love.

গান্ধীজি একদিন যাঁকে ভারতের তথা বিশ্বের বাণী-রাজ্যের সুদূরদর্শী প্রহরীপ্রধান ("The Great Sentinel") আখ্যা দিয়ে অভিবাদন করেছিলেন তাঁরই উপযুক্ত এই উপদেশ শান্তিনিকেতনের রক্ষাকবচ স্বরূপ হল। বিদেশ থেকে ফিরে শ্রীনিকেতনের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি তাঁর নিজের বাণীর প্রতি নিষ্ঠার প্রাণঢালা প্রমাণ দিলেন।

১৯২৫ সাল, ২৯ মে। গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধ। মহাত্মা গান্ধী তৃতীয়বার শান্তিনিকেতনে এলেন বাংলা-ভ্রমণের মুখে। এবার আশ্রমগুরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁর আশ্রমে, অতি সরস সুন্দর অভিনন্দন জানালেন তিনি, কেবলমাত্র দেশনেতাকে নয়, 'আশ্রমসুহৃদ পরমাত্মীয়' মহাত্মাজিকে। শান্তিনিকেতন মূল বাড়ির (অধুনা অতিথিশালা) দোতলায় ফুলে পল্লবে সুসজ্জিত শয়নগৃহে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে নিজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন শোনা যায় গান্ধীজি প্রশ্ন করেন, "Why bring me to this bridal chamber ? Where is the bride ?"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে বলেন, "Santiniketan, the ever young queen of our hearts, welcomes you."

গান্ধিজি : But surely, she would hardly care to look twice at the old toothless pauper that I am ?

রবীন্দ্রনাথ : No, our Queen has loved truth and worshipped it unreservedly all these long years.

---

* A Sheaf of Gandhi Anecdotes by G. Ramchandran.

একদিকে তর্কবিতর্ক মতভেদ পূর্ণ পরিমাণে, অপরদিকে সরস সহৃদয় রহস্যালাপের দোসর-সুলভ অজস্র হাস্যবিনিময়। মহাত্মাজির এবারের আশ্রমজীবন-যাপনের অবিনশ্বর এই স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ ও গান্ধীজির একত্র আলাপের সুন্দর একখানি আলোকচিত্রে সে-সময়ের কোনো আশ্রমবাসী এই সুখস্মৃতির প্রতিবিম্বটুকু অনেকখানি ধরে রেখেছিলেন।

১৯৪০ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস। ১৭ তারিখে মহাত্মাজি ও কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই এবং অন্যান্য সহচর-সহকর্মী সমভিব্যাহারে শান্তিনিকেতনে চতুর্থবার, এবং আশ্রমগুরুর জীবদ্দশায় সর্বশেষবার আগমন করলেন। এই ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখই তাঁর সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতন পদার্পণেরও তারিখ। ছুটিমাত্র দিনের শান্তি ও 'গুরুদেবে'র আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে মালিকান্দা যাবার পথে তিনি আশ্রমে আসেন। তাঁর প্রিয়সুহৃদ চার্লি এণ্ড্রুজ তখন কলকাতায় নার্সিং হোমে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে সেখানে প্রথমে না দেখে তিনি যেন শান্তিনিকেতনে আসার উৎসাহ কিছুতেই পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ ১৮ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে তাঁর দুর্বল শরীর সত্ত্বেও আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে গান্ধীজিকে আশ্রমবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন— অতি সংক্ষেপে এবং গভীরতম ভাষায়। গান্ধীজিও হিন্দিতে তার অতি মর্মস্পর্শী প্রত্যুত্তর দিলেন। উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে সেদিন সন্ধ্যায় তিনি 'চণ্ডালিকা' নৃত্যাভিনয় দেখলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ হয়ে। রহস্যচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজিকে তাঁর অতি আদরের মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'টি দান করতে চেয়েছিলেন একটিমাত্র সর্তে যে, তিনি প্রতি বৎসরে অন্তত একবার আশ্রমে এসে সেখানে বাস করবেন। পরদিন বিদায়ের শেষ মুহূর্তে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আশা ও উদ্বেগপূর্ণ সেই পত্রখানি নিজে হাতে মহাত্মার হাতে দিলেন যাতে আশ্রমগুরু আবেগপূর্ণ ভাষায় জনিয়েছিলেন :

> . . . . Visva-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation.

ট্রেনে বসেই মহাত্মাজিও তাঁর স্মরণীয় সুন্দর জবাবটি লিখে পাঠালেন :

> . . . . Of course Visva-Bharati is a national institution. It is undoubtedly also international . . . . Though I have always regarded Santiniketan as my second home, this visit has brought me nearer to it than ever before.

১৯৪৫ সাল, ডিসেম্বর মাস। মহাত্মাজি আবার এলেন শান্তিনিকেতনে। শোকতাপজড়িত বেদনার পথ বেয়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় তিনি এসে অবতীর্ণ হলেন আশ্রমের গভীরতম বেদনার মাঝখানে। প্রার্থনার শান্ত আলাপনে, সংগীতের সুরের ভাষায়, নবোদিত জ্যোৎস্নার সিতচন্দনসেচনে মধুময় হয়ে উঠল আশ্রম-প্রাঙ্গণ। বেদনামধুর সেও এক অপূর্ব অনুষ্ঠান আশ্রমের ইতিহাসে। চার্লি এণ্ড্রুজের স্মরণে যে হাসপাতাল হবার আয়োজন চলেছে তারই ভিত্তিস্থাপনা এবার তাঁর প্রধান কাজ। তারপর কত আলাপ-আলোচনা আশ্রমের কর্মীদের নিয়ে, কত আগ্রহ, কী করে গুরুদেবকে দেওয়া আশ্বাস সত্য করে তুলবেন। সংবাদপত্রে সে-সব খবর প্রতিদিনই তখন দেশবাসী সকলেই জেনেছেন। সে তো মাত্র সেদিনের কথা, তা নিয়ে ইতিহাস রচনার চেষ্টার মতো বাহুল্য আর কী হতে পারে।

ভারত তথা বিশ্বের মিলনতীর্থ শান্তিনিকেতনে, সংখ্যার হিসাবে মহাত্মা এই নিয়ে পাঁচবার পদার্পণ করলেন—কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগটির যথার্থ পরিমাপ তুচ্ছ এই সংখ্যার বিচারে একেবারেই নয়। এই সূত্রে মনে পড়ে বিস্মৃতপ্রায় একটি প্রসঙ্গ; বছর সাতেক পূর্বে 'প্রবাসী'তে (১৩৪৬ আষাঢ়) আশ্রমসুহৃদ শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু সেটির উল্লেখ করেছিলেন।

জাপানের জগদ্‌বিখ্যাত জনহিতকর্মী ও শান্তিকামী কাগাওআ কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসেন এবং মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে তিনি সর্ ডানিয়েল্ হ্যামিলটনের 'গোসাবা' দেখতে যাবেন।

মহাত্মাজি: শান্তিনিকেতনে যাবেন না?

কাগাওয়া: না।

মহাত্মাজি তখন তাঁকে একটি অতি মূল্যবান কথা বলেন: গোসাবা গোসাবাই, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ— "Well—Gosaba is Gosaba, but Santinikatan is India."

শান্তিনিকেতনের এই ভারতপ্রতীক ধ্যানরূপটি যাঁর মানসপটে এমন অম্লান আলোকে উদ্‌ভাসিত, তিনি দূরে থেকেও নিয়ত আমাদের কত যে নিকটে আছেন তা হৃদয়ঙ্গম করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাপুজী

যে ছোটোখাটো মানুষটিকে মঞ্চের উপর বসিয়ে না দিলে কেউ দেখতেই পায় না, তবু যাঁর বিরাট সত্তা আজ সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত— তাঁর কাছে কোনো মানুষই ছোট নয়, কোনো বিষয়ই তুচ্ছ নয়। রাজনৈতিক সমস্ত কূট প্রশ্নের মীমাংসাও যেমন প্রাণ দিয়ে করেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার সমাধানেও তেমনি প্রাণ ঢেলে দেন। মহাদেব দেশাই বলতেন, "বাপু কি শুধু দেশের পলিটিক্স করেন? তাঁর উপর যে সকলের 'হোম পলিটিক্স'-এর মীমাংসায়ও ভার"— কথাটা যে কত সত্য তা আমার এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনেও খুব উপলব্ধি করেছি।

১৯২১ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মাজী এলেন কলকাতায়। নানা আঘাতে আমার মানসিক অবস্থা তখন অবসন্ন; আমি প্রায় সর্বক্ষণই বসে থাকতাম তাঁর কাছে, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কিছু জ্ঞান লাভের আশায়; আমার সঙ্গেও কিছু কথা হ'ত ফাঁকে ফাঁকে। চলে যাবার পর পথ থেকে তাঁর একখানা চিঠি পেলাম অপ্রত্যাশিত। তাতে লিখেছিলেন:

"I know what widowhood has done for India. I have a sister who is a widow. But she has a limited horizon whereas yours is as wide as the Bay of Bengal. I ask you to take up some national work in a truly religious spirit."

তাঁর এই ডাকে আমি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেছিলাম। তারপর এই সুদীর্ঘ

পঁচিশ বৎসরে তাঁকে চিনবার অনেক সুযোগ আমি পেয়েছি বহু ভাগ্যে। তাঁর সবরমতী ও সেবাগ্রাম আশ্রমের কাজে তাঁকে দেখেছি, রাজনীতির কর্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁকে দেখেছি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিভৃত আলাপে তাঁকে দেখেছি, আর দেখেছি ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে হাস্যকৌতুকে— প্রত্যেক পরিবেশে তাঁর নব নব মূর্তি।

নারীজাতির বন্ধু

নারীজাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমেই তিনি ভারতবর্ষের নারীদের ডাক দিয়েছিলেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে, বলেছিলেন, "তোমরা এস, মায়ের অর্ধেক সন্তান ভীরু পঙ্গু হয়ে থাকলে মায়ের শৃঙ্খল ভাঙবে না— তোমরা শক্তি, তোমরা এসে পুরুষের পাশে দাঁড়াও, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।" সেই অবধি তাঁর চিন্তাধারা নারীজাতির আত্মবোধ জাগানোর দিকে সদাজাগ্রত। খদ্দরের কাজে এক সময় যখন বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করি তখন মাঝে মাঝে বড়ই কাতর হয়ে পড়তাম অবসাদে, আমাদের নারীসমাজের সব বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখে। "খদ্দর পরব? ওরে বাবা! এত মোটা কাপড় কি পরা যায়? চরকা কাটব কখন? সংসারের কাজ করেই সময় পাই না। দুপুরে একটু না ঘুমলে প্রাণ বাঁচবে কি করে? পুরুষরা হুজুগে মাতবে বলে মেয়েরাও হুজুগ করে বেড়াবে নাকি?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি একবার তাঁকে লিখেছিলাম, "এ সব দেখে আমার মন বড় ভেঙে যায়— আমাদের মেয়েরা এত হৃদয়হীন কেন?" তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "এ অবস্থাটার জন্যে নারীরা দায়ী নয়, দায়ী আমরা; আমরাই তাদের উপেক্ষা করে ঘরের কোণে বন্ধ করে রেখেছি, তাদের ফুটতে দিইনি। আমরা ভাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে বুঝি কেউ মানুষ হয় না। এই ভাব মেয়েদের মন থেকে দূর করতে হবে আমাদেরই। কাজ করে যাও— ভেঙে পড়লে চলবে না, মেয়েদের আত্মবোধ জাগিয়ে তুলতেই হবে।"

একবার একখানা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, "আমাদের মেয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার খবর এখনও জানে না— তারা মনে করে আর-একটা জীবনের সঙ্গে বাঁধা না পড়লে তাদের আর কোনো সার্থকতা নেই— কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এটা তাদের বুঝিয়ে দিতেই হবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বিধবা হলেই মনে করে তাদের জীবন শেষ হয়ে গেল; তখন তারা যে বেঁচে আছে তাও ভুলে যায়। কিন্তু কোনো জীবনই অন্য জীবনের সঙ্গে এমন করে এক হয়ে যেতে পারে না যাতে করে একজন চলে গেলে তারও জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের, তাকে বাঁচতে হবে তার নিজেরই জন্যে।"

তাঁর এই নারীজাতির আত্মবোধের আশা আজ সফল হতে চলেছে।

নারীদের সিঁদুর, হাতের লোহা প্রভৃতি এয়োতির চিহ্নগুলি তাঁর ভারি ঠাট্টাতামাসার জিনিস! তিনি বলেন, ওগুলো মেয়েদের দাসীত্বের চিহ্ন। বেশ অল্প বয়স থেকেই তাঁর এসব মতামত। শুনেছি এ নিয়ে কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর অনেক মনান্তর হয়েছে সে সময়েও— কিন্তু কস্তুরবাও কম ছিলেন না—বাপু তাঁকে এসব বিষয়ে কখনও হার মানাতে পারেন নি।

শিশুবাৎসল্য

ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে বাপুকে দেখলে মনে হয় তিনিও একটি ছোট শিশু— কি এক সুন্দর ভাব যে মুখে ফুটে ওঠে! আমি যখনই দেখি বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের সেই কথাটি আমার মনে পড়ে Suffer little children to come unto me. তিনি যখন আশ্রমবাসী সব শিশুদের নিয়ে বেড়ান, যেমন তাদের মনের আনন্দ কলরবে উৎসারিত হয়ে পড়ে তেমনই তাঁরও মুখের থেকে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে এক শান্ত সুন্দর শ্রী! সকাল বিকাল তিনি হাঁটতে বেরোন, সেই সময় সেখানে যে-কটি ছোট শিশু আছে পিল পিল করে বেরিয়ে আসে। দুদিকে দুটি চলে, আর সকলে কলরব করতে করতে পেছন পেছন যায়। গত বছর জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে গিয়ে দেখি একটি নূতন ছোট শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। তার বয়স চোদ্দমাস হলেও চোঁদ্দবছরের কিশোরীর মত তিনি সকলের ওপর নির্বাক হুকুম জারি করছেন নিয়ত। তাঁর বাক্য ফোটে নি তখনও, কিন্তু নাচের ভঙ্গীতে তাঁর চলন, চেনা-অচেনা সকলের সঙ্গেই ভাব, আর ইঙ্গিতে সকলকে পরিচালনা করার ইচ্ছা ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। তাঁর এই হুকুমজারি বাপুর উপরও চলে সর্বদা— সকালে উঠে বাপুর বিছানায় বসে খেলা আর তাঁর খাদ্যের অংশ গ্রহণ করা যেন তার জন্মজন্মান্তরের অধিকার। দুপুরে বাপুর কুটীর-প্রাঙ্গণে তাঁর জন্যে আসন রচনা হয় সমস্ত দিনের জন্যে, সেইখানে বসে তিনি তাঁর চিঠিপত্র লেখা, লোকজনের সঙ্গে দেখা ও দুপুরের আহার শেষ করেন। তাঁর আহারের সময় হলেই শিশুটি এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যেত তাঁর দু কাঁধে দু হাত রেখে, বাপুকে তার উপস্থিতি একটুও ভুলতে দিত না। আহার্য কিছু তার হাতে তুলে না দিলে বাপুর রক্ষা থাকত না— একটু কিছু তার হাতে তুলে না দিয়ে খেতে আরম্ভ করবেন সাধ্য কি? বাপু হয়তো খেতে খেতে কারও সঙ্গে দুরূহ রাজনীতির আলোচনা করছেন, হঠাৎ পিছন থেকে মাথায় এক চাঁটি— বাপু বুঝলেন, একটু হেসে আবার একটু কিছু হাতে তুলে দিলেন; খানিক পর আবার এক চাঁটি। আশ্চর্য এই যে, একদিনও বাপুর মুখে একটুও বিরক্তির ভাব দেখিনি— শিশুটিকে কেউ সরিয়ে নিতে চাইলে হাত তুলে বারণ করেছেন। সর্বদা যেখানে বসে তিনি কাজ করেন তার আশেপাশে ছোট শিশুদের কলরব যতই প্রচণ্ড হোক তাঁর কাজের বা বিশ্রামের কোনো ব্যাঘাত হয় না।

রসবোধ

হাস্যরসবোধ তাঁর অসাধারণ। বহুদিন পূর্বে যখন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকরূপে কাগজের পৃষ্ঠায় জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন তখন একবার একজনের "Have you got a sense of humour" এই প্রশ্নের উত্তর লিখেছিলেন "If I did not have a sense of humour I would have committed suicide long ago." কথাটা যে কত সত্যি তা যাদের কাছে বসে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাস্যালাপ শোনাবার ভাগ্য হয়েছে তারাই জানে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আমার দাদা[১] ও বাপুজী যখন কাজকর্মের অবসরে বসে খোসগল্প করতেন তখন সেখানে যেন হাস্য-রসের উৎসধারা বয়ে যেত। তিন জনেই সমান ছিলেন — একের কথার উত্তর, ইংরেজীতে যাকে বলে

---

১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

repartee যেন তাঁদের ঠোঁটের আগায় লেগেই থাকত। দিলীপকুমার রায় বলতেন, "আমি বোধ হয় সারা-রাত জেগে এদের গল্প শুনতে পারি।"

একবার বাপুর পাওয়া সব উপহার আমার দাদা নিলাম করছিলেন একটা খুব বড় জনসভায়; একজন ভিখারি একটি আধলা দান করেছিল—সেটা পাঁচ শো টাকায় বিক্রি হল। একখানা রুপোর রেকাবি হাতে করে দাদা বললেন বাপুর দিকে ফিরে, "Now I am going to auction this, unless you want to appropriate it." বাপু তখনই জবাব করলেন, "Not unless you want to misappropriate it" এই ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তর সব সময়েই চলত এঁদের।

দাদার মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে বাপু দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন দাদার অনুরোধে— এখনও কানে শুনি, বিছানায় আসন করে মুখোমুখি বসে গল্প করতে করতে তাঁদের সেই অট্টহাসি। একদিন কথা বলতে বলতে বলছেন, "আজ আমার বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ছে— সেদিনও আমরা দুজনে এমনি করে মুখোমুখি বসেছিলাম।"

দার্জিলিঙে সব কাজে অগ্রণী, অদ্বৈত-বংশধর শ্রীমান অনুপ গোঁসাইকে দাদা ছাগল সংগ্রহ করার ভার দিয়েছিলেন বাপুর দুধের জন্য। সে বেচারা দিন কয়েক অনন্যমনা হয়ে ছাগল খুঁজে বেড়াতে লাগল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী একদিন ঠাট্টা ক'রে তাকে বললেন, "তোমার হল কি? অদ্বৈত গোঁসাইএর বংশধর হয়ে তুমি ছাগল দেখলেই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাক? এ তো ভালো কথা নয়।" যাক, ছাগল চার-পাঁচটি জোগাড় হ'ল। বাপু বিকেলে পৌঁছলেন—সেদিন তারা খুবই ভদ্র ব্যবহার করল, দুধ পাওয়া গেল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। পরদিন সকালে দুধ দুইতে গেলে তারা সোজা মাটিতে শুয়ে পড়ে তাদের অনিচ্ছা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল। আমি বাপুকে এসে বললাম, "খাবেন কি? আপনার মায়েরা তো শুয়ে পড়েছে সটান।" সে-কথা শুনে বাপুর কি হাসি! বললেন, "ছাগলদের যে এতটা বুদ্ধি ও ইচ্ছার দৃঢ়তা আছে এটাই এত উপভোগ্য যে, কোনো কষ্ট হবে না একদিন দুধ বিনা।"

এ তিনদিন আমাদের বাড়ির রাস্তায় সব সময়ে ভিড় জমে থাকত, তাঁকে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দর্শন দিয়ে আসতে হত। ছোট ছোট শিশু দেখলেই তাদের আদর করতেন। একদিন ছোট একটি শিশুকে কোলে করে ভিতরে এনে বসলেন— একঘর লোক বসে আছে, তাদের সঙ্গে কথাও কইছেন আর শিশুটিকে আদরও করছেন। হঠাৎ সেই একঘর লোকের দিকে চেয়ে বললেন, "I have got a weakness for flat noses because my wife has got a flat nose".

সকলেই জানেন বাংলা দেশ ছাড়া ছানা ও ছানার মিঠাইএর কোথাও চল নেই— আর এ-কথাও বোধ হয় সকলে জানেন যে বাপু খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা করেন ও নিজের উপর পরীক্ষা করেন সব সময়ে। একবার গিয়ে দেখি তাঁর খাদ্যতালিকায় ছানা আমদানি হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ছানা খাচ্ছেন? বললেন, "হ্যাঁ খাচ্ছি তো। কিন্তু খুব ভালো হজম হচ্ছে না, ভাবছি ছেড়ে দেব।" আমি বললাম, "আপনার পেটে ছানা কখনও হজম হতে পারে? ওটা যে বাঙালীর খাদ্য। আপনি যে বাঙালী-বিদ্বেষী!" এ অন্যায় অপবাদের কথা তাঁর জানা আছে—খুব হাসতে লাগলেন, বললেন, "ঠিক হয়েছে তো, আমিও ভাবছিলাম এমন জিনিসটা হজম হচ্ছে না কেন? এখন তো

বুঝে গেলাম।" একবার একটা জিনিস 'মহাদেব হারিয়ে ফেলবে' বলে কৃষ্ণদাসকে রাখতে দিচ্ছিলাম, অমনি বলে উঠলেন, "ও, কৃষ্ণদাস বাঙালী বলে বুঝি তার উপর বিশ্বাস বেশি হল ?" আমিও বললাম, "তা কেন, আপনার মহাদেব যে একেবারে ভোলা মহেশ্বর— তার নিজের কোনো-কিছুরই হিসাব থাকে না, সে আবার অন্যের জিনেসের কি হেপাজত করবে ?" একটু হেসে বললেন "এবার জব্দ করেছ।"

স্নেহস্মৃতি

তাঁর আশ্রমবাসী প্রত্যেক নরনারীর শরীর ও মন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি সজাগ। দুরূহ রাজনীতির কাজে ব্যস্ত থেকেও তাঁর চোখ যেন নিয়ত মেলে আছে তাদের দিকে। প্রত্যেকের শরীর ও মনের খবর তাঁর জানা থাকে— তারা পূজা করে না তাঁকে দূর থেকে, ভয় পায় না কাছে আসতে, সংকোচ করে না মতের অমিল হলে তর্ক করতে। আশ্রমে অতিথি-অভ্যাগতের স্রোত বয়েই চলেছে। তাদের সুখসুবিধার দিকে তাঁর সব সময় দৃষ্টি, ভোলেন না কখনও কিসে তাদের অসুবিধা, কি তাদের অভ্যাস— এ-সব কথা তাঁর মনে যেন চিরদিনের জন্য ছাপ রেখে যায়। প্রথম যেবার সবরমতী আশ্রমে যাই— প্রায় চব্বিশ বছর আগেকার কথা— রাত্রে শুতে যাবার আগে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পত্নীকে সব উপদেশ দিলেন খুঁটিয়ে, তারপর বারান্দায় আমার জন্য পাতা খাটিয়ার বিছানাটি হাত দিয়ে বেশ ক'রে পরীক্ষা করে শুতে গেলেন। আমি তখন রান্নাঘরে বসে সংকোচে মরে যাচ্ছি, কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। এ রকম লজ্জা জীবনে অনেকবার পেয়েছি তাঁর কাছে। আমি ঘরে ঢুকলে চোখ তাঁর উঠে যায় পাখার দিকে। জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলেও, পাখা বন্ধ থাকলে ইশারা করে খুলে দিতে বলেন; একবার মনে আছে তিনি যে-ঘরে ছিলেন সেখানে পাখা ছিল না, আমি গিয়ে বসতে সামনে একখানা কার্ডবোর্ড ছিল সেখানা ঝেড়ে দিলেন আমার হাতে। সেবাগ্রামে গেলে একটি মোড়া আমার জন্য পাতা থাকে তাঁর আসনের পাশে, আমি অসুস্থতার জন্যে মাটিতে বসতে পারি না ব'লে; আমি গিয়ে দাঁড়ালেই চোখ তাঁর ঘুরে যায় সেদিকে— মোড়াটি যথাস্থানে আছে কিনা।

য়েরোদা জেলে 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড' ব্যাপারে তাঁর অনশনের কিছুদিন পরে হঠাৎ চিঠি পেলাম অস্পৃশ্যতার কাজে তোমাকে মালাবার যেতে হবে'। আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত। আমি সে-দেশের ভাষা জানিনা, ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস নেই, আমি গিয়ে কি করব। আমি তার করলাম এ-কথা জানিয়ে। উত্তর এল "Start at once, everything will be all right." তিনি যখন বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে তখন দায় তাঁর! তলপিতলপা বেঁধে রওনা হলাম পুনার দিকে তাঁর আদেশে। পুনা পৌছে জেলে গেলাম দেখা করতে, বললেন, "তুমি একহপ্তা এখানে বিশ্রাম কর, আমি তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক করে তোমায় পাঠাব। তোমার ছেলেকে সঙ্গে আনতে বলেছি, কারণ তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকব সে সঙ্গে থাকলে। তুমি রোজ এখানে এসো, তোমাকে সময়মত সব উপদেশ দেব।"

তার পর রোজই যাই, কথা আর হয় না, মহাব্যস্ত। অস্পৃশ্যতার কাজ নিয়ে কত লোক আসছে দেখা করতে। আমি বেলা বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ব'সে ব'সে মহাদেবের সঙ্গে গল্প করি, সে আমাকে মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠি দেখায়, আমার সুবিধার জন্য খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বহর দেখে লজ্জায় মরে যাই— আমার শরীর ও অভ্যাস সম্বন্ধে যে-সব জিনিস লক্ষ্য করছেন সে-সব

নিয়ে খুঁটিনাটি ব্যবস্থা! তারপর একদিন বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে কথা বলব, পরশু রবিবার, সেদিন কারও সঙ্গে দেখা করি না। কাল তোমার সঙ্গে কথা শেষ করে দেব, তুমি সোমবার রওনা হয়ে যেয়ো।" তার পর একটু হেসে বললেন, "তুমি ভাবছ মানুষটা কি অদ্ভুত, সেই কলকাতা থেকে ডেকে নিয়ে এল, আর কথাই কয় না।" আমিও অসংকোচে বললাম, "আপনি তো এ-রকম করেই থাকেন তাদের সঙ্গে যারা আপনার কাছে একেবারে surrender করে— আর আমরা কত ভাল যে আপনাকে ক্ষমা করেই চলি সর্বদা!" হেসে উত্তর দিলেন, "If you have to forgive, it is not surrender"। পরদিন কথাবার্তার পর চলে আসবার সময় প্রণাম করতেই পিঠে হাত রেখে বল্লেন, "God be with you"। এখনও মনে আছে সেদিনকার সেই স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল— একটা যেন কি পেলাম। সেদিনের সেই আশীর্বাদের স্পর্শ আজও যেন অনুভব করি সর্বক্ষণ।

কস্তুরবা

মালাবার ভ্রমণে কস্তুরবা আমাদের সঙ্গে ছিলেন; সমস্তদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে আমাদের একান্তে আলাপ চলত ঘণ্টাখানেক। কস্তুরবা অনেক গল্প করতেন তাঁদের প্রথম-জীবনের। তাঁর মত সরল স্নেহপ্রবণ ও মিষ্টপ্রকৃতি মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। বড়ই স্পষ্টবক্তা ছিলেন। একদিন আমরা খবর পেলাম, বাপু আবার অনশনের ব্যবস্থা করছেন। ব্যাপারটা নিশ্চয়তার মধ্যে না এলে কস্তুরবাকে জানান হবে না, আমাদের মধ্যে ঠিক হ'ল। কিন্তু আমাদের স্তব্ধভাব ও কথাবার্তায় তিনি সবই বুঝতে পারলেন। বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আবার আমার মাথা খাবার চেষ্টায় আছেন।" আমাদের এই কাজে যেখানেই গেছি শিক্ষায়তন আশ্রম ইত্যাদি সবই পরিদর্শন করতে যেতে হ'ত। প্রায় সর্বত্রই বাপুর ছবি টাঙানো থাকত। কস্তুরবাকে দেখেছি একটু থমকে গিয়ে একটুক্ষণ ছবির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। একদিন দেখি একখানা ছবির কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, "ও তো সব সময়েই হাসে।" বাপুর আদেশ ছিল রোজ একখানা চিঠি দিতে হবে রোজকার কাজের কথা জানিয়ে, আর ফেরবার সময় পুনায় দেখা করে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে হবে। সে-সময়ে আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, "আপনাদের প্রথম-জীবনের অনেক গল্প এবার বা'র কাছে শুনেছি।" তিনি বললেন, "নিশ্চয় আমার খুব নিন্দা করেছে? তা করুক, আমি উপস্থিত থাকলে আমিও তার প্রত্যেক কথার সমর্থন করতাম।"

দীর্ঘ বাষট্টি বছর যাঁর সাহচর্য জীবনে সব কাজে পেয়েছেন সেই প্রিয়তমা সহধর্মিণীকে, আর, যে একাধারে তাঁর পুত্র ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য সব ছিল সেই মহাদেবকে হারিয়ে এই মহামানব যে কত ভেঙে পড়েছেন তা যারা তাঁর খুব কাছে এসেছে কেবল তারাই দেখতে পায়। কাজের সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষা, জগতের মঙ্গলের জন্য সেই চিন্তা, সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেম সবই আছে কিন্তু একটা কি যেন দীপ্তি সেই মুখ থেকে নিবে গেছে।

এবার শীতের তিনমাস সেবাগ্রামে থাকার সংকল্প করে বাপুকে জানিয়েছিলাম নভেম্বর মাসে। তিনি বাংলাদেশে আসবেন তখন কথা ছিল। আমায় বললেন, "আমি ডিসেম্বর মাসে বাংলা থেকে ফিরে এলে এস। নভেম্বরে সেবাগ্রামে বেশ গরম— Knowing you as I do, I do not think you

will keep well। আর তাছাড়া আমি সে সময়ে থাকব না।" আমি বললাম, "সেবাগ্রাম তো আমার ঘরবাড়ি— আপনি না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না আমার।" তাতে বললেন, "If I am not there when you come I shall worry"। আমার কিন্তু যাওয়া হল না দৈবদুর্বিপাকে। কলকাতায় এসে দেখা হতেই বললেন "আমি থাকতে থাকতে তুমি তো গেলে না। যাক, আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে এসেছি, তুমি চিমনলালকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে চলে যেয়ো।"

অনেক দিন পর পর দেখা হয় তাঁর সঙ্গে— আমার সংসার ও পরিবারের সকলের খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন দেখা হলেই। একবার তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তেতালা ভেঙেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম গিয়েই, সুস্থ হতে প্রথমে তিরস্কার করলেন, তার পর উপস্থিত একঘর লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "She is just as obstinate as her brother." আমিও তখনই জবাব দিলাম, "No Bapuji, I learnt my lesson of obstinacy at your feet"— উত্তর শুনে খুব হাসতে লাগলেন। আমি প্রায়ই তাঁকে বলি, "The greatest autocrat and the most obstinate man on earth"— তিনি এইসব কথা খুবই উপভোগ করেন, অসংকোচে তাঁর কাছে সব কথা বলা যায়।

আমার মত এ রকম স্নেহের পাত্র এ জগতে তাঁর অসংখ্য।

আমার দাদার মৃত্যুর পর আমাকে বলেছিলেন, "তুমি ভেঙে পোড়ো না— যতদিন আমি আছি তুমি অসংকোচে আমার উপর নির্ভর কোরো সব বিষয়ে।" যত ঝড়-ঝঞ্ঝা বিপদ-আপদ জীবনে এসেছে ঐ এক অভয় আশ্রয় আমায় সব সহ্য করার শক্তি দিয়েছে। একখানা চিঠিতে বহুদিন আগে আমায় লিখেছিলেন, "সুখের চেয়ে দুঃখের প্রয়োজন আমাদের অনেক বেশী— সুখ আমাদের অমানুষ করে, স্বার্থপর করে কিন্তু দুঃখ আমাদের শেখায় পরদুঃখকাতরতা, যাতে করে আমাদের জীবন উন্নত হয়।" যতক্ষণ মানুষ নিজে দুঃখ না পায় ততক্ষণ অন্যের দুঃখের গভীরতা বোঝা, তার জন্য প্রাণ কাঁদা অসম্ভব। দুঃখই মানুষকে মানুষের কাছে টেনে আনে।

এই মহামানবের কথা লিখতে গেলে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়— আজ পঁচিশ বৎসর তাঁর যে স্নেহ পেয়েছি সে-সব মধুর স্মৃতির কথা প্রকাশ করি, আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে এমন কোন্ ভাষা আছে? প্রাণের মধ্যে যে-সব কথা উদ্বেল হয়ে ওঠে তার সীমাই বা কোথায়?

শ্রীউর্মিলা দেবী

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের সময় রবীন্দ্রনাথ বিদেশে ছিলেন; ১৯২১ সালে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন; দীনবন্ধু এণ্ডরুজও তথায় উপস্থিত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত যে রঙিন চিত্রটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। মূল চিত্রটি শান্তিনিকেতন কলাভবনে রক্ষিত আছে।—শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত "প্রার্থনারত মহাত্মাজী"র ছবিটি "দেশ"-কর্তৃপক্ষ সৌজন্যপূর্বক আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

স্বরলিপি

"আমার যাবার সময় হল"

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

[-া]

II সা ঋা -মা | মা মা -গমপা | পা পা -া | পা পা -দপমা I
আ মা র্ | যা বা ০ ০ র্ | স ম য়্ | হ ল ০ ০ ০

I মা পা -দা | -র্ঋা র্সা র্সা | না র্সা না | নদনা -দা -পা I
আ মা ০ | য়্ কে ন | রা খিস্ ধ | রে০০ ০ ০

I পা পা -দা | দা দা -ণদা | পা পদা -পণা | দা পা -দপা I
চো খে র্ | জ লে ০ র্ | বাঁ ধ০ ০ ন্ | দি য়ে ০ ০

I মা মপা -দণা | -া দা পা | মগা -মপমা -গমগা | ঋা সা -া II
বাঁ ধি০ ০ ০ | স্ নে আর্ | মায়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ডো রে ০

II { পা পা পদা | মা পা দা | দর্সা -া -নর্সঋা র্সর্সা -া -া I
ফু রি য়ে০ | ছে জী ব | নে ০ ০ ০ র্ ছুটি ০ ০

I ণর্সা র্সা র্সা | র্সনা -র্সা র্সর্সা | র্ঋা -া -র্সর্ঋর্গা | র্গর্গা -র্ঋর্সা -ণদা } I
ফি রি য়ে | নে০ ০ তোর্ন | য় ০ ০ ০ ন্ | ছুটি ০ ০ ০ ০

I পা -দর্সা র্সা | র্সা র্সা -র্ঋসা | ননা -র্সর্ঋর্সা -নর্সনা | দা পা -মগা I
না ০ ম্ ধ | রে আ ০ র্ | ডাকি ০ ০ ০ ০ ০ স্ | নে ভা ০ ই

I মদা পণদা -া | -পমা মমা -গপা | মমা -া -পমগা | -ঋা -সা -া IIII
যেতে হবে ০ | ০ ০ ত্বরা ০ ০ | করে ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

লিন্দবর্তিনী

শ্রীনন্দলাল বসু
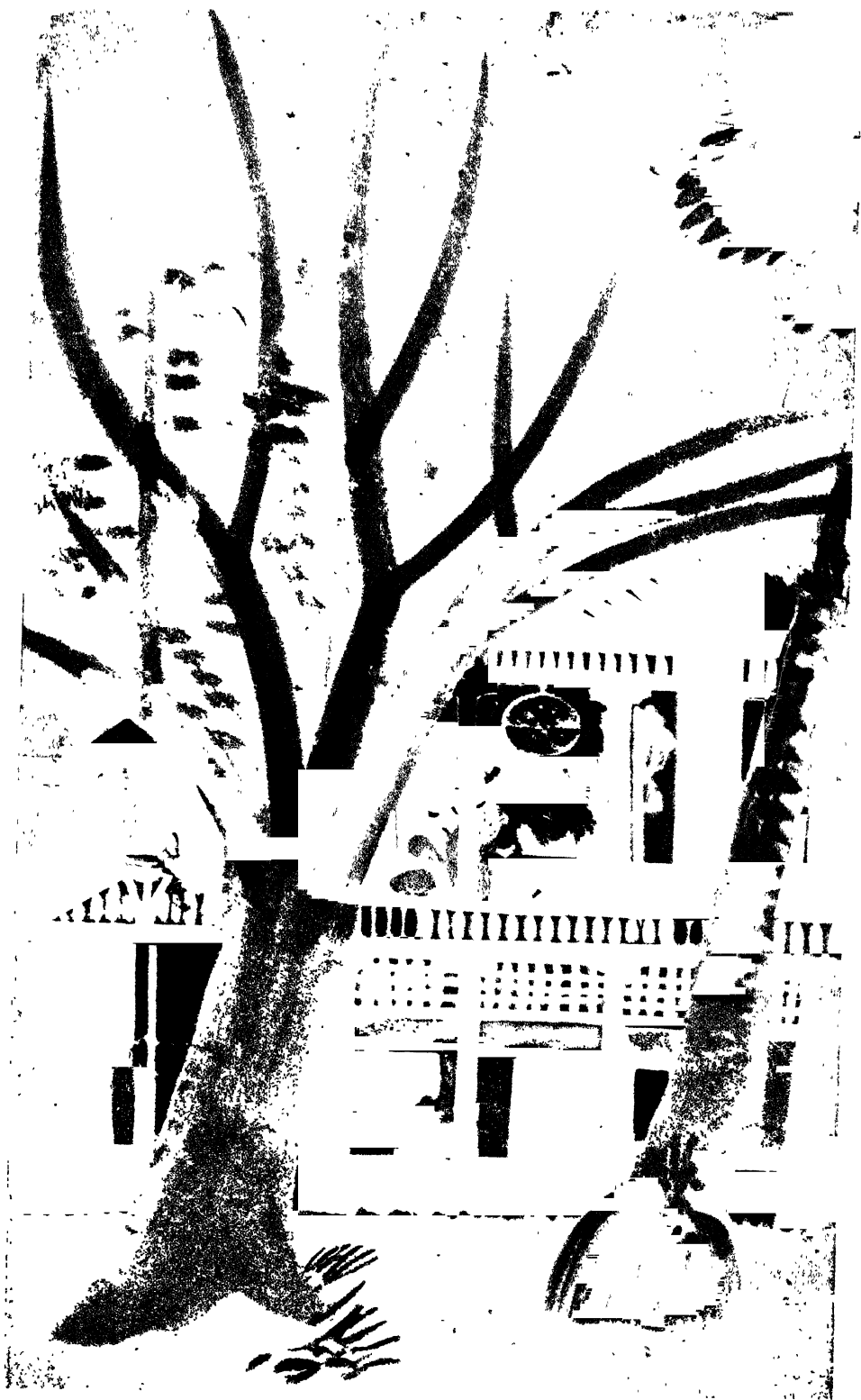
বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩

খাপছাড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন
চড়েছেন চৌঘুড়ি।
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর
ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।

পথ দেখালো মাছরাঙাটায়,
দেখল এসে চিংড়িঘাটায়
ঝুম্‌কোফুলের বোঝাই নিয়ে
মোচার খোলা ভাসে।
খোকনবাবু বিষম খুশি,
খিল্‌খিলিয়ে হাসে॥

৫।৯।৩৮
উত্তরায়ণ

২

মাঝে মাঝে বিধাতার
ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাসে
ফোটে বেলফুল।

হঠাৎ আনাড়ি কবি
তুলি হাতে আঁকে ছবি,
অকারণে কাঁচা কাজে
পেকে যায় চুল ॥

৩

ট্রাম-কন্‌ডাক্‌টার্‌
হুইসিলে ফুঁক দিয়ে
শহরের বুক দিয়ে
গাড়িটা চালায়, তার
সীমা নেই জাঁকটার।

বারো-আনা বাকি তার
মাথাটার তেলো যে,
চিরুনির চালাচালি
শেষ হয়ে এল যে।
বিধাতার নিজ হাতে
ঝাঁট-দেওয়া ফাঁকটার
কিছু চুল দু পাশেতে
ফুট্‌পাথ আছে পেতে,
মাঝে বড়ো রাস্তাটা
বুক জুড়ে টাকটার ॥

৪

জর্মন প্রোফেসার
দিয়েছেন গোঁফে সার
কত যে !

উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে
খোঁচা-খোঁচা ছাঁটা-ছাঁটা,
দেখে তাঁর ছাত্রের
ভয়ে গায়ে দেয় কাঁটা—
মাটির পানেতে চোখ
নত যে।

বৈদিক ব্যাখ্যায়
বাণী তাঁর মুখে এসে
যে নিমেষে পা বাড়ান
ওষ্ঠের দ্বারদেশে
চরণ কমল হয়
ক্ষত যে॥

৫

গাড়িতে মদের পিপে
ছিল তেরো-চোদ্দো।
এঞ্জিনে জল দিতে
দিল ভুলে মদ্য।

চাকাগুলো ধেয়ে করে
ধানখেত-ধ্বংশন,
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে
'কোথা কানুজংশন',
ট্রেন করে মাৎলামি
নেহাৎ অবোধ্য—

সাবধান করে দিতে
কবি লেখে পদ্য॥

৬

দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌
হেমবাবু দেয় লাফ,
মা বলেন, 'এ কি খেলা
ভূতের নাচন নেচে।'

নাকি সুরে বলে হেমা,
'চলতে যে পারি নে মা,
সকালে সর্দি লেগে
যেম্‌নি উঠেছি হেঁচে
অম্‌নি যে খচ্‌ করে
পা আমার মচকেছে।'

৭

হাত দিয়ে পেতে যবে
কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে
সেটাই পছন্দ।

আপিসেতে খেটে মরা,
তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো— এ কথায়
নাই কোনো সন্দ॥

এই সাতটি কবিতা 'খাপছাড়া' (১৩৪৩ মাঘ) কাব্যের সমসাময়িক, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এগুলি ও অনুরূপ অন্যান্য কবিতা খাপছাড়ার আগামী সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে যোগ করা হইবে। সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৭

শিলাইদহ। ২১শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৫]

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোন একটা রচনাকার্য্যে নিযুক্ত করাতে পারি তাহলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে— কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, প্রথম লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারিনে— মন বলে, আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল— এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না। আমি তাকে বলি, ঐ কথা ত তুমি বরাবর বল্‌চ কিন্তু লিখ্‌তেও ত কসুর কর না। আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মত, যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাথি ছুঁড়ে পিছন হঠ্‌তে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে কেটে বাপুবাছা বলে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুট্‌তে থাকে। এখন সে কেবলি তার কলকাতার আস্তাবলটার দিকে ঝুঁক্‌চে— আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখ্‌তে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ লাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত-পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম, তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরৎকাল আমার চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— তাই আমাকে একরকম স্মৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে।

শিলাইদহ। ২৫শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৫]

মানুষ আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে পাকিয়ে তুলেছে যে, এ সমাজে সুখী হওয়া এবং সুখী করা বিষম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখটা হয়ত মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা, সহ্য করা, ত্যাগ করা, হয়ত সুখী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশ্যক। কষ্টে মানুষকে মানুষ করে তুলতে থাকে, এবং সে মনুষ্যত্বের মূল্য কোথাও না কোথাও আছে। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালবাসেন তাকে পীড়া দেন,— কথাটা অনেক সময় কপট "ক্যাণ্টে"র মত শুনতে হয়— কিন্তু তাই বলে ওটা একেবারে অমূলক নয়। কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।··· দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সঙ্গতি নেই যে কারো দুঃখ দূর করতে পারি।— সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোট মনে হয় না— যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে উঠ্‌তে পারি তাহলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব— এই মেট্যিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালবাসার দ্বারা কারো দুঃখ দূর করা যায় না।

শিলাইদহ। ২৬শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৫]

যদিও ঝড় হবার কোন লক্ষণ দেখ্‌চিনে; আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবালোক নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল,— স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে— মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্চে— শরীর এবং মনের মধ্যে একটি পুলকমিশ্রিত জড়িমার সঞ্চার হচ্চে। আজ আমার নির্জ্জনবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে··· আমার সাধনা লেখার কাজে এখনো হাত দিইনি —কেবল সঙ্গীত আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি। এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্ত্তিনী— তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাসহিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সঙ্গীত ছাড়া আর কোনরকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজ্‌তে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামল-নীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মত আমার মর্ম্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি— কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে ত এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা ত ঐ একই— বৃষ্টি পড়চে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে— কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য নূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

শিলাইদহ। ৩০শে সেপ্টেম্বর [১৮৯৫]

তুই "আমরা ও তোমরা" [১] লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস্ দেখলুম— লোকটা কিন্তু খুব মজা করেছি মনে করে বসে আছে,— মুস্কিল এই যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না— কারণ রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মত প্রত্যক্ষবোধ;— এমন কি, ভালমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এই জন্যে সমালোচনার কাজটাকে ঝকমারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তথৈবচ।— কিন্তু তবুও ত সংসারে মোটের উপরে ভালমন্দের বিচার একরকম চলে যাচ্চে এবং নিতান্ত মন্দ চল্‌চে না— যদিচ ব্যক্তিগত মত-বৈষম্যের অপ্রতুল নেই— তবুও ত কালক্রমে সাধারণ মতের অনেকটা ঐক্য দাঁড়িয়ে যাচ্চে। কতকটা natural selectionএর মত— বৈষম্য (variation) প্রতিদিন নানা আকারে দেখা দিচ্চে— কিন্তু যেগুলো টেঁকবার নয় সেগুলো নানা উপায়ে নষ্ট হচ্চে, এবং যেগুলো টেঁকসই সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে সমস্ত বীজবপন করে যাচ্চি যদি

---

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা "আমরা ও তোমরা"; রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনা-পত্রের ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সোনার তরী'র "তোমরা ও আমরা" কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি।

মানুষের মনের পক্ষে তার যথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তাহলে যে সমালোচক যেমনি নিন্দা করুন বীজ ব্যর্থ হবে না;— আসল কথাটা এই যে মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নয়— আমার মনে আপাততঃ কোন্‌টা ভাল লাগল বা না লাগল তা আমি বল্‌তে পারি, এবং মোটামুটি অন্য লোকের কি ভাল লাগ্‌বে বা না লাগ্‌বে তাও বলতে পারি কিন্তু ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্ম বা জটিল হলেই খুব নিপুণ সমজদার ব্যতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে না— এবং নিপুণ সমজদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল থেকে যায়। সমজদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন সূক্ষ্ম, সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাগাকে অতিক্রম করে সমবেদনা-শক্তি-প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। সেরকম লোক বড় দুর্লভ। বরঞ্চ লেখক অনেক ভাল পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত সমজদার দুর্লভ— কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তবুও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণতঃ ভাল জিনিষেরই আদর দাঁড়িয়ে যায়। অতএব রুচির কোন প্রকৃত আদর্শ আছে কিনা তা নিয়ে তর্কের দ্বারা কোন সূক্ষ্ম মীমাংসা করা যায় না অথচ ব্যবহারতঃ মানুষের সমাজে একটা রুচির আদর্শ দাঁড়িয়ে যাচ্চে এবং সম্পূর্ণ কদর্য্যতা কখনই সৌন্দর্য্যরূপে টিকে যাচ্চে না— ভ্রম হচ্চে এবং তা সংশোধনও হয়ে যাচ্চে। তাই যদি না হত, তাহলে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সম্পূর্ণতা-সাধনের জন্যে চিরকাল থেকে গুণীবর্গের এত প্রাণপণ চেষ্টা থাকৃত না— রুচির অমোঘ আদর্শ তারা প্রমাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠা।

শিলাইদহ। ৪ঠা অক্টোবর। [১৮৯৫]

দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে— বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম্ম স্বল্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারিদিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য-প্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ— এই সব রংগুলি— এই জলের গেরুয়া, এপারের শাদা, ওপারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ সমস্ত কতই বেশ ভূষা দৃষ্টি হাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দ্দিকে শরৎ-কিরণে ঝলকিত হচ্চে। সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মত আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য্য এই যে, পর্শু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে, তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না— মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাক্‌বে না— মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দ্দিকে এতটা জিনিষের অপব্যয় করে!

শিলাইদহ। ১৫ই অক্টোবর। [১৮৯৫]

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে, জল ঝিক্‌মিক্‌ করচে, একটু একটু শীতের বাতাস দিচ্চে, নদীর জল আয়নার মত স্থির, মাঝে মাঝে এক আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে চলে যাচ্চে। যদি একলা থাক্‌তুম তাহলে এই সময়টাতে জান্‌লার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্ট চিত্তে পড়ে থাকতুম— দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শুন্‌তে পেতুম, এবং নিজের অস্তিত্বকে এই রৌদ্র জল বায়ুর ভিতরে সম্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্লোলিত অনুভব করতুম— নিজেকে অখণ্ড অনন্ত-

কালের শয্যাতলে শয়ান উপলব্ধি করতুম— সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তৃণগুল্মতরুলতা পশুপক্ষীরূপে যে জীবনরাশি উচ্ছ্বসিত হচ্চে নিজেকে সেই কলধ্বনিমুখরিত চিরনির্ঝরের মধ্যে প্রবাহিত বোধ করতুম— আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজত্ব-আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত, এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আত্মবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অমুকের বন্ধু, শ্রীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান।

শিলাইদহ। ১৬ই অক্টোবর। [১৮৯৫]

কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হয়নি— অনেকক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম— তারপরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে অনেকদিন পরে একাকী যাপন করেছিলুম— নদীর জল স্থির আয়নার মত ছিল— তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, যেন একটা কালো কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন, এবং তখনো দুই একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল— ওপারটা বেশ একটি স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত শান্তিময় দেখাচ্ছিল— আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মত স্থির দাঁড়িয়ে ছিল, এবং খুব দূর থেকে একটা কীর্ত্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটুও বাতাস ছিল না। আমাদের জনপ্রাণীহীন বালির চরের উপর কাশবন তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছিল— অবশেষে অনেকক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রাভারে সেইরকম অবনত হয়ে এল তখন আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে স্নানের পর মনে হচ্চে যথেষ্ট ঘুম হয়নি। শরীরে যে একটা ক্লান্তি বোধ হচ্চে সেটা বেশ লাগ্‌চে— বেশ বুঝ্‌তে পারচি, এখনি যদি বিছানার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একখানা ভ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অল্প অল্প শীতের বাতাসটি লাগ্‌তে থাকে, তাহলে ভারি আরাম করবে; সেই জন্যে সকালবেলাকার এইরকম ক্লান্তি আমার বড় ভাল লাগে— বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এক বেলার মত ছুটি নেওয়া যায়। আজকাল আমার ছুটি বাঁধা— কিন্তু এরকম অকর্ম্মণ্য দশা ভাল লাগে না— শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে তখন সে আপনিই কর্ম্ম অন্বেষণ করে, মানুষকে অস্থির করে তোলে— কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত আছে, নিজের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডটাই তার ভার বোধ হচ্চে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

পতিসর পথে। ২২শে নবেম্বর। [১৮৯৫]

ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে— সমস্তদিন একলা রয়েছি— কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয়নি, এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাস্‌চে, তার থেকে একরকম নতুন ধরণের সুগন্ধ আস্‌চে— পালে অত্যন্ত মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে— বোট খুব আস্তে আস্তে চলেছে, জলের উপর যে একটি সুকোমল আলো পড়েছে, এবং অদূরবর্ত্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব

সবুজ রঙের পর্য্যায় এবং নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্চে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আন্‌চে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্চে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আস্‌চে। কলকাতার নানান্ কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করচে— কিন্তু বেশ বুঝ্‌তে পারচি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগৎকে অনন্তবৃহৎ বলে জান্‌ব, এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। এই সুস্নিগ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে এবং কিছুক্ষণের জন্যে বেদনা বোধ হয়— তারপরে অতল সান্ত্বনার মধ্যে যখন একটি অসীম স্নেহের আলিঙ্গন অনুভব করি— অত্যন্ত নিবিড় নিভৃত অন্তরতম আত্মীয়তার উদার বক্ষের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ বোধ করি, তখন অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে— বুঝ্‌তে পারি "সুখ অতি সহজ সরল"— যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে এবং তার থেকে কোন বিমুখ অদৃষ্ট আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। অহমিকার বাইরে একবার পদক্ষেপ করবামাত্রই দেখা যায় সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ, জীবনে যৌবনে সৌন্দর্য্যে সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে— তখন মনে হয় আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাক্‌ব বলে আমি ধন্য— আমি যা জেনেছি যা পেয়েছি যা অনুভব করেছি তা একটিমাত্র হৃদয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য বৃহৎ।

পতিসর। ২৫শে নবেম্বর। [১৮৯৫]

আমরা এম্‌নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলিকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালিগ্রামটিতে এসে মনে করচি একটা কি বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খুঁটির সঙ্গে এম্‌নি ছোট দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একটুখানি নড়লে চড়লেই অম্‌নি টান পড়ে— কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা! আমি সরে আস্‌বামাত্রই আমার আত্মীয়সংসার একেবারে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে পড়েনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা বাঙ্গালীর ছেলেদের দেননি—আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড় জোর গ্রামের মাঠ পর্য্যন্ত আমাদের চরে' বেড়াবার সীমা— তাও সর্ব্বদাই রাখালবালক লাঠি হাতে পিছন পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম— তাতে দেখ্‌ছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করে কি এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কি এক অপূর্ব্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল— তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কি একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্য্যাদা অর্জ্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মত কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্দ্ধেকও হওয়া যায়নি— শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে; মনে হয় যদি গেটের মত শুভাদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাঙ্গলা দেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এদেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকৃত— তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম— এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি ত আমিও একসময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব— এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

যে ভূখণ্ড আজকাল বাংলা দেশ নামে পরিচিত প্রাচীন কালে তা বহু ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগেরই একেকটি পৃথক্ নাম ছিল। সমগ্র প্রদেশটির পরিচয়জ্ঞাপক কোনো বিশেষ নাম ছিল না। অর্থাৎ তখনও অখণ্ড বাংলা দেশ গড়ে ওঠেনি। এই প্রদেশটি তখন ছিল বহু বিভিন্ন জাতি বা নরগোষ্ঠীর (tribeএর) বাসভূমি। প্রাচীন সাহিত্যে এরকম নরগোষ্ঠীকে বলা হয় 'জন'[১] এবং তাদের অধ্যুষিত ভূভাগকে বলা হয় 'জনপদ'। একভাষিক ও একনামিক অখণ্ড বাংলা দেশ গড়ে উঠেছে মধ্যযুগে তুর্কিবিজয়ের পরে। যেসব ঘটনাপরম্পরায় বহু 'জন' ও 'জনপদ' একত্র সংহত হয়ে অখণ্ড বাঙালি জাতি ও বাংলা দেশ গড়ে উঠল তার বিবরণই হচ্ছে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের মূল কথা। সে ইতিহাসের ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রাচীন জন ও জনপদগুলির ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান জনপদগুলির ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু কাজটি নানা কারণেই সহজ নয়। প্রাচীন কালের যাযাবরবৃত্তির ফলে জনসমূহ সর্বদাই একস্থানে অবস্থিতি করত না, নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ত। প্রত্যেকটি জনেরই নানা উপবিভাগ থাকত, তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানার উপায় নেই। জনপদগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় কারণে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ হত এবং এক জনপদের উপর অন্য জনপদের আধিপত্য ঘটত, ফলে জনপদগুলির ভৌগোলিক সংকোচন-সম্প্রসারণ ঘটত। কালে কালে জনপদগুলির ভৌগোলিক সীমাপরিবর্তনের ন্যায় নামেরও পরিবর্তন ঘটত। আমরা প্রাচীন জনপদগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করব না, শুধু প্রধান প্রধান জনপদগুলির আদি সংস্থিতির পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্বে বলেছি অখণ্ড বাংলার অভ্যুদয় ঘটেছে মধ্যযুগে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বতন জনপদবিভাগগুলির ছেদচিহ্ন আজও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। আমাদের ভাষায়, সমাজব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে পূর্বতন বিভাগের স্মৃতি-অবশেষ এখনও জেগে রয়েছে। আমাদের বাসভূমিকে কখনও বলি 'বঙ্গ' দেশ, কখনও 'বাংলা' দেশ। মধুসূদন কাব্য লিখলেন 'গৌড়' জনের আনন্দের জন্য। পূর্ববঙ্গবাসীর, বিশেষত তাদের ভাষার, 'বাঙাল' দুর্নাম আজও ঘোচেনি, অথচ পূর্ব বা পশ্চিম কোনো অঞ্চলের অধিবাসীই 'বাঙালি' নামে পরিচিত হতে লজ্জা বোধ করে না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে 'বঙ্গজ' কায়স্থ ছিলেন, ভারতচন্দ্রের সময় থেকে সেকথা সুবিদিত। 'রাঢ়ী' ও 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের নিষিদ্ধতা আজও অটুট রয়েছে; উভয় শ্রেণীর পার্থক্য জাতিগত পার্থক্যের ন্যায়ই মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উভয় শ্রেণীর বংশগত পদবীই এই পার্থক্যের পতাকাকে সগর্বে উড্ডীয়মান রেখেছে। এর থেকে সহজেই বোঝা যাবে প্রাচীন কালের জনপদবিভাগগুলি আসলে ছিল একেকটি পৃথক্ দেশ অর্থাৎ

---

১ তুলনীয়: গৌড় 'জন' যাহে আনন্দে করিবে পান ইত্যাদি।

একেকটি পৃথক্ জাতির বাসভূমি এবং এই জনপদগুলির মধ্যে বঙ্গ, বাংলা, গৌড়, রাঢ় ও বরেন্দ্র এইগুলিই কালক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এসমস্ত প্রাচীন জনপদের নাম সুপরিচিত হলেও এগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই।

পণ্ডিতমহলে বাংলা দেশের প্রাচীন জনপদসংস্থান সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু গবেষণা-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সে গবেষণার ফল এখনও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজলভ্য হয়নি এবং পণ্ডিতমহলেও অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও অস্পষ্টতা ঘোচেনি। ১৯০৮ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মনোমোহন চক্রবর্তী প্রাচীন বাংলার ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ডক্টর বিমলাচরণ লাহার Tribes in Ancient India নামক পুস্তকের আলোচনাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলার প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস প্রথমখণ্ডে। এই আলোচনাটি দীর্ঘকাল গবেষকদের একটি অত্যাবশ্যক অবলম্বন হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপ সম্বন্ধে এখনও আরও অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সমস্ত জটিলতা পরিহার করে প্রাচীন বাংলার প্রধান জনপদগুলির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করব এবং প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে কিছু নূতন তথ্যও উপস্থাপিত করব।

২

মধ্যযুগের প্রসিদ্ধি অনুসারে বাংলা দেশ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও বাগড়ী এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। গোপালভট্টের বল্লালচরিত গ্রন্থের মতে বল্লালসেনের সময়েও এই বিভাগই প্রচলিত ছিল।[২] মোটামুটি ভাবে এই চারটি বিভাগকে যথাক্রমে আধুনিক কালের বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্বতন রূপ বলে গণ্য করা যায়। নদীমাতৃক বাংলা দেশের বড়ো বড়ো নদীগুলিই দেশটিকে এই চারটি স্বাভাবিক বিভাগে বিভক্ত করেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এই নামগুলি বাংলা দেশের একেকটি বিভাগের নাম বলেই গণ্য হত, যথার্থ জনপদ বা বিশেষ বিশেষ নরগোষ্ঠীর বাসভূমি বলে গণ্য হত না। তার মধ্যে 'বঙ্গ' নামটি একটি প্রাচীন জন বা নরগোষ্ঠীরই পরিচায়ক, 'রাঢ়' নামটিও মূলত একটি 'জন'এর নাম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা যায়।[৩] কিন্তু 'বাগড়ী'

---

২ নন্দলাল দে-প্রণীত *Geographical Dictionary* ২য় সং, পৃ ২২; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী-সম্পাদিত কানিংহামের *Ancient Geography*, পৃ ৭২৯-৩০; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *History of Bengal* ১ম খণ্ড, পৃ ২১৭।

৩ জৈন আয়ারাঙ্গসুত্তে রাঢ়েরা একটি অসভ্য জাতি বলেই বর্ণিত হয়েছে; বর্ধমান মহাবীর যখন রাঢ়ভূমিতে এসেছিলেন তখন রাঢ়েরা তাঁর প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করেছিল, তাঁর দিকে কুকুর লেলিয়েও দিয়েছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রাঢ়দের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে।

অক্ষটি হিংশক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়।

কৃতাঞ্জলী বীর কহে হই গ চোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড়।
— কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং) প্রথম ভাগ, পৃ ২০৫,২১৫।

জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।
—ধর্মমঙ্গল ২২।২৭৫ (বঙ্গবাসী সং) পৃ ২২৩।

নামটি নিঃসন্দেহেই জনবাচক নয়, 'বরেন্দ্র' নামটিও সম্ভবত তাই। বস্তুত বরেন্দ্র ও বাগড়ী নাম দুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, বঙ্গ ও রাঢ় নাম তার তুলনায় অনেক প্রাচীন। যাহোক প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিতলিপিতে বহু জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন্‌গুলি কোন্‌ বিভাগের অন্তর্গত তা নির্ণয় করা আবশ্যক। তাছাড়া আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগটি প্রাচীনকালে কি নামে পরিচিত ছিল, এটি তৎকালীন বঙ্গ বিভাগেরই অন্তর্গত কি না এবং এর জনপদবিভাগই বা কি রকম ছিল, এসকল প্রশ্নেরও যথোচিত আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা এখন যথাক্রমে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও বাগড়ী বিভাগের প্রধান প্রধান জনপদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে অগ্রসর হব।

৩

প্রথমেই রাঢ় বিভাগের কথা। কান্যকুব্জের প্রতীহারবংশীয় সম্রাট্‌ মহেন্দ্রপালের (আনুমানিক ৮৯০-৯১০) সভাকবি রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে ভারতবর্ষের পূর্বাংশের জনপদসমূহের উল্লেখ আছে। যথা—

অথ সর্বে প্রথমং প্রাচীং দিশং শিশ্রিয়ুর্যত্রাঙ্গবঙ্গসুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রাদ্যা জনপদাঃ।

—কাব্যমীমাংসা[৪], তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৮।

এই জনপদগুলির মধ্যে অঙ্গ (ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা) আধুনিক বাংলা দেশের অন্তর্গত নয়। বাকি চারটি জনপদই বাংলার অন্তর্গত। বঙ্গ ও পুণ্ড্র জনপদের কথা পরে আলোচনা করব। এস্থলে সুহ্ম ও ব্রহ্ম জনপদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কেননা ও-দুটিই রাঢ় বিভাগের অন্তর্গত। রাজশেখরের উক্তি থেকে এই জনপদ-দুটির অবস্থান জানা যায় না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ" (সভাপর্ব ৩০।১৬)। জৈন আয়ারাঙ্গসুত্তে দেখা যায় তৎকালে রাঢ় দেশ সুব্‌ভ-ভূমি ও বজ্জ-ভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সুব্‌ভ যে সুহ্ম শব্দেরই রূপান্তর একথা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং সুহ্ম জনপদ যে রাঢ়ের অন্তর্গত তাতে আর সন্দেহ করা চলে না। বজ্জভূমি ব্রহ্মভূমি কথার রূপান্তর বলেই সন্দেহ হয়। কেউ কেউ বজ্জভূমিকে বজ্রভূমি কথার রূপান্তর বলে মনে করেন।[৫] কিন্তু ব্রহ্ম জনপদ যে রাঢ়ের অংশ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৫) সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে। উক্ত কাব্যে সুহ্ম ও ব্রহ্ম উভয় জনপদেরই উল্লেখ আছে এবং দুটি জনপদই গঙ্গার (ভাগীরথীর) পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে।[৬] পবনদূতের বর্ণনা থেকে ব্রহ্মদেশের অবস্থান সম্বন্ধেও অনেকটা ধারণা করা যায়। প্রথমত, ব্রহ্মকে সুহ্মদেশের উত্তরে স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যেস্থানে যমুনা নদী গঙ্গা থেকে নির্গত হয়েছে সে স্থানটি, অর্থাৎ

---

৪ *Gaekwad's Oriental Series No. I*, ৩য় সং (১৯৩৪)।

৫ ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ৯। তিনি মনে করেন বজ্জভূমি (পরবর্তী কালের মদারন সরকার) আধুনিক বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলি জেলার কোনো কোনো অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। আমরা পরে দেখব ব্রহ্মভূমিও ঠিক এই ভূখণ্ডের উপরেই বিস্তৃত ছিল। তাই বজ্জভূমি ও ব্রহ্মভূমিকে অভিন্ন বলেই মনে হয়।

৬ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত পবনদূত (১৯২৬), ২৭-৩৩। কাব্যমীমাংসায় সুহ্ম ও ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'জনপদ', পবনদূতে বলা হয়েছে 'দেশ', আর আয়ারাঙ্গসুত্তে বলা হয়েছে 'ভূমি'। শব্দগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

বর্তমান হুগলি জেলার উত্তরাংশস্থিত ত্রিবেণী, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বলে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পবনদূতের মতে সেনরাজাদের রাজধানী গঙ্গাতীরবর্তী বিজয়পুরও ব্রহ্মদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতদের মতে মিন্‌হাজ-উদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থোক্ত লক্ষণসেনের রাজধানী নদিয়া এবং পবনদূতের বিজয়পুর একই স্থান।[৭] যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে মিন্‌হাজ-কথিত নদিয়া অর্থাৎ আধুনিক নবদ্বীপ শহরটিও তৎকালে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বলেই স্বীকৃত ছিল।

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে সুহ্মদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মদের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় শুধু কাব্যমীমাংসা ও পবনদূত গ্রন্থে। কিন্তু ওই দুই গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র ব্রহ্মদের উল্লেখ যে একেবারেই নেই তা নয়। কাব্যমীমাংসারই অন্যত্র আছে—

> বারাণস্যাঃ পুরতঃ (পাঠান্তর, পরতঃ) পূর্বদেশঃ। যত্রাঙ্গকলিঙ্গ··· পুণ্ড্র প্রাগ্‌জ্যোতিষ-তাম্রলিপ্তক-মলদমল্লবর্তক-সুহ্মব্রহ্মোত্তর-প্রভৃতয়ো জনপদাঃ।
>
> —কাব্যমীমাংসা, অধ্যায় ১৭, পৃ ৯৩।

কেউ কেউ 'ব্রহ্মোত্তর' কথাটিকেই জনপদবাচক বলে মনে করেন।[৮] কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে সুহ্মের সঙ্গে ব্রহ্ম জনপদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকাতে সপ্তদশ অধ্যায়ের 'ব্রহ্মোত্তর' কথাটিকে 'ব্রহ্ম' ও 'উত্তর' শব্দের সমাসবদ্ধ পদ বলে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। তবে ব্রহ্মোত্তর কথাটির ঠিক অর্থ কি তা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতে ভীমের দিগ্‌বিজয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে সুহ্মের সঙ্গে 'প্রসুহ্ম' নামক একটি জনেরও উল্লেখ দেখা যায়।[৯] সম্ভবত সুহ্মদেরই কোনো বিশেষ শাখা প্রসুহ্ম বলে অভিহিত হয়েছে। একথা অনুমান করা বোধ করি অসংগত হবে না যে, এই শাখাটিরই বিশিষ্ট নাম ছিল ব্রহ্ম। সুহ্মদের পুরোভাগে অবস্থিত ছিল বলেই বোধ করি তাদের প্রসুহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের সুহ্মপ্রসুহ্ম- এবং কাব্য-মীমাংসার সুহ্মব্রহ্ম বা সুহ্মব্রহ্মোত্তর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি জনপদের নামভেদ বলেই মনে হয়। ব্রহ্মোত্তর শব্দটি শুধু যে কাব্যমীমাংসাতেই পাওয়া গিয়েছে তা নয়। ভরতনাট্যশাস্ত্র (১৪।৪৪) এবং মার্কণ্ডেয় (৫৭।৪৩) প্রভৃতি পুরাণেও এই শব্দটির সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু কাব্যমীমাংসা ছাড়া অন্য কোথাও এই শব্দটির পূর্বে সুহ্ম কথাটি নেই। কাব্যমীমাংসা, নাট্যশাস্ত্র ও পুরাণগুলিতে জনপদের যে তালিকা দেখা যায় সেগুলির রচনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক তুলনা করলে বোঝা যায় সবগুলি তালিকাই মূলত এক, অর্থাৎ একই উৎস থেকে গৃহীত, এবং প্রত্যেকটি তালিকাতেই অদ্ভুত অদ্ভুত পাঠবিকৃতি ঢুকেছে। তুলনায় কাব্যমীমাংসার তালিকাতেই সব চেয়ে বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয়। তাই এই তালিকাতে সুহ্ম কথাটি রক্ষিত হয়েছে এবং অন্য তালিকাগুলিতে লুপ্ত হয়েছে। যাহোক সব মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয় রাঢ়ভূমিতে সুহ্ম জনপদের পাশেই ব্রহ্ম নামে অপর একটি জনপদ বিদ্যমান ছিল এবিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

---

৭ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার নদিয়া ও বিজয়পুরের অভিন্নতা স্বীকার করেন—*History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ২৫২। কিন্তু ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এ বিষয়ে সন্দিহান, ঐ পৃ ৩৩।

৮ ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩।

৯ সভাপর্ব ৩০।১৬।

পূর্বে দেখিয়েছি পবনদূতের মতে সুহ্মদেশ রাঢ়ের দক্ষিণ অংশে এবং ব্রহ্মদেশ উত্তর অংশে অবস্থিত ছিল। দশকুমারচরিতে (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, মিত্রগুপ্তচরিতম্— সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য) তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) নগর সুহ্ম জনপদের অন্তর্গত বলে বর্ণিত হয়েছে।[১০] এর থেকেও অনুমিত হয় যে, সুহ্ম রাঢ়ের দক্ষিণ অংশেই অবস্থিত ছিল।[১১] আর ব্রহ্ম ছিল সুহ্মের উত্তরে অর্থাৎ রাঢ়ের উত্তর অংশে; আমরা দেখেছি ত্রিবেণী এবং নবদ্বীপ ব্রহ্মদেশভুক্ত বলে গণ্য হত।[১২] প্রাচীন সাহিত্যে ও খোদিতলিপিতে বহুস্থলে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ- রাঢ়ের উল্লেখ দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, যেসব স্থলে রাঢ়ের উল্লেখ থাকে সেসব স্থলে সুহ্ম-ব্রহ্মের নাম থাকে না এবং যেখানে সুহ্ম-ব্রহ্মের উল্লেখ থাকে সেখানে রাঢ়ের নাম থাকে না। রাজশেখরই কাব্যমীমাংসায় সুহ্ম ও ব্রহ্ম জনপদের নাম করেছেন, রাঢ়ের নাম করেননি; অথচ তিনিই তাঁর কর্পূরমঞ্জরী নাটকে রাঢ়ার নাম করেছেন, সেখানে সুহ্ম-ব্রহ্ম নেই। এসব কারণে মনে হয় প্রাচীন কালের ব্রহ্ম ও সুহ্ম জনপদই কালক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় বলে পরিচিত হয়েছে এবং ব্রহ্ম ও সুহ্ম নাম দুটি লোপ পেয়েছে।

৪

সুহ্ম জনপদের অস্তিত্ব পণ্ডিতমহলে চিরকালই স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ব্রহ্ম জনপদের কথা অজ্ঞাত ছিল। প্রধানত কাব্যমীমাংসা ও পবনদূতের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আমিই প্রথম ব্রহ্ম জনপদের কথা প্রকাশ করি এবং দেখাতে চেষ্টা করি যে, সুহ্ম ও ব্রহ্ম হচ্ছে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ের বিশিষ্ট নাম।[১৩] অতঃপর ডক্টর এ. বি. কীথ[১৪], ডক্টর বিমলাচরণ লাহা[১৫], প্রমোদলাল পাল[১৬] প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই মতের মর্যাদা স্বীকার করেও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১৭] ব্রহ্ম ও সুহ্ম যে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের

---

১০ পবনদূতে তাম্রলিপ্তির নাম নেই, বোধকরি তখন এটি সুহ্মের অন্তর্গত বলেই গণ্য হত। কিন্তু মহাভারতের ভীমের দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় এবং কাব্যমীমাংসার পূর্বদেশের জনপদতালিকায় সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তক উভয়েরই উল্লেখ আছে। মনে হয় তাম্রলিপ্তি সময়ে সময়ে সুহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র জনপদের মর্যাদা লাভ করত।

১১ দিগ্‌বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে বলা হয়েছে "দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।" মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত "বীরভূম-বিবরণ" প্রথম খণ্ড, পৃ ২৩৬। কিন্তু দিগ্‌বিজয়প্রকাশ অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে প্রাচীনতর প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আমার বিশ্বাস দিগ্‌বিজয়প্রকাশের মূলপাঠ ছিল 'ব্রহ্মদেশঃ'। এই পাঠ স্বীকার করলে, অর্থাৎ দামোদরের উত্তরভাগকে ব্রহ্ম এবং দক্ষিণভাগকে সুহ্ম বলে স্বীকার করলে, সমস্ত জানা তথ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষিত হয়।

১২ সাধারণত অজয় নদকেই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমারেখা বলে ধরা হয়। কিন্তু অন্তত প্রাচীন কালে তা ছিল না। হুগলি জেলার উত্তরাংশ ও বর্ধমান জেলারও কিছু অংশ যে ব্রহ্ম বা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দ্রষ্টব্য *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ২২।

১৩ *Some Janapadas of Ancient Radha, Ind. Hist. Quarterly* 1932, পৃ ৫২১-৩৪।

১৪ একখানি ব্যক্তিগত পত্রে (১৭।৫।৩৩) ডক্টর কীথ লিখেছেন, "I think you have made out a very strong case for the explanation of the region Brahma as parallel with Suhma and making up with it Radha. This seems adequately to account for all the facts mentioned."

১৫ *Ancient Indian Tribes* Vol. II (Luzac & Co., 1934) পৃ ৫ এবং ৯; *Tribes in Ancient India* (Bhandarkar Oriental Series No. 4, 1943) পৃ ২৬৭ এবং ২৭৬।

১৬ *Early History of Bengal* Vol. I. (1939), Introduction পৃ ২।

১৭ *History of Bengal D. U.* Vol. I, পৃ ৩৩।

প্রাচীন নাম একথা তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু জৈন আয়ারাঙ্গসুত্তের বজ্জভূমি ও সুব্‌ভভূমিকে তিনি রাঢ়ের উক্ত দুই অংশের প্রাচীন নাম বলে মনে করেন।[১৮] অথচ বজ্জভূমি যে সুব্‌ভভূমির উত্তরে অবস্থিত ছিল এমন কোনো কথা আয়ারাঙ্গসুত্তে নেই। মনে হয় কাব্যমীমাংসার দেশবিভাগ অধ্যায়ে উক্ত 'সুহ্মব্রহ্মোত্তর' অংশটাই তিনি দেখেছেন, কিন্তু এই গ্রন্থেরই তৃতীয় অধ্যায়ের 'সুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রাদ্যা জনপদাঃ' এই স্পষ্ট উক্তিটি তিনি লক্ষ্য করেননি। সম্ভবত এই জন্যই তিনি ব্রহ্ম জনপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেননি। ফলে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে, ১৬ পৃষ্ঠায় বাংলা দেশের প্রাচীন বিভাগসমূহের যে মানচিত্রটি আছে তাতে সুহ্ম জনপদের অবস্থান দেখানো হলেও ব্রহ্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৯] এস্থলে মানচিত্রটির আরেকটি ক্রটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নীলকণ্ঠের টীকা এবং দণ্ডীর দশকুমারচরিতের সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে, তাম্রলিপ্তির সমীপবর্তী ভূভাগই সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ়। কিন্তু উক্ত মানচিত্রে সুহ্ম ও দক্ষিণ রাঢ়কে পরস্পর থেকে বহু দূরে স্থাপন করা হয়েছে। সুহ্মকে যথাস্থানেই অর্থাৎ তাম্রলিপ্তির সমীপেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়কে স্থাপন করা হয়েছে অজয়নদের ঠিক দক্ষিণেই; অথচ ডক্টর রায়চৌধুরীই দেখিয়েছেন যে অজয়ের দক্ষিণতীরবর্তী ভূভাগও উত্তর রাঢ়েরই অন্তর্গত ছিল।[২০] নবদ্বীপ এবং ত্রিবেণী, এই স্থানদুটিকে দক্ষিণ রাঢ়ে স্থাপন করাও ঠিক হয়নি।

৫

অতঃপর রাঢ় বিভাগের প্রাচীন নগরগুলির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের (একাদশ শতক) কোনো কোনো পাঠে 'রাঢ়াপুরী'র উল্লেখ দেখা যায়। এই রাঢ়াপুরীর অবস্থান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমি এক প্রবন্ধে দেখিয়েছি, রাঢ়াপুরী পাঠবিকৃতি মাত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়ে বস্তুত রাঢ়াপুরীর কোনো উল্লেখ থাকতে পারে না এবং প্রাচীনকালে বা কোনো কালেই ওই নামে কোনো শহর ছিল না।[২১]

দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মের প্রধান নগর ছিল তাম্রলিপ্তি। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে তাম্রলিপ্তির বহু উল্লেখ আছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে এই নগরটি (Tamalites) গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক তমলুক কিন্তু রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত। নদীর ধারা পরিবর্তনের ফলেই এই পার্থক্য হয়ে থাকবে, অথবা টলেমির ভ্রান্তিও হতে পারে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন (৩৯৯-৪১৪), হিউএন্থ সাঙ (৬৩০-৪৩) এবং ইৎসিঙ (৬৭৩-৮৮), এই তিন জনই তাম্রলিপ্তির কথা বলেছেন। এঁদের সময়ে এই নগরটি ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর থেকে সমুদ্রপথে সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত চলত। ফা হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর বাস করেছিলেন এবং এখান থেকেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন। ইৎসিঙ স্বদেশ

---

১৮ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ২০-২১।

১৯ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থে (২য় সং, ১৩৪৬) "কালিদাসের যুগে উত্তরভারত" নামক সংকৃত মানচিত্রে সুহ্ম ও ব্রহ্মের অবস্থান দ্রষ্টব্য।

২০ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ২২।

২১ *Indian Historical Quarterly* 1932, পৃ ৫৩১।

থেকে সমুদ্রপথে এসে এখানেই অবতরণ করেন এবং এখান থেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পালি (বিনয়পিটক, মহাবংশ) এবং সংস্কৃত (দশকুমারচরিত, কথাসরিৎসাগর) সাহিত্যেও তাম্রলিপ্তির এই গৌরবের সমর্থন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের মতে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা তাম্রলিপ্তি থেকেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন।

গুজরাতের রাজা কুমারপালের (১১৪৩-৭৪) গুরু জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তির অনেক নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি নাম 'বিষ্ণুগৃহ'। এই নাম থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্তিতে সম্ভবত একটি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৫) সভাকবি ধোয়ী হেমচন্দ্রের প্রায় সমকালীন। তাঁর পবনদূত কাব্যে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ নেই, কিন্তু সুহ্মদেশের বর্ণনায় প্রথমেই একটি বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ আছে।

দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।

—পবনদূত, ২৮।

এই মুরারি-বা বিষ্ণু-মন্দিরের উল্লেখ থেকে মনে হয়, এই শ্লোকটির লক্ষ্য হেমচন্দ্রের কথিত বিষ্ণুগৃহ অর্থাৎ তাম্রলিপ্তি নগর। 'সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তঃ' এই বিশেষণ থেকে মনে হয় 'পরমবৈষ্ণব' লক্ষ্মণসেন এই বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দিতে এসেছিলেন। সম্ভবত এই মন্দিরটিই ইদিলপুর তাম্রশাসনে 'বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে-র্মুসলধরগদাপাণিসংবাসবেদী' বলে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর ধোয়ী শিবমন্দিরবিশিষ্ট একটি নগরের (নগরমনঘং চারুচন্দ্রার্ধমৌলেঃ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি কোন্ নগর তা নির্ণয় করার উপায় নেই। তারপর উল্লিখিত হয়েছে ব্রহ্ম দেশের অন্তর্গত একটি স্থান —ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী, যেখানে ভাগীরথী থেকে তপনতনয়া অর্থাৎ যমুনা নদী নির্গত হচ্ছে। এই স্থানটির নাম কি তা উল্লিখিত হয়নি এবং এটি নগর না গ্রাম তাও বলা হয়নি। কিন্তু স্থানটি যে আধুনিক ত্রিবেণী তাতে সন্দেহ নেই।

তৎপরে গঙ্গাতীরবর্তী রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পূর্বেই বলেছি বিজয়পুর নবদ্বীপেরই নামান্তর বলে অনুমিত হয়ে থাকে। বিজয়পুর নগরটি লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেন-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। আর নবদ্বীপ নাম থেকে মনে হয় ওটি একটি নবপ্রতিষ্ঠিত নগর। হয়তো লক্ষ্মণসেনই বিজয়পুরের নিকটেই একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যদি তাই হয় তবে তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে উক্ত রাঢ়ের অন্তর্গত 'লখন-ওর' অর্থাৎ লক্ষ্মণপুর শহর আর নবদ্বীপ অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। পাল-রাজধানী রামাবতীর কাছেই লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণাবতী নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।[২২] এই লক্ষ্মণাবতীরই অপর নাম গৌড়। সুতরাং লখন-ওর বা লক্ষ্মণপুরেরই অপর নাম নবদ্বীপ এবং এটি হয়তো লক্ষ্মণসেনেরই প্রতিষ্ঠিত একথা মনে করা অযৌক্তিক নয়। নবদ্বীপ থেকে দক্ষিণপশ্চিমে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি থানার এলাকায় যোয়া নদীর তীরে 'বিজুর' নামে একটি গ্রাম আছে। বিজুর নামটি 'বিজয়পুর' থেকেই উৎপন্ন। কিন্তু এই গ্রামটিকে পবনদূতে উল্লিখিত রাজধানী বিজয়পুর বলে স্বীকার করার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে, স্থানটি গঙ্গা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

২২ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩।

রাঢ়ভূমির আরেকটি প্রসিদ্ধ নগর হচ্ছে বর্ধমান। বর্ধমানের প্রথম উল্লেখ পাই বরাহমিহিরের (৫০৫-৮৭) বৃহৎসংহিতায়।

একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্ধমানাশ্চ।

—বৃহৎসংহিতা ১৪।৭।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কূর্মনিবেশ-নামক অধ্যায়ের তালিকাটি বৃহৎসংহিতার তালিকার সঙ্গে প্রায় অবিকল একরূপ। তাতে আছে—

তাম্রলিপ্তৈকপাদপা বর্ধমানাঃ কোশলাশ্চ।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮।১৪।

অথর্ববেদ-পরিশিষ্টের কূর্মবিভাগ অংশেও অনুরূপ জনপদতালিকা আছে। তাতেও বর্ধমানক নামের উল্লেখ দেখা যায়। এসব তালিকায় বর্ধমান ভারতবর্ষের পূর্বাংশেই স্থাপিত হয়েছে এবং তাতে তাম্রলিপ্তিও স্থান পেয়েছে। সুতরাং রাঢ়ের কোনো স্থান যে অতি প্রাচীন কালেই বর্ধমান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং বর্ধমান নগরটিও তৎকালে বিদ্যমান ছিল এ অনুমান অসংগত নয়। বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যেও 'বর্ধমানপুর' নামক স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

কামরূপে তথা দেশে বর্ধমানে পুরোত্তমে।

—মঞ্জুশ্রীমূলকল্প ১ম খণ্ড, পৃ ৮৯।

রাঢ়ের অন্তর্গত আধুনিক বর্ধমানকেই মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে 'পুরোত্তম বর্ধমান' বলে বর্ণনা করা হয়েছে মনে করা যায়। কারণ বাংলা দেশে বা পূর্বভারতে অন্য কোনো বর্ধমানপুর ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু সংশয় উপস্থিত করেছে হরিকেল মণ্ডলের বৌদ্ধ নৃপতি কান্তিদেবের (নবম শতক) একখানি তাম্রশাসন। এটি পাওয়া গিয়েছে চট্টগ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরে। এই তাম্রশাসনখানি থেকে জানা যায় হরিকেল মণ্ডলের অধিপতি কান্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুরে এবং তাম্রশাসনখানিও সেখানেই উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই তাম্রলিপিটি একটি ভৌগোলিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। হরিকেল বাংলা দেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম, এটির অবস্থান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। এই লিপিতে উক্ত বর্ধমানপুর ও রাঢ়ভূমির বর্ধমান যদি অভিন্ন হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে, হরিকেল রাঢ় বিভাগেরই একটি জনপদ। কিন্তু একথা স্বীকার করার পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে হরিকেল জনপদ যদি রাঢ়ের অন্তর্গত না হয় তাহলে বাংলা দেশে দ্বিতীয় একটি বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তার পক্ষেও কোনো প্রমাণ নেই। এই অবস্থায় পণ্ডিতদের মধ্যে মতৈক্য আশা করা যায় না। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাসেও মতানৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে হরিকেল রাঢ়ের অন্তর্গত নয়, সুতরাং কান্তিদেবের রাজধানী বর্ধমানপুর ও রাঢ়ের বর্ধমানকে অভিন্ন বলে গণ্য করা যায় না। পক্ষান্তরে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার দ্বিতীয় বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব স্বীকারের পক্ষপাতী নন, সুতরাং তাঁর মতে হরিকেল জনপদ রাঢ়েরই অন্তর্গত।[২৩] উক্ত ইতিহাসে বাংলার জনপদ-পরিচায়ক যে মানচিত্রখানি আছে তাতে কিন্তু হরিকেলকে রাঢ়ে স্থাপন করা হয়নি, অথচ হরিকেল

---

২৩ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ৩১ ও ১৩৪।

প্রাচীন বাংলা
জনপদ-বিভাগ
প্রাগজ্যোতিষ
কোটীবর্ষ
রামাবতী
কর্ণসুবর্ণ
কর্মান্ত
পূ র্ব সা গ র
০ ৩২ ৬৪ ৯৬

চম্পা
গ ঙ্গা
সোমপুর
পুণ্ড্রবর্ধন
রামাবতী
কর্ণসুবর্ণ
ম য়ু রা ক্ষী
সিঙ্গল
কেন্দুবিল্ব
নবদ্বীপ
বিজয়পুর
দা মো দ র
রূ প না রা য়ণ
তাম্রলিপ্তি
উপবঙ্গ
প্রাচীন
রাঢ়া
পূ র্ব সা গ র
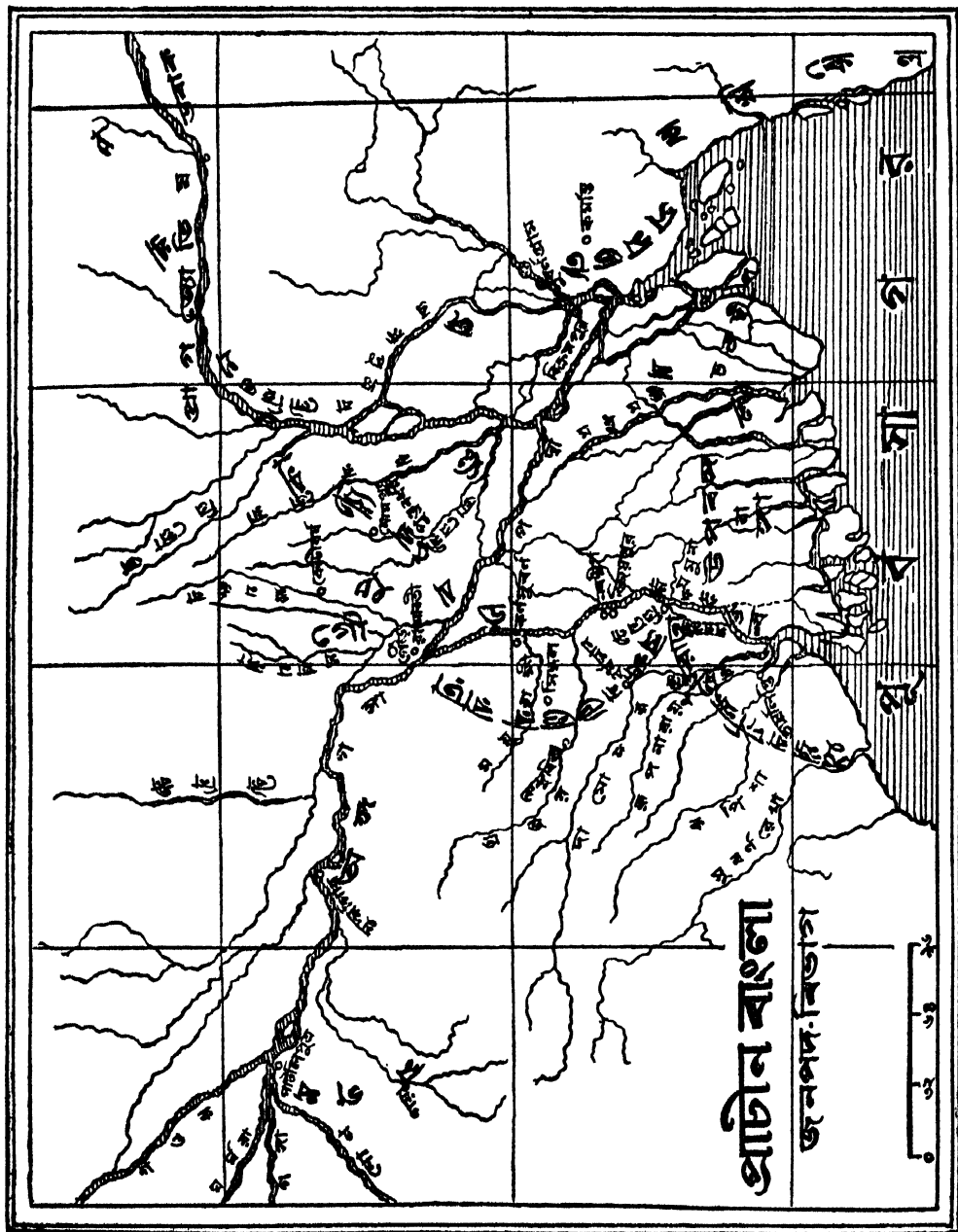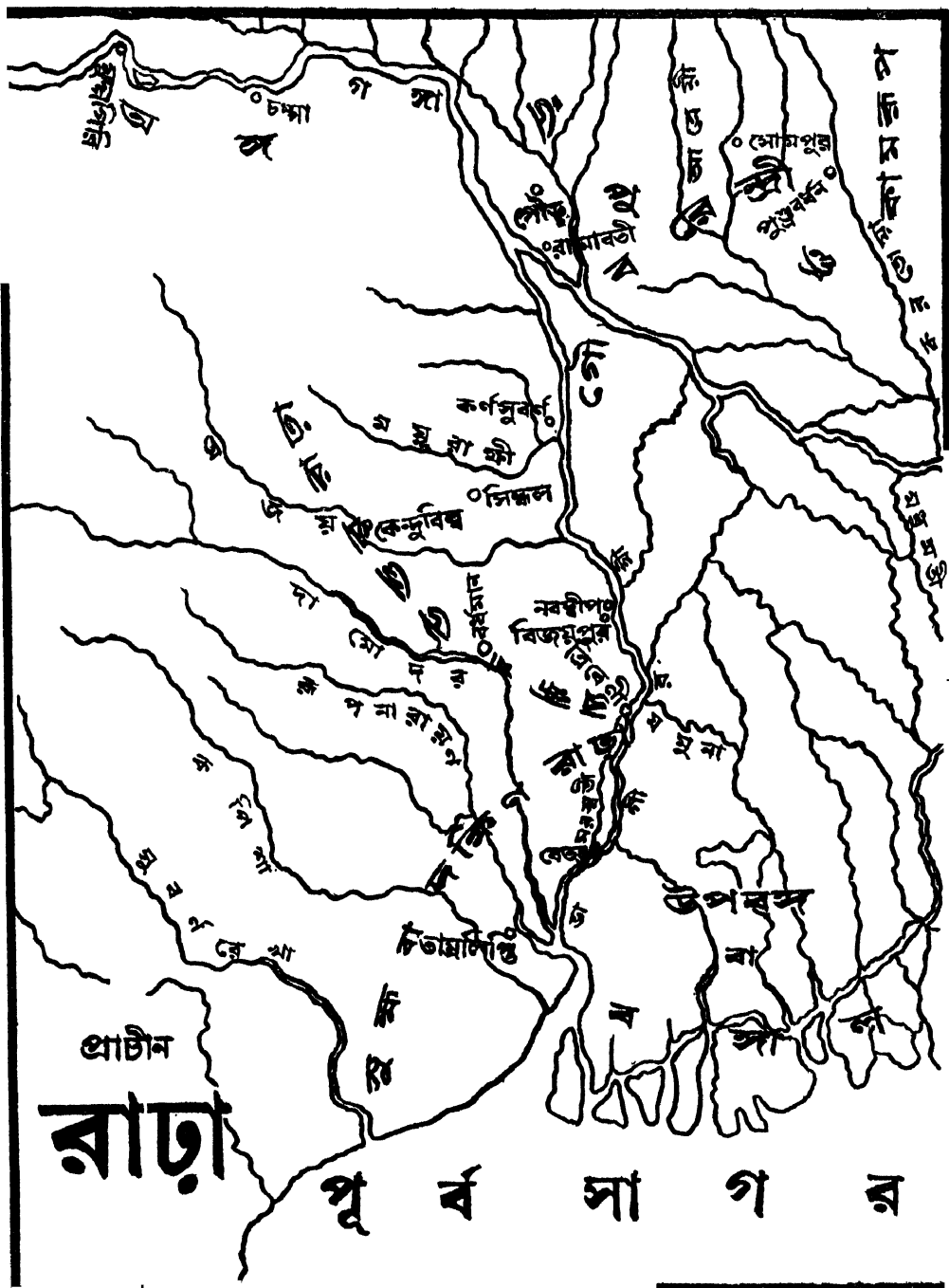
জনপদে বর্ধমানপুর নামে কোনো শহরও প্রদর্শিত হয়নি।[২৪] বস্তুত নূতন উপাদান আবিষ্কৃত না হলে কান্তিদেবের তাম্রশাসনোক্ত বর্ধমানপুরের অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের পুরোত্তম বর্ধমানের অবস্থিতি সম্বন্ধেও সংশয়ের অবসান হবে না। অবশ্য 'পুরোত্তম' বিশেষণ থাকাতে এই বর্ধমানকে রাঢ়ের বর্ধমান বলেই মনে হয়। কেননা হরিকেল মণ্ডলে দ্বিতীয় বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব থাকলেও সেটি সম্ভবত 'পুরোত্তম' বলে স্বীকৃত হবার যোগ্য ছিল না।

যা হোক, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বৃহৎসংহিতার সময় অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকেই রাঢ়ের বর্ধমান বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান নগর বলে গণ্য হয়ে আসছে। কেননা অনেকগুলি তাম্রশাসন থেকেই জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ছয় শত বৎসর কাল রাঢ় দেশে বর্ধমানভুক্তি নামে বাংলার রাজগণের একটি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল। আধুনিক কালে যাকে বলা হয় 'বিভাগ', প্রাচীন কালে তাকেই বলা হত 'ভুক্তি'। একেকটি প্রধান নগরকে কেন্দ্র করেই সাধারণত একেকটি ভুক্তি গঠিত হত। সুতরাং ষষ্ঠ শতক থেকেই বর্ধমানপুর তৎকালীন বর্ধমানভুক্তির কেন্দ্রস্থানীয় প্রধান নগর ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৬

বাংলা দেশ চিরকালই পল্লীপ্রধান। বাংলার জাতীয় জীবনে নাগরিকতার চেয়ে গ্রামীণতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে একথা সুবিদিত। সুতরাং এস্থলে রাঢ়ভূমির কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ করা অনুচিত হবে না।

মনে হয় প্রাচীন কালে দক্ষিণ রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠি গ্রামই সব চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। খ্রীস্টীয় দশম শতকে "ন্যায়কন্দলী"-টীকা-রচয়িতা সুবিখ্যাত শ্রীধরভট্ট এই গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ন্যায়কন্দলীর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় তৎকালে এই গ্রামটি বহু ধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা বহু শ্রেষ্ঠীর বাসভূমি বলে খ্যাত ছিল। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের একটি উক্তি থেকে মনে হয় দ্বাদশ শতকেও ভূরিশ্রেষ্ঠির খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমম্। —প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক।

তৎকালেও ভূরিশ্রেষ্ঠিতে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এই নাটকেই তার প্রমাণ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিখ্যাত মুখটিবংশীয় ব্রাহ্মণ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি হিসাবে ভূরিশ্রেষ্ঠি নূতন করে খ্যাত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর রচনায় ভুরিশিটের উল্লেখ করেছেন। যথা—

ভুরিশিটে মহাকায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

—অন্নদামঙ্গল (সাহিত্যপরিষৎ সং) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯।

---

২৪ হরিকেল জনপদের অবস্থানও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয়নি। তাই উক্ত মানচিত্রে হরিকেল নামের পরে প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য ভুরিশিট বা ভুরসিট ভূরিশ্রেষ্ঠি নামের আধুনিক রূপ।[২৫] হুগলি ও হাওড়া জেলায় দামোদর নদের তীরবর্তী একটি পরগনার নাম ভুরস্থট।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কে চক্রতীর্থ নামে রাঢ়ের আরেকটি স্থানের উল্লেখ আছে। যথা—

অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদস্তত্রৈব চ ভাগীরথীতীরপরিসরালংকারভূতচক্রতীর্থে…

বোঝা যাচ্ছে চক্রতীর্থ ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ছিল এবং তার খ্যাতিও কম ছিল না। এই স্থানটি সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে পবনদূতের ত্রিবেণীবর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রযুক্ত 'দর্শিতাবর্তচক্রাং' বিশেষণটি স্মরণীয়। ত্রিবেণী ও চক্রতীর্থ উভয়ই ভাগীরথীতীরে অবস্থিত, দুটিই তীর্থস্থান। সুতরাং চক্রতীর্থ ত্রিবেণীরই প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব নয়।

ভূরিশ্রেষ্ঠির পরেই বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রাম হচ্ছে দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রাম। এই গ্রামটি ছিল বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৈব সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বরশম্ভুর বাসভূমি। বিশ্বেশ্বরশম্ভু তৎকালে অন্ধ্র দ্রবিড় প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে যে গভীর প্রভাববিস্তার ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর।[২৬] অন্ধ্রদেশের কাকতীয়বংশীয় বিখ্যাত রাজা গণপতি (১২১৩-১২৪৯) তাঁকে স্বীয় দীক্ষাগুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর কীর্তিকলাপের বর্ণনা থেকে পূর্ববর্তী কালের শংকরাচার্য এবং পরবর্তী কালের চৈতন্যদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকলাপ ও প্রভাবের কথা স্মরণ হয়। বিশ্বেশ্বরশম্ভু যে একাই এই মহান্ কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা নয়, এই বিষয়ে তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী আরও বহু ব্রাহ্মণের সহায়তা পেয়েছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের আরেকটি প্রাচীন গ্রামের নাম নবগ্রাম। এই নামের একটি গ্রাম এখনও হুগলি জেলায় বিদ্যমান আছে। কেউ কেউ এই গ্রামটিকেই প্রাচীন 'নবগ্রাম' বলে মনে করেন। একাদশ শতকে হলায়ুধ নামে নবগ্রামবাসী এক ব্যক্তি সুদূর মালবদেশে গিয়ে অধিষ্ঠিত হন এবং যথেষ্ট কবিখ্যাতি অর্জন করেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের আরেকটি প্রসিদ্ধ স্থান বেতড্ড। হাওড়া জেলার গঙ্গাতীরবর্তী বেতড় গ্রামেরই প্রাচীন নাম বেতড্ড। সেনরাজাদের আমলে এই স্থানটি একটি রাষ্ট্রীয় উপবিভাগের কেন্দ্র ছিল। তা ছাড়া বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও স্থানটির খ্যাতি কম নয়। কলকাতার উৎপত্তির পূর্বকাল পর্যন্ত বেতড় একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ ছিল। বড়ো বড়ো বিদেশী জাহাজ ভাগীরথী বয়ে সপ্তগ্রাম (ত্রিবেণীর নিকটবর্তী) পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না বলে বেতড়ে এসে নোঙ্গর করত এবং এখান থেকে দেশী মাল নিয়ে বিদেশে যাত্রা করত।[২৭]

দক্ষিণ রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠি ও পূর্বগ্রামের যে খ্যাতি ও মর্যাদা, উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামও সে খ্যাতি

---

২৫ ভারতচন্দ্রের লেখায় ভুরিশিট, ভুরসিট ও ভুরষুট এই তিন রকম বানানই দেখা যায় (গ্রন্থাবলী, সাহিত্যপরিষৎ সং, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা পৃ ৫-৯, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৯ পাদটীকা)। সংস্কৃতেও এই নামটির ভূরিশ্রেষ্ঠি, ভূরিশ্রেষ্ঠিক ও ভূরিসৃষ্টি এইতিন রূপ দেখা যায়।

২৬ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮৩-৮৬।

২৭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথমভাগ (৩য় সং), পৃ ৩৪৭ ; *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড, পৃ ১২, পাদটীকা ৭।

ও মর্যাদার অধিকারী। বীরভূম জেলায় আহমদপুরের নিকটে লাভপুর থানার অন্তর্গত সিধলগ্রামই প্রাচীন সিদ্ধলগ্রাম বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।[২৮] ভোজবর্মদেবের বেলাব তাম্রশাসন থেকে জানা যায় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এই গ্রামটি সাবর্ণগোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাসভূমি ছিল। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপি থেকেও একথা সমর্থিত হয়। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী বহুশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ভট্টভবদেব নিজেও এই সিদ্ধল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। ভুবনেশ্বর লিপিতে এই গ্রামের প্রশস্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর্যাবর্তভুবাম্বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলংকারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধল গ্রামটি তৎকালে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাধ্যুষিত শত শত গ্রামের মধ্যে সর্বাগ্রিম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), আর্যাবর্তভূমির ভূষণ এবং রাঢ়ালক্ষ্মীর অলংকার বলে খ্যাত ছিল। এই বর্ণনার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ভূরিশ্রেষ্ঠি গ্রামের পূর্বোদ্ধৃত প্রশস্তিটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার যোগ্য। শুধু ভাবসাদৃশ্য নয়, ছন্দসাদৃশ্যও লক্ষণীয়; দুটি প্রশস্তিই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। তাছাড়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও ভুবনেশ্বর লিপি প্রায় সমকালেরই রচনা, একথাও মনে রাখা উচিত। যাহোক, এই সিদ্ধল গ্রামটি যে পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে ভূরিশ্রেষ্ঠি গ্রামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

উত্তর রাঢ় বা ব্রহ্মভূমির আরেকটি বিখ্যাত গ্রাম হচ্ছে কেন্দুবিল্ব (পাঠান্তর কিন্দুবিল্ব)। গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মভূমি বা বাসভূমি বলেই এই গ্রামটির খ্যাতি। জয়দেব নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥
—গীতগোবিন্দ ৩।১০।

কেন্দুবিল্বের আধুনিক নাম কেঁদুলি। এই গ্রামটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত এবং অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। জয়দেবের স্মৃতি উপলক্ষ্যে এখানে প্রতিবৎসর পৌষসংক্রান্তি থেকে চারদিনব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়।[২৯]

এই প্রবন্ধে উক্ত জনপদ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির অবস্থিতি দেখাবার উদ্দেশ্যে দুটি মানচিত্র দেওয়া হল।[৩০] আশাকরি মানচিত্র-দুটির সাহায্যে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করা সহজ হবে।

---

২৮ মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত "বীরভূম-বিবরণ", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৪; ননীগোপাল মজুমদার-সম্পাদিত *Inscriptions of Bengal*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯২।

২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাসে (প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৬৯) ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখেছেন, কেঁদুলির মেলা হয় মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে। একথা ঠিক নয়। মেলা আরম্ভ হয় পৌষসংক্রান্তি দিনে এবং থাকে চার দিন। কি কারণে ঐ দিনেই মেলা হয় তার বর্ণনা আছে মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত "বীরভূম-বিবরণ" প্রথম খণ্ডে (পৃ ২০৫-১৩)।

৩০ মানচিত্র-দুটি আমার অভিপ্রায় অনুসারে এঁকে দিয়েছেন শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আকবরের ধর্ম্মনীতি

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোয়

'দীন-দুনিয়ার মালিক শাহানশাহ্ জালালউদ্দীন আকবর বাদশাহ অমরকোটের মরুপ্রান্তরে পিতা হুমায়ুঁর চরম দুর্দ্দশার দিনে, মাতা হামিদা-র হাসিকান্নার মৌনস্তব্ধ মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।*

জন্মাবধি শিশুর মুখে ছিল বিষাদের অস্পষ্ট ছায়া, মনের মধ্যে কোথায় যেন কোনো বস্তুর অভাব। শৈশবে ভাবী ভারতেশ্বর অভাব এবং আশঙ্কার মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, খুল্লতাত কামরান্ মীর্জ্জার আশ্রয়ে অর্ধকারাবাস এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনাবিল আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্তির অনুকূল অবস্থা ছিল না। বালক আকবরের ধমনীতে মরুচারী যাযাবরের উষ্ণরক্ত; মন তাঁহার মরুবায়ুর ন্যায় মুক্ত ও চঞ্চল; সম্মুখে দিল্লীর বাদশাহী মসনদ, পশ্চাতে তৈমুর-বাবরের সাম্রাজ্যস্মৃতি; আকাশে বাতাসে কোষমুক্ত অসির ঝন্ঝনা;—অথচ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াব্যস্ত অশান্ত বালকের মুখমণ্ডলে অহেতুক বিষণ্ণতার ছায়া স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

আকবর ছোটকাল হইতেই সোজা পথে চলিতে নারাজ ছিলেন। প্রকৃতিদত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অনন্য-সাধারণ প্রতিভা এবং অদ্ভুত স্মরণশক্তির অধিকারী হইয়াও তাঁহার পুস্তকগতবিদ্যা বর্ণ পরিচয় এবং নাম দস্তখতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পুত্র জাহাঙ্গীর বাপকে সোজাসুজি "উম্মী" বা অপঠিত বলিয়া গিয়াছেন। পাঠবিমুখ শাহজাদার বিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ কিংবা ওস্তাদের উপর আক্রোশ ছিল না। কিন্তু তাঁহার খেয়াল, কানে শুনিয়াই তিনি কৃতবিদ্য হইবেন; এবং বস্তুতঃ শেষ বয়সে যথারীতি বহুশ্রুত হইয়া সম্রাট্ আকবর শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিতগণের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষক মীর আবদুল লতিফ ফার্সি 'বাল্যশিক্ষার' প্রতি শিষ্যের বিরক্তি দেখিয়া তাঁহাকে মুখে মুখে হাফেজের কবিতা পড়াইতেন। সুবিখ্যাত খুশনবীস্ মীর আবদুস্ সমদের কাছে হস্তাক্ষর দুরস্ত করিতে বসিয়া তিনি দুষমন্ হিন্দু "হিমু"র ছবি আঁকিয়া দ্বিতীয় পানিপত যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে তাহার মাথা কাটা এবং অন্যবিধ কার্য্য করিতেন। শুধু পড়াশুনা নহে, আহার বিহার সমস্ত ব্যাপারে গতানুগতিককে উপেক্ষা করাই ছিল তাঁহার স্বভাব। বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তরুণ সম্রাট শিকার, আরাম-আয়েশ, কবুতরবাজী, দুষ্ট ঘোড়া এবং পাগলা হাতী লইয়াই দিন কাটাইতেন। ভক্ত আবুলফজল বলিয়াছেন, প্রথম বয়সের এই সমস্ত বেহুদা কাজ আসলে গায়েবী ব্যাপার (হিন্দুরা যাহাকে বলে "লীলা")। যিনি ভাবী "যুগকর্ত্তা", সাহেব-উজ্-জমান, এবং "পূর্ণমানব", ইন্সান-ই-কামিল, তিনি বিধিনির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে জাহির হইতে পারেন না; এই জন্য বেখেয়ালীর মেঘের অন্তরালে ইস্লামের আগতপ্রায় "দ্বিতীয় সাহস্রিকী"-র প্রভাতী তারকা সুবহ্-সাদিকের অপেক্ষায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ইহা যেন খোদাতালার নূরের উপর আঁধারের পরদা।

যাহা হউক, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আকবর-চরিত্রের মধ্যে সহজাত আসুরী প্রকৃতির

---

* আকবরনামা মতে জন্মতারিখ ৬ই কার্ত্তিক ১৫৯৯ বিক্রম সম্বত (১৫ই অক্টোবর ১৫৪২ খ্রীঃ) রবিবার ভোরবেলা। স্মীথ সাহেব এই জন্মতারিখ লইয়া যে গোল পাকাইয়াছেন উহা গ্রহণীয় নহে।

প্রাধান্যই লক্ষিত হয়; তবে হিন্দুস্থানের মাটির গুণে কিংবা দৈব কৃপায় উহাতে সত্ত্বগুণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। শাহনশাহ্ আকবরের কথা এবং কাজের মধ্যে ঐতিহাসিক সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না; কখনও তিনি অতি ছল, অতি কুটিল—প্রমাণ, উজীর-ই-আজম শমস্উদ্দীন আত্কা-র শোচনীয় মৃত্যুর পর রাজনৈতিক লাভালাভের হিসাব নিকাশ।* আকবর বাদশাহ্-র অধিকাংশ কার্য্য অতি মহৎ, আবার কোনো-কোনোটি অতি নিন্দনীয়; উপদেশে তিনি ধর্ম্মের ব্যাপারে কবীরদাসজী; কিন্তু রাজধর্ম্মে চাণক্য পণ্ডিত। মোটের উপর, তিনি-ই কেবলমাত্র তাঁহার উপমা; ইতিহাসে তিনি "বে-নজীর"; আকবর অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ চরিত্র অবশ্যই আছেন; কিন্তু দোষে-গুণে ঠিক তাঁহার জুড়ি নাই। পরস্পরবিরোধী অথচ সমান প্রবল বৃত্তি, গুণ এবং সংস্কারের দ্বারা গঠিত আকবরের মনের মধ্যে প্রথম যৌবনে হিংসা-অহিংসা, স্বার্থ-পরার্থ, ধর্ম্মান্ধতা-মানবতা, ক্ষমা-নৃশংসতা, এবং সর্ব্বোপরি নূতন-পুরাতনের যে অবিরাম সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, উহাতে মন্দের নিকট একাধিক পরাজয় স্বীকার করিয়া মহামতি আকবর অবশেষে বিজয়ী হইয়াছিলেন; সকল মতবাদের উপরে যে শাশ্বত মানবধর্ম্ম চিরপ্রতিষ্ঠিত উহাই অশোকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের ইতিহাসে জয়যুক্ত হইল। এই জন্যই সংঘর্ষপ্রবণ অসমসাহসিক আকবরচরিত্রে গতানুগতিক সামঞ্জস্য অপেক্ষা আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য এবং অসামঞ্জস্যই স্বাভাবিক।

২

খানখানান্ বৈরাম খাঁ-র পতনের পর ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদরবারে নিরঙ্কুশ সুন্নীপ্রাধান্য স্থাপিত হইল। এই সময় বহুমান্য শেখ্-উল্-ইস্লাম আবদুন্নবী এবং মখদুম্-ই-আলম্ আবদুল্লা সুলতানপুরী ছিলেন সুন্নীসম্প্রদায়ের নেতা—শরিয়তের যুগলস্তম্ভ। সেকালে ইরান দেশে সুন্নীর স্থান ছিল না, এবং হিন্দুস্থানে ধর্ম্মমত গোপন না করিলে রাফিজী শিয়া-র স্থান হইত না। আকবরের বাল্যশিক্ষক মীর আব্দুল লতিফ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান শিয়া হইলেও সুন্নীমত-কে অযথা নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি কিংবা বিরুদ্ধ সমাজের প্রতি অনুদার বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে তিনি অপারগ ছিলেন। এই অপরাধে স্বদেশ হইতে তিনি হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। আকবরের প্রবলপ্রতাপ অভিভাবক ছিলেন শিয়া। সুতরাং তাঁহার আমলে মীর আব্দুল লতিফ শিয়া-সুন্নী ভেদজ্ঞানের প্রতিষেধক উদার সমভাবের বীজ বালক শিষ্যের হৃদয়ে বপন করিয়া হাফেজের কবিতাবারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত করিতেছিলেন। বৈরামের শিক্ষা, এবং শেখ গদাই নামক বৈরামের গুরু (আকবর রাজত্বের প্রথম প্রধান সদর) জ্ঞানাভিমানী সুফী-র সাহচর্য্যে ধর্ম্মে স্বাধীন উদার ভাব ছোটকালেই আকবরের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু সহসা প্রতিকূল ঝঞ্ঝায় কল্পবৃক্ষ উন্মূলিত হওয়ার উপক্রম হইল।

স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর (১৫৬৪ খ্রীঃ) সম্রাটের শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ভাবপ্রবণ মন সহজেই শেখ-উল-ইস্লাম আব্দুন্নবীর পাণ্ডিত্য এবং বুজুর্গী-বুজরুকির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল। এই সময়ে তিনি পাকা সুন্নী এবং শেখজীর পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন, এমন কি নবীজীর চটিজোড়া তাঁহার পায়ের কাছে

* *Tarikh-i-Humayun*— Bayazid Bihat quoted by V. A. Smith in J R S.
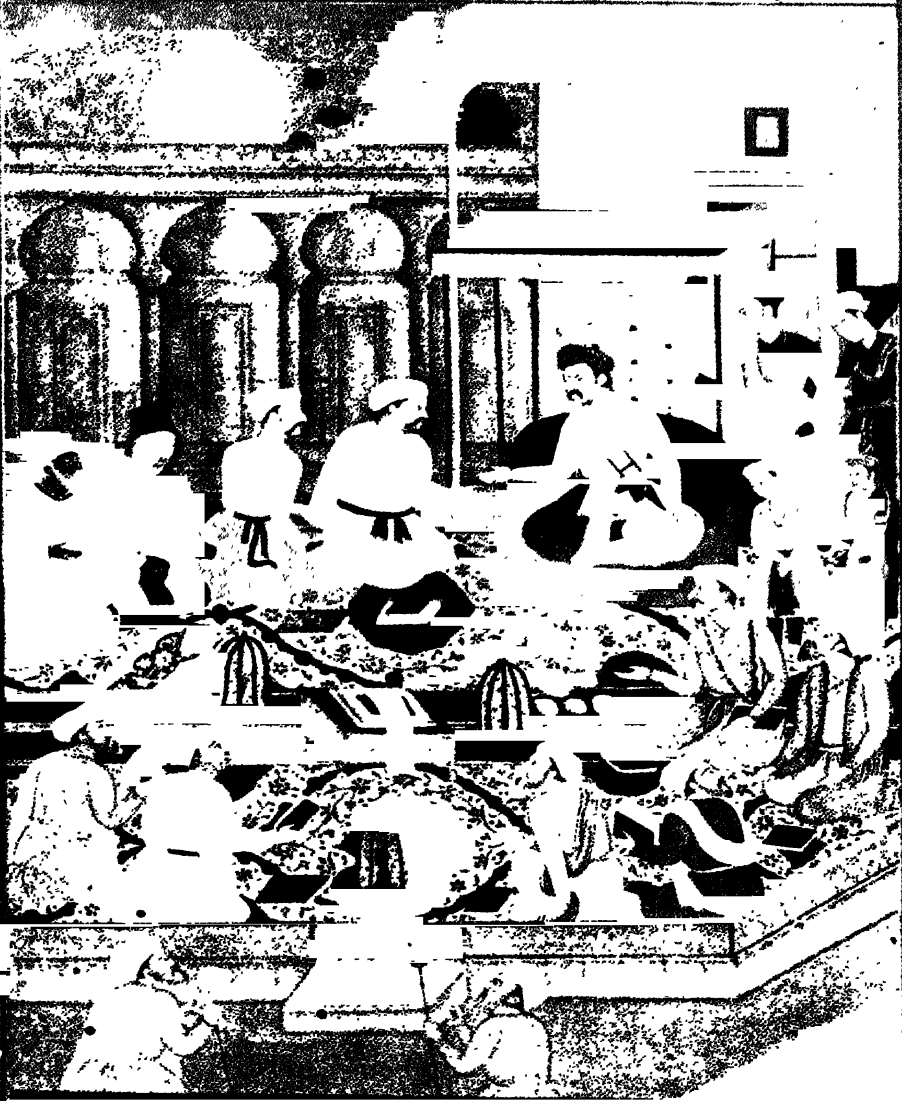
আকবরের সভায় খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মপ্রসঙ্গ

আগাইয়া দিতে পারিলে নিজকে ধন্য মনে করিতেন। প্রথমেই ইস্‌লামের জঞ্জাল সাফ্ এবং সমাজে শরিয়তের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হইল। শিয়া এবং ইমাম মেহেদীর আশু-আগমনবার্ত্তাবাহক ইত্যাদি ধর্ম্মদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে নবীজী ফতোয়া জারী করিলেন। শাহানশাহ্ উক্ত ফতোয়া শিরোধার্য্য করিয়া শিয়াদিগকে বিনা বিচারে কর্ম্মচ্যুত এবং দুই-একজনকে প্রাণদণ্ড দিলেন; কেবল মীর আবদুল লতিফ ও তাঁহার পুত্রগণ রক্ষা পাইল। "যুগান্তে"-(Millenium বা সাহস্রিকী) বিশ্বাসী সুবিদ্বান্ শেখ মোবারক-কে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিবার জন্য শেখ্-উল্-ইস্‌লামের হুকুমে আকবর একদল সিপাহী পাঠাইলেন। এই সংবাদ গোপনে কোন বন্ধুকর্ত্তৃক নাগোরে প্রেরিত না হইলে তিনি পালাইবার অবকাশ পাইতেন না। সিপাহীরা শিকার হাতে না পাইয়া শেখ মোবারাকর ভিটামাটি লোপাট এবং তাঁহার নমাজের জায়গা নানা রকমে নাপাক করিয়া ধর্ম্মান্ধতা চরিতার্থ করিল। ফৈজী এবং আবুল ফজলকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ মোবারক আকবরের ভয়ে নানাস্থানে আত্মগোপন করিয়া দুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন। নবীজীর শরিয়ত ব্যাখ্যার গুণে আলা হজরতের অবিদ্যা ক্রমশঃ চরমে উঠিতে লাগিল, তিনি মনে করিতে লাগিলেন সুন্নীর পবিত্র আত্মা মাটির নীচেও রাফিজী শিয়ার সান্নিধ্যে অস্বস্তি বোধ করে। নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ্-র মধ্যে কবি আমীর খসরু-র পাশে একজন শিয়া-কে দফন করা হইয়াছিল, ইহার বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌র কাছে নালিশ রুজু হওয়াতে লাশ অন্যত্র উঠাইয়া লইবার হুকুম হইল।

তুর্কী আমীর মুজাফর খাঁ-র সুপারিশে আকবর শেখ আবদুন্নবী-কে অত্যন্ত নির্লোভ এবং ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি মনে করিয়া প্রধান সদর নিযুক্ত করিলেন। মুসলমান সমাজে যাঁহারা সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানী ফকীর; যাঁহারা শারীরিক অক্ষমতার জন্য জীবিকা অর্জন করিতে পারেন না, এরূপ সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি যাঁহাদের বাপ-দাদার নাম ছাড়া কোনো পুঁজি নাই ও পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম; যে সমস্ত বিদ্বান এবং ধার্ম্মিক লোক নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশ হইতে আশ্রয়প্রার্থী—তাঁহাদিগকে বৃত্তি (ওজিফা) কিংবা নিষ্কর ধর্ম্মোত্তর জমি মঞ্জুর করা ইত্যাদি হইল সদরের প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত মৌলবী, কাজী, আলেম-ইমাম প্রভৃতি আয়েমাদার-গণের (ধর্ম্মোত্তর জমির ভোগদখলকারী) পূর্বকালীন সনদ পরীক্ষা, স্বত্বনির্ণয়, মৃত কিংবা অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণের মদদ্-ই-মাশ, সুয়ুরঘুল লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতাও প্রধান সদরের ছিল। শেখ আবদুন্নবী-র মত অবাধ ক্ষমতা তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কোনো প্রধান সদরের হাতে সমর্পিত হয় নাই * এবং ক্ষমতার এত অপব্যবহারও কোনো আমলে হয় নাই। নবীজী দুই হাতে নিজের পরিচিত মোল্লাদিগকে লাখেরাজ জায়গীর বিলি করিতে লাগিলেন, অথচ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সমস্ত আয়েমাদারগণ দলিলপত্রসহ তাঁহার দরবারে হাজির হইত তাহাদের দুর্গতি এবং অপমানের অবধি রহিল না। সুন্নী ঐতিহাসিক মোল্লা বদায়ুনী লিখিয়াছেন, আবদুন্নবী-র হাত-পা-ধোয়া "ওজু"র জলের ছিটা বহু অসহায় ধর্ম্মপ্রাণ সুন্নীর চুল দাড়িতে পড়িয়াছে; তাঁহার ফর্‌রাশ দারোয়ান খিদমতগারগণের বেয়াদবী এবং ঘুষ-দাবীর ত কথাই নাই। আয়েমাদারগণ কপাল চাপড়াইয়া চীৎকার ছাড়িল পাপী আবুলাহাব মরিয়াই

---

* **Akbarnama, Beveridge**

আবদুন্নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শেখ-উল-ইসলাম ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া ভাবিতেছিলেন আরাম আয়েশে মশগুল নওজোয়ান বাদশাহ হিন্দুস্থানের খেলাফত তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সম্রাট আকবর নবীজীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু প্রজার উপর তীর্থকর, এবং এক বৎসর পরেই "জজিয়া" বা মুণ্ডকর রহিত করিয়া ফরমান জারি করিলেন। ইস্লামের প্রারম্ভ হইতে অমুসলমান প্রজার উপর মুণ্ডকর স্থাপন সম্পূর্ণ বৈধ এবং শরিয়তনির্দ্দিষ্ট নীতি; মুসলমান রাষ্ট্রে ইহার অন্যথা হইতে পারে না। হিন্দু প্রজাকে বৈষম্যমূলক করভারে নিপীড়ন, এবং ধর্ম্মের নামে শুল্ক আদায়ের বৈধতার প্রশ্ন আকবরের মনেই সর্ব্বপ্রথম জাগিয়াছিল; তাঁহার শাস্ত্র ও সংস্কার মুক্ত যুক্তি অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিল না। শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহাই সূত্রপাত।

প্রায় তিন বৎসর পরে সেখ আবদুন্নবী-র ধর্ম্মের মুখোস খসিয়া পড়িল; শেখজী নিজে ডুবিলেন, ইস্লামকেও ডুবাইলেন। প্রধান সদরের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা হরণ করিয়া সম্রাট্ একান্ত রাজনৈতিক কারণে কেবলমাত্র কাগজে কলমে আবদুন্নবী-কে ১৫৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল রাখিয়াছিলেন। সাময়িক অবিবেচনার জন্য অনুতপ্ত হইয়া আকবর পুনরায় শিয়াগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন; শেখ মোবারক এবং তাঁহার পুত্র ফৈজী এবং আবুলফজলকে সাদর আমন্ত্রণ করিয়া যথাযোগ্য পদ ও বৃত্তি প্রদান করিলেন, ইস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিলেও শেখ্-উল্-ইসলামের আচরণে আকবরের মনে এই ধারণা জন্মিল মোল্লাপ্রভাব সুশাসন এবং তাঁহার অনুসৃত উদারনীতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কিন্তু তখনও মুসলমান সমাজে মোল্লাসম্প্রদায়ের অসীম প্রতিপত্তি; অধিকাংশ তুরানী মন্সবদার বাদশার হুকুম অপেক্ষা আবদুন্নবী-র ফতোয়াকে বড় মনে করিত। সম্রাটের দুর্জ্জয় পণ,—যুক্তিসঙ্গত সন্দেহমূলক হেতুবাদ দ্বারা তিনি পবিত্র ইস্লামের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন; কোনো অপব্যাখ্যার দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। মনের উপর ইহার উগ্র প্রতিক্রিয়ার দরুণ তাঁহার সহজাত বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল—"অহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা"।

৩

ভারতবর্ষের বিপুল সাম্রাজ্য এবং উহার আনুষঙ্গিক অসংখ্য ব্যাপার অপেক্ষা শাহনশাহ্ আকবর বাদশাহ-র মন ছিল ব্যাপক, বিরাট্, অপ্রমেয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন আকবর বাল্যেই জরাবিহীন "বার্দ্ধক্য" লাভ করিয়াছিলেন। ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও আমরা দেখিতে পাই পঞ্চাশোর্দ্ধেও তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে বালকবুদ্ধি-মুক্ত হয় নাই। তৈমুরবংশে আলমগীর বাদশাহ ব্যতীত প্রকৃত বার্দ্ধক্য কাহারও আসে নাই; বাদ বাকী সম্বন্ধে বলা যায়, "দিল্লীশানাং ন খলু বয়ঃ যৌবনাদন্য দস্তি।"

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আকবর তাঁহার বিষাদরোগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। কিন্তু উহার কোনো প্রকার কবিরাজী-হেকিমী ব্যবস্থা না করিয়া বাদশাহ স্বয়ং জালিনুস-ধন্বন্তরির অসাধ্য এই মনোব্যাধির যুগপৎ আসুরিক এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিয়াই তিনি নিজের মনকে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এবং সংগ্রামবিরত করিবার জন্য বাহিরের ভোগবিলাস বাসনাদির মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা খুঁজিয়া বেড়াইতেন। দিগ্বিজয় এবং রাজকার্য্যের অবসরে শিকার, হাতী-খেদা, চৌগানবাজী, দরবারী পালোয়ান এবং শমসের-বাজগণের কুস্তি ও অসিখেলা, যমুনাসৈকতে

হস্তিযুদ্ধ, বাদশাহী মহলের বাহিরে হরিণের লড়াই এবং ভিতরে যুধ্যমান মাকড়শাদ্বয়ের পায়তারা ও হাম্‌লা দেখিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আকবরের মন বিষণ্ণ হইবার অবকাশ পাইত না। বাহিরে সফরের সময় মনকে চাঙ্গা করিবার অন্য আয়োজন হাতের কাছে না থাকিলে তিনি দাঙ্গা দেখিতে যাইতেন।

কুরুক্ষেত্রে কোনো পর্ব্ব উপলক্ষ্যে একবার "সন্ন্যাসী" এবং "গোঁসাই" সম্প্রদায়ের মধ্যে কুম্ভমেলার হাঙ্গামার মত তুমুল দাঙ্গা লাগিল। উহার কিছু দূরে দৈবক্রমে সফরের বাদশাহী তাঁবু পড়িয়াছিল। গোলমালের খবর পাইয়া পরম উল্লাসে আলা হজরত মামুলী-পোষাকে দাঙ্গা দেখিতে চলিলেন। উভয় পক্ষে তখন বহু সাধু খুন জখম হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সংখ্যায়-কম গোঁসাইর দল পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার উপক্রম করিল। বৃদ্ধ জাঠ চৌধুরীর ন্যায় রক্তের খেলা দেখিতে দেখিতে বাদশাহ্-র খুন গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তামাশা মাটি হইয়া যায় দেখিয়া তিনি অনুচর কয়েকজনকে হুকুম দিলেন, গোঁসাইর দলে ভিড়িয়া যাও। দিল্লীশ্বরের মারাত্মক কৌতুকপ্রিয়তা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা গোঁসাই দলের পিছনে থাকিয়া সন্ন্যাসীদিগের উপর ঢেলা-পাথর ছুঁড়িতে লাগিল; গোঁসাইরা এইবার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিল। শাহানশাহ্-র বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়।

আকবরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের বড় ভাই ওমর শেখ ছাদের উপর কবুতর উড়াইতে গিয়া শহীদ হইয়াছিলেন; শাহী কবুতরখানার মনসবদারীর জন্য হিন্দুস্থানে উপযুক্ত লোক না পাইয়া শাহানশাহ বিলায়েতী মোঙ্গলবিশেষজ্ঞ কবুতরকুলপঞ্জিকাবিৎ সালেহ্ বেগকে দরবারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সাধারণ নেশার মধ্যে পিতামহ বাবর বাদশাহ্-র "মাজুন" (ভাঙমিশ্রিত মিঠাই) এবং পৈতৃক আফিম তিনি বাহাল রাখিয়াছিলেন। হুমায়ুঁ বাদশাহ হইতে আমীর খাঁ পিণ্ডারীর সময় পর্য্যন্ত মোগলাই আমলের আমীরী নেশা অহিফেনের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সেকালে আফিমের মাত্রা আমীরী মাপেই ছিল। আকবরশাহী দরবারের খান্-ই-জাহান্ হোসেন কুলী আফিমজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যের দরুণ ফুরসত থাকিলে প্রত্যহ এক প্রহর পায়খানাতেই বসিয়া থাকিতেন। "পানীয়"-র মধ্যে "শিরাজী" হইতে "তাড়ী" [তারিখ-ই কান্দাহারী] পর্য্যন্ত কোনো বস্তুতেই আলা হজরতের অরুচি ছিল না। কিন্তু সর্ব্ববিধ নেশায় ভরপুর হইয়াও আকবর বাদশাহ কোনো দিন বেসামাল হইয়াছিলেন, কিংবা পুত্র জাহাঙ্গীরের মত অপ্রকৃতিস্থ থাকিতেন মোল্লা বদায়ুনী-ও এরূপ অপবাদ করেন নাই। মজলিস্, চিত্রশালা, বাদশাহী "কারখানা", কামান ঢালাই হইতে বন্দুকের নল পরিষ্কার পর্য্যন্ত অস্ত্রাগারে নূতন এবং উন্নততর প্রণালীর গবেষণা—সর্ব্বত্রই তাঁহার মনের প্রচুর খোরাক। তানসেন-বাজবাহাদুরের রাগরাগিনী, সুপরিস্রুত হাস্যরসের বীরবলী ফোয়ারা, রূপোপজীবিনী নর্ত্তকী প্রবীণা-রায়ের কলাকৌশল, দশপঁচিশ খেলার হীরা মাণিক্যের ঘুঁটির বদলে রক্তপ্রস্তর বেদিকার উপর "সঞ্চারিণী দীপশিখেব" তন্বী-চতুর্বিংশতি, শাহীমহলে হিন্দুস্থানের অনিন্দ্যসুন্দরী তিনশত বেগমের দিলফেরেব্ গুলিস্তাঁ—সব কিছুই আকবর বাদশাহ্-কে সাময়িক আত্মবিস্মৃতির বিশ্রাম দান করিত বটে কিন্তু কোনোটাই তাঁহার মনকে সমগ্রভাবে অধিকার করিতে পারে নাই; জনবহুল নগরীর মধ্যে অরণ্যানীর নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে বিষাদগ্রস্ত করিত; ভোগ-লিপ্সা এবং কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে ফাঁক পাইলেই অহেতুক বিষণ্ণতা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

রাজ্য প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পরে যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হৃতরাজ্য হুমায়ুঁ-পুত্রের

শিরায় জঙ্গিস-তৈমুরের রক্ত হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল, "ম্যায় ভূখা হুঁ।" ইহার পর পূর্ণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া একচ্ছত্র ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য রণদেবতার শোণিত-তর্পণ চলিতে লাগিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর দুর্গে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া ত্রিশহাজার নরমুণ্ডের মিনার প্রস্তুত করিলেন। বাঙ্গালা হইতে কাবুল-কান্দাহার, অমরনাথের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে গোদাবরী তীর ভারতভূমি গ্রাস করিয়াও তাঁহার সাম্রাজ্যক্ষুধা মিটিল না, বা বিজিগীষার কোনো বৈরাগ্যলক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ঐতিহাসিক আবুলফজল তর্কজাল বিস্তার করিয়া এই সাম্রাজ্যক্ষুধাকে "বহু"-র মধ্যে "একত্ব" (unity in the forecourt of plurality) সংস্থাপনের যে আদর্শবাদে রূপায়িত করিয়াছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ সমর্থনের যে ধ্বনি তাঁহার "আকবরনামা"-য় প্রথম ঝংকৃত হইয়াছে বর্ত্তমান কালে উহা ক্ষমতা-দৃপ্ত দানবের আত্মপ্রবঞ্চনার প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। আবুল ফজল যেন পররাজ্যে বীতস্পৃহ দিল্লীশ্বরকে উপদেশ দিতেছেন, "রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্ম নহে মহারাজ"; প্রজা নিজের অধিকারসীমা অতিক্রম করিয়া অপ্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্য বস্তুর জন্য লালসার পা বাড়াইবে না, প্রকৃতিবর্গ সন্তোষ পরমধন জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে—ইহাই প্রজাধর্ম্ম। অপর পক্ষে রাজধর্ম্ম ইহার বিপরীত। প্রজার ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলবিধায়ক, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি নিজরাজ্যকে কখনও পর্য্যাপ্ত মনে করিবেন না; পরন্তু অবিজিত রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিয়া এরূপ কার্য্যকে খোদাতালার খাস (choice) "ইবাদৎ" বা উপাসনা জ্ঞান করিবেন। *

৪

সম্রাট জৌনপুর-অভিযান হইতে নবনির্ম্মিত রাজধানী ফতেপুর-সিক্রীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইবাদৎ-খানা-র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন (*Akbarnama* iii p. 157)। রাজধানী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ফতেপুর-সিক্রী-র বিজন প্রান্তরে পাহাড়ের গায়ে এক গুফা ছিল। ঐখানে আবদুল্লা নিয়াজী নামক এক পাঠান ফকীর বাস করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তৎকালীন অনাচার কলঙ্কিত মুসলমান সমাজে সংস্কারের আন্দোলন এবং ইমাম মেহেদীর আশু-আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া সমাজকে সজাগ করিয়াছিলেন এই পাঠান ফকীর উঁহাদের অন্যতম। এই গুফার সঙ্গে ধর্ম্মসংস্কারের বহুস্মৃতি জড়িত। কথিত আছে এইস্থানে সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শহীদ শেখ আলাই, ফকীর আবদুল্লার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। "ইবাদৎ-খানা-"র জন্য এই স্থান নির্বাচন ঝটিকার পূর্বসূচনা,—বাদশাহী খেয়াল নহে। আবদুন্নবী-প্রমুখ মোল্লাসম্প্রদায়ের উপদেশে আকবর যে-সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন মনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। গুরু সলিম চিশ্‌তীর কৃপালাভ করিয়া তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেও মোল্লাসম্প্রদায়ের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণও ছিল। তুর্কী, উজবেগ মোগল জাতীয় উগ্র সুন্নীভাবাপন্ন আমীরগণ আকবরের

---

* **Beveridge, *Akbarnama*, Eng. trans iii 122 দ্রষ্টব্য।**

উদার শাসননীতির বিরোধী ছিল; মোল্লাগণও রাজক্ষমতার বিরুদ্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। ধর্ম্মের দোটানা স্রোতে পড়িয়া আকবর পীর সলিম চিশ্‌তী-র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শরিয়ত-নিষ্ঠ পীরের শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। গুরু খোদাতালার উপর দুনিয়ার বোঝা তুলিয়া দিয়াই খালাস; কিন্তু শিষ্য মনে করিতেন, বাদশাহীর সহিত দুনিয়ার সেই বোঝা খোদাতালা তাঁহার মাথার উপর চাপাইয়া তামাশা দেখিতেছেন; অথচ বাদ্‌শাহ-র উপর যিনি বাদ্‌শাহ তাঁহার রাজ্যে সবই অব্যবস্থা—ইস্‌লাম আছে, রসুলাল্লার উম্মত কায়েম আছে, অথচ নবী প্রচারিত সাম্য মৈত্রীর বাণী মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে; মুসলমান সমাজে দেখা দিয়াছে বায়াত্তর ফির্‌কা বা সম্প্রদায়, ধর্ম্মমতের বিরোধ, ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায় গত স্বার্থের সংঘাত, পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, কলহপ্রবণতা। শাহানশাহ্‌-র সম্মুখে ছিল চিরানুচরিত শরিয়তের প্রশস্ত পথ এবং তাঁহার পথপ্রদর্শক শেখ্‌ উল্‌ ইস্‌লাম আবদুন্নবী। কিছুদিন নবীজীর হাত ধরিয়া তিনি চলিয়াছিলেন, কিন্তু চোখ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন মুসলমান সমাজে ঠগ বাছিতে গেলে ইস্‌লাম উজাড় হইয়া যাইবে; কারণ নবীজীর মতে সমস্ত ইরানী মাত্রেই ঠগ; হিন্দুস্থানেও ঠগের উপদ্রব এবং শেখ মোবারক ঠগের সর্দ্দার।

সলিমচিশ্‌তীর কৃপায় আকবরের মন আবদুন্নবীর অনুদার শরিয়ত ব্যাখার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়া তত্ত্বান্বেষী হইয়াছিল। কিন্তু গুরুপ্রদর্শিত জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না; শিষ্যের অপেক্ষাকৃত স্থূলবুদ্ধি বহির্জ্জগতের স্থূলতত্ত্ব লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িল। বাহ্যতঃ নমাজ রোজা ত্যাগ না করিলেও এইগুলি তিনি নিম্নস্তরের ইবাদৎ মনে করিতে লাগিলেন। ইবাদৎ বা উপাসনা তাঁহার মনে নূতন সংজ্ঞা লাভ করিল; জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা বিচার এবং বিবেক প্রদর্শিত মার্গে জ্ঞানের অনুসন্ধান। ইহাই বিদ্রোহের সুত্রপাত এবং ফতেপুরসিক্রীর ইবাদৎ-খানা এই বিদ্রোহের প্রতীক—ফরাসী বিপ্লবের Mansion of Reason—মসজিদ-মন্দির-গির্জ্জা নয়। আকবর-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দেবতা এবং অসুর এইবার ইবাদৎ-খানার বিচার-মঞ্চে বসিয়া ধর্ম্মসিন্ধুমন্থন আরম্ভ করিল। **তৌহিদ-ই-ইলাহী** ধর্ম্মমত, এবং ধর্ম্মের শেষ বাণী **সুলেহ কুল**—এই মহামন্থন হইতেই উদ্ভূত।

৫

ঐতিহাসিক আবুলফজল লিখিয়াছেন, ইবাদৎ-খানার অপূর্ব কার্য্যবিবরণী সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আবুলফজলের অপঘাত মৃত্যুর সহিত আকবরশাহী আমলের অনুপম চিন্তাধারারও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। আকবরনামা এবং বদায়ুনী রচিত মুন্তাখাব-উৎ-তবারিখ গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমসাময়িক বিবরণ হইতে বৃহস্পতিবারে বাদশাহী ইবাদৎখানার সাপ্তাহিক সান্ধ্য-সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয়, তর্কের ধারা, আকবরের আপোষমুখী খোলা মন, বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের বাদানুবাদ, পাকা জহুরী আকবরের আসল-মেকী চিনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা, আবশ্যক-ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের খাতিরে যাহার উকীল নাই কিংবা যে-পক্ষ দুর্বল উহার জন্য আলা-হজরতের ওকালতী ইত্যাদির একটি মোটামুটি ধারণা আমরা করিতে পারি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আগ্রহ অপেক্ষা আল্লামা আবুলফজল জাহিরী বা ব্যবহারিক ইসলাম ও মতবাদী

মোল্লাসম্প্রদায়ের নিন্দায় অশোভন উল্লাস এবং বক্রোক্তি বর্ষণে কামাল মুন্‌শীয়ানা দেখাইয়াছেন—দুই এক জায়গায় মিথ্যাভাষণের দায়েও পড়িয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি বাদানুবাদের সময় অতিরিক্ত উষ্মা প্রকাশ, কিংবা অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার হুকুম ছিল দরবারী ইমাম মোল্লা বদায়ুনীর উপর। বদায়ুনী একদিন ফাঁপরে পড়িয়া আসফ খাঁ-কে বলিয়াছিলেন, জনাব-ই-আলা! এই হুকুম তামিল করিতে গেলে মোল্লাদের আসন যে খালি হইয়া যায়। যাহা হউক, ইবাদৎখানায় ইসলামের শ্রদ্ধাহীন সমালোচনা এবং মোল্লাগণের পরাজয় অসহ্য হওয়ায় তিনি কয়েক বৎসর পরে চাকরীর উপর তৌবা করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অনেক কিছু তিনি অন্যের কাছে শুনিয়া আক্রোশবশতঃ গোপনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তবে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের "দজ্জাল" আকবর বাদশাহের উপর তিনি বেশী অবিচার করেন নাই। সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে লিখিত দাবিস্তান-উল-মুজাহেব পুস্তকে ইবাদৎখানার মজলিসে শিয়া, সুন্নী এবং দার্শনিকের একটি চমৎকার কাল্পনিক কথিকা আছে; সমসাময়িক না হইলেও উহা প্রকৃত ইতিহাসের ছায়ায় রচিত—Landor's Imaginary Conversation নহে।

আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি ইবাদৎখানা স্থাপনের প্রথম তিন বৎসর (১৫৭৫—১৫৭৮) পর্য্যন্ত ইস্‌লাম এবং মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই বিচার মজলিসে বাদানুবাদ হইত। ইস্‌লামের মূল সত্যগুলি বুঝিবার জন্য আকবরের উৎসাহ এই সময়ে অতিপ্রবল—কিঞ্চিৎ উৎকটও বটে। শিয়া-সুন্নী, সুফী-তার্কিক নির্বিশেষ প্রত্যেক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই নৈশসভায় আমন্ত্রিত হইতেন। পূর্ব বারান্দায় দরবারী উচ্চপদস্থ আমীরগণ, পশ্চিমে আহেল্-ই-সাদাৎ অর্থাৎ ধর্ম্মবেত্তা এবং মতবাদী উলেমা সৈয়দ প্রভৃতি, উত্তর দিকে তত্ত্ববাদী সুফী, এবং দক্ষিণ দিকে "**রৌশন-দিল**" [the Illuminati] —সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যে সুলতান **আকল** [Reason] ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিকট মস্তক অবনত করিতেন না, শাস্ত্র এবং আপ্তবাক্য [authority] যাঁহারা যুক্তি বলিয়া মানিতেন না—এই শ্রেণীর বিদ্বানগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; মধ্যস্থলে সভাপতির আসনে স্বয়ং সম্রাট। বাহিরে এতদিন যে সমস্ত দাহ্যমান পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, সমস্তই এখন ইবাদৎখানার মধ্যে একত্র পুঞ্জীভূত হইল; প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ইহার অনিবার্য পরিণাম। প্রথম বিস্ফোরণে কোরাণ শরীফ এবং হজরৎ রসুলাল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই রক্ষা পাইল না। শরিয়তের যুগলস্তম্ভ শেখ-উল্-ইস্‌লাম আবুন্নবী এবং মখদুম-ই-আলম্ আবদুল্লা সুলতানপুরীর জ্ঞানগরিমা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার সুনাম মাটী হইয়া গেল। পাঠান সুলতান ইসলাম্ শা-র দরবারে বাঙ্গালী শেখ আলাই-র সহিত ধর্মবিষয়ক তর্কে পরাজিত হইয়াও মুসলমান সমাজে তাঁহাদের যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিশ-পঁচিশ বৎসর অব্যাহত ছিল উহা লোপ পাইতে বসিল। মুসলমান কয়টী বিবাহ করিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বে একদিন নবীজী হদিস্ আওড়াইয়া ছিলেন, "দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার"। আকবর ধরিয়া লইলেন ১৮টী বিবাহ শরিয়তসিদ্ধ। তর্কের সময় এই বিষয় উপস্থিত হওয়ায় গত্যন্তর না দেখিয়া নবীজী জবাব দিলেন ১৮টী বিবাহের কথা আকবরকে তিনি বলেন নাই। আকবরের বেগম সংখ্যা "আঠার"কে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমে শতাভিমুখী হইয়াছিল; সুতরাং তিনি "মুতা" বিবাহের প্রশ্ন তুলিলেন, শরিয়তপন্থীগণ কোনো যুক্তিসহ প্রমাণের দ্বারা ইহার অশাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। আর একদিন প্রকাশ পাইল ইহাদের মধ্যে একজন "জাকাত" দান হইতে

অব্যাহতি পাইবার জন্য বৎসরের দশম মাসে নিজ সম্পত্তি স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করিয়া নূতন বৎসরের প্রারম্ভে আবার নিজের নামে লিখাইয়া লইতেন। এই ব্যক্তি আজীবন মুসলমান সমাজকে রোজা, নমাজ, জাকাত সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভিতরে ভিতরে খোদাতালা এবং আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই অপূর্ব্ব ফন্দী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ ঈর্ষ্যামূলক হইলে ধর্মনিষ্ঠ বদায়ূনী ইহার সবিস্তার উল্লেখ করিতেন না।

ইবাদৎখানার উদ্বোধন আকবরশাহী আমলে ধর্ম্মক্ষেত্রে ভাবী কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব। এই কুরুক্ষেত্রে শাহান্‌শাহ আকবর পার্থসারথীর ন্যায় স্বয়ং নির্লিপ্ত, নিরস্ত্র; জয়পরাজয়ে বাহ্যতঃ তিনি উদাসীন; পণ্ডিতে পণ্ডিতে যেখানে লড়াই, "উম্মী" আকবর সেখানে নিধিরাম সর্দ্দার। কিন্তু ঈর্ষাজর্জ্জরিত মোল্লাশিবিরে শরিয়তের ভীষ্ম-কর্ণ ব্যক্তিগত কলহে মাতিয়া পরস্পরের প্রতি কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফলে সব্যসাচী-প্রতিম আবুলফজলপ্রমুখ সন্দেহমূলক যুক্তিবাদী "রৌশন-দিল" এবং নাস্তিক শিখণ্ডীতুল্য তার্কিকগণের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে জ্ঞানবৃদ্ধ, আজীবন শাস্ত্রব্যবসায়ী মোল্লাগণ ইসলামের বহির্ব্যূহ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পুঞ্জীভূত দাহ্যমান পদার্থের বিস্ফোরণে আকবরের সত্যান্বেষী মন মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অবিদ্যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উর্দ্ধস্তরে নিজের পথ খুঁজিতে লাগিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল ইস্‌লাম দুনিয়ায় নাজেল (বা অবতীর্ণ) হইয়া শিয়া-সুন্নী মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য এবং বিরোধ সৃষ্টি করে নাই; হজরত রসুলাল্লাহ্‌ও ইহার জন্য দায়ী নহেন—তবে কোরাণ শরীফের একটী তফ্‌সীর—টীকা তিনি স্বয়ং না লিখিয়াই কাঁচা কাজ করিয়াছেন; ময়দান খালি পাইয়া পরবর্তী যুগে মানুষের অভিমান, স্বার্থ এবং অন্ধদৃষ্টি ধর্মের নামে তর্কের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া মুসলমানকে ধোঁকা দিয়াছে—ইহার অধিক আলা হজরতের বিদ্যার দৌড় ছিল না। কিন্তু ইবাদৎখানায় যে তর্কের তুফান উঠিয়াছিল উহাতে তাঁহার মনের মেঘ কিঞ্চিৎ কাটিয়া গেল বটে কিন্তু নঙ্গরছেঁড়া জাহাজের মত তিনি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন। ধর্ম্মের সকল ঘাটে এক একবার টক্কর খাইয়া অবশেষে ইস্‌লামের শাহ্‌-বন্দরে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বহু বৎসর লাগিয়াছিল; এই জন্যই গোঁড়া মুসলমানগণ "ইস্‌লাম বিপন্ন" রব তুলিয়া বিদ্রোহের আয়োজন করিতে লাগিল।

৬

আকবর রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে (মার্চ ১৫৭৭—ফেব্রুয়ারি ১৫৭৮) মোগলবাহিনী যখন হিন্দুস্থানে পররাজ্য জয়ে ব্যাপৃত মোগলসম্রাট্ তখন দুনিয়ার ব্যাপারে বিলক্ষণ সচেতন থাকিয়াও রাজর্ষি জনকের মত স্বীয় মনোরাজ্যজয় সংগ্রামে লিপ্ত। লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার পুস্তক সংগ্রহের বাতিক ছিল; বিজিত রাজ্য হইতে সেনাপতিগণ অতি যত্নে যে-কোনো ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তিনি খলিফা মনসুরের দার-উল-হিকমতের মত হিন্দুস্থানে যে দরবারী পুস্তাকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার প্রপৌত্র শাহজাদা দারাশুকো-র উৎসাহে সেই পুঁথিভাণ্ডার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আকবর বাদশাহ্‌ বিষয়নির্বিশেষে ভাল ভাল পুস্তক নিয়মিত ভাবে অন্যের দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন। সুপণ্ডিত দারা বহি পড়িতে পড়িতে হয়রাণ হইয়া অবশেষে

বুঝিতে পারিয়াছিলেন বহি পড়িয়া প্রকৃত জ্ঞান হয় না। শাস্ত্রবিচারে সাত ঘাটের জল খাইয়া আকবর অবশেষে কবীরদাসজীর দোঁহায় মুক্ত মানব-আত্মার বাণী শুনিতে পাইলেন—

লায়া সাখী বানায় করি ইত উত অচ্ছর কাট্।
কহ কবীর কব্ লগ্ জীবৈ ঝুঠী পত্তল চাট্॥

বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহের নিকট হইতে বলাৎগৃহীতা, ললিতকলায় কবি কেশবদাসের প্রিয়-শিষ্যা নর্ত্তকী প্রবীণা রায়ের কাছে যৌবনে কামাসক্ত আকবর এঁটো পাত চাটিবার খেয়াল ত্যাগ করিবার উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাটের ইন্দ্রিয়লালসাকে তিরস্কার করিয়া তিনি আকবরকে একটী দোঁহা শুনাইয়াছিলেন—

বিনতী রায় প্রবীন্ কী, সুনিয়ে শাহ্ সুজান্।
ঝুটী পত্‌রী ভখত হৈঁ বারী বায়স শ্বান্॥

এই তিরস্কার আকবরের অভিমানে আঘাত করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুর উপর হইতে অবিদ্যার পর্দা ছিন্ন করিল। দিল্লীশ্বর নাপিত, কাক কিম্বা কুত্তা নহে যে এঁটো পাত চাটিবেন; সেই অবধি তিনি স্ত্রীর তিরস্কার-বিদ্ধ তুলসীদাসজীর মত ইশ্‌ক-ই-খোদা বা ভগবৎ প্রেমের রাস্তা ধরিলেন। ইবাদৎ-খানার মজলিসে জ্ঞানের গহনারণ্যে দিশাহারা হইয়া পূর্ণ তিন বৎসর তিনি দিলের কিতাব পাঠ করিতে লাগিলেন—যেহেতু নিরক্ষর ব্যক্তিকে একমাত্র ঐ কিতাবই খোদাতালা বখশিশ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মে মতবাদীদিগের সহিত তত্ত্বান্বেষী আকবরের মনের মিল হইল না; কবীরদাসজী বলিয়াছেন—

তেরা মেরা মনুবা কাহে এক হোই রে।
তুঁ কহতা কাগদ কী লেখী, ম্যাঁয় কহতা আঁখিন দেখি॥

আর একজন ফকীর আকবরের একশত বৎসর পরে শুনাইয়াছেন—

মতবাদী জানে নহী তত্ত্‌বাদীকা বাত্।
সূরজ্ উগে উলুয়া গিনে আঁধারী রাত্॥

আকবর ক্রমশঃ অনুরূপ অবস্থায় পৌঁছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, আল্লা-র রসুলগণ সকলেই "উম্মী" ছিলেন; বাপ-মা ছেলেদের মধ্যে একজনকে "উম্মী" করিয়া রাখিলে মন্দ নয়। ইহা ভাবের বিকার, কাজের কথা নহে; আকবর স্বয়ং কাজে উহা করেন নাই।

আকবরনামা পড়িয়া মনে হয় সম্রাট্ এই সময়ে কয়েকটী অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমে ভরপুর তাঁহার মন শাহুদ-দরিয়া-য় (Ocean of Vision) ভাসিয়া চলিয়াছে। এই সময় শাহনশাহ্ শুক্রবারে মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; জীবে দয়া এবং অহিংসার পরীক্ষা তখন নিজের উপর চলিতেছিল। উপদেশচ্ছলে তিনি পারিষদবর্গকে বলিতেন, "মানুষের পেট যেন জানোয়ারের এক একটি গোরস্থান; হাতীর মাংস হালাল হইলে বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী রক্ষা পাইত।" পাঞ্জাব সফরের সময় বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত সাদিওয়াল নামক স্থানে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহী ডেরা পড়িয়াছিল। এই সময়ে আলা হজরত একদিন অন্তরঙ্গগণকে বলিলেন, "দুনিয়াদারীর বালাই না থাকিলে মাংস খাওয়া একদম ছাড়িয়া দিতাম। কিন্তু মানুষ যেন নেকড়ে বাঘ, মাংসের খোরাক বন্ধ করিলে তুমুল চীৎকারে

জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। ভরসা আছে, ক্রমশঃ কমাইয়া বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিনেই মাংস খাওয়া সীমাবদ্ধ থাকিবে।"

এইস্থান হইতে কুচ করিয়া কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করিবার পর অদূরে একটি গ্রাম দেখিয়া বাদ্‌শাহ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ গ্রামের নাম কি? লোকটী বলিল "তিহারা" [হিন্দী "তোমার"]। "তিহারা" কাণে পৌছিতেই আলা হজরতের ভাবাবেশ হইল; তিহারা "তোমার"-ই বটে; "আমি" এবং "আমরা"*—এই ধাঁধাঁর মধ্যে গেরেফ্‌তার হইয়াই এই দুর্গতি। ভক্ত রুইদাসের দোঁহা মনে পড়িলে আকবর হয়ত বলিতেন, "প্রভুজী সরণ সঙ্গতি তিহারী"। আবেগভরে বাদশাহ মনে মনে খোদার কাছে নিবেদন করিলেন, কাল ভোরবেলা যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তোমার "তিহারা" তাহাকেই সোপর্দ্দ করা হইবে। খোদার রহমত্‌ রহমতকুলী-র উপর পড়িল; তিহারা গ্রাম তিনিই জায়গীর পাইলেন। কয়েক বৎসর পরে শাহানশাহ্‌ মুলতান জিলার পাক-পট্টন শহরে উপস্থিত হইলেন। ঐস্থানে পীর ফরিদের দরগায় জিয়ারত্‌ করিয়া বাদ্‌শাহ সন্ধ্যা হইতে পরের দিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত ইবাদতো মশ্‌গুল্‌ ছিলেন। শেখ ফরিদের অনেক কেরামতী শুনা যায়; একদিন তাঁহার পাক্‌-নজরে থাক্‌ (ধূলা বালি) শক্কর বা চিনি হইয়া গিয়াছিল; এইজন্য তিনি "শক্করগঞ্জ" বা শর্করা-ভাণ্ডার নামে আজ পর্য্যন্ত পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আবুলফজল ভক্তির আতিশয্যে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—

. . . . . harchand ke sāyah-i-khuda khawanand-sh

Mā sāyāh na-guyaim ke u nur-i-khudast.

[ভাবার্থ—লোকে বলে বাদ্‌শাহ্‌ জমীনের উপর খোদাতালার ছায়া; জিল্ল্‌-ই-সোভানী। আমরা বলি ছায়া নয়,—আলো; খোদার নূর।]

বিশ্লেষণশক্তি, ভাবের ঐশ্বর্য্য এবং বাগাড়ম্বরে আল্লামা আবুলফজলের তুল্য কেহ সে যুগে ছিল না—ইংরেজ আমল ত দূরের কথা। আমাদের মনে হয় আবুলফজল কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, যে নূর বা আলো তিনি আকবরের মধ্যে দেখিয়াছেন উহা সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়ে নির্ব্বাত নিষ্কম্প জ্ঞানের প্রদীপ নহে; বাদশাহী নূর একবার জ্বলিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে—আলো-আঁধারের পর্য্যায়ক্রম প্রাধান্য। মোটের উপর, আকবরের অবস্থা কাহিল; ভিতরে তাঁহাকে লইয়া বিরুদ্ধ বৃত্তিদ্বয় দড়িটানাটানি করিতেছে; হেঁচকা টানে তিনি কখনও এদিকে কখনও ওদিকে কাৎ হইয়া পড়িতেছেন। সুপ্ত অসুর জাগ্রত হইয়া নিরামিশাভিলাষী আকবরকে অকারণ অজস্রপ্রাণী হিংসার পথে চালিত করিল; তাঁহার আদেশে ঝিলম নদীতীরে "কমরগাহ্‌" শিকারের বহু মাইলব্যাপী ব্যূহ রচনা আরম্ভ হইল।

৭

পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার পুরাণো ভেরা শহর আকবরশাহী আমলে ঝিলাম নদীর দক্ষিণ তীরে বর্ত্তমান শহরের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন শহর হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে গিরজাহ্‌ক,

* ফার্সি মা-ওমা-মন্‌; *Akbarnama* Bib, *Indica* text iii; p. 235

বর্ত্তমান নাম জালালপুর। এই জায়গায় সিকেন্দর বাদশাহ তাঁহার ঘোড়া বিউসিফেলাসের ইয়াদ্‌গার্ বিউসিফেলা শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে বাদ্‌শাহ্ ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া ভেরা হইতে গিরজাহক পর্য্যন্ত ২৫ক্রোশ জায়গা জুড়িয়া কমর্‌-গাহ বা বেড়াজাল শিকারের আয়োজন করিবার হুকুম দিলেন। দশদিন ধরিয়া স্থানে স্থানে বেড়া, কোথাও বা জাল দিয়া এই শিকার-ভূমি হইতে পশুর নির্গমপথ বন্ধ করা হইল। শুধু একটি জায়গায় ফাঁক, নিকটে সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট সুদৃঢ় উচ্চ মঞ্চ। রবিবার ৪ঠা মে সকাল বেলা ঢাক ঢোল বাজাইয়া চতুর্দিক হইতে মাচার দিকে শিকারীরা জানোয়ার তাড়াইয়া চলিয়াছে; শিকারের বাজনা, শিকারীর চীৎকার, পলায়মান পশুর আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ মঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইল। শিকার জালে পড়িয়াছে, কিন্তু শাহান্ শাহ মোহাবিষ্টের ন্যায় নিষ্ক্রিয়, স্থির উদাসীন তাঁহার দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বাদ্‌শাহ্ হুকুম দিলেন,—"শিকার মকুব্, সব জানোয়ার খালাস।" হঠাৎ আলা-হজরতের ভাবাবেশ দেখিয়া অনুযাত্রীগণ নানাবিধ জল্পনা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, জঙ্গলের বোবা বেগুনাহ্ জানোয়ার গায়েবী জবানে শাহানশাহ্‌র্ দরবারে নিশ্চয়ই জান্ বখশিশের আর্জি করিয়াছে। যাহারা কবরের নীচে ফকির এবং বনে জঙ্গলে জটাধারী সাধুর অশরীরী সত্তা প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণা হইল, হয়ত এই বনের কোন সন্ন্যাসী সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হইয়া আলা-হজরতের মথসদ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে,—দিল খোদার প্রেমে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; সেই জন্যই তিনি খামোশ—চুপ হইয়া আছেন। এতক্ষণ শিকারীরা জানোয়ার আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছিল, একটা চিড়িয়াও কেহ মারিতে পারে নাই।

আকবর বাদশাহ্‌-র অবস্থা সম্বন্ধে আবুলফজল বলিয়াছেন, রৌশন-দিল ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যতীত মূর্খেরা ইহার রহস্য কি বুঝিবে? ঐতিহাসিকেরা ইহাকে জজ্বা-ই-কবী (*jazaba-i-qabi*) বা ভগবৎ প্রেমের "তীব্রতম আকর্ষণ" বলিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে "কেন" এবং "কিসের জন্য" এই তত্ত্ব-বিচারের মোহমুদ্‌গর আকবরের মায়ামোহের উপর সর্ব্বক্ষণ আঘাত করিতেছিল। শিকারের ময়দানে বন্দুক তাক্ করিয়া হয়ত তিনি "চূঁ ওয়া চেরা" [why and wherefore] বিচার করিতে-ছিলেন। বাপ দাদার মত মাথা নেড়া করিবার বিলায়েতী রেবাজ ছাড়িয়া আকবর হিন্দুস্থানী কায়দায় পাঠান এবং রাজপুতগণের অনুকরণে লম্বা বাব্‌রী চুল রাখিতেন। এই ঘটনার পর তিনি তাহার সখের চুল চাম-ছাঁটা করিয়া ফেলিলেন। কয়েকদিন পরে এই সংবাদ পাইয়া রাজমাতা হজরত মরিয়ম-মকানী (হামিদা বানু) পুত্রকে দেখিতে আসিলেন, এবং দুর্দ্দৈব প্রশমনের নিমিত্ত দান খয়রাত করিলেন। হিন্দুস্থানে দেও-পরীর "হাওয়া" লাগিলেও মাথা খারাপ হয়—মায়ের এরূপ আশঙ্কা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যাহা হউক, ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় শুভদিন। ঐ দিনে আকবর বাদ্‌শাহ্‌-র আকবরত্ব লাভ হইয়াছিল। "সত্য" স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—দিদাওয়ার-ই-হাকিকী বা সত্যদ্রষ্টা হইয়া তিনি ধন্য হইলেন। কুরুক্ষেত্রে যে বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন কে বলিতে পারে খোদাতালার জাত্‌-ই-মোহিত, "সর্বান্ আবৃত্য"-তিষ্ঠমান্ "বিরাট"-রূপ মৃগয়াভূমিতে দেখিতে পাইয়া আকবর অন্তসংবরণ করেন নাই?

৮

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখ হইতে ইবাদৎ-খানার সান্ধ্যসভা আবার নিয়মিত আরম্ভ হইল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উহা ইস্‌লাম এবং মুসলমানের খাস মজলিস রহিল না। সম্রাটের আমন্ত্রণে স্ব স্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের জন্য সুন্নী, শিয়া, হিন্দু, জৈন, চার্বাক্, ঈসাই এবং অগ্নি-উপাসক জর-দোশ্‌তী— সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ইবাদৎ-খানায় উপস্থিত হইলেন। আমন্ত্রিত হইয়া গোয়া-র যিশু-সংঘভুক্ত (Jesuit) পাদ্রী সাহেবেরা আসর গরম করিয়া তুলিলেন—হিন্দু মুসলমান কেহই রেহাই পাইল না। খ্রীষ্টানেরা এদেশে গীর্জ্জা নির্ম্মাণ এবং ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার পাইল। বড়দিনের খ্রীষ্ট জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শাহানশাহ্ আগ্রার গীর্জ্জায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গীর্জ্জার ভিতরে তিনি প্রথমে জানু গাড়িয়া প্রার্থনা, পরে নমাজ এবং অবশেষে পদ্মাসন করিয়া সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিলেন। শাহজাদা মোরাদকে খ্রীষ্টান পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে একজন পাদ্রী শিক্ষক নিযুক্ত হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল, বাকী শুধু আলা-হজরতের মস্তকে 'জর্দ্দন'-বারির অভিষেক। একদিন শাহানশাহ্ পাদ্রীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "পাপাজী, তোমাদের সব কিছুই ভাল; কিন্তু খোদাতালা এবং হজরত ঈসার মধ্যে বাপবেটা সম্বন্ধ মানুষের কিয়াস্ যুক্তি অনুমানের বাহিরে। তোমাদের 'একে তিন, তিনে এক' সূত্রটীও বুঝিতে পারিলাম না।" সাহেবের বিদ্যা উম্মী আকবরের কাছে প্রকাশ্য বিচারে হার মানিল, কিন্তু পাদ্রী সাহেব সহজে হাল ছাড়িলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই সোজা কথাটা, প্রভু যিশুর পবিত্র 'খোঁয়াড়ে' ঢুকিয়া পড়িলেই আলাহজরত, বুঝিতে পারিবেন। বাদ্‌শাহ ভাবিলেন, খোঁয়াড়েই যদি ঢুকিতে হয়, হিন্দুস্থানেই হরেক রকমের খোঁয়াড় আছে, রসুলাল্লার উম্মত ছাড়িয়া ঈসাহির দলে ভিড়িলে ইস্‌লাম এবং হিন্দুস্থানের উপর অবিচার করা হয়, অথচ মনের ধাঁধাও দূর হইবার নয়। গতিক বুঝিতে পারিয়া পাদ্রী সাহেবেরা দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইবাদৎ-খানার তর্ক সভায় সমস্ত ধর্ম্মই অল্পবিস্তর নাকাল হইয়াছিল। আকবর বুঝিতে পারিলেন, মোল্লা পাদ্রী পণ্ডিত সবই "একে তিন, তিনে এক"; অধিকাংশই ধর্ম্মের নারিকল-ছোবড়া চিবাইতেছে; শাঁসটুকুর দিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। শরিয়তের উপর আকবরের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। তিনি বলিতেন, কল্‌মা পাঠ, ত্বক্-ছেদ (সুন্নত), কিংবা খোদাতালার সুলতানী সাজা-র ভয়ে মাটিতে মাথা খোঁড়া খোদাকে তালাশ করা নয়; ইস্‌লামের আসল বস্তু ছাড়িয়া আমরা ধর্ম্মের খোলস লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম; বহু হিন্দুকে জোর করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি; আমি প্রকৃত মুসলমান হইতে পারি নাই—অন্যকে মুসলমান করিবার আমার কি অধিকার? এখন বুঝিতে পারিয়াছি নানা মতের ঝগড়া ফ্যাসাদের মধ্যে সত্যনির্দ্ধারণে "যুক্তিপ্রমাণ* ব্যতীত এক পা বাড়াইবার জো নাই।" এই জন্য আকবর বাদশাহ্ স্থির করিলেন ধর্ম্মের ঝগড়ায় আর শরীক হইবেন না এবং হিন্দুস্থানের শাহী মসনদের ছায়ায় ধর্ম্মের নামে কেহ ঝগড়া করিতে পারিবে না; কেহ যদি মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণের সহজাত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে,

---

* *Be mushaa'l-i-dalil qadame na-tawanraft ;* text Akbarnama iii, p. 2555

তাহাকে রাজদ্বারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এইভাবে হিন্দুস্থানে "সুলেহ্ কুল" বা সকল ধর্ম্মের সহিত আপোষ-রফার নীতি প্রবর্ত্তিত হইল।

৯

মানুষের মন উদার এবং বিচারমুখী না হইলে ধর্ম্মের বিরোধ শান্ত হইবার নয়, এই জন্যে সকল ধর্ম্মের মূল সত্য, ঈশ্বরের একত্ব বা তৌহিদ্-ই-ইলাহী-র ভিত্তির উপর কয়েক বৎসর পরে সম্রাট আকবর "ইলাহী" ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করিলেন; ভারতবর্ষের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ইস্‌লামের "দ্বিতীয় সাহস্রিকী"-র প্রারম্ভে যুগোপযোগী নবরূপ ধারণ করিল। এই "সাহস্রিকী" বিদ্রোহের যুগ—আকবর হইতে আমানুল্লা আতাতুর্ক কামাল পর্য্যন্ত সকলেই বিদ্রোহী। মুসলমান সমাজের এক অংশ ইহাকে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে নব্যতুর্কী যে *Pan Turanianism* প্রচার করিয়াছে, ইস্‌লামের উপর আরবী ছাপ এবং ভিতরে সেমেটিক কুলাভিমান দেশ ও কালের অনুপযোগী বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, শাহানশাহ্ আকবর হিন্দুস্থানে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় সেই প্রকার বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যজাতির ইরানী এবং হিন্দুস্থানী সমাজগোষ্ঠির প্রাক্-ইস্‌লামীয় যুগের উপাসনা এবং সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নির্ম্মল একেশ্বর-বাদের সহিত যুক্ত করিয়া দীন্-ই-ইলাহী সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এই সৃষ্টি সেমেটিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সুপ্ত আর্য্যাভিমানের অভ্যুত্থান। গত মহাযুদ্ধের পর সেনাপতি লুডেন্‌ডর্ফ যিশুখ্রীষ্টকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য জার্ম্মান দেবতা ওডিন্-থর-কে যে প্রেরণায় আহ্বান করিয়াছিলেন উহাই হিটলারী আমলে ইহুদী-যজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল—উহার পশ্চাতে রহিয়াছে মরুচারী আদিম আর্য্যজাতির উগ্র কুলাভিমান।

শাহনশাহ্ আকবর স্বপ্নবিলাসী ছিলেন, তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই। দীন্-ই-ইলাহী এবং সুলেহ্-কুল বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। কিন্তু হিন্দুস্থানের মাটিতে উহার বীজ, এবং চিন্তাধারায় উহার প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। যে যুক্তির অবতারণা করিয়া দিল্লীশ্বর তাঁহার "সুলেহ্-কুল" নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, মানুষের পাণ্ডিত্য উর্ম্মী আকবরের সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারে নাই। ইরাণের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ শাহ্ আব্বাসের নিকট ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে [উনচল্লিশ জুলুস্] দরবার হইতে যে পত্র লিখিত হইয়াছিল উহাতে "সুলেহ্-কুল" নীতির প্রচার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:—

"আল্লা-র কুদরতী রহমত প্রত্যেক ধর্ম্মের উপর রহিয়াছে—এইরূপ জ্ঞান করিয়া সকল ধর্ম্মের সহিত আপোষ-রফা-র সুলেহ্-কুল নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্য আপনার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত… আদমসন্তান জানিয়া শুনিয়া দুনিয়ার কাজেও স্বার্থহানিজনক ভুলচুক্ করে না। দীনের মামলায় ধর্ম্মের ব্যাপারে, যাহার জন্য তাহাকে খোদাতালার কাছে জবাব দিতে হইবে, তেমন কাজে সজ্ঞানে সে কেমন করিয়া গুণাহ্-গাফেলী করিতে পারে? প্রত্যেক জাতির হাল [*hāl-i-har taifa*] এই দুই বিভাগের বাহিরে নাই;—হয় হক্ উহার দিকে, অর্থাৎ তাহার ধর্ম্মের মধ্যে সত্য আছে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ঐ সত্যকে গ্রহণ এবং উহার নির্দ্দেশমত কাজ করা, না হয় হক্ উহার দিকে নাই, ইহা বেচারার বদনসীব,—নাদানির বিমারী, [*Be-chārā bimari-i-nadani*] অজ্ঞতা

রূপ ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং শেষোক্ত শ্রেণীর হতভাগ্যেরা কৃপা ও সহানুভূতির পা ত্র,—তিরস্কার ও শাস্তির যোগ্য নহে।......"

১০

দুনিয়ার অজ্ঞানব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভাগাগণকে আঁধার হইতে আলোকে, নরকযন্ত্রণা ও দোজকের আগুন হইতে বেহেশ্‌তের আনন্দধামে লইয়া যাওয়া; কিংবা মানবসমাজের এক অঙ্গ দুষ্টক্ষত দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহার উপর অস্ত্রোপচার করা কি পাপ? জানিয়া শুনিয়া মূর্খতা এবং অসত্যের সহিত সংগ্রামবিমুখ সত্যের আপোষ-সলাহ্‌ কি খোদার মর্জ্জী?—এইরূপ যুক্তির দ্বারা বিচার করিলে আকবরের "সুলেহ-কুল" নীতি প্রজার প্রতি রাজার, মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যপালন না করিবার একটা অজুহাত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। ধর্ম্মশীল রাজা এবং উৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারকগণ সত্যযুগ হইতে তাঁহাদের জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে মানুষকে সত্য এবং স্বর্গের পথে পরিচালিত করিয়াছেন; কেহ কেহ সমাজদেহের উপর ছুরি চালাইতেও কসুর করেন নাই। রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর মাথা কাটিয়াছেন, মামুদ গজনবী মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন, স্পেন-সম্রাট্‌ দ্বিতীয় ফিলিফ্‌ পশ্চিম ইয়োরোপে ঈসাঈ পাকিস্থান করিবার জন্য মুসলমান সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ্‌, অর্দ্ধ-মূর খ্রীষ্টানপ্রজা বিতাড়ন, পোপ-বিদ্বেষী পাষণ্ড-প্রোটেষ্টাণ্ট্‌-দলন ইত্যাদি অনেক "ধর্ম্ম"-কার্য্য করিয়াছিলেন; তবুও ধর্ম্মিকগণের মুখে শুনিতে পাই কলিকালে পাপ চতুর্গুণ হইয়াছে; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কল্কি, ইমাম মেহ্‌দী এবং ইহুদী "মহাশয়" বা মেসায়া সহসা আসিবেন; কাজেই প্রথমে যুদ্ধপর্ব্ব এবং পরে সলাহ্‌-আপোষ করিবার মত দুই পক্ষ অবশিষ্ট থাকিলে তাঁহারাও আকবরের সুলেহ্‌-কুল ব্যতীত আপোষরফার কোন সূত্র উদ্ভাবন করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

অনাচারী উম্মীয় খলিফাগণের সময় সাম্রাজ্যগর্ব্বিত আরবজাতি আশ্রিত বা মাওয়ালী-শ্রেণীর নবদীক্ষিত মুসলমানকে মুসলমানদিগের ন্যায্য অধিকার হইত বঞ্চিত রাখিয়া শোষণ করিবার স্বপক্ষে একাধিক হদিস্‌ আবিষ্কার করিয়াছিল; হজরত রসুলাল্লা নাকি বলিয়াছেন—খোদাতালা এমন লোকগুলিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন, যাহাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়া হইতেছে।* পরাজিত জাতিসমূহকে এইভাবে স্বর্গের দুয়ারে হাজির করিয়া ঐ আমলে আরবশাসক-সম্প্রদায় পুণ্য অর্জ্জন এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আরবেরা মনুষ্যজাতিকে তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিল; যথা, "মানুষ" [আরব পিতামাতার সন্তান]; অর্দ্ধমনুষ্য" অর্থাৎ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত আর-বেতর জাতি, গ্রীক পারসিক ইত্যাদি; এবং "অমানুষ" [non-man] বা কাফের্‌ জিম্মী—যাহারা দ্বিপদ হইয়াও চতুষ্পদের সামিল। এইরূপ দিব্যজ্ঞান না থাকিলে আকবরের পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর ময়দানে লক্ষ হিন্দুবন্দীর পাইকারী কতল্‌ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন; তাঁহার সহযাত্রী জীবহিংসায়বিরত একজন মোল্লা,—যিনি জীবনে একটী চড়ুই পাখীও মারেন নাই তিনি পরম উল্লাসে পনেরজন হিন্দুর মাথা কাটিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন না; কিংবা স্বয়ং আকবর চিতোরে মানুষের মাথার মিনার গড়িতেন না। হিন্দুস্থানে

---

* **"God marvels at men that are dragged to Paradise with chain." (quoted in *Umayyad* and *Abbarids* ; Margoliouth, p 70)**

সুলতানী আমলে একশ্রেণীর মোল্লা মানুষকে প্রায় উম্মীয় যুগের জাহেল আরবের চোখেই দেখিতেন; সুতরাং আকবরের বিবেকবুদ্ধির উদয় হওয়ায় তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন; সম্রাটের নিরপেক্ষ সমদর্শিতা ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ ইস্‌লামের উপর অশ্রদ্ধা এবং জুলুম বলিয়া মনে করিলেন। মানুষের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে আকবর যত রাজ্যের অমঙ্গল নিজের মাথার উপর ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রাজত্বের চতুর্বিংশতি বর্ষে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিহারে মোগল আমীরগণ বিদ্রোহী হইল; জৌনপুরী মৌলানাগণ ফতোয়া জারি করিয়া শাহানশাহ্-কে কাফেরীর অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত করিল এবং বিদ্রোহীগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিম হিন্দুস্থানের ইস্‌লামী মসনদের লোভে কাবুলী ফৌজসহ সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইল। বঙ্গবিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আবুলফজল সম্রাট্ প্রচারিত সুলেহ্-কুল নীতিকে নবম কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (A. N. iii p. 482)।

পূর্ণ পাঁচ বৎসর সংগ্রামের পর আকবরের উদার রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি সুলেহ্-কুল জয়যুক্ত হইল; সম্রাট্ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ইস্‌লাম রাষ্ট্রকে ভারতবর্ষের জাতীয় সাম্রাজ্যে রূপায়িত করিয়া জাতিগঠন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। সে যুগের ধারণা, নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন ধর্ম্মের প্রয়োজন। আকবর পয়গম্বর নহেন; সুতরাং তিনি ইস্‌লামের গণ্ডীর ভিতর দীন-ই-ইলাহী কায়েম করিবার মতলব করিলেন—ইহাতে মোল্লাসম্প্রদায়ের অসোয়াস্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। শাহানশাহ্ এইবার "সুলেহ্-কুলের" চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া কোন্ রাস্তা ধরিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভালবাসা—মহব্বত ব্যতীত বুদ্ধির আপোষ চিরস্থায়ী হইতে পারে না—এইজন্য ভারতেশ্বর সুলেহ্-কুলের মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া মহব্বত্-ই-কুল সর্ব্বধর্ম্মে সমপ্রীতির বিঘ্নসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফতেপুরসিক্রীর সুবিশাল মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবার কয়েক বৎসর পরে আকবর কাশ্মীরে একটী ক্ষুদ্র হিন্দুমন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাকাল ঐ মন্দির গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু উক্ত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ সম্রাটের অনুশাসন কালজয়ী হইয়া ইতিহাসের পাতায় রহিয়া গিয়াছে; ধর্ম্মের শেষ এবং শাশ্বতবাণী আকবর হিন্দুস্থানবাসীকে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে শুনাইয়াছেন—

"এই গৃহ [Khānā] হিন্দুস্থানের একেশ্বরবাদীগণের হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইল।·········যে কেহ সিদ্দিকের সত্য এবং অকপট দৃষ্টিতে [*nazr-i-sidq nendakhtah*] না দেখিয়া এই খানা খারাব করিবে (Khānā-rā khārāb sazad) সে প্রথমে নিজ উপসনাগৃহ বরবাদ করুক; কেননা, নজর যদি দিলের [ভিতরের বস্তুর] উপর থাকে তবে সকলকে লইয়াই থাকিতে পারে। যদি জল-মাটি (*ab wa gil*), অর্থাৎ চুণাপাথর ব্যতীত আর কিছু নজরে না পড়ে তবে সমস্তই [বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনাগৃহ] ধ্বংস করিতে হয়।"

১১

ভারতের বাহিরে ইস্‌লামে যাঁহারা প্রেমের বাণী সুলেহ্-কুল প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সাধক কবি ফরিদ্‌উদ্দীন আত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলিয়াছেন,

কুফ্‌র্ কাফের্-রা, দীন্ দীনদার্-রা;
জরাহ্-ই-দরদ্-ই-দিল্ আত্তার-রা।

[অর্থাৎ, কাফেরের অবিশ্বাস এবং মুসলমানের "ইমান" তাহাদেরই থাকুক। দিলের দরদের (ভগবৎ প্রেমের) এক বালুকণা আত্তারের জন্য যথেষ্ট।]

হিন্দুস্থানে আকবরের পূর্ব্বে ভক্ত আমীর খসরু এবং কবীর দাসজী এই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ; আকবরের প্রপৌত্র শাহজাদা দারা-র সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সূফী সাধকগণ মানব-আত্মার এই আবেগময়ী অন্তরের বাণীকে ভাষা দিয়াছেন। সাধক দারাশুকো আত্মোপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন—

দরূঁ হর্ বুতে জানিস্ত্ পিনান্।
বে-জের্-ই-কুফ্র্ ইমানিস্ত্ পিনান্॥

[অর্থাৎ, প্রত্যেক্ মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণ, এবং অবিশ্বাসের আড়ালে ইমান্ লুক্কায়িত আছে।]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দীন্ দরবেশ কবীরদাসজীর পীঠস্থান কাশীধামে বসিয়া আবার গাহিলেন,

হিন্দু কহেঁ সো হম্ বড়ে, মুসলমান কহে হম্ম্।
এক মুংগ-কা দো ফাঁড় হৈ্ কুণ্ জাদা কুণ্ কম্ম্॥

* * * *

কহে দীন্ দরবেশ দোয় সরিতা মিলৈ এক সিন্ধু।
সব্দা সাহেব্ এক হ্যায় এক মুসলমান হিন্দু॥

[মুসলমান বলে আমি বড়, হিন্দু বলে আমি ; গোটা মুগের দুটা ফালি, কোন্‌টা বড় কোন্‌টাই বা ছোট ? দীন দরবেশ বলে দুই নদী একই সাগরে মিলিয়াছে ; সকলের "সাহেব" বা প্রভু এক ; হিন্দু মুসলমানও এক]

বাঙ্গালা দেশে বাংলা সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে স্নেহ্-কুল মহাত্মা রামমোহনের পূর্ব্বে কেহ প্রচার করিয়াছিলেন কিনা জানি না। বর্ত্তমান্ যুগে ইবাদৎ-খানার প্রয়োজন না থাকিলেও আকবরের ধর্ম্মে সাম্য ও প্রেমের বাণী ভারতবাসীকে আবার শুনাইবার অবকাশ আছে।

কবিতাগুচ্ছ

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌরভ

কোথা হতে আসিতেছে কুসুমসুবাস,
মরমের নিরালায় শিহরে নিশ্বাস।
প্রতি শ্বাসে বিকশিছে শত ফুলকলি,
সোহাগেতে গায়ে গায়ে কত ঢলাঢলি।
প্রাণ হতে প্রাণ যেন বাহিরিতে চায়,
সৌরভের মাঝে যদি ডুবিবারে পায়।
এ যেন বিরহস্মৃতি মিলনের সাথে,
সুখদুখে-মেশামেশি জ্যোছনার রাতে।
যেন কী বিস্মৃতিলেশ রয়েছে স্মৃতিতে,
আধো-চোখে চাওয়াচায়ি ভবিষ্য-অতীতে।
ধীরে মুদে আসে আঁখি সৌরভপরশে,
আপনারে খুঁজে প্রাণ বিষাদে হরষে।
ফুলরেণু থরোথরো হৃদয়ের পাতে
মৃদু মৃদু শিহরিছে নিশ্বাসের সাথে।

দুজনায়

উষার শিশিরসিক্ত চম্পকশাখায়
দুইটি সোনালি রশ্মি পুলক খেলায়।
দুইটি চুম্বনরেখা অধরবেলায়,
রোমাঞ্চ শিহরি উঠে কম্পিত ছায়ায়।
চম্পকপরাগরাগে ঝিকিমিকি-কায়
দুজনে দুজনা-পানে চাহিয়া না চায়।
দুখানি অবশ হিয়া আঁখির পাতায়
দোঁহার পরশে যেন লাজে মরে যায়।
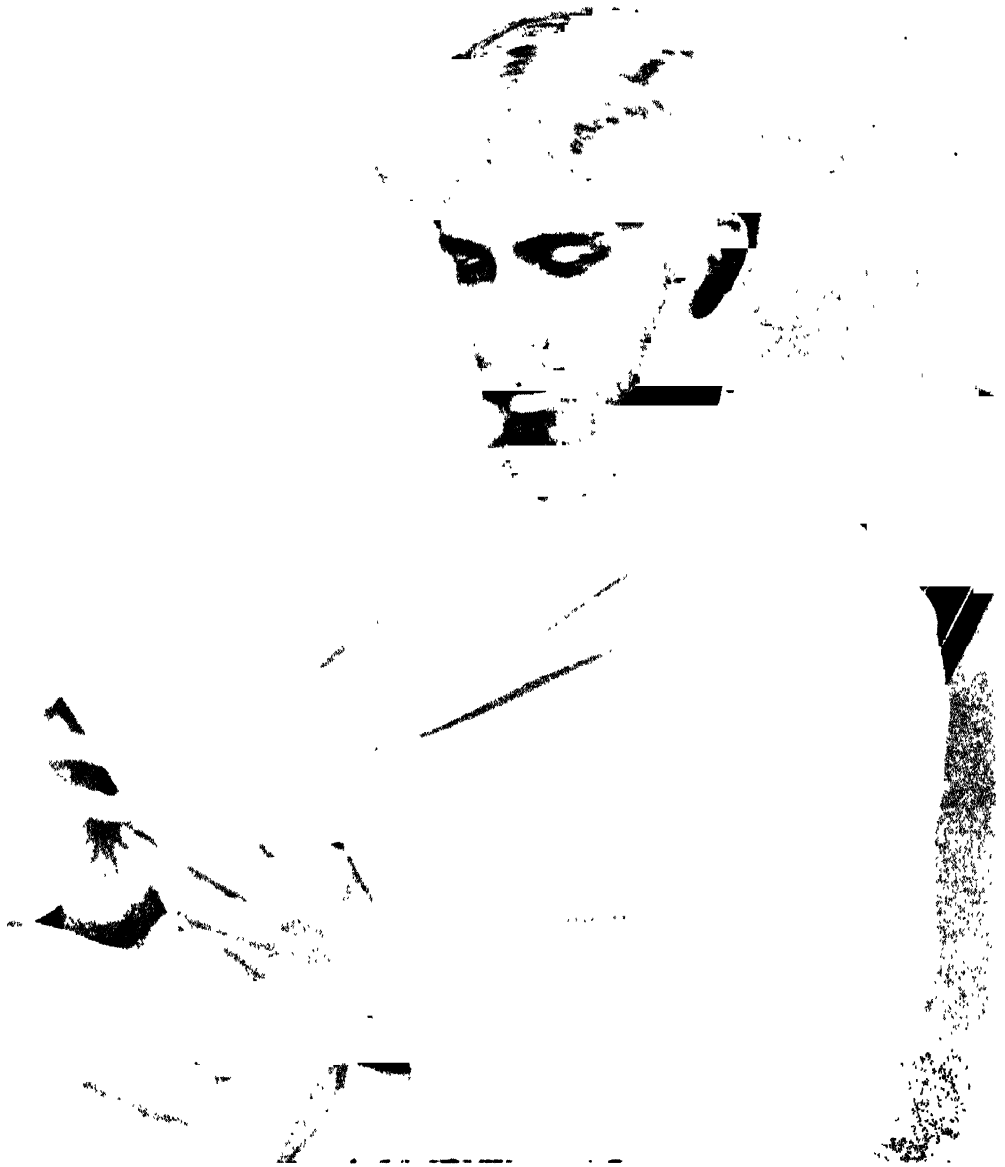
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে

শ্রীসুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় দিনেন্দ্রনাথ হিতেন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ নীতীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ শ্রীসমরেন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযোগেশ চৌধুরী দ্বিপেন্দ্রনাথ অরুণেন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ শ্রীশেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বিদায়

দুইটি জীবন আজি অন্তিমদশায়
এসেছে দোঁহার কাছে চাহিতে বিদায়।
মিলনের বুকে যেন দুটি অশ্রুরেখা
বিরহ-অক্ষর দিয়া রহিয়াছে লেখা !
দুইটি বিস্মৃতি যেন ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে
বিদায় লইবে শুধু অধরে অধরে।
দুইটি নন্দনশোভা মরণশয্যায়,
সন্ধ্যার আঁধারছায়ে লইছে বিদায়।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত।

স্কেচ : শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
শ্রীযুক্ত এ. পেরুমলের সৌজন্যে

বলেন্দ্রনাথের গদ্য রচনা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

যে কয়জন প্রতিভাশালী বাঙালী সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্যলীলা সমাপ্ত করিয়া অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে অস্তমিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের কাহারও রচনার পরিমাণ খুব বেশি নহে। এই সব মুষ্টিমেয় রচনায় প্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ ছাপ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করিয়া আছে প্রতিভার পূর্ণতর দীপ্তির আভাস। ইঁহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে ইঁহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।

এই সাহিত্যিক চতুষ্টয়ের মধ্যে সতীশচন্দ্র সব চেয়ে অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একুশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

একুশ বৎসরের যুবককে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অধিকাংশ বাঙালী যুবক এই বয়সে কলেজের ছাত্র। অথচ সতীশচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার ভাস্বরতা, প্রচণ্ড বেগ ও অস্থায়িত্ব তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই নীহারিকামণ্ডল সংহত হইয়া স্থায়ী নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। তবে এটুকু নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, সতীশচন্দ্র মূলতঃ কবি ছিলেন। কবিদৃষ্টির উদারতা ও গভীরতা, কবির সৌন্দর্যসন্ধ নেত্র, কবিসুলভ রসপিপাসা তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষ। জীবনপরিণামলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিলে তিনি বাংলাদেশের একজন মহৎ কবি হইতেন বলিয়াই বিশ্বাস। আর, গদ্য রচনা যতই তিনি লিখুন না কেন, সকলের উপরেই মহৎ কবির মুদ্রা অঙ্কিত থাকিত।

অজিতকুমার চৌত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। এই বয়সে শক্তির দিক্‌নির্ণয় ঘটিয়া যায়, কিন্তু শক্তি তাহার পূর্ণলক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। এই দিক্‌নির্ণয়ের সূত্র ধরিয়া বলা যায় যে, অজিতকুমারের বিশ্লেষপ্রবণ চিত্ত উত্তরোত্তর সমালোচনার পথেই চলিত। তাঁহার সব রচনাই বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। তাঁহার রচিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বাংলাদেশের তাৎকালিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুস্তকখানি সমালোচনার চৌখুপি 'গ্রাফ পেপার'। ইহারই খোপে খোপে দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি বসাইয়া দিয়াছেন। খণ্ডকে সংহত করিয়া জীবনচরিত রচনার 'বস্‌ওয়েলি পন্থা' তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অজিতকুমারের পরিণত রচনা প্রধানতঃ হইত আলোচনা ও সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে বাংলাদেশের মহৎ সমালোচক হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে মহত্তম সমালোচক হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল চল্লিশ। এই বয়সে প্রতিভার দিক্‌নির্ণয় ও পরিণতি দুইই ঘটিয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কবিজীবন একরূপ সমাপ্ত হইয়া

গিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা 'ফুলের ফসল' এবং 'কুহু ও কেকা'য় সঞ্চিত। এ দুইখানি কাব্য, রবীন্দ্রকাব্যের বাহিরে, যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের বাংলা কাব্য আছে তাহাদের অন্যতম। তাঁহার 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা' বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁহার পরবর্তী বহু কবিতাই বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষাক্ষেত্র বলা চলে। শতদলবাসিনী সরস্বতী 'ফুলের ফসল' এবং 'কুহু ও কেকা'র যুগ্ম পদ্ম হইতে চরণযুগল নামাইয়া পরবর্তী সব কাব্যে তারের উপর দিয়া হাঁটিবার লীলাকৌশল দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ছন্দের কসরৎ-প্রদর্শনে কবি বিরক্ত হইয়া পড়িলে কি করিতেন? কোন্ জাতীয় রচনায় আত্মনিবেশ করিতেন? 'ছন্দসরস্বতী'তে সমালোচনার সংহতি বা প্রত্যক্ষগতি নাই। ভাষায় প্রসাধনকলা ও ভাবের অতিব্যাপ্তি ইহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। 'ডঙ্কানিশান' রচনা পড়িয়া মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের পটে উপন্যাস-রচনায় কলম চালনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার সহায় ছিল হাস্যরসবুদ্ধি। তাঁহার প্রধান অন্তরায় অতিব্যাপ্তি, উপন্যাসকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না— যদিচ তাহা তাঁহার কবিতাগুলিকে, বিশেষ ব্যঙ্গকবিতাকে, শরবৎ ঋজুগতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অনেক স্থলে লক্ষ্যহীন উর্ধ্বাকাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের কণ্ঠে পুষ্পমাল্যের মতো— তাহাতে শোভাবর্ধন করিয়াছে কিন্তু রচনাকে ভারগ্রস্ত করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহার শেষ জীবনের রচনার ঘাড়ে আড়াই-মনি তোরঙের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। ছন্দের ভাঁজে ভাঁজে বাহকের আর্তধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর বয়স মাত্র উনত্রিশ। সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলে, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অল্প বয়সে মারা গেলেও সাহিত্যিক সম্ভাবনাতে তিনি বোধ করি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং হেয়ার স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায় এবং তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে প্রকাশিত 'বালক' নামে পত্রে তিনি লিখিতেন। পরে 'সাধনা' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়া ওঠেন। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের চালনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যজীবন গড়িয়া ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যসাধনাই বলেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিষয় ছিল না। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান উপলক্ষ্যে ঋতেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

ইহার পরে তিনি বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার প্রবল কল্পনা ছিল; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল। ...স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। ...রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। ...বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। ...তিনি জীবনের শেষভাগে আর্য্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্য্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা। ...তিনি নিজে লাহোরে গিয়া পাঞ্জাবী আর্য্যসমাজীদিগের মধ্যে থাকিয়া এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৩০২ সালের ২২শে মাঘ। বলেন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে বলেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবন। তাঁহার মানসজীবনের পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার রচনাগুলি।

বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ বড় অল্প নহে। গদ্য ও পদ্য দুই শ্রেণীর রচনাই তিনি লিখিয়াছেন। গদ্যের ভাগই বেশি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ডিমাই আকারের পুস্তকের গদ্যাংশ ৬৯২ পৃষ্ঠা। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। বর্তমান প্রবন্ধে গদ্য রচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বহুলতার চেয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য তাহার বিষয়বৈচিত্র্য। স্বল্পস্থায়ী সাহিত্যজীবনে নানা শ্রেণীর রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সমালোচনা-জাতীয় রচনাই বেশি— সমালোচনারও আবার কত রকম উপশ্রেণী। সাহিত্যসমালোচনার অন্তর্গত সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের আলোচনা আছে। চিত্রসমালোচনা আছে। সামাজিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। দেশীয় আচারব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধও রহিয়াছে। দেবস্থান পীঠস্থান প্রভৃতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সন্যাল এসে' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। আর আছে কতকগুলি নিছক প্রকৃতিবর্ণনা। ন্যারেশন বা কথাভাসপূর্ণ রচনারও অভাব নাই। গ্রন্থাবলীখানিতে ভালোমন্দ, পরিণত-অপরিণত সবজাতের রচনা একত্র ঠাসিয়া ভর্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমাহিত হইয়া পড়িয়া আছে— বাঙালী পাঠকের পক্ষে না তাহা গৌরবজনক, না তাহা লাভজনক। অবিলম্বে বলেন্দ্রনাথের রচনার একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বলেন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপটি কি? যে-সমস্ত রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সমালোচনাজাতীয়। অজিতকুমারের অধিকাংশ রচনাও সমালোচনা-শ্রেণীর। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। অজিতকুমারের সমালোচক-দৃষ্টি অখণ্ডকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে চাহিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের সমালোচক-দৃষ্টি খণ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। একজনের দৃষ্টি সত্য-সন্ধ, অপরের সৌন্দর্যসন্ধ। অজিতকুমারের কাছে সমালোচনা বিজ্ঞান, বলেন্দ্রনাথের কাছে সমালোচনা কলা; অজিতকুমার সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী; একজনের কাছে সমালোচনা তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, অপরের কাছে তাহা সৃষ্টিকার্য। বলেন্দ্রনাথের মন মূলতঃ কবির মন। কবির মনের কাছে জগৎ এবং সাহিত্য শিল্প ও চিত্রাদি অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই রূপ, একই সৌন্দর্যময় সত্তা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। তিনি সৌন্দর্য ভোগ করিয়াছেন, এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়া, কখনো বা তাহার উত্তরীয়প্রান্ত টানিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খণ্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির করিতে, অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। সৌন্দর্য জগৎব্যাপারের পরিণাম ও পরা নিয়ম— ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপদর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য— ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্য-

ভোগের এমন 'কীট্‌সীয়' দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালী লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা।

এই বিশিষ্ট গুণকে দুইটি সাহিত্যিক প্রভাব বলবত্তর করিয়াছিল। সংস্কৃতসাহিত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্য। বলেন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃতজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ কালিদাস ও কাদম্বরী হইতে প্রাপ্ত। কালিদাসের সৌন্দর্যানুরাগ এবং বাণভট্টের সুন্দর চিত্রাঙ্কনস্পৃহা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরসপ্রবণ প্রতিভাকে শক্তিশালী করিয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবও তাঁহার উপরে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশের সময় আর মৃত্যুর সময় ভিন্ন নয়, এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য ও 'প্রাচীন সাহিত্য'র অনেক প্রবন্ধ প্রকাশের কাল। কল্পনা নির্যাসিত সৌন্দর্যের কাব্য, প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সমালোচনার সৃষ্টিকার্য। আর আগেই বলিয়াছি যে, সৌন্দর্যদর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণ। এ দুইও আবার ভিন্ন নয়; মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ডরূপের সন্ধান, যাহার অপর নাম সৌন্দর্যসন্ধান, ইহাই বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পর্বটা পরিণত বলেন্দ্রনাথের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বলশালী হইতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বকীয় বিশিষ্ট গুণের অনুরূপ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানবজীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রভাববৈষম্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। মিল্‌টনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যরসপ্রবণ চিত্ত 'পিউরিটান' ফিলজফির মরুভূমি অতিক্রম করিতে গিয়া কি দুঃসহ দুঃখ-ভোগই না করিয়াছে! খণ্ডিত প্রতিভা মহৎ সার্থকতা-লাভের প্রধান অন্তরায়। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে শ্রেণীরই হোক, এই দুর্ভাগ্য হইতে অন্তত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার সৌন্দর্যদর্শনরূপ মূল শক্তি সংস্কৃত কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৌন্দর্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অল্পবয়সে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং পদে পদে তাঁহাকে নিজের সহিত লড়াই করিতে হয় নাই বলিয়া, তাঁহার রচনার পরিমাণও সমধিক হইতে পারিয়াছিল।

আবার এই স্বভাবজ সৌন্দর্যপিপাসা ও সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের ও ভাষার সমস্যা জড়িত। যথার্থ সৌন্দর্যরসপ্রবণতা মানুষকে সংযম শালীনতা ও আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দান করে। এইগুলি তাঁহার ভাষা ও স্টাইলের গুণ। আবার কাদম্বরী ও কালিদাসের প্রভাবও একই সঙ্গে তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বর্ণাঢ্য শব্দাঢ্য ভাষা, উপমা- ও অলংকার -বহুল স্টাইল তাঁহার বৈশিষ্ট্য—এগুলির জন্য তিনি প্রধানতঃ সংস্কৃতসাহিত্যের নিকট ঋণী। বলেন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলে একটি আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের পরিচয় পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যায়। এই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য লেখকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট প্রতিভার প্রকাশ্য বাহ্যরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি বলেন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা কতক পরিমাণে সম্ভাবনার আলোচনা হইতে বাধ্য। তিনি জীবনের স্বাভাবিক দীর্ঘতা পাইলে তাঁহার রচনার কি পরিণাম ঘটিত? তাঁহার পরিণত রচনা যাহা বর্তমান তাহার অধিকাংশই নিছক সৌন্দর্যভোগস্পৃহা হইতে সঞ্জাত। তাঁহার কাব্যবিচারও

সমালোচনার বেনামিতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহার উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনাও ভাষার মধ্যে পাথরের সৌন্দর্যকে ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কি!

কিন্তু, এই 'কীট্সীয়' সৌন্দর্যভোগস্পৃহাতে আর যেন তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না, তাঁহার সৌন্দর্যভোগের মনোবৃত্তিতে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরিয়া উঠিতেছিল— এবং এই ফাটলের অবকাশে জীবনের বৃহত্তর কর্মজীবনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার একটা অব্যক্ত আকুতি যেন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে বাণিজ্য-ব্যাপারে ও স্বদেশীভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আর, তিনি জীবনের শেষভাগে আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কার্যপ্রণালীর সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাবে যান। এখন, এই সব প্রচেষ্টার মূলে কোন্ মনোভাব সক্রিয় ছিল? বলেন্দ্রনাথ কর্মী ছিলেন না, কর্ম তাঁহার প্রতিভার ও চরিত্রের স্বাভাবিক বাহন ছিল না—তবে এই কর্মোদ্যোগ কেন? আত্মজীবন-কেন্দ্রী মোহময় সৌন্দর্যলোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল— এই মোহজগৎ হইতে কর্মজগতে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাঁহার এই সব কর্মোদ্যোগে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবিত থাকিলে, একদিন এই বাহ্য কর্মানুষ্ঠানও তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। তিনি কর্মের বাহ্য জগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবীনতর উৎসাহে আবার সাহিত্য-লোকে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু সে সাহিত্য কোন্ শ্রেণীর? নিশ্চয় তাহা আর পূর্বতন নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির সাহিত্যলোক নয়। খুব সম্ভবতঃ তিনি কাহিনীরচনার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন— যাহার অল্পবিস্তর সূত্রপাত আছে 'চন্দ্রপুরের হাট' এবং 'পুলের ধারে' প্রভৃতি রচনায়। গল্প উপন্যাস ও কাহিনী যতই সৌন্দর্যময় হোক-না কেন তাহাদের আত্মকেন্দ্রী সৌন্দর্য বলা চলে না। যেহেতু একবার গল্পের সূত্র ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেই লেখক নিজের জীবন হইতে বাহির হইয়া সংসারের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গল্পের নায়ক-নায়িকা ও ঘটনাপ্রবাহ লেখককে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে টানিয়া লইয়া চলে। তাহাদের জীবনের দাবির নিকটে লেখকের ব্যক্তিগত দাবি ও অভিরুচিকে খর্ব করিতে হয়। আত্মতন্ত্র সেখানে পরতন্ত্রের নিকটে নতমস্তক। গল্প-উপন্যাসের কর্মজগৎ পরোক্ষে বৃহত্তর জীবনের কর্মজগৎ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস বলেন্দ্রনাথ জীবনপরিণাম ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে কাহিনীরচনার কর্মজগতে প্রবেশ করিয়া স্বস্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিতেন এবং তাঁহার হস্তক্ষেপে বাংলার উপন্যাসসাহিত্য নূতন সার্থকতা লাভ করিত।

কিন্তু কি হইতে পারিত, নূতন কোন্ ঐশ্বর্য লাভ করিত তাঁহার রচনা, ইহাতেই তাঁহার সমালোচনা পর্যবসিত হইলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। যে-সব রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও প্রতিভার চিহ্ন আছে তাহাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রধান ঐশ্বর্য তাঁহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা। ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাহিরে বড় একটা চোখে পড়ে না। শব্দাঢ্য, বর্ণাঢ্য, অলংকৃত, উপমাবহুল ভাষার কি চতুরঙ্গ ঐশ্বর্য। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা ভাব-প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। ভাবের তল্পি বহিয়া পীড়িত ও নিঃস্ব ভাষা তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র। তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বলেন্দ্রনাথের

ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিবিভূষিত, নানাচিত্রাদি-সুশোভিত কারুকার্যের-মহিমায়-উজ্জ্বল শিবিকার মতো। আর সেই শিবিকার বাহকদেরই বা কি সাবলীল গতি। সৌকর্য্যও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তো অনবদ্যরূপা, কিন্তু তাহার শিবিকাখানিও তুচ্ছ নয়। শিবিকার তিরস্করণীর অন্তরালবর্তিনীর মূর্তি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়।—

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির, শৈবালাচ্ছন্ন জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন কক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন, যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত।

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কতলোকে কতদিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে, হে দেবতা রক্ষা করো, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্ত হৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন করো; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়।

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশব্দ বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে। কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মতো বোধ হয়।

বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতোই। কণারকের মন্দিরের মতোই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতোই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ্য মদনোৎসবের অভ্যন্তরে যেমন সুকঠিন বৈরাগ্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের লীলাস্থল, শিল্পের ইন্দ্রিয়বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য'র বাহিরে আর এমন ভাষা অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মতো নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত। ভাষার এমন ছন্দঃস্পন্দ, এমন স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমা বাংলা সাহিত্য হইতে যেন লোপ পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান যেন অনেক পরিমাণে ইতর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাভাষা যে ইতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর 'প্রেমিকের দৃষ্টি' নাই, নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভাষাকে দেখিয়া থাকেন। এখন বাংলা ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে, নমনীয়তাও কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয় তাহা কি লোপ পায় নাই? ভাষার সে রাজকীয়তা আর নাই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম. এল. এ-র স্তরে, বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। হয়তো কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও গিয়াছে। বহুজনের আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; তাহাতে পুরাতন ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের কিছু সংকোচ অপরিহার্য। বলেন্দ্রনাথের ভাষার 'রাজবদুন্নতধ্বনি' ছন্দঃস্পন্দকে বর্তমানের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ স্বভাবতই কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। বলেন্দ্রনাথের ভাষার সেই ধ্বনি আর ফিরিবে না, কিন্তু লোপও পাইবে না। কণারকের মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না সত্য—কিন্তু সে ভগ্নাবশেষ যে অবলুপ্ত হইবে এমন সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বালুশয্যা অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভাসৌন্দর্য দেখিতে যাইবে; বলেন্দ্রনাথের ভাষার ঐশ্বর্যভোগ করিবারও লোকের অভাব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার ভাষা কণারকের মন্দিরের মতোই নিঃসঙ্গমহিম এবং প্রাচীন আড়ম্বরের লীলাস্থল। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিলে নূতন কি সম্পদের সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাহা ব্যর্থ জল্পনার অন্তর্গত, কিন্তু ভাষার মহিমার জন্যই যে তিনি বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার বহুতর রচনার বালুশয্যা পার হইয়া ভাষার কণারক দেখিতে খুব বেশি লোকের যাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কষ্টসংকল্পী যে রসিকেরা একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

[রবীন্দ্রনাথের যৌবনে তাঁহার উৎসাহচ্ছায়ায় ঠাকুর-পরিবারের যে-সকল তরুণ কবি শিল্পী সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। কিশোর বয়স হইতেই বলেন্দ্রের সাহিত্যক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বকীয় প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছিলেন— এমন সময় তরুণ বয়সেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সঙ্গী, ভ্রমণে অনুবর্তী, নানা মঙ্গলানুষ্ঠানে সহকর্মী। শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত যে কয়টি চিঠি নিম্নে প্রকাশিত হইল তাহা হইতেও এই সহযোগিতার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; 'ছিন্নপত্রে'র ইতস্ততও তাহার চিহ্ন বিক্ষিপ্ত আছে। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে তাঁহার রচনাকুণ্ঠ সুহৃৎ প্রিয়নাথ সেন ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ "বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা" কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া, একটি রচনা নিজে সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় মন্তব্য-সহ প্রকাশ করেন; উক্ত মন্তব্যাংশও নিম্নে উদ্‌ধৃত হইতেছে]

"পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ প্রদীপে তাঁহার একটি লেখা দিবেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার অবসর ছিল না। নিজের বিষয়কার্য্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহা সত্বেও পঞ্জাবী আর্য্য সমাজের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের জন্য তিনি দিনরাত সচিন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য মনে লইয়া তিনি গত বৎসর মাঘ মাসের শেষে পঞ্জাবে যাত্রা করেন। পথকষ্টে অনিয়ম ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বল দেহে কঠিন রোগের সূত্রপাত হয় কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কিছু দিনের জন্য রোগযন্ত্রণার উপশম হইবামাত্র শিলাইদহ পল্লীভবনে বসিয়া তিনি প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লেখা কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, শেষ করিতে পারেন নাই। নিষ্ঠুর পীড়ার আক্রমণে দ্বিতীয়বার শয্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার পৃথিবীর সমুদয় কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তরুণ বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

"বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহদাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিলাম।

"'প্রদীপের' জন্য তিনি যথাক্রমে তিনটি প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনটিই অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধটি রবিবর্মার চিত্রকলা সম্বন্ধে। যতটুকু লিখিয়াছেন এস্থলে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।"

"আর একটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, লাহোরের বর্ণনা, তাহার কয়েকছত্র মাত্র লেখা আছে।"

"ইহা ছাড়া লেখক লাহোর চিত্রের যে সূচনাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।"

"রবিবর্মার চিত্রশিল্প ও লাহোরের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যে প্রবন্ধটি তিনি প্রদীপের জন্য লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহাকেই কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণ করিয়া শিবসুন্দর নাম দিয়া পরে প্রকাশ করা গেল।

"এই স্থলে লেখকের তরুণ বয়সে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

বলু

তোমার রত্নাবলী বেশ হয়েচে— একটু আধ্‌টু সংশোধন করে দিলুম। ঋতির "অভিমান" কবিতাটা আমি ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না— সপ্তস্বর কবিতাটি সবচেয়ে ভাল হয়েচে। এইটে পৌষমাসে দিলে ভাল হয়। সন্ধ্যার পথিকটিও ভাল। তারপরে order of merit অনুসারে লিখ্‌তে গেলে রামমোহন রায়, চিত্রদর্শনে, যৌবন, ব্যাকুলতা, মালাগাঁথি, অভিমান। অভিমানটা সবশেষে পড়ে। শেষ দুটি ছাড়া অন্যগুলি বেশ ভাল হয়েচে। আমার য়ুরোপের ডায়ারি পাঠালুম। এই লেখাগুলোর হেডিংয়ের নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ("য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি") সাব্‌হেডিং বসিয়ে দিয়ো। "যক্ষি" নাম দেওয়াটা সঙ্গত হয় না তাহলে পাঠক শেষ পর্য্যন্ত পড়বার পূর্ব্বেই গল্পটা কতক বুঝ্‌তে পারবে। বরং "বিষয় দান" কিম্বা "সম্পত্তি সমর্পণ" নাম দেওয়া ভাল। সেই গল্পটাই পৌষ সংখ্যায় দিয়ো।— এবারকার গল্পটা বড় মস্ত হয়েচে— তার নাম "স্বর্ণমৃগ" কিম্বা "মরীচিকা" দেওয়া যেতে পারে। পৌষমাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্যে বাঙ্গলা কাগজ পাঠিয়ো।

যদি সাধনা ছাপার ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার সুবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদের এখানে এলে আমি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি। আমার এখান থেকে ফেরবার বিলম্ব আছে— আবার পথের মধ্যে সাহজাদপুর হয়ে যেতে হবে। এখন এখানকার বাতাসও বেশ।

রবিকাকা

আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, কার্ত্তিকমাসের "সাহিত্য" পত্রিকার সমালোচনা, প্রাচ্যসমাজ, পৌষমাসের জন্য সাময়িক সারসংগ্রহ— এ সবগুলো পাওনি ?

ওঁ

বলু—

তোমাকে আজকের রেজেষ্ট্রি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্চে আগে তার একটা নম্বরওয়ারি ফর্দ্দ দিই পরে তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখ্‌ব।—

১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প)

২। সমস্যা-পূরণ। (ঐ)

৩। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।—

৪। জাহাজের কাহিনী। (ডায়ারি)—

৫। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ। (লোকেনের পত্র)—

৬। মানব প্রকাশ।— (তদুত্তর)।

৭। স্বরবর্ণ "এ"।

৮। দুর্ব্বোধ বৈষ্ণব পদাবলী।

৯। গোবিন্দ দাস।

১০। পঁহু সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর পত্র।—

প্রথম কথা হচ্চে— এবারে ১৩ আশ্বিন পূজার দিন, অতএব ভাদ্র আশ্বিন মাসের কাগজ একসঙ্গে বের করা উচিত। দুটো কাগজ আলাদা না করে একসঙ্গে করবার গোটাকতক সুবিধা আছে— প্রথমতঃ মলাট এবং দপ্তরী খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখা একত্র থাকাতে বেশ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তৃতীয়তঃ বড় কাগজখানা হাতে এলে লাগে ভাল, চতুর্থতঃ বড় বড় লেখাগুলো একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়— অতএব এই বেলা থেকে তৎপ্রতি মন দিয়ো।—

প্রথম দুটো গল্প তোমার কাছে রেখে দিয়ো ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।

নম্বর তিন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে নব্যভারত এ পর্য্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।

নম্বর চার লেখাটা ভাদ্র আশ্বিন একেবারে দু-মাসের মত।

নম্বর ৫, পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপ্‌তে হবে। আর কপি কর্ত্তে পারিনে।—

নম্বর ছয়— ভাদ্রমাসের। ওটা এইবেলা ছাপিয়ে একটা প্রুফ লোকেনের কাছে পাঠাতে হবে, সে সেইটে দেখে তার শেষ উত্তর লিখ্‌লে তবে সেইটে আবার ঐ ভাদ্র আশ্বিনের কাগজে ছাপা হবে।—

নম্বর ৭— শ্রাবণে দেবে কি ভাদ্রে দেবে সুবিধে বুঝে তোমরা স্থির কোরো।—

নম্বর ৮, ভাদ্রমাসে দিলেই হবে।—

নম্বর ৯। অঘোরকে অবিলম্বে পত্র লিখো তার সমস্ত প্রবন্ধটা শেষ করে পাঠাতে। তা হলে ভাদ্র আশ্বিনের সংখ্যায় একবারেই বের করতে পারবে।

নম্বর দশ। এই লেখাটা ক্ষীরোদবাবু সাহিত্যে পাঠিয়েছিলেন— সাহিত্য সম্পাদক, এটা সাধনাতেই ছাপা হওয়া উচিত বিবেচনা করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন— যদি জায়গা থাকে তাহলে এটা শ্রাবণমাসে

যাওয়া আবশ্যক— নতুবা লেখকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভাদ্রমাসে দিলেও চল্‌বে। যদি ওটা ভাদ্রমাসে যায় তাহলে নম্বর আটটা শ্রাবণমাসে দিয়ো— একসঙ্গে দুটো তিনটে বৈষ্ণবীকীর্ত্তন যাওয়া কিছু নয়।—

ভাদ্রমাসের কাগজটা বোধ করি অক্সফোর্ড অথবা অন্য কোন প্রেসে দেওয়া আবশ্যক হবে, নইলে ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ সমাজ থেকে বের করা অসাধ্য হবে। এ বিষয়ে তোমরা পরামর্শ করে যথাকর্ত্তব্য স্থির কোরো, দ্বিধায় পড়ে কালবিলম্ব কোরো না। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ একসঙ্গে বের না করলে ভারি মুস্কিলে পড়বে। কারণ পূজোর ছুটির সময় অনেক গ্রাহকেরই ঠিকানা পরিবর্ত্তন হবে পনেরই ভাদ্রে আশ্বিনের কাগজ পাঠালে নিশ্চয়ই তারা নিজ নিজ স্থানেই পাবে। কিন্তু ওদিকে আবার ১৩ আশ্বিন থেকে ১৩ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সমাজ বন্ধ থাকবে, অতএব কার্ত্তিকমাসের কাগজটাও খুব সম্ভব Oxford Mission Pressএ ছাপ্‌তে হবে। সেখানে তা হলে এইবেলা খবর নিয়ো তাদের ছুটির নিয়ম কি রকম ?

ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, আমার কোন্ দুটো গল্প দেবে ? "ছুটি" এবং "স্বর্ণমৃগ" দিয়ো।—

শনিবার দিন তুমি আমার এই চিঠি পাবে যদি সেইদিন কিম্বা রবিবার দিন জবাব দাও তাহলে আমি এখানেই পাব— নইলে শিলাইদহের ঠিকানায় দিয়ো।

রবিকাকা

[১২৯৯]

ওঁ

বলু

তুমি যে একখানা দো-আঁসলা কাগজ পাঠিয়েছ ওটা অতি অপাঠ্য এবং অপদার্থ। ওর কোন সমালোচনা বা উল্লেখমাত্র করা আবশ্যক দেখিনে। ও ত প্রতিবারেই খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করতে থাকবে ওটাকে ঘরে টেনে এনে লগুড়াঘাত করার চেয়ে ঘরে ঢুকতে না দেওয়াই ভাল। আমি তোমাদের পরামর্শ দিই, এ রকম সব কাগজে পত্রে যে যাই বলুক্ কিছুই কানে এনো না। একেবারে পোড়োই না। এ রকম সব সমালোচনা পড়লে মন অনর্থক উত্তেজিত হয়ে ওঠে তিলমাত্র ভাল ফল হয় না। দৃঢ়সংকল্প পূর্ব্বক ধৈর্য্য রক্ষা করে শান্ত অবিচলিত চিত্তে আপনার কাজ করে যাও— কারো আঘাত গ্রহণ কোরো না কাউকে আঘাত দেবার চেষ্টা কোরো না। এ সব জিনিষ কখনো থাকে না, এবং থাক্‌লেও বিশেষ কোন ফল হয় না— কিন্তু এদের সঙ্গে যদি রীতিমত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায় তা হলেই এরা কৃষ্ণ বিষ্ণু হয়ে দাঁড়ায়। আমি তোমার লেখাটা এখানকার মুন্সী মারফৎ পাঠিয়েছি আজ এতক্ষণে পেয়েছ— সেইটে সংশোধন করে খানিকটে বাড়িয়ে নিয়ো তা হলেই এবারকার সাধনার অবশিষ্ট স্থান পূরে যাবে।

রবিকাকা

শাম্বপূজা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাম্ব ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পাঞ্চরাত্র-ভাগবত ধর্মে তিনি যে এক সময়ে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তাঁহার চারিজন আত্মীয়ের মত সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্চরাত্র উপাসকগণের দ্বারা তাঁহার পূজার কাল সুদূর অতীতের কাহিনী। প্রাচীন শিলালিপি ও পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত তাঁহার পূজা যে উত্তর ভারতের অংশবিশেষে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অল্প পরেই দিতেছি। কিন্তু ইহা একরূপ সুনিশ্চিত যে পাঞ্চরাত্রিন্‌দের মধ্যে তাঁহার পূজা গুপ্তযুগেই কিংবা তাহার অব্যবহিত পরেই ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে এবং কয়েকটা পুরাণে তাহার নামের সঙ্গে এমন কতকগুলি কুৎসা সংযুক্ত করা হয়, যাহা তাঁহার দেবত্বের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া উঠে। বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র স্ত্রী তাঁহাদের এই সপত্নীপুত্রের রূপে আকৃষ্ট হন এবং শাম্বও নাকি প্রকারান্তরে তাঁহাদের এই অত্যন্ত নিন্দার্হ আচরণের প্রশ্রয় দেন। নারদ এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, বাসুদেব পুত্রকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইতে অভিশাপ দেন। মহাভারতের অংশবিশেষেও শাম্বের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার উল্লেখ আছে। শাম্ব যে মদ্যপায়ী ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, একথার উল্লেখ আমরা মুষলপর্বে পাই। উক্ত পর্বের প্রধান বিষয়বস্তু শাম্বকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। যদুবংশ ধ্বংসের বৃত্তান্ত ঐ পর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে শাম্বই মূল অপরাধী। তিনিই স্ত্রীবেশ ধরিয়া দুর্বাসাকে প্রবঞ্চনা করেন এবং ক্রোধনস্বভাব ঋষির অভিশাপের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস হইয়া যায়। অবশ্য শাম্ব এবিষয়ে প্রধান অপরাধী হইলেও অন্যান্য অনেক যদুবীর তাঁহার সাহায্যকারী ও প্রশ্রয়দাতা ছিলেন।

কিন্তু শাম্বের চরিত্রে কলঙ্ক-আরোপকারী মহাভারত ও পুরাণাদির এই সকল কাহিনী যে গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের রচনা সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। কারণ প্রাক্-গুপ্তযুগের শিলালিপি ও গুপ্তযুগের প্রথমদিকে রচিত দু-একটি পুরাণ হইতে ইহা নিশ্চিতরূপ প্রমাণ করা যায় যে ভাগবতধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে শাম্বের সম্মান ও পূজা আদৌ উপেক্ষার বস্তু ছিল না। তাঁহার পিতা বাসুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়ের মত তিনিও পাঞ্চরাত্র উপাসকদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মথুরার শক মহাক্ষত্রপ স্বামী ষোডাশের সময়ে উৎকীর্ণ একটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি মথুরার নিকটবর্তী মোরা নামক গ্রামের একটী কূপ-মধ্যে বহুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শিলালেখটী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া না গেলেও ইহার যে অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে তাহা হইতে শাম্বপূজা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। ষোডাশ শক মহাক্ষত্রপ রজুল বা রজুবুলের পুত্র, এবং তাঁহার অবস্থানকাল আনুমানিক খৃস্টপূর্ব বা খৃস্টীয় প্রথম শতক। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার *Archaeology and Vaishnava Tradition* নামক বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তির আদিম ইতিহাস বিষয়ে বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থে এই লেখটীর অংশ-

বিশেষের যে পাঠোদ্ধার করেন তাহা এইরূপ : (১) মহাক্ষত্রপস রজুবুলস পুত্র...... (২) ভগবতো বৃষ্ণেঃ পঞ্চবীরাণাং প্রতিমা......। তিনি দ্বিতীয় পংক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ইহাতে আমরা ভগবান্ বৃষ্ণির অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের এবং পঞ্চবীরের অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমার উল্লেখ পাই। প্রাচীন ভারতীয় লিপিতত্ত্বে পারদর্শী জার্মান পণ্ডিত ল্যুডার্স্ কিন্তু চন্দ মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ এবং তাৎপর্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করেন। তিনি এই বহু পুরাতন শিলালেখের সমস্তটীর নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করেন :

(১) —মহক্ষত্রপস রজুবুলস পুত্রস স্বামী.........

(২) ভগবতাং বৃষ্ণীনাং পঞ্চবীরাণাং প্রতিমাঃ শৈলদেবগৃ.........

(৩) যস্তোষায়াঃ শৈলং শ্রীমদগৃহমতুলমুদধসমধার.........

(৪) আর্চাদেশাং শৈলং পঞ্চ জ্বলত ইব পরমবপুষা......

অনুবাদ :

(১) মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র স্বামী (ষোডাশের সময়কালে)

(২) বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান্ পঞ্চবীরগণের প্রতিমা...পাষাণ মন্দিরে

(৩) সে তোমার এই অতুলনীয় মহান্ মন্দির...

(৪) প্রোজ্জ্বল প্রস্তরে নির্মিত বিশিষ্ট সৌন্দর্য মণ্ডিত পাঁচটী ভক্তির পাত্র......

এই খণ্ডিত পাঠ ও অনুবাদের তাৎপর্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ইহা এই প্রকার : 'মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র স্বামী যোডাশের রাজত্বকালে তোষা নাম্নী কোনও মহিলার (সম্ভবতঃ শক জাতীয়া) অর্থে নির্মিত একটী বিচিত্র কারুকার্য খচিত প্রস্তর মন্দিরে বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান্ পঞ্চবীরগণের উজ্জ্বল প্রস্তর, হইতে উৎকীর্ণ পাঁচটী সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল'।

সমগ্র লিপিটির ল্যুডার্স প্রদত্ত পাঠই যে ঠিক সে বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ইহাতে পাঁচটি প্রতিমার কথাই বলা হইয়াছে—ছয়টির নহে। কিন্তু এই পাঁচজন বৃষ্ণিবীর—যাঁহাদের প্রতিমা তোষা কর্তৃক ভক্তি সহকারে পাষাণমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,— ইঁহারা কাহারা? ইঁহারা নিশ্চয় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব নহেন, কেননা তাঁহারা পাণ্ডব বা কৌরব, কিন্তু বৃষ্ণিবংশীয় নন। ল্যুডার্স জৈনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত য়্যাল্স্ডর্ফের নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, য়্যাল্স্ডর্ফ 'অন্তগড়-দসাও' 'ন্যায়াধম্মকহাও', 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র', 'হরিবংশ-পুরাণ' প্রভৃতি বিবিধ জৈনশাস্ত্র মন্থন করিয়া উত্তর করেন যে ঐসব গ্রন্থে লিখিত 'বলদেব পামোখ্খা-পঞ্চ-মহাবীর'গণই মোরা-শিলালেখের 'ভগবান্ পঞ্চ বৃষ্ণিবীর'। কিন্তু উক্ত জৈনগ্রন্থসমূহে বলদেবপ্রমুখ পঞ্চ মহাবীরের কথাই আছে—বলদেব ব্যতীত অন্য চারজন বৃষ্ণিবীরের নামের উল্লেখ নাই। তবে উক্ত জৈনশাস্ত্রসমূহে আরও যেসব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের কথা আছে তাহার একটা তুলনামূলক আলোচনা করিয়া য়্যাল্স্ডর্ফ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই বলদেবাদি পঞ্চ মহাবীর—বলদেব, অক্রুর, অনাধৃষ্টি, সারণ ও বিদূরথ, এবং মোরা লিপিতে ইঁহাদের প্রতিমার প্রতিষ্ঠার কথাই উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৎপ্রণীত *Development of Hindu Iconography* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি এই মীমাংসাই স্বীকার করি, তবে তখনও আমার মনে ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল এবং আমি ইহাকে সাময়িক মীমাংসা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। আমার সন্দেহের

কারণ ছিল এই যে বস্তুতঃ য়্যাল্স্ডর্ফ-কথিত জৈন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ মহাবীরগণের মধ্যে এক বলদেব ব্যতীত অপরগুলির মধ্যে কেহই বিখ্যাত যাদব নহেন। বলদেব বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র এবং পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণের পরেই তাঁহার স্থান; কিন্তু বৃষ্ণিবংশের অপ্রসিদ্ধ কয়েকটী ব্যক্তি যথা শ্বফল্ক, শূর ও ভজমানের পুত্রত্রয় যথাক্রমে অক্রূর, অনাধৃষ্টি ও বিদূরথের সেযুগে এমন কি সম্মান ছিল যে বিদেশিনী মহিলা তোষার ভাগবত মন্দিরে বলদেবের মূর্তির সহিত তাঁহাদের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছিল? সারণ বলদেবের সহোদর হইলেও পাঞ্চরাত্র গ্রন্থাদিতে ও হরিবংশে আদৌ প্রসিদ্ধ নন। এসম্বন্ধে আরও দু-একটী কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে ভাগবদ্ধর্ম সংক্রান্ত শিলালেখের দুর্বোধ্য অংশে আলোকপাত করিতে গেলে আমাদের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্য লওয়াই প্রশস্ততর। উপরোক্ত জৈনগ্রন্থাদিতে পঞ্চবৃষ্ণিবীরগণের মধ্যে বলদেবের কথা বলা হইলেও এ প্রসঙ্গে অক্রূরাদি আর চারিজনের কথা কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পঞ্চবৃষ্ণিবীরের বাকী চারিজন বলিয়া লিখিত নাই। এই সকল যুক্তি হইতে আমাদের মনে কোনও দ্বিধা থাকিতে পারে না যে ল্যুডার্স সমর্থিত য়্যাল্স্ডর্ফের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জার্মাণ পণ্ডিতদ্বয়ের ভ্রমের কারণ তাঁহারা এই বিষয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু পুরাণাদি গ্রন্থের সাহায্য না লইয়া জৈনগ্রন্থের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণ যে একটী প্রাচীনতম পুরাণ সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। ইহার ৯৭ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক কয়টী আমাদের সমস্যার উপর সঠিক আলোকপাত করে। সমবেত ঋষিগণকে সূত বলিতেছেন—

মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্ত্যমানান্ নিবোধত।
সংকর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নঃ শাম্ব এব চ।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

অর্থাৎ 'যেসব দেবতা আগে মনুষ্য ছিলেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের কথা বলিতেছি শুনুন। সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ এই পাঁচজনই বংশবীর রূপে কীর্তিত আছেন।' বলা বাহুল্য যে এই বংশ বৃষ্ণিবংশ এবং ইঁহারাই পঞ্চ বৃষ্ণিবীর—যাঁহাদের মূর্তির কথা মোরা-লিপিতে লিখিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণের এই শ্লোক কয়টী পরোক্ষভাবে জৈনগ্রন্থাদির 'বলদেব প্রমুখ পঞ্চ মহাবীরের কথারই উল্লেখ করিতেছে। জৈনগ্রন্থে বলদেব ব্যতীত আর কাহারও নাম নাই এবং তাঁহার নাম আদিতে রহিয়াছে; বায়ুপুরাণেও সংকর্ষণের (বলদেবের আর এক নাম) নাম সর্বপ্রথম, অধিকন্তু অপর চারিজনের নামও লিখিত রহিয়াছে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে পুরাণোক্ত বৃষ্ণিবীরগণের ক্রম বংশের পর্যায় অনুযায়ী সঠিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সংকর্ষণ-বলদেব বাসুদেব-কৃষ্ণের অগ্রজ, কাজেই তিনি সকলের আগে, তাঁর পর বাসুদেব, ইঁহার পর বাসুদেবের দুই পুত্র—প্রথমটী তাঁর প্রধানা পত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র প্রদ্যুম্ন (ইঁহার অপর পরিচয় মন্মথ বা কামদেব) এবং দ্বিতীয়টী কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র শাম্ব; সর্বশেষে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের স্থান। বায়ুপুরাণের এই উক্তি হইতে মোরা-শিলালিপিতে বর্ণিত পঞ্চ বৃষ্ণিবীরগণের সঠিক পরিচয়

পাইলাম এবং মোরা লিপি হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গেল যে বলদেব বাসুদেবাদির সহিত শাম্বও ভাগবতদিগের নিকট খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তাহার পূর্ব হইতে ভক্তি ও পূজার পাত্র ছিলেন।

শাম্বের পূজা যে ইহার পরেও প্রচলিত ছিল তাহার নির্দেশ পুরাণ, বৃহৎসংহিতা আদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের কথা এইমাত্র আলোচিত হইল। সেখানে স্পষ্টই লিখিত আছে যে তিনি সংকর্ষণ বাসুদেবাদির ন্যায় মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৃষ্ণি-বংশের বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহার সম্যক্ অনুশীলন করিলে আমরা শাম্বসমেত এই পাঁচজন বৃষ্ণিবীরেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই; ইঁহারা সাধারণ মানুষ হইলেও তাঁহাদের মৃত্যুর পর দেবত্ব প্রাপ্ত হন এবং ভাগবত-বৈষ্ণবদিগের প্রধান পূজার পাত্র হইয়া পড়েন। বিশ্বভারতী পত্রিকায় মল্লিখিত 'প্রাচীন বঙ্গের বৈষ্ণব মূর্তি' প্রবন্ধে আমি পাঞ্চরাত্র ব্যূহবাদের পরিচয় দিয়াছি। প্রধান ব্যূহ চারিটী, যথা বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; ইঁহাদের মধ্যে শাম্বের স্থান নাই। আমার মনে হয় মনুষ্য প্রকৃতি পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের পূজা পাঞ্চরাত্র ধর্মে ব্যূহবাদের সুষ্ঠু বিকাশের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং উক্ত মতবাদের প্রাধান্যের ও সম্যক্ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। শাম্বকে বাদ দিয়া আর চারিটী বৃষ্ণিবীরই প্রধান চতুর্ব্যূহরূপে পরিগণিত হন, স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যূহরূপে ইঁহাদের ক্রম—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—সংকর্ষণ, বাসুদেব ইত্যাদি নহে। বৃষ্ণিবীর প্রসঙ্গে ইঁহাদের মনুষ্যপ্রকৃতির প্রাধান্যই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ব্যূহ পর্য্যায়ে তাঁহাদের দেব-প্রকৃতিই আপেক্ষিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। মতবাদের পরিণত বিকাশের সময়ে শাম্বকে কি কারণে যে ক্রমশঃ বাদ দেওয়া হইল, উহা পাঞ্চরাত্র—বৈষ্ণব ধর্মের এক রহস্য। অথচ ইহা ঠিক যে প্রাক্ গুপ্তযুগে এবং বোধ হয় গুপ্তযুগের গোড়ার দিকেও ইঁহার পূজা উত্তর ভারতের কোনও কোনও অংশে অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে পূর্বে প্রদত্ত প্রমাণ ছাড়াও আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা (আনুমানিক রচনা কাল খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ) গ্রন্থের ৫৭শ অধ্যায়ে শাম্বের মূর্তি কিরূপে নির্মিত হইবে তাহার বর্ণনা আছে[১]। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের (ইহাও গুপ্তযুগের রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে) তৃতীয় খণ্ডের ৮৫তম অধ্যায়ের শেষ দিককার শ্লোকগুলিতে ভাগবত ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহ বর্ণন প্রসঙ্গে শাম্বও গদাহস্ত এবং কমনীয়কান্তিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (শাম্বঃ কার্যে গদাহস্তঃ সুরূপশ্চ বিশেষতঃ)[২]। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। শাম্বের মূর্তির বিষয় এই সকল গ্রন্থে জানা গেলেও পরবর্তী কালে রচিত মূর্তিশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ ইহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই তথ্যটীও শাম্বপূজার ক্রমিক বিলোপের কথাই প্রমাণ করিতেছে।

১। প্রতিমালক্ষণ নামক এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটী দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই অল্প কয়েকটী বিগ্রহ বর্ণনার মধ্যে শাম্বের এবং এমনকি তাঁর স্ত্রীরও প্রতিমার কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু (বাসুদেব), বলদেব ও একানংশা (বাসুদেব ও বলদেবের ভগিনী) মূর্তি নিচয়ের বিশদ বর্ণনার পর, গ্রন্থকার নিম্নলিখিত শ্লোকে শাম্ব ও প্রদ্যুম্নের এবং তাঁহাদের উভয়ের স্ত্রীর মূর্তি এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন: শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ। অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ চ কার্যে খেটক নিস্ত্রিংশধারিণ্যৌ॥

২। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে অক্রুর, অনাধৃষ্টি, সারণ ও বিদুরথের মূর্তি বর্ণনা এজাতীয় কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাতেই মনে হয় তাঁহাদের মূর্তি পূজার জন্য নির্মিত হইত না।

এখন দেখা যাউক অধুনা আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন মূর্তিনিচয়ের মধ্যে শাম্বের মূর্তি চিহ্নিত করা যায় কিনা। মোরা-শিলালিপি এবং বৃহৎসংহিতা ও বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক প্রাচীন গ্রন্থ শাম্বের বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিলেও এপর্যন্ত এমন কোনও প্রতিমা আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ শাম্বের বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় মথুরা প্রদেশে প্রাপ্ত খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লাল বেলেপাথরে নির্মিত কয়েকটী মূর্তি শাম্বের হইলেও হইতে পারে। প্রথমে মোরা গ্রামে প্রাপ্ত দুটী ভাঙা মূর্তির কথাই ধরা যাক্। এগুলি এখন মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে এবং ইহাদের মিউজিয়ম নম্বর E 21 এবং E 22; ল্যুডার্‌স্ অনুমান করিয়াছিলেন যে এগুলি মোরা-শিলালিপিতে বর্ণিত পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের প্রতিমার অন্যতম দুটী। ইহাদের তক্ষণকৌশল অনবদ্য এবং ইহারা যে দেবমূর্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তাহাদের অলংকারাদি এবং অপর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উহাদের মাথা, পা ও হাত ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই যে উহাদের মধ্যে কোনটি শাম্বের ছিল কিনা। অন্তত, হাত দুটী এবং হস্তে ধৃত আয়ুধ অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেলে আমরা ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারিতাম। কিন্তু মথুরার আরও এক জাতীয় মূর্তির মধ্যে আমরা বোধ হয় শাম্বের মূর্তি চিনিয়া লইতে পারি। এগুলি খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর 'আসন' মূর্তি; ইহাদের কয়েকটী চতুরশ্ববাহিত রথে আসীন বলিয়া মনে হয়, হাত দুটীতে পদ্মকোরক (?) ন্যস্ত এবং ইহাদের বেশ বৈদেশিক (উদীচ্য বেশ—সমস্ত শরীর লম্বা জ[illegible] দিয়া ঢাকা এবং পদদ্বয় উপানৎপিনদ্ধ)। সবগুলিতেই যে রথ কিংবা অশ্ব চারটী দেখা যায় তাহা নহে এ[illegible] যেখানে এগুলি অস্পষ্ট বা অদৃশ্য, সেখানে হাতে পদ্মকোরকের পরিবর্তে দণ্ড ও খড়্গ দেখা যায়। এই [illegible]রণে এ মূর্তিগুলির সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এগুলি সূর্যে[illegible]র প্রতিমা, আবার কেহ কেহ এগুলিকে কোনও কুষাণরাজের প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমান করেন। ইহা[illegible] দুইটী বিভাগের কথা এখনই বলা হইয়াছে—প্রথমটী সূর্যের হওয়াই সম্ভব।[৩] কিন্তু দণ্ড ও গদাপা[illegible] বিগ্রহগুলি জনৈক কুষাণরাজের না হইয়া শাম্বের হইতে পারে। এই জাতীয় একটী মূর্তি যে শাম্বের [illegible] বিষয়ে আমি একপ্রকার নিঃসন্দেহ। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁহার *History of Indian and Indon[illegible]an Art*এর ৬৮ পৃষ্ঠায় ইহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—'মূর্তিটীর দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হ[illegible] একটী পানপাত্র; ইহার বেশ ভারতীয় এবং দেহের উপরিভাগ অনাবৃত; ইহার দুই পার্শ্বে দুটী নারীমূর্তি[illegible] কুমারস্বামী ইহাকে স্ফূর্তিবাজ যক্ষের (Bacchanalian Yaksa) মূর্তি বলিয়াছেন; ইহার হস্তস্থিত [illegible]পাত্রটী ও সঙ্গিনী নারীমূর্তিদ্বয় তাঁহাকে ইহার এইরূপ পরিচয় দানে প্রলুব্ধ করিয়াছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃ[illegible] বৃহৎসংহিতা ও বিষ্ণুধর্মোত্তরের শাম্বরূপ বর্ণনার সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে; শাম্বও গদাহস্ত—ই[illegible] ও তদ্রূপ। অপর হাতের পানপাত্র, মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত শাম্বের পানাসক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে[illegible]। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলা যায় যে এক বাসুদেব ব্যতীত অন্য প্রধান কয়েকজন যদুবীরও এই দোষে দুষ্ট ছিলেন। সংকর্ষণ (বলদেব) ও প্রদ্যুম্ন উভয়ের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য, কারণ সংকর্ষণ তালধ্বজ ও

---

[৩]। সূর্য দেবতার এরূপ উদীচ্যবেশ পরিহিত প্রতিমা নির্মাণের কারণ আমি বহু পূর্বে *Indian Antiquary* (1925) পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'The Representation of Surya in early Brahmanical Art' নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

'মত্তবিবৃতেক্ষণ' অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি মদির ও বিবৃত এবং তাঁরও এক হাতে পানপাত্র; প্রদ্যুম্নের ধনু ইক্ষুদণ্ড নির্মিত, বিকল্পে পুষ্পধনু হইলেও যেহেতু তিনি কামদেব, সেজন্য তাঁহার সঙ্গিনী রতি ও তৃষা। মহাভারতে (আদিপর্ব, ২১৯,৯) শাম্ব ও প্রদ্যুম্নের এই দৌর্বল্যের বিষয় নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

'রৌক্মিণেয়শ্চ শাম্বশ্চ ক্ষীবৌ সমরদুর্মদৌ। দিব্যমাল্যাম্বরধরৌ বিজহ্রাতে মরাবিব'

অর্থাৎ যুদ্ধে দুর্মদ রুক্মিণীর পুত্র (প্রদ্যুম্ন) এবং শাম্ব মধুপানোন্মত্ত অবস্থায় দিব্য মাল্য বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া দেবতাদ্বয়ের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। এই সকল কারণে আমার মনে হয় মথুরায় প্রাপ্ত উপরে বর্ণিত মূর্তিটি ও উহার অনুরূপ বিগ্রহ শাম্বেরই বিগ্রহ। হলপাণি ও পানপাত্রহস্ত সংকর্ষণের মূর্তিও যেরূপ পাঞ্চরাত্রদিগের পূজার প্রতীক ছিল গদা ও পানপাত্রহস্ত শাম্বের মূর্তিও তদ্রূপ ছিল।

এখন প্রশ্ন এই প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণাদির পূজা পরবর্তী যুগের ভাগবত-বৈষ্ণব ধর্মে সম্যক্ প্রচলিত থাকিলেও শাম্বপূজা উঠিয়া গেল কেন? ইহার উত্তর যদি এই দেওয়া যায় যে শাম্বচরিত্রের কতক-গুলি কলঙ্কের জন্যই (ইহার বিষয় প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে) তাঁহার পূজা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন উঠে যে, শাম্বের চরিত্রেই বা উক্তরূপ কলঙ্ক আরোপিত হইল কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি? আমার মনে হয় ভারত মহাকাব্যের শেষাংশের রচয়িতাগণ এবং বরাহাদি পুরাণের গ্রন্থকর্তারা—কিংবা তাঁহারা যাঁহাদের নিকট এই সকল কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারা—পঞ্চবীরগণের মধ্য হইতে এই সবের জন্য শাম্বকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন, কারণ শাম্ব বাসুদেবাত্মজ হইলেও তাঁহার মা ছিলেন ঋক্ষরাজ জাম্ববানের ভগিনী জাম্ববতী। মহাকাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে, রাক্ষস, বানর, ঋক্ষ (ভল্লুক) ইত্যাদি শব্দ ভারতের আদিম অনার্য জাতিকেই বুঝায়। সুতরাং কিংবদন্তী অনুসারে শাম্ব তাঁহার মাতার বংশের দিক হইতে অনার্য গোষ্ঠীর। এই অনার্য-সম্পর্ক বোধ হয় তাঁহাকে একশ্রেণীর আর্য ভাগবতদিগের নিকট প্রথম অপাংক্তেয় করে এবং পরে নানারূপ কলঙ্ক তাঁহার চরিত্রে আরোপিত হয়।

শাম্বচরিত্র এইভাবে মসীলিপ্ত হওয়ার ফলে তাঁহার পূজা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কিংবদন্তী তাঁহার নাম অপর দুইটী ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ফেলে। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাসুদেব কৃষ্ণ শিবের অনুগ্রহ বশতঃই জাম্ববতীর গর্ভে শাম্বকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। ভবিষ্য-বরাহাদি পুরাণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে শাম্বই প্রত্যক্ষভাবে সূর্যপূজার এক প্রকার বৈদেশিক পদ্ধতি শকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আনিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল কিংবদন্তীও বোধ হয় শাম্বের মূলতঃ অনার্য সম্পর্কের সূত্র ধরিয়াই তাঁহাকে আশ্রয় করে। পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শাম্বপূজার ক্রমশঃ অপ্রচলনের ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অনার্য দেবদেবী একপক্ষে যেমন হিন্দুধর্মের ভিতর নিজেদের যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছিল, তেমন অপর পক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অনার্যতার স্পর্শ ই বোধ হয় দেবসত্তা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলধর্মী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধব্য

শ্রীআর্যকুমার সেন

বহুবিবাহ প্রথার বিলোপসাধনে সাহায্য করিবার জন্য এই কাহিনীর অবতারণা করি নাই। কারণ, যতদূর জানি, কুলীনের বহুবিবাহ অপর কোনও কারণে না হৌক অর্থনৈতিক কারণে বহুকাল পূর্বেই অন্যান্য অনেক প্রাচীন প্রথার ন্যায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং পুনরুজ্জীবনের আপাততঃ কোনও আশা নাই। অতএব যাঁহারা রচনার মধ্যে লেখকের সমাজসংস্কারমূলক অভিসন্ধির অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা যে নিতান্তই নিরাশ হইবেন, সে কথা আগে হইতেই জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ছোট শহরের শহরতলি। পাড়াগাঁ বলিলে দোষ হয় না। নিতান্তই কেমন করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় ফলে বড় রাস্তায় গোটাকতক কেরোসিনের বাতি জ্বলে। ফলে অন্ধকারটা সোজাসুজি অন্ধকার না হইয়া রহস্যময়ভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে।

কয়েকটি ছোট পাকা বাড়ি, কিছু পরিমাণে খোড়ো ঘর, একটি পোস্ট অফিস এবং একটি পুলিশ থানা, এই হইল শহরতলির সম্পত্তি। দোকানপাট যাহা আছে না-থাকিবারই মধ্যে।

কিছুকাল পূর্বে মুন্সেফি লইয়া আসিয়াছি। আদালত শহরতলিতে নহে, শহরেই। একটি প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার গাড়িতে সকালে আদালতে যাই, সন্ধ্যায় সেই গাড়িই আবার ফিরাইয়া লইয়া আসে। সংসারধর্ম পালনের খরচ যথেষ্ট, এবং যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি মুন্সেফি করিয়া লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, তাঁহারা কি উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করেন, সেটা এখনও প্রহেলিকার মধ্যে। তবে মুন্সেফ যখন হইয়াছি, তখন কালে সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি যে মিলিবে সে বিষয়ে ভরসা আছে।

চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ করিয়াছিলাম। ত্রিশের প্রান্তে আসিয়া যখন চাকুরি এবং জীবনসঙ্গিনী দুইটি দুর্লভ বস্তুর সম্বন্ধেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন একই সঙ্গে দুইই মিলিল। বিনতা নিতান্তই ছেলেমানুষ, মোটে উনিশ বছর বয়স।

চাকরি পাইয়াছি সাতমাস পূর্বে, এবং বিবাহ করিয়াছি মাসখানেক পরেই। ফলে টাকার টানাটানি সত্ত্বেও ছয়মাস পূর্বে আরব্ধ মধুযামিনী এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। যতটুকু সময় আদালতে থাকি, ঘড়ির দিকে চাহিয়া সময় কাটে। কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হইবার মত মনোভাব এখনও আসে নাই। ফলে ঘড়ির কাঁটা যথাস্থানে পৌছিলেই উঠিয়া পড়ি, এবং কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হই।

যতক্ষণ একত্র থাকি, নেহাৎ ঘুমাইয়া না পড়া পর্যন্ত বিনতাকে শুনাইতে হয় আমি তাহাকে ভালোবাসি কিনা, এবং কতখানি ভালোবাসি। যেহেতু প্রেমের কোনও মাপকাঠি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত

হয় নাই, এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অথবা ওজনের অনুপাতে তাহার পরিমাণ নির্ধারিত করা যায় না, কাজেই আমার উত্তর হয়, "হ্যাঁ, বাসি, অনেকখানি।" মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য বলি "একটুও না", ফলে অবিলম্বে কৃত্রিম মান-অভিমানের পালা শুরু হইয়া যায়, এবং চিরাচরিত প্রথায় মানভঞ্জন করিতে হয়। মন্দ লাগে না।

যাঁহারা দীর্ঘদিন বিবাহিতজীবন যাপন করিয়া মুখরা পত্নী, এবং অধিকসংখ্যক পুত্রকন্যাদি লইয়া বিব্রত আছেন, এ কাহিনী তাঁহাদের ভালো লাগিবে না। মুশকিল এই, যাঁহারা বিবাহই করেন নাই, তাঁহাদেরও যে লাগিবে এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কারণ তাঁহারা এবংবিধ বর্ণনা অসহ্য ন্যাকামির পর্যায়ে ফেলিয়া বিরক্ত হইবেন।

কিছুদিন হইতে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সেটি হইতেছে অত্যন্ত আধো আধো স্বরে "আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?" এই প্রশ্ন। সম্ভবত ইহার পরের ধাপই, "আমি ম'রে গেলে তুমি আবার বিয়ে করবে?" প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে ওষ্ঠে ওষ্ঠ দিয়া প্রশ্ন করার পথই বন্ধ করিয়া দিতেছি। দ্বিতীয়টি আরম্ভ হইলে কি করিব এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

অথচ মজা এই যে আমি তাহাকে ভালোবাসি কিনা, সে বিষয়ে বিনতার সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু অশনবসনের অভাব এবং মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। মুন্সেফের বেতন কম, অথচ নূতন মুন্সেফ বলিয়া খানিকটা চাল বজায় রাখিতেই হয়, নচেৎ লোকে মুখ টিপিয়া হাসে, এবং বাংলাদেশের যাবতীয় মুন্সেফের সহিত একগোত্রে ফেলিয়া প্রাতঃকালে নামগ্রহণ করিতে বিরত থাকে। ব্যয়াধিক্য সত্ত্বেও বিনতাকে প্রায় প্রতিমাসেই একখানি করিয়া রেশমের শাড়ি কিনিয়া দিতেছি (এ জিনিসটা এদিকে প্রস্তুত হয়, ফলে খানিকটা সস্তা), এবং যে স্বামী এই দুর্মূল্যের বাজারে মুন্সেফি বেতন হইতে বাঁচাইয়া স্ত্রীকে রেশমের শাড়ি কিনিয়া দেয়, তাহার পত্নীপ্রেমে সন্দেহ থাকিলে চলে কি করিয়া! তবু নববধূর ভীতিপ্রদ প্রশ্নের বিরাম নাই।

এমনি করিয়াই চলিতেছিল। সেদিন বাড়ি ফিরিয়া দেখি, পত্নী এক বর্ষীয়সী অপরিচিতার সহিত গল্প করিতেছেন। ভদ্রমহিলা আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না, সে বয়সও তাঁহার ছিল না। আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "জামাই বুঝি?" প্রত্যুত্তরে গৃহিণী এমন একটি সলজ্জ ভঙ্গী করিলেন, যে কথা না কহিয়াও প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর দেওয়া হইল।

মহিলাটিকে পূর্বেও পথে ঘাটে দেখিয়াছি, এবং তাঁহার পাকা চুলে অনেকখানি সিন্দুর ও পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি চোখে পড়িয়াছে।

তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে প্রশ্ন করিলাম, "উনি কে?"

বিনতা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "চিরসধবা।"

উত্তরটা খুব পরিষ্কার মনে না হওয়ায় কহিলাম, "সবই বুঝলাম।"

বিনতা কহিল, "ছাই বুঝেছ।"

তখন পুরা ইতিহাসটা শুনিলাম। ভদ্রমহিলার বয়স আশির কাছাকাছি। ষাট বৎসর পূর্বে

জনৈক কুলীনের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহটা নিতান্তই কন্যার পিতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য, কারণ বিবাহের পরেই স্বামী স্থানান্তরে গমন করেন, এবং তদবধি স্বামিস্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবার আশা কম।

ষাট বৎসর পূর্বে কৌলীন্যপ্রথা বজায় ছিল কিনা, অথবা এ বিবাহটা একটু অসাধারণ ঘটনা, তাহা জানিনা। তবে শুনিলাম, এই বিবাহের পূর্বেও নাকি স্বামী আরও গুটিকয়েক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কহিলাম, "তা নাহয় হ'ল। কিন্তু কুলীনরা শুনেছি সম্মান আদায় করার জন্যে খাতা দেখে শ্বশুরবাড়ি যেত মধ্যে মধ্যে, ওঁর স্বামী কি তাও আসেন নি?"

"উঁহু! বোধ হয় গোলমালে তাড়াহুড়োর মধ্যে খাতায় নাম তুলতে ভুল হয়ে গেছ্‌ল। ভদ্রলোক ঐ লগ্নেই আরও তিনটে বিয়ে করেছিলেন কিনা!"

অর্থাৎ যতদিন স্বামীর সংবাদ না পাওয়া যায়, ততদিনই ইনি সধবা। আজ এতদিন পরে স্বামীর সংবাদ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না, এবং ইনিও আয়ুর পথে যে দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছেন, তাহাতে সিঁথায় সিঁদুর এবং পায়ে আল্‌তা লইয়াই যে চিতারোহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণত নাকি স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে বারো বৎসর পরে সৌভাগ্যের চিহ্ন বর্জন করিতে হয়, কিন্তু যাঁহার উদ্দেশই কোনদিন ছিল না, তাঁহাকে নিরুদ্দিষ্টের পর্যায়ে ফেলা যায় কি করিয়া? ফলে বামুনদিদি সধবাই রহিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করা অবধি একটু ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছি। বৃদ্ধার ষাট বৎসরের কাল্পনিক সধবাজীবনের কথা ভাবিতে লাগিলাম। সধবার লক্ষণ কি? স্বামিসঙ্গ? না সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া, এবং সঙ্গতিতে জুটিলে মাছভাত-ভক্ষণ? পরিধেয় ও আহার্যে সধবাবিধবার ব্যতিক্রম না থাকিলে অন্তত এই সমস্যাটা মিটিত, এবং যে স্বামী সম্ভবত বহু বৎসর আগে মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে তাহার অস্তিত্ব হাস্যকরভাবে কল্পনা করিতে হইত না।

তাহার পর হইতে বামুনদিদিকে প্রায়ই আমার বাড়িতে দেখিতাম। তাঁহার বাপের বাড়ি অথবা শ্বশুরবাড়ি কোথায়, এবং এই শহরে তিনি কি সূত্রে আসিয়াছেন তাহা জানি নাই, তবে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে দুটির একটিও এ শহরে নহে। এককালে বোধ হয় বামুনদিদি দেখিতে সুন্দরীই ছিলেন। মুখের অগণিত বলিরেখার মধ্য দিয়াও যুগ-যুগ-আগে-অদৃশ্য রূপের খানিকটা আভাস এখনও পাওয়া যায়। ভাবিয়াছি, কুলীনের কন্যা হওয়ায় তিনি বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া ছিলেন, রূপের অভাব ছিল না, সে সময় কি গ্রামের কোনও সমবয়স্ক তরুণের প্রতি তাঁহার চিত্ত এতটুকুও আকৃষ্ট হয় নাই? বিবাহের পরে অবশ্য ও-সকল কথার চিন্তা করাই পাপ, কারণ হিন্দুর মেয়ের জাতই আলাদা। কিন্তু বিবাহের আগে?

তাঁহার দিনগুজ্‌রান কি করিয়া হইত, সে চিন্তা প্রথমে মনে উদিত হইলেও দুই-একদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। বিনতার মত অসমবয়সী সখীর অভাব তাঁহার ছিল না। ফলে

কলাটা মূলাটা, কখনও বা অল্পপুরাতন একখানা লালপাড় শাড়ি হাত বদল করিত, একটি মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন তাহাতেই চলিয়া যাইত।

বিনতা বলিতেছিল, "বামুনদিদি লোকটি বেশ, কিন্তু এ আবার কিরকম সধবা বুঝি না। যে স্বামীর সঙ্গে দু-একদিনের বেশি দেখা পর্যন্ত হ'ল না, সে স্বামী থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? আর ওঁর বয়েসই হ'ল আশির কাছাকাছি, স্বামীর অন্তত নব্বুই—বেঁচে আছে না ছাই।"

বলিলাম, "বেঁচে যে নেই সেটা সত্যি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আছে এই কল্পনা ক'রে বেচারা যদি দুটো মাছভাত খেতে পান, তাতে তোমার আপত্তি কি? উনি আলোচাল কাঁচকলা খেয়ে থাকলেই তোমার কি খুব বেশি সুবিধে হ'ত?"

বিনতা রাগ করিয়া কহিল, "আমি কি সেই কথা বলছি? আমি বল্‌ছি, ওঁর সধবা-বেশের কথা। ওঁর ইচ্ছে হয় এবং রুচি থাকে তো উনি রোজ দুবেলা পোলাও কালিয়া খান্-না কেন, আমার কি? শখ হয় তো বেনারসী শাড়ি পরুন না, তাতেই বা আমার কি? আমার আপত্তি হচ্ছে ওঁর সধবার চিহ্নগুলো সম্বন্ধে।"

ভাবিলাম বলি যে, অশীতিপরা বৃদ্ধার দুবেলা পোলাও কালিয়া খাওয়া সামর্থ্যে যদি বা কুলাইত স্বাস্থ্যে কুলাইবে না। আর বেনারসী শাড়ি? সকলের তো আর স্ত্রৈণ মুন্সেফ স্বামী নাই!

কিন্তু যে কথা মনে মনে অক্লেশে ভাবা যায়, মুখে প্রকাশ করিলে তাহাতেই প্রাণান্ত ঘটিতে পারে। একটা কিছু বলিতে যাইতেছি, বিনতা কহিল, "আচ্ছা মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর পরে কেন? স্বামীর কল্যাণের জন্যেই তো? ওঁর তো স্বামীর কল্যাণের কথা ভেবে রাতে ঘুম হচ্ছে না! ধরো, ওঁর স্বামী সত্যিই বেঁচে আছেন, এবং হঠাৎ তাঁর মারা যাওয়ার খবর এল। উনি কি কাঁদবেন?"

উত্তর দিতে পারিলাম না। বলিলাম, "যেহেতু বাংলা দেশে সাধারণ মানুষের আয়ু তেইশ বছর, ধরে নেওয়া যেতে পারে, ভদ্রলোক বহুকাল আগেই পটল তুলেছেন, এবং বামুনদিদির সে রকম কান্নার কোনও কারণ ঘটবে না।"

স্ত্রীজাতি পরস্পরের সম্বন্ধে কতটা অকরুণ হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গত কয়েকদিন ধরিয়া বিনতা মরিয়া গেলে আমি কাঁদিব কিনা প্রশ্নটা দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়য়াছে। পাল্‌টা প্রশ্ন করিতে সাহস হয় না। কেন সে কথা ভুক্তভোগী বুঝিবেন। আছি বেশ। নেহাৎ মন্দ লাগে না। আর কয়েকবছর পরেই তো খুকুর জ্বর, খোকার আমাশা, প্রভৃতি বিষয় প্রেমালাপকে স্থানচ্যুত করিবে, যতদিন নূতনত্ব বজায় থাকে, ততদিন এ ছেলেমানুষিটুকুও থাক্-না!

শনিবার। বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়াছি। অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিয়াছে। বারান্দার

এক কোণে বসিয়া আমি ইংরাজী উপন্যাস পড়িতেছি, এবং আর-এক কোনে বসিয়া বিনতা অতি ক্ষুদ্র এক জোড়া মোজা বুনিতেছে। কাহার জন্য সেটা আপাতত গোপন থাক্।

এমন সময় বামুনদিদি প্রবেশ করিলেন, একখানি পোস্টকার্ড হাতে। বিনতা মোজার সরঞ্জাম লুকাইল। কাছে আসিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "দেখ্ তো ভাই, পিওন বললে আমার চিঠি। আমাকে আবার কে লিখবে ?

বামুনদিদিকে কে চিঠি লিখিবে ভাবিয়া আমিও অবাক হইলাম। বিনতা ঠিকানা পড়িয়া বলিল, "আপনার নাম কি মোক্ষদাসুন্দরী দেবী ?"

ও-নামটা সম্ভবত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কেহ বামুনদিদির সম্বন্ধে ব্যবহার করে নাই। তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "ওমা, তাই তো! আমারই তো বটে। তা কে লিখল পড়্ তো ভাই!"

চিঠি পড়িতে পড়িতে বিনতার মুখ গম্ভীর হইল। সহসা আমার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "তুমি এক্ষনি বাইরে যাও, যেখানে খুশি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এ বাড়ি এসো না। এই চিঠিটা নাও, পড়লে সব বুঝতে পারবে।"

আদেশ পালনে অভ্যস্ত হইয়াছি। বিনা প্রশ্নে পত্র হাতে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

পোস্টকার্ডের উপরে বাংলাদেশের যাবতীয় ডাকঘরের ছাপ। ঠিকানা কতবার নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

লিখিতেছেন হরিসদয় মুখোপাধ্যায়। মাসতিনেক আগে পিতৃদেব ৺কালীজীবন মুখোপাধ্যায় সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন, সেই সংবাদ ৺কালীজীবনের, ঈশ্বর জানেন, কোন্ পত্নীর পুত্র যাবতীয় বিমাতাকে জানাইতেছেন। চিঠি যথাসময়েই লেখা হইয়াছিল, বহু ডাকঘরের ছাপ খাইয়া এতদিনে বামুনদিদির হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কত প্রয়োজনীয় রেজিস্টার্ড চিঠি ডাকঘরে মারা পড়ে, আর এই পোস্টকার্ডখানি হতভাগিনী মোক্ষদাসুন্দরীকে পৌঁছাইয়া না দিলে ডাকবিভাগের সুনামের যেন হানি হইত!

দু ঘণ্টার স্থানে তিন ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরিলাম। আমার বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তাহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। আর সেই লোকারণ্যের মধ্যে বামুনদিদি ভূলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতেছেন, শহরতলির যাবতীয় অধিবাসীও তাঁহার পতিশোকে সান্ত্বনা দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কান্নার ধুয়া হইতেছে, "ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো ?"

যে ব্যক্তি বিবাহের পরেই ফেলিয়া পলাইয়াছে চিরদিনের জন্য, তাহাকে আর একটু দূরে যাইবার অপরাধে দোষারোপ করা আমার নিকট অসহ্য হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। হাসি চাপিতে না পারিয়া আবার বাহিরে আসিলাম।

একটা কৌতূহল উদয় হওয়ায় হরিসদয় মুখোপাধ্যায়ের পত্রখানি আবার আদ্যোপান্ত পড়িলাম। নাঃ, ৺কালীজীবনের বয়স কত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরীরই যখন আশি, এবং মোক্ষদাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও যখন ভদ্রলোকের আরও গোটাকয়েক স্ত্রী ছিল, তখন বয়সটা যে মারাত্মক রকম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বামুনদিদি তাহা হইলে মাসতিনেক বাদ দিলে সম্পূর্ণভাবে সাধব্যপালনে অধিকারিণী!

আপাতত তিনটি কঠিন প্রশ্নের মধ্যে দুইটির জবাব মিলিয়াছে; প্রথম, বামুনদিদি অযথা সধবাজীবন যাপন করেন নাই, ন্যায্য অধিকার বশতই করিয়াছেন। দ্বিতীয়, স্বামীর সহিত বিবাহের পরে আর দেখা না হইলেও বামুনদিদি পতির ৺গঙ্গালাভের সংবাদে কাঁদিয়াছেন, বেশ বিনাইয়া বিনাইয়াই কাঁদিয়াছেন। তৃতীয় প্রশ্নটা এখনও গোলমাল করিতেছে। সেটি হইতেছে, এই স্বল্পজীবী বাঙালীজাতির দেশে ভদ্রলোক কি করিয়া নব্বুই অথবা ততোধিক বৎসর বাঁচিলেন?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পাইলাম রাত্রে। ইচ্ছা করিতেছিল বিনতার দৈনন্দিন প্রশ্নটা পাল্‌টাইয়া জিজ্ঞাসা করি, আমার ভবলীলা সাঙ্গ হইলে বিনতা বামুনদিদির মত কাঁদিবে কি না। সাহস হইল না। শুধু আস্তে আস্তে কতকটা আপন মনেই কহিলাম, "উঃ, ভদ্রলোকের বিস্তর বয়েস হয়েছিল নিশ্চয়। বাবুনদিদিরই আশি, তাঁর তো অন্তত নব্বুই!"

কথাটা প্রশ্ন-আকারে গ্রথিত না হইলেও বিনতা জবাব দিল। গম্ভীরভাবে কহিল, "না, ওঁর স্বামী ওর চেয়ে আট বছরের ছোট ছিলেন।"

বাঁচিলাম। একটা বাঙালী অক্লেশে নব্বুইয়ের কোঠায় পা দিয়াছে ভাবিয়া অযথা কষ্ট পাইতেছিলাম। এখন অনেকটা শান্ত হইলাম।

একটা কথা। বামুনদিদির চিঠিখানা প্রথমে বিনতার পরিবর্তে আমার হাতে পড়িলে ইতিহাস অন্যরূপ হইত।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপঞ্জী

জন্ম: ৬ নবেম্বর ১৮৭০ মৃত্যু: ১৯ আগস্ট ১৮৯৯

১। **চিত্র ও কাব্য**। ৫ ভাদ্র ১৩০১ (২০ আগষ্ট ১৮৯৪)।' পৃ. ১১৭

সূচী: কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, জয়দেব, পশুপ্রীতি, কাব্যে প্রকৃতি, রবিবর্ম্মা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র। এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

২। **মাধবিকা** (কাব্য)। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ ৩২

৩। **শ্রাবণী** (কাব্য)। ৪ আষাঢ় ১৩০৪ (১৭ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ২৬

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী। ১৩১৪ সাল (৯ আগষ্ট ১৯০৭)। পৃ. ৭৩৫

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত। ইহাতে বলেন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

"অভিধান বনাম অন্বয়"

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের "অভিধান বনাম অন্বয়" প্রবন্ধের বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তা এখানে সংক্ষেপে বল্‌ছি।

(১) "মত্ত মধুপ ভোরণি" ও "কুলবতি চিত চোরণি"—এখানে "ভোরণি" ও "চোরণি" শব্দে গোবিন্দদাস কবিরাজ ব্যাকরণ অভিধান ও প্রয়োগরীতি কোনটিই উল্লঙ্ঘন করেন নি। সংস্কৃত হ্বল্ ধাতু থেকে *হ্বলনিক (া) > প্রাকৃত ভোরণিঅ (া), ভোলণিঅ (া) > লৌকিক বা আধুনিক ভোরণি (শৌরসেনী > ব্রজবুলি), ভোলনি (মোগধী > বাংলা ; আধুনিক বাংলায় ভুলানি, ভুলুনি)। "মত্ত মধুপ ভোরণি" বিশেষণ, বিশেষ্য "মল্লি মালতি যূথি"। তেমনি "কুলবতিচিত চোরণি"-ও "মুরলি-গান পঞ্চম-তান"-এর বিশেষণ। সংস্কৃত চোরণিক (া) > প্রাকৃত চোরণিঅ (া) > লৌকিক চোরণি (আধুনিক বাংলায় চুরনি > চুন্নি)। এই রকম "-নি" প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায় দুর্লভ নয়; যেমন, চাহনি > চাউনি, ছাঅনি > ছাউনি, জলনি > জলুনি, কাদনি > কাদুনি ইত্যাদি [সুনীতি বাবুর বই দ্রষ্টব্য]।

(২) দামিনী শব্দের "বিদ্যুৎ" অর্থ পরে এসেছে, "বিদ্যুদ্দাম-" এই সমাসযুক্ত পদের প্রথম শব্দের লোপের পর। "দামন্" শব্দের অর্থ "রজ্জু", "মালা"। এইরূপ "বিদ্যুল্লতা"। বিদ্যুৎ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ তাই যখন "দামন্" শব্দ এই অর্থে ব্যবহার হল তখন এটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে হল "দামিনী"।

(৩) শশিবাবু বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের মাদার গাছ দেখেন নি। মাদার গাছ অনেক রকম হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যে মাদার গাছ দেখা যায় তা বৃহৎ ও ঘনপত্রবহুল। "আঁধার হল মাদার গাছের তলা"—রবীন্দ্রনাথের এই কথা প্রত্যক্ষদর্শীর সম্পূর্ণ স্বভাবোক্তি।

(৪) "(ক্ষিতি) সৌরভরভসে" লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ আভিধানিক অপরাধ করেন নি। তাঁহার আট ন শ বছর আগে জয়দেব লিখে গেছেন "মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে"।

(৫) পশ্চিম বঙ্গে "ঘসি" ঠিক ঘুঁটে নয়; এ হচ্ছে আস্ত গোবর শুখনো। সুতরাং এর ধিকি ধিকি আঁচ বহুক্ষণ থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় "ঘসি" ও "ঘুঁটে" সমার্থক। সুতরাং চণ্ডীদাস "নাত্রাপরাধঃ।"

(৬) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু পোহালে।" শশিবাবু মন্তব্য করেছেন, "বেলা পোহাইল" এরূপ ব্যবহারও বাংলায় কোথাও নাই। শশিবাবু জানেন না, পশ্চিম বাংলার কথ্য-ভাষায়—মধ্য রাঢ়ে—এই ইডিয়ম খুব চলিত আছে; "বেলা পুইয়ে গেল", এমন কি "রোদ পুইয়ে গেল" হুগলি-বর্দ্ধমানের যে কোন গ্রামে গেলে শোনা যায়।

প্রসিদ্ধ কবিদের লেখায় প্রয়োগের অসঙ্গতি দেখাতে গেলে সাবধান হওয়া দরকার। বাক্‌পতিরাজ রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নাই।

শ্রীসুকুমার সেন

প্রবন্ধলেখকের উত্তর

বিশ্বভারতী পত্রিকায় আমার 'অভিধান বনাম অন্বয়' শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় কিছু মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কতগুলি শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তবে তাঁহার বক্তব্যের সহিত আমি বহুস্থানে একমত হইতে পারি নাই। তাঁহার বক্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছে।

(১) 'মত্ত মধুপ ভোরণি'— সুকুমার বাবুর মতে 'ভোরণি' শব্দটি এখানে সংস্কৃত হ্বল্-ধাতু হইতে জাত এবং 'মত্ত মধুপ ভোরণি' 'মল্লি মালতি যুথি'র বিশেষণ। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এই— মত্ত-মধুপকে ভোলায় যে এমন 'মল্লি মালতি যুথি'। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'মত্ত' কথাটির কোনই সার্থকতা থাকে না। যে-ফুলের সৌন্দর্যে এবং মধু-গন্ধে ভ্রমর মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ফুল তাহাকেই আবার ভুলাইতেছে এ-কথার তাৎপর্য কি? ভুলিয়া মত্ত হয়, মত্ত হইয়া ভোলে না। এই জন্যই আমি 'ভোরণি' শব্দটিকে ভ্রমর গুঞ্জন অর্থে গোবিন্দদাসের একটি নূতন ধ্বন্যাত্মক শব্দসৃষ্টি বলিয়া মনে করিয়াছি; সমস্ত পদটির ধ্বনি-সম্পদের প্রাধান্য এই অনুমানের অনুকূল। তা ছাড়া সুকুমারবাবু যে অর্থে 'ভোরণি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই অর্থে এই শব্দটির পদাবলী সাহিত্যে অন্যত্র কোথায়ও ব্যবহার পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত নহি; তবে শব্দটির এইখানেই যদি একক ব্যবহার দেখা যায় তবে তাহাও আমার ব্যাখ্যারই অনুকূল। আরও লক্ষণীয়, এই 'ভোরণি-'র সঙ্গে অন্য যে-সকল নি-প্রত্যয়ান্ত শব্দের মিল দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রায় সকলই বিশেষ্য। যথা, 'মুরলিক কল লোলনি' 'একু কুণ্ডল ভোলনি', 'গলিত বেণি লোলনি (চঞ্চলতা)', 'গোবিন্দ দাস গাওনি' প্রভৃতি। সুতরাং সমগ্র পদটির সহিত অন্বয়ে গ্রহণ করিলে 'ভোরণি' শব্দটিকেও ক্রিয়া-বিশেষ্য বলিয়াই সহজে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। শব্দটির অভিধার্থই গ্রহণ করিতে হইলে এ-ক্ষেত্রে সুকুমারবাবু প্রদত্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা ৺সতীশচন্দ্র রায়ের ব্যাখ্যা (অর্থাৎ বিহ্বলতা অর্থে 'ভোর' শব্দ হইতে জাত) আমার অধিক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। 'চোরণি' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে সুকুমারবাবু আধুনিক বাঙলার 'চুরণি' > 'চুন্নি' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। 'চুরি করে যে' এই অর্থে পুংলিঙ্গে 'চুরণি' বা 'চুন্নি' শব্দের ব্যবহার আমার জানা নাই। সুকুমারবাবু এই প্রসঙ্গে বাঙলায় এই জাতীয় নি-প্রত্যয়ান্ত কতগুলি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; চাউনি, ছাউনি, জ্বলুনি প্রভৃতি শব্দের বাঙলায় কোন বিশেষণাত্মক ব্যবহার আমার জানা নাই, আমি ইহাদের বিশেষ্যরূপে ব্যবহারের সহিতই পরিচিত।

(২) দামিনী শব্দটি যে অর্বাচীন তাহাতে আমারও সন্দেহ নাই। আমি আমার প্রবন্ধের মধ্যে শব্দটি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতরেই আমার এই সংশয় স্পষ্ট। সুকুমারবাবু এখানে শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন প্রবন্ধটি লিখিবার পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে ঐ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু 'বিদ্যুদ্দাম' হইতে 'দামিনী' কথার বিদ্যুৎ অর্থ গ্রহণ করিতে মুশকিল হয় এই, বিদ্যুৎ অর্থে 'সৌদামিনী' (সৌদামনী) শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে

রহিয়াছে। 'দামন্' শব্দের 'রজ্জু', 'মালা' (বা 'মেখলা') অর্থ হইতেই শব্দটির বিদ্যুৎ অর্থে ব্যবহার এ-সম্বন্ধে সুকুমার বাবুর সহিত আমার প্রবন্ধেরও কোন বিরোধ নাই।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে যে মাদার গাছ দেখা যায় তাহাকে ঠিক 'বৃহৎ এবং ঘনপত্রবহুল' বলা যায় কি না সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যদি বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবন্ধের ভিতরে আমি যে কথা বলিয়াছি তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ দেখিতেছি না। সন্ধ্যার অন্ধকারের বর্ণনায় এ-জাতীয় মাদার গাছের কোন কবি-প্রসিদ্ধি নাই ; রবীন্দ্রনাথ 'আঁধারে'র প্রসঙ্গে মাদারের 'ঘনপত্রবহুলতা' হইতেও 'মাদার' নামটির দ্বারা যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সে বিশ্বাস আমার এখনও রহিয়া গেল।

(৪) 'সৌরভরভসে' লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কোন আভিধানিক অপরাধ না করিতে পারেন, কিন্তু এখানেও শব্দটির সার্থকতা যে আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিগত অন্বয়ের ভিতরেই বেশি আমার সে কথাটি সুকুমার বাবু কর্তৃক উদ্ধৃত জয়দেবের 'মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে' চরণটির ভিতরে আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৫) 'ঘসি' ও 'ঘুঁটে'র ভিতরে পশ্চিমবঙ্গে কি সূক্ষ্ম তফাৎ রহিয়াছে তাহা আমার জানা নাই। গোবরের শুকনো চাকতিকেই ত আমরা ঘসি বলিয়া জানি, সহরতলিতে তাহার সহিত মাটির ভেজাল দিয়া ঘুঁটে প্রস্তুত হয়। সে যাহাই হোক, আমার বক্তব্য অর্থাৎ 'দহ দহ' শব্দের যোগে 'ঘসি' শব্দের কাব্যরূপ ফুটিয়াছে ভাল সে-কথা 'ঘসি' এবং 'ঘুঁটে' ঠিক এক না হইলেও বোধ হয় ঠিক থাকিবে।

(৬) 'বেলা পুইয়ে গেল', 'রোদ পুইয়ে গেল' প্রভৃতি বিশিষ্ট বচন-রীতি আমার জানা ছিল না।

শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত

স্বরলিপি

তোমায় নতুন করে পাব ব'লে : ফাল্গুনী

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** শ্রীইন্দিরা দেবী

```
                                                          I
পা   পা  II {পা   মপা | -ধণর্সা   ণা   ধা | পা   পা | পা   পা   -  া I
তো   মায়       ন   তু ০  ০ ০ ন্   ক   রে  পা   ব   ব   লে      ০

        I পা   পধা | -পধণধা   পমা   গা | মা   -   ধা | ণা   র্সা   -   ণধা I
          হা   রা ০   ০০০ই    ক্ষ ০   ণে   ক্ষ       ণ্   ও   মো        ০র্

                                             [-া   -া     -া]
        I ধা   ণা | র্সা   ণা   -   া | ধা   -   া | -   ণা   ধা   -   পা } I
          ভা   ল   বা   সা      র্   ধ      ০      ন্   তো      মায়্

        I  ধর্সা   র্সা | না   র্সা   না | র্সা   না | র্রর্সা   -া   -পা I
           দে    থা   দে   বে     ব   লে    তু   মি    ০    ০
```

I পা না | র্সা না র্সা | নর্সা - র্রর্সর্রর্সা | না র্সা -ণধা I

হ ও যে অ দ র্শ০ ০০০ন্ ও মো ০র্

I ধণা র্সণা | -া ধা -া | -ণা ধা | পা - া - া II

ভালো বাসার ০ ধ ০ ন্ "তো মায়" ০ ০

[পা ধা]

II {পা পা | পা পা -া | ধর্সা র্সা | র্রা র্রা -া I

তু মি আ মা র্ নও আ ড়া লে র্

[-া]

I র্রর্পা র্মা | র্গা র্রা -া | র্সর্রা র্সধর্সা | ণধা পা - পধণর্সা } I

তু মি আ মা র্ চি০ র০০ কা০ লে ০০০র্

I পা না | না -না না | -র্সা না | র্রর্সা -া -পা I

ক্ষ ণ কা লের্ লী লার্ স্রো তে ০ ০

I পা না | র্সা না র্সা | নর্সা -র্রর্সা | না র্সা -ণধা I

হ ও যে নি ম গ০ ০ন্ ও মো ০র্

I ধা ণা | র্সা ণা -া | ধা -া | - ণা ধা -পা II

ভা ল বা সা র্ ধ ০ ন্ "তো মায়"

II {পধা পা | মা গা -া | মা ধা | পা ধা -া I

তো মায় য খ ন্ খুঁ জে ফি রি ০

I মা ধা | পা ধা ধণা | -র্সণা ধা | পা পা -পা I

ভ য়ে কাঁ পে ম০ ০ন্ প্রে মে আ মার্

[তো মার]

I পধা ণা | ধা পমা গা | -মা -া | -া পা পা ¦ I

ঢে০ উ লা গে০ ত খ ০ ন্ আ মি

[ণা -া ধা]

I {পা -া | পা পা পা | ধা -র্সা | র্স র্রা র্রা I

শে ষ্ না হি তাই শূ ০ ন্য সে জে

[পা]

I র্রর্পা -া | র্মা র্গা র্রা | র্সর্রা -ধর্সা | ণা ধা পধণর্সা } I

শে ষ্ ক রে দাও আ০ প্ না কে যে০০০

I পনা না | না না না | -া র্সা | না র্রর্সা - পা I

ঐ০ হা সি রে দে য় ধু য়ে মো র্

I পা না | না -া র্সা | নর্সা -র্রর্সা | না র্সা -ণধা I

বি র হে র্ রো দ০ ০ন্ ও মো ০র্

I ধণা র্সা | ণা -া ধা | -া -ণা | ধা - পা -া II II

ভালো বা সার্ ০ ধ ০ ন্ "তো মায়" ০